বাণীভবনে শিল্প শিক্ষা

সংখ্যা-১-৬, ৮, ১০, ১২, ১৩৩৩

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৪র্থ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৩৩ | ১ম সংখ্যা

নববর্ষ

শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া আমরা মাতৃ-মন্দিরের ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ করিলাম; শিশুকালের তিনটি বৎসর মাতৃ-মন্দির নিরাপদে রক্ষা পাইয়া ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা তাঁহারই বিশেষ আশীর্ব্বাদের ফল।

বাংলার নারীদিগের মধ্যে নানা ভাবের শিক্ষার আলোচনা হওয়াই মাতৃ-মন্দিরের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে প্রথম বৎসরের মাতৃ-মন্দিরের ভিতর দিয়া বাংলার নারীদিগকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বৎসরে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইয়া উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। তৃতীয় বৎসরে নানা ভাবের শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছে।

এক্ষণে এই চতুর্থ বৎসরে মাতৃ-মন্দির প্রকৃত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। এখন হইতে ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে,—

(ক) মহিলাদিগের সাধারণ শিক্ষা।

(খ) বিভিন্ন স্থানে মহিলা সমিতি গঠন।

(গ) পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষা।

(ঘ) সেবা ও রোগী পরিচর্য্যা।

(ঙ) রন্ধন ও আহার সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক প্রথা।

(চ) প্রাচীন ও বর্ত্তমান গার্হস্থ্য নীতি।

(ছ) গৃহ কর্ম্ম, সময়ের ব্যবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

(জ) চরকা, তাঁত, সূচিকর্ম্ম প্রভৃতি অর্থকরী সূচীশিল্প ও পারিবারিক অর্থনীতি।

(ঝ) সমাজ-বিজ্ঞান।

(ঞ) সার্ব্বজনীন ধর্ম্মালোচনা, আদর্শ নারী-জীবনী আলোচনা।

(ট) ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ প্রসঙ্গ।

(ঠ) দেশ-বিদেশের নারী-প্রগতি ও তাহাদের রীতিনীতি।

(ড) শিক্ষার সহিত নানা প্রকার মেয়েলী আমোদ প্রমোদ।

(ঢ) নারী কল্যাণ সম্বন্ধে সহর ও পল্লীর সংবাদ।

(ণ) অভাব অভিযোগ।

এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট কবিতা, গল্প-উপন্যাস যথাসম্ভব মাতৃ-মন্দিরে স্থান পাইবে। অল্পশিক্ষিতা পল্লী-মহিলাদের আবশ্যক শিক্ষাপ্রদ বিষয়েই মাতৃ-মন্দিরে বিশেষ ভাবে থাকিবে।

বাংলার সহর, পল্লী প্রভৃতি সর্ব্বস্থানের শিক্ষাব্রতী লেখক-লেখিকাদিগের নিকট এই সকল বিষয়ের অনুকূল প্রবন্ধ সাদরে মাতৃ-মন্দিরে পাইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আর একটি কথা এই যে, অন্ততঃ দশ হাজার বঙ্গ-মহিলা প্রতি মাসে নিয়মিত মাতৃ-মন্দির পাঠ করিয়া থাকেন। ইঁহারা অনেকেই উপযুক্ত লেখিকা না হইতে পারেন কিন্তু প্রত্যেকের প্রাণের ভিতরেই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভাবের চিন্তাধারা খেলা করিতেছে। কত প্রাচীন যুগের উপন্যাস ব্রতকথা, কত কবিতা ছড়া গান হেঁয়ালী, কত প্রবাদ বচন, কত খেলা ধূলা আমোদ প্রমোদ, কত গ্রাম্য রীতি-নীতি আচার পদ্ধতি, কত গার্হ স্থ্যছড়ার ডগ, কত টোটকা ঔষধ, আচার চাটনী আমসত্ত্ব বড়ি প্রভৃতি বার মাসের কত রকম খাদ্য—এই সকল লিখিয়া পাঠাইলে মাতৃ-মন্দির যথেষ্ট বিষয়-সম্পদ লাভ করিতে পারে। আমাদের ইচ্ছা বাংলার এই সকল সম্পদ নষ্ট হইতে না দিয়া মাতৃ-মন্দিরে সুরক্ষিত হউক।

দেশের শিক্ষিতা অর্দ্ধশিক্ষিতা মা-ভগিনীদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেমন করিয়া যাহা পারেন—এই সকল বিষয় কিছু কিছু মাতৃ-মন্দিরের জন্য লিখিয়া দিতে চেষ্টা করুন। সমস্ত লেখাই যে মাতৃ-মন্দিরে স্থান পাইবে এমন সম্ভব না হইলেও বহু বহু বিষয়ের মধ্যে এমন অনেক আবশ্যক বিষয় পাওয়া যাইবে যাহা মাতৃ-মন্দিরের পক্ষে মূল্যবান হইবে।

এসম্বন্ধে শিক্ষিতা মহিলারা যতটা দিতে পারিবেন, স্বল্প শিক্ষিতারা তাহা অপেক্ষা কম দিতে পারিবেন মনে হয় না। যেমন তেমন করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেই আমরা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

এই প্রসঙ্গে আমার স্বর্গগতা জননীর কথা মনে পড়ে; তাঁহাদের সময়ে পল্লীগ্রামে মেয়ে মহলে লেখা পড়া শিক্ষার প্রচলন ছিল না, তিনি লেখা পড়া জানিতেন না—অথচ কত গল্প, উপন্যাস, ছড়া, কবিতা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, কত শিক্ষাপ্রদ উচ্চ ভাব তাঁহার কাছে পাইয়াছি, তাহার অন্ত নাই। কেবল আমি কেন—মায়ের কাছে সকলেই এমন অনেক পাইয়াছেন যাহা বর্ত্তমান কালে দুর্লভ।

আমার মা বলিতেন "আঁচড়াও—আঁচড়াও হয় দেউল হবে, না হয় শিয়ালের গর্ত্ত হবে।" অর্থাৎ কর্ম্ম কর—কর্ম্ম কর, ফলাফলের ভাবনা ভাবিও না। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার কর্ম্মযোগের এই সার কথাটি কেমন সরল ভাবে আমার নিরক্ষর জননীদেবীর প্রাণে খেলিত ভাবিলে বাংলার নিরক্ষর প্রাচীনাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

মায়ের উপদেশ আমাকে এই শিক্ষা দেয়—শিক্ষিত অশিক্ষিত ভাবিয়া কাজ নাই, সক্ষম অক্ষম ভাবিয়া কাজ নাই, আমরা যাহাই থাকিনা কেন—আমরা কেবল কর্ম্মের মধ্য দিয়া চলিতে থাকিব, যতটুকু যাহা পারি মন প্রাণ দিয়া করিতে থাকিব,—শ্রীভগবান আমাদের সঙ্গে থাকিয়া ইহাই আদেশ করিতেছেন।

শ্রী অক্ষয়কুমার নন্দী।

বৈশাখ

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

নীলিমার নীল আঁখি কঠিন নিষ্ঠুর
গোপন খনির যেন মণি দিয়ে গড়া,
রবিকর রুদ্ররূপ, বিজুলি বিদ্ধুর
তীক্ষ্ণ তেজ রজত আলোর মত কড়া।
সে কর পরশে চোখে ভ'রে আসে জল
পল্লব লুইয়া পড়ে কাতর বাথায়,

কোমল মেদুর মেঘ সজল কাজল
ছায়ার মতন ধীর, গেল সে কোথায়?
সাগরের মমতায় আকাশের চোখে
দিক্ রেখা পেলব গভীর ভালবাসা,
অবারিত হৃদয়ের অমর আলোকে
ভাষার অতীত কোন্ অতলের আশা।

বাঙ্গালীর আহার

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রী চুনীলাল বসু, এম-বি, সি-আই-ই, আই-এস্-ও।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য অতি ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধ। পুষ্টিকর খাদ্য পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিলে শরীর ও মন যে সুস্থ ও সবল থাকে, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। খাদ্য অথবা তদন্তর্গত বিবিধ পুষ্টিকর পদার্থের যে কোনটীর অভাব বা অপ্রতুল হইলে শরীর যেমন দুর্ব্বল, শীর্ণ এবং বিবিধ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অকালে ক্ষয় বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রয়োজনাতিরিক্ত যে কোন খাদ্য গ্রহণ করিলে শারীরিক যন্ত্রাদির অতিরিক্ত পরিশ্রম বিধায় এবং দেহমধ্যে অপরিপাক-জনিত বিকৃত বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া দেহ নানাবিধ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

এই জীবন-মরণ-সমস্যার সন্তোষকর পূরণের ভার, কেবল আমাদের দেশে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নারীজাতির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। সকল দেশেই গৃহলক্ষ্মীগণ সমগ্র পরিবারের খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে যে পরিমাণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আবশ্যক, তাহার অভাব হইলে বিষম অনর্থপাতের সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড, জর্ম্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি বিজ্ঞানালোকোদ্ভাসিত দেশে দেহযন্ত্রের উপর খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের (বিশেষতঃ ভাইটামিন্ Vitamines নামক সার পদার্থের) প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা চলিতেছে। পাশ্চাত্য দেশের মহিলাগণ আমাদের দেশের মহিলাগণ অপেক্ষা শিক্ষাবিষয়ে অনেক অগ্রসর বলিয়া তাঁহারা এই সকল গবেষণার ফল আয়ত্ত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইতেছেন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীগণের তুলনায় আমরা এ বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি এবং স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও সুখ সচ্ছন্দতা লাভ সম্বন্ধে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছি। এই হেতু আমাদের গৃহের অন্নপূর্ণাদিগের অবগতির জন্য এস্থলে খাদ্য-বিষয়ক বিজ্ঞান-সম্মত দুই চারিটী কথা সংক্ষেপে বলিতে মনস্থ করিয়াছি। এবিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে খাদ্যের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, নানা কারণে (বিশেষতঃ সহর অঞ্চলে) তাহার সম্পূর্ণ ওলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। ঘি, দুধ, মাছ প্রভৃতি বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য্য পুষ্টিকর খাদ্য এরূপ মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের পক্ষে এই সকল অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য যথোচিত পরিমাণে সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি বিবিধ খাদ্যদ্রব্যে এত অধিক পরিমাণে ভেজাল দেওয়া হইতেছে যে যথোপযুক্ত অর্থব্যয় করিয়াও লোকে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। দুধের পরিবর্ত্তে আমরা শিশুসন্তানগণকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত যে সকল খাদ্য প্রদান করিতে বাধ্য হই, তাহাদিগের মধ্যে দেহের পোষণ ও বৃদ্ধির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ভাইটামিন্ নামক সারপদার্থের অভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। আমাদের দেশে এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক শিশুর মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এই কলিকাতা নগরীতে হাজার করা গড়ে চারি হইতে পাঁচশত শিশু জন্মের পর একবৎসরের মধ্যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লণ্ডনে শিশুমৃত্যু-সংখ্যা হাজার করা আশি জনের অধিক নহে। উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব যে এই শোচনীয় বালজীবনধ্বংসের একটী প্রধান কারণ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী সাধারণতঃ প্রত্যহ যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহার মধ্যে শরীর পোষণোপযোগী যাবতীয় পদার্থ যথা পরিমাণে অবস্থিতি করেনা। আমাদের দৈনিক খাদ্যে পেশীগঠক প্রোটীন্ জাতীয় সারপদার্থের যথেষ্ট অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ যে জাতীয় খাদ্য দ্বারা দেহ-মধ্যে চর্ব্বি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই শর্করা

তৈল জাতীয় উপাদান আমাদের খাদ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে অবস্থিতি করে। এই কথাগুলি ভালরূপে বুঝিতে হইলে খাদ্যের মধ্যে আমাদের দেহ-গঠন ও দেহের ক্ষয় পূরণ এবং তাপ ও কার্য্যকরীশক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত যে সকল সার পদার্থের অবস্থিতির আবশ্যক, এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

খাদ্য আমাদের দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন, তাপসংরক্ষণ, বলবিধান এবং পরিশ্রমজনিত ক্ষয়ের পূরণ করে। খাদ্যের উপাদান সমূহ দেহ মধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাদন করে এবং ঐ তাপের কিয়দংশ কার্য্যকরীশক্তিতে পরিণত হইয়া দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের পরিচালনের এবং পরিশ্রমসাপেক্ষ বাহ্যিক কার্য্য করিবার শক্তি আমাদিগকে প্রদান করে। এক্ষণে দেখা যাউক যে আমাদের খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় সারপদার্থ কি কি আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের কার্য্যই বা কি।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়জাতীয় উপাদান বা সারপদার্থ যথা পরিমাণে থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী উপাদানের অভাব অথবা উহার পরিমাণের অল্পতা বা আধিক্য ঘটিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া দেহ বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। এই সকল উপাদানের নাম ও তাহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়া নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

খাদ্যের উপাদান বা সার পদার্থ (Nutritive Principles).

(১) ছানা জাতীয় উপাদান বা প্রোটীন্ (Proteins)
(২) মাখন, তৈল বা চর্ব্বি জাতীয় ,, (Fats)
(৩) শর্করা বা শালিজাতীয় ,, (Carbohydrates)
(৪) লবণ জাতীয় ,, (Salts or Mineral matter)
(৫) জল ,, (Water)
(৬) ভাইটামিন্ জাতীয় ,, (Vitamines)

ছানাজাতীয় উপাদান বা প্রোটীন্

এই জাতীয় উপাদান দ্বারা পেশী ও শারীরিক যন্ত্রাদি গঠিত হয়। অস্থি প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য এবং শারীরিক রস, রক্ত প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার সহিত লবণ জাতীয় উপাদান ও জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে পেশী (Muscle) প্রভৃতির গঠন বা তাহাদের ক্ষয় পূরণের জন্য মাখন (Fats) বা শর্করাজাতীয় (Carbohydrates) উপাদান কোন কার্য্যে লাগে না। এই কার্য্যের জন্য ছানাজাতীয় উপাদান বা প্রোটীন্‌ই একমাত্র উপযোগী। সুতরাং খাদ্যে এই জাতীয় উপাদানের অভাব হইলে আমাদের শরীর সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, দেহ শিথিল, অপটু ও দুর্ব্বল হইয়া যথোচিত পরিশ্রমের কার্য্য করিতে অসমর্থ হয়, দেহের রোগ-প্রতিষেধ ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং এই শেষোক্ত কারণে আমরা বিবিধ উৎকট সংক্রামক রোগে সহজে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। বহুদিন ব্যাপিয়া খাদ্যে প্রোটীনের অল্পতা ঘটিলে মানসিক উৎসাহ ও শক্তি কমিয়া যায় এবং সকল কার্য্যেই অব্যবস্থিতচিত্ততা এবং দীর্ঘসূত্রতা লক্ষিত হয়।

দেশে দুধ ও মাছের অভাব হওয়াতে বাঙ্গালীর খাদ্যে বর্ত্তমান সময়ে যথোচিত পরিমাণে প্রোটীনের অভাব হইয়াছে। আমাদের দৈনিক খাদ্যে সের দুটাক (তিন-আউন্স) পরিমাণ প্রোটীন্ জাতীয় সার পদার্থ থাকা আবশ্যক, কিন্তু আমাদের গৃহস্থ পরিবারের এবং কলেজ হষ্টেল্ বা মেসের ছাত্রগণের খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহার মধ্যে এক ছটাকের (দুই আউন্স) অধিক প্রোটীন্ থাকেনা। যখন দেশে দুধ ও মাছ সুলভ মূল্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইত, তখন বাঙ্গালী তাহার দৈনিক খাদ্যে যথাপরিমাণে প্রোটীন্ পাইত এবং তখন তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল না। পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে কলিকাতার কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে শত করা ৬৬ জন ছাত্র কোন না কোনরূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত এবং একশত ছাত্রের মধ্যে কেবল মাত্র ১০।১২ জনের পেশী সুদৃঢ় ও সবল লক্ষিত হয়। যৌবন কালেই আমাদিগের ছাত্রগণের দেহের অবস্থা যদি এরূপ মন্দ হয়, তাহা হইলে একটু বেশী বয়সে কর্ম্মক্ষেত্রে যে তাহাদের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং অকালমৃত্যু এদেশে এত অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি!

যুক্তপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতনা, নেপাল, কুটান প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীগণের দৈনিক

খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের খাদ্যে ২ছটাক হইতে ২½ ছটাক পরিমাণ প্রোটীন্ বিদ্যমান থাকে। ইয়ুরোপীয়দিগের খাদ্যে ইহা অপেক্ষা অল্প প্রোটীন্ থাকে না, বরঞ্চ অনেক স্থলে বেশী পরিমাণ প্রোটীন্ থাকিতে দেখা যায়। এইজন্য এই সকল জাতি বঙ্গবাসী অপেক্ষা শারীরিক গঠন ও বলে সমধিক উন্নত এবং কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বিষয়েই বাঙ্গালীকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এমন কি, পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীগণ পশ্চিমবাঙ্গার অধিবাসীগণ অপেক্ষা বলিষ্ঠ, উন্নতদেহ, পরিশ্রমী এবং কষ্টসহ। উদ্যম, অধ্যবসায় ও দৃঢ়চিত্ততায় পশ্চিমবঙ্গবাসীগণ পূর্ব্ববঙ্গবাসী-গণের সমকক্ষ নহে। ইহার একটী কারণ এই যে পূর্ব্ববঙ্গে সুলভমূল্যে যথেষ্ট মৎস্য পাওয়া যায়, সুতরাং তথাকার অধিবাসীগণের দৈনিক খাদ্যে যথা পরিমাণ প্রোটীনের অভাব হয় না। পুষ্টিকর খাদ্য যথোচিত পরিমাণে তাহারা প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাদের শরীর আমাদের অপেক্ষা সুগঠিত, উন্নত ও বলিষ্ঠ, এবং তাহাদের সাহস ও মনের জোরও আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী।

(ক্রমশঃ)

অরূপ লহরী

শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ।

তব, নিত্য যা ঘটে জীবনে
　　এই নিখিল ভুবন-ভবনে,
তুমি, সোনার স্বপন মোহন মায়ায়
　　ছন্দ-পত্রে ভরিও ;
রজনী-দিবার পলক গুলিকে
　　মালা গেঁথে গলে পরিও !

তব, সরল হৃদয়ে আপনা হইতে যদি গো,
বহে, দুকূল ছাইয়া করুণা-প্রেমের নদী গো,
তুমি, উলসি বক্ষ, বিলসি তনুর তনিমা
　　ঢেউগুলি বুকে বহিও,
কলকথা চলে কি যে কথা বলে
　　গোপনে আমারে কহিও।

যদি, দূর গগনের কিনারে
পাখী, হারায় আপন দিশারে
　　তাহারি সুরের সুরের অরূপ লহরী
　　আপনার সুরে তুলিও,
তব, করপল্লবে ওই যে মোহন তুলিকা
　　মোর, আঁখনয়নে বুলিও।

যদি, নয়নের আগে একটি মোহন মালতি
　　তোমারেই করে মোহন রূপের আরতি,
তুমি, আপনার বুকে পরশিয়া তারে যতনে
　　মোরে, গন্ধে শোভায় মোহিও,
বুকে মুখ রেখে ফুল-জীবনের
　　কি কথা সে কয় কহিও।

মাতৃ-পূজা

শ্রী উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জগতে ভগবদারাধনার যত ভাবের পদ্ধতি আছে তৎসমুদয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোথাও পিতৃভাবে, কোথাও প্রভুভাবে, কোথাও বা বন্ধুভাবে ভগবদারাধনা প্রচলিত। কিন্তু কখন হইতে জানিনা এই ভারতে আমাদের হিন্দুজাতির ভিতর এতদতিরিক্ত মাতৃভাবে ভগবদারাধনার পদ্ধতিও প্রচলিত। বর্ত্তমানে এই মহদ্ভাবটি ভারতের বাহিরেও মানব-মনে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

আমাদের শাস্ত্র স্বজনীশক্তিরূপা প্রকৃতিকে স্পষ্টতম ভাবে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে; তাই মাতৃসাধনায় আমাদের অন্তর্দৃষ্টি সদা উৎফুল্ল! আমাদের গর্ভধারিণী মা, জন্মভূমি মা, ভাষা মা, জ্ঞানোন্মাদিনী মা, মুক্তিমুক্তি প্রদায়িনী মা, বেদমাতা গায়ত্রী গীতা উপনিষৎ মা, জ্যোতি-আকাশ, জল-বাতাস সবই মা, সর্ব্বরূপময়ী ভুবন-মনোমোহিনী মা। এই মা নাম নিলে আনন্দ পায় না, মাকে দেখিলে হৃদয়ে ভক্তি জাগে না, মাতৃচরণ বন্দনার জন্য মাথা নত হয় না, এমন মানুষ বিশ্বসংসারে আছে কিনা সন্দেহ। জগতের সকলজাতির সকলভাষায় অল্পাধিক বৈষম্যের ভিতর দিয়া এই 'মা' নাম নিনাদিত। মানবশিশু মাত্রেই, এমন কি অনেক পশুশিশুও ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাভাবিক মা নাম স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে। আমার মনে হয় ঋষিদের আবিষ্কৃত বেদের আদিময় ওম্ এবং মা সম্পূর্ণ অভিন্ন। মা-ই ওম্ আর ওম্ই মা।

ভগবদ্বাচক প্রণব উপাসনা যেমন চির অবিরোধী ও সার্ব্বজনীন, তেমন এই মাতৃ-উপাসনাও সার্ব্বজনীন। মাতৃ-পূজায় অনধিকারী কেউ নাই। সন্তান উচ্চ বা নীচ হউক, সম্রাট বা কাঙ্গাল হইক, পণ্ডিত বা মূর্খ হউক, সুরূপ বা বিকলাঙ্গ কুরূপ হউক, পুরুষ বা রমণী হউক, মায়ের স্নেহ যত্নের যেমন সকলেই সম অধিকারী; তেমনই মাতৃ-পূজায়ও সকলে সম্পূর্ণরূপে সম-অধিকারী। মায়ের সন্তানের পক্ষে এমন প্রাণমাতানো পূজা আর কি আছে?

এই মাতৃ-পূজা কিরূপে হয় তদ্বিষয়ে একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কোন মন্দিরে গিয়া মা-মা বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলেই মায়ের পূজা সুসম্পন্ন হয় না। মাকে পূজা করিবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া তাঁর পরিচয় লইতে হইবে। এতদ্বিষয়ে মাতৃসাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষদের চরিত্র পর্য্যালোচনাই একমাত্র সম্বল। যে কোনও মাতৃ সাধকের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা ইহাই স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, সাধকের ধ্যান-লব্ধ মূর্ত্তি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া 'সর্ব্বং মাতৃময়ং জগৎ' হইয়া গিয়াছে। আর এই মাতৃময়ত্বের বিশেষ বিকাশ তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন জগতের নারী জাতির ভিতরে। চণ্ডীর ঋষি বজ্রনাদে ঘোষণা করিয়াছেন 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'। জগতের প্রত্যেক রমণী জগজ্জননীর প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি। চিরকুমার দেবসেনাপতি কার্ত্তিক কুতূহলচ্ছলে শূকরিণীর স্তনে শরাঘাত করিয়া যখন স্বীয় জননী জগদম্বার স্তনযুগল ক্ষত ও রক্তাক্ত দেখিতে পাইলেন তখনই 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' মহাবাক্যের সত্যমর্ম্ম সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াই নিজ বিবাহিতা পত্নীকে ষোড়শীমাতৃকারূপে পূজা করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক রমণীর ভিতর জগন্মাতার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রণাম করিতেন—'সতীমা তোমাকে নমস্কার, অসতীমা তোমাকেও নমস্কার।' এইত প্রকৃত মাতৃদর্শন। বিশ্বমায়ের সর্ব্বভূতস্বরূপিনী মূর্ত্তি যিনি প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তিনি ধন্য হইয়াছেন।

মাতৃভক্ত সাধকের ধ্যানোত্থিত প্রত্যেক মাতৃমূর্ত্তিই বরাভয়া! সকল বিঘ্ন বিপদ নাশ করিয়া জগতকে নির্ভয় করিতে এবং জগতে সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠার্থ যা-কিছু

দরকার তৎসমস্ত অর্পণ করিতে যেন সদা প্রস্তুত। ইহা যথার্থই মাতৃহৃদয়ের ভাব। নারী চরিত্রেও এই ভাবটি সুস্পষ্ট। প্রত্যেক জননী সন্তানের, প্রত্যেক স্ত্রী স্বামীর, প্রত্যেক ভগ্নী ভাইয়ের সুখ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। এমন যে মাতৃজাতি তাঁহাদের পূজাই ত যথার্থ মাতৃ-পূজা। মনু মহারাজ লিখিয়া গিয়াছেন 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—যেখানে মাতৃজাতি সম্মানিত ও পূজিত সেখানেই দেবতার বাস, অর্থাৎ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বিরাজিত। তাহা হইলে যেখানে এসবের অভাব সেখানেই বুঝিতে হইবে দেবতার বদলে অসুরের বাস। অসুরেরা মাতৃজাতির পূজা না করিয়া অপমান অত্যাচারই করিয়া থাকে, ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জগতের ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে, মাতৃ জাতির সম্মান যখনই যে জাতি দ্বারা ব্যাহত হইয়াছে সেই জাতি সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

আজকাল প্রতিনিয়তই যে হেথা সেথা নারীহরণ ও নারী ধর্ষণের পাশব ক্রিয়া চলিতেছে, তাহা জাতির পক্ষে ধ্বংসের ও ঘোর অমঙ্গলেরই কারণ। যদি জাতিকে বাঁচাতে হয়, যদি জাতিকে মনুষ্যত্ব গৌরবে উন্নত করিতে হয়, তবে মাতৃ-পূজায় ঐসব হীন পশুভাবগুলিকে সর্ব্বাগ্রে বলি দিয়া প্রত্যেককে যথার্থ মাতৃভক্ত হইতে হইবে। বাঙ্গালীজাতি কি হিন্দু, কি মুসলমান, মাতৃপূজায় সকলকেই সমভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। কাহাকেও উদাসীন হইয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবেনা। সকলকেই বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে বাঙ্গালী সাধকের মহামন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'! এই মূলমন্ত্র শুধু মুখে উচ্চারণ করিলেই চলিবে না—প্রাণে প্রাণে জপ করিতে হইবে এবং মাতৃজাতির উন্নতিকর প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে সাধ্যমত সাহায্য করিবার জন্য যোগ দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে কবির সত্যবাণী—'না জাগিলে সব ভারত ললনা; এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।' চণ্ডীতে মহামুনি মেধস বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছেন 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতিমুক্তয়ে'; সেই বিশ্বজননী প্রসন্না হইলেই মানব-জাতির মুক্তির নিমিত্ত বর প্রদান করিয়া থাকেন। মুক্তিকামী বাঙ্গালীজাতিকে মাতৃজাতির সেবানুষ্ঠান করিয়া বিশ্বজননীকে প্রসন্না করিতেই হইবে।

"মাতৃ-মন্দির" মাতৃজাতির সেবায়, মাতৃজাতির কল্যাণ কামনায় অনুষ্ঠিত ও উৎসর্গীকৃত। মা অধিষ্ঠিতা বলিয়াই মাতৃ-মন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব যে জগজ্জননীর অশেষ কৃপায় মাতৃ-মন্দির দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ তিনটি বৎসর অতিবাহিত করিয়া এবং বাংলার ঘরে ঘরে মায়েদের সহিত পরিচিত হইয়া চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, সেই সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়িনী মায়ের চরণতলে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আশীষ মাগিতেছি।—মা, তোমারই নাম স্মরণ করিয়া এই নববর্ষে মাতৃ-মন্দিরের প্রথম সংখ্যার উদ্বোধন করা হইতেছে। এই আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন মাতৃ-মন্দির উত্তরোত্তর নূতন সৌন্দর্য্যে এবং নূতন ঐশ্বর্য্যে বিমণ্ডিত হইয়া যথার্থ মাতৃ-মন্দির নাম ধারণের সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

শঙ্খ

শ্রী কালিদাস বসু।

উঠ বাজি শঙ্খ আজি সমুদ্র নিস্বনে
এ বঙ্গ মাঝারে পুনঃ সর্ব্ব প্রাণ মনে।
ছিলে তুমি পাঞ্চজন্য হৃষীকেশ করে,
অর্জ্জুনের হস্তে দেবদত্ত নাম ধ'রে।
ভগীরথ এনেছিলা, তোমারে বাজা'য়ে
উদ্ধারিতে পিতৃকুল—পুণ্য গঙ্গামায়ে।
আজি পুনঃ নিয়ে এস সেই মিষ্ট ধারা,
পুরাণে লভিলা খ্যাতি সতী নামে যাঁরা
পুণ্যালোক প্রতি গৃহে জ্বালিবেন তাঁরা,
এই আশা নিয়ে চিত্ত আজি আত্মহারা!
ঋষি কবিদের কণ্ঠে ধ্বনিলে যে সুরে,
সেই তান তুলি আজি এস বঙ্গপুরে।

খেয়ার শেষে

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(১)

যেদিন মহা সমারোহের মাঝখান দিয়া অমিয় বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিল, সেদিন তখনও পর্য্যন্ত সে বা আর কেহই জানিতে পারে নাই অমিয়ের পার্শ্বোপবিষ্টা অনুপম রূপবতী স্ত্রী ইভাই তাহার বুকে দারুণ অশান্তি আনিয়া দিবে।

যখন বাড়ীতে একটা অস্ফুট গুঞ্জন শব্দ চারিয়া উঠিল, সকলের মুখের উপর একটা নীরব বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল, তখনও সে বুঝিতে পারে নাই ব্যাপারখানা কি?

সে বুঝিতে পারিল ফুলশয্যার রাত্রে। উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত গৃহ, সদ্যপ্রস্ফুটিত হেনা, বেল, যুঁই, চামেলি প্রভৃতির গন্ধ মিশিয়া এক হইয়া আর একটা অভিনব গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল, বিছানার উপর রাশিকৃত কুসুমরাজির মাঝে গোলাপের তোড়ার মতই সাজিয়াছিল ইভা, তাহার অনিন্দ্য মুখখানা উজ্জ্বল আলোকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

অমিয় সে মুখ দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। হৃদয়ের গোপন কথাগুলি সে এক নিঃশ্বাসেই নিবেদন করিয়া ফেলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় তাহার মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু ইভা পাষাণমূর্ত্তির মতই বসিয়া রহিল, তাহার চোখের পলকটিও পড়ে নাই। ভক্তের সম্মুখে দেবীমূর্ত্তি নিশ্চল অবস্থায় বসিয়া যেমন পূজা গ্রহণ করেন, সেও তেমনি বসিয়া এই পূজা গ্রহণ করিল।

অমিয় বিস্মিত হইল, ইভা একটাও কথা বলিল না ইহার কারণ কি?

ইহার পরে অমিয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিল ইভা মূক, সে একেবারেই কথা কহিতে পারে না।

তাহার উৎসাহপূর্ণ হৃদয় একেবারে দমিয়া গেল, সে আর একটীও কথা কহিতে পারিল না। ফুলশয্যার আনন্দ তাহার হৃদয় হইতে মিলাইয়া গেল, উজ্জ্বল আলোকমালা চোখের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল, সম্মুখে জাগিতে লাগিল শুধু নিকষ কালো অন্ধকার। ইভার সেই অনিন্দ্য মুখখানা, যাহা দেখিয়া একটু আগে সে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, তাহাই এখন তাহাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিতে লাগিল; সে আর গৃহে থাকিতে পারিল না, ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পাড়ার কয়েকটী মেয়ে এবং বিধবা ভ্রাতৃবধূ লুকাইয়া জানালার ফাঁক দিয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। অমিয় এমন অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল যে তাহারা থতমত খাইয়া দাঁড়াইল, পলায়নের অবকাশ পাইল না।

আকাশে সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ প্রহরীর কার্য্য করিতেছে, তাহার অনুপমেয় রজত-কিরণ-ধারায় সারা-বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছে, খিলান-পথে অনেকখানি চাঁদের কিরণ আসিয়া বারাণ্ডায় পড়িয়া বারাণ্ডাকে আলোকময় করিয়াছে।

অমিয় একবার মুখ ফিরাইয়া সঙ্কুচিতা নারীকুলের দিকে চাহিল। ইহারা নিশ্চয়ই জানে ইভা বোবা, তবু জানিয়া শুনিয়াও যে গোপনভাবে লুকাইয়া আবার দেখিতে আসিয়াছে ইহা ভাবিতেই তাহার সারা হৃদয়খানা তিক্ত হইয়া উঠিল, সে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল "কি? কি দেখতে এসেছ তোমরা, কি চাও এখানে?"

তাহার রুক্ষস্বরে মেয়েগুলির বুঝি চেতনা ফিরিয়া আসিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের দ্রুতধাবন-জনিত দুপ্‌দাপ্ শব্দ বিলীন হইয়া আসিল।

অমিয় জ্যোৎস্নাধারার মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সম্মুখে চামেলি ফুলের গাছটায় অসংখ্য চামেলি ফুটিয়া মৃদু বায়ু দ্বারা চালিত তাহার গন্ধ অমিয়ের নাসাগ্রে ধরিতেছিল; দূরে কোথায় একটা পাপিয়া আজিকার এই চাঁদিনী রাতকে আরও মধুময় করিবার জন্য ডাকিতেছিল —"চোখ গেল—চোখ গেল।"

বাড়ীখানি তখন প্রায় নীরব হইয়া আসিয়াছে। দাসীদের গৃহ হইতে ক্বচিৎ তাহাদের চাপা কথা ও হাসির শব্দ আসিয়া কাণে বাজিতেছিল। সকল গৃহের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, কেবল তাহার নিরাশনাথা গৃহটীর মধ্য হইতে আলোকের রেখা বাহির হইয়া চাঁদের শুভ্র আলোর সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

নিভিয়া যাক্ আজিকার এই প্রস্ফুট চাঁদের আলো, থামিয়া যাক্ পাপিয়ার কলগীতি। আর কেন, কেন এ আনন্দের আয়োজন, শ্মশানে বাসরশয্যা?

এই তাহার জীবনের স্বপ্নসফলতা? কত কবিতা হইতে জীবন্ত ভাব লইয়া, কত ইংরাজি বাংলা হইতে মনের মত কথা তুলিয়া বুকের মধ্যে রাখিয়াছিল সে, তাহার পূজার অর্ঘ্য কত সাজাইয়াছিল, নিষ্ঠুর ভাগ্য তাহার সে অর্ঘ্য পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিল। তিলে তিলে সে নিজের জীবনটাকে মোহময় একটা স্বপ্নে গড়িয়া তুলিয়াছিল, সে স্বপ্ন তাহার টুটিয়া গেল; তাহার অমল ধবল জীবনখানার উপর কে নিষ্ঠুরহস্তে মসী ঢালিয়া দিল, তাহার শুভ্রতা ঘুচিয়া গেল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস কখন তাহার বক্ষ দীর্ণ করিয়া পড়িয়া গেল, সে উঠিয়া পড়িল। মায়ের রুদ্ধকক্ষ-দ্বারে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া সে ডাকিল "মা—"

মায়ের চোখে তখন তন্দ্রা, জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?"

"আমি, দরজাটা খোল একবার।"

পুত্রের কণ্ঠ বুঝিতে পারিয়া মা দরজা খুলিয়া দিলেন। চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল তাহার মূর্ত্তিখানার স্থানে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে তিনি বলিলেন "কি রে, এত রাত্রে তুই যে?"

"এদিকে এসো মা" বলিয়া সে মায়ের হাতখানা ধরিয়া বারাণ্ডার একধারে লইয়া গেল। মা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন সে কি বলিতে আসিয়াছে, তাঁহার বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল, অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে তিনি পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

রুদ্ধকণ্ঠে অমিয় বলিল "আমায় এ কি দিলে মা? এই কি পিতামাতার হাতের স্নেহের দান? আমি এখন বিয়ে করতে বরাবরই তো অস্বীকার করে আসছি মা, সত্যি বল, করি-নি কি?"

মা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "করেছিলি।"

অভিমানে ভরা কণ্ঠে অমিয় বলিল "তবু একি দিলে?"

মা তেমনি বেদনাভরা সুরে বলিলেন "আমিও কি এ জানতুম বাবা? তুই মনে করছিস আমি সব জেনেশুনে তোর ঘাড়ে এই দায়িত্বটা দিলুম? তুই যে আমার ছেলে রে অমিয়, আমি যে তোর মা, তোর ভালটাই আমি চাই, মন্দটা তো চাইনে বাবা, তোর জীবন কি সাধ করে আমি বিষময় করে তুলতে পারি? ওরে বাবা, মাকে তোর এমন সন্দেহের চোখে দেখিস নে, মাকে দোষ দিস নে। মা যে চিরদিন নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই বসে আছে—নিজের জীবনকে সন্তানের হিতার্থে বলি দিয়ে ফেলে। ও ভাব মুছে ফেল রে মুছে ফেল; মনে সত্যি একবার ভেবে দেখ সন্তান মায়ের কি জিনিষ। কত কষ্ট সয়ে তবে নারী মা হতে পায়; তারপর কত যত্ন করে, নিজেকে একেবারে নষ্ট করে তবে সন্তানকে মানুষ করতে হয়। আমি যদি আগে জানতুম, কখনো তোর বিয়ে দিতুম না।"

অমিয় মুখখানা একেবারে অন্ধকার করিয়া তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, আর একটিও কথা বলিল না। মায়ের মনে সন্দেহ হইতেছিল বুঝি সে বিদ্রোহী হইয়া যাইবে, এই বিমর্ষ অন্ধকার মুখখানায় তাহারই পূর্ব্বাভাস আসিয়া উঠিয়াছে।

তিনি শুধু তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, অজানিত একটা আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয়খানা দারুণ নিপীড়িত হইতেছিল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অমিয় বলিল, "যাক গিয়ে, যা হবার তা হয়ে গেছে, যাও মা শোও গিয়ে।"

মা বলিলেন "তুই কি ভাবছিস অমিয়? আমায়

সম্পূর্ণরূপে কিংবা আংশিক ভাবে এ ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলছিস কি ?"—তাঁহার কণ্ঠ নিরাশাপূর্ণ।

অমিয় একটু হাসিয়া বলিল "তুমি পাগল হয়েছ মা ? যাও শোও গিয়ে, আমিও শুতে যাই।"

ধীরে ধীরে সে ফিরিয়া আসিল, গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল ইভা সেইরূপ একভাবে বসিয়া আছে ; তাহার যে সংজ্ঞা আছে, তাহাকে দেখিয়া তাহা জানা যাইতেছে না।

অমিয় অনিন্দ্যসুন্দর সেই মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল। এমন সুন্দর মুখ যার, ভগবান কেন তাহাকে মূক করিলেন ? কেন ইহার মধ্যে এতটুকু ক্ষমতা দিলেন না, যাহার দ্বারা সে অন্ততঃ একবারও সাড়া দিতে পারিত, তাহার পানে চাহিয়া প্রসন্ন হাসিয়া তাহার অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে পারিত।

অমিয় চোখ ফিরাইয়া লইয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল ; তাহার পর আলোটা খুব কমাইয়া দিয়া স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল "তুমি ওখানেই শুয়ে ঘুমাও, আমি এই কৌচে শুচ্ছি।"

ইভা তাহার কথা শুনিল কি না তাহা সে দেখিল না, কৌচে সটান সে শুইয়া পড়িল।

(২)

অনিন্দ্যসুন্দর রূপ লইয়াও ইভা সকলের সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। পরদিন দুপুরে যখন অন্তঃপুরে নবীনাগণ গত কল্য রাত্রের ঘটনা উল্লেখ করিয়া প্রচুর হাসিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ তাহা অমিয়ের কাণে প্রবিষ্ট হইল। ইভা বাক্যবিহীনা না জানিয়া সে তাহার চরণতলে অর্ঘ্য প্রদান করিতে গিয়াছিল, তাহার হৃদয়ের পুঞ্জিভূত প্রেম নিবেদন করিয়া দিয়াছিল ; একে সেই দারুণ ব্যথা তাহার বুকের মধ্যে জ্বালা প্রদান করিতেছিল, তাহার উপর এই তীব্র সমালোচনা ও তাহার গতরাত্রের ব্যর্থ হৃদয়ের পানে চাহিয়া কিশোরীকুলের উচ্ছ্বাসিত হাসি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। তাহার যতটা রাগ সব পড়িল পিতামাতা ও ইভার উপর। পিতামাতা নিশ্চয়ই বহু পূর্ব্ব হইতে জানেন মেয়েটী বোবা, জানিয়া শুনিয়া প্রচুর অর্থলোভেই যে তাহাকে একমাত্র পুত্রের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। পিতামাতার অর্থলোভ কি এতই বেশী হইল, সন্তানের পানে একবার তাঁহারা চাহিলেন না ?

খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিল এই প্রবল অর্থলোভে সন্তানস্নেহের উপরেও আধিপত্য লাভ করিয়াছে।

বউদি শৈলবালা কক্ষমধ্যে কি করিতে আসিয়াছিল, অমিয়কে তেমনি অভিভূত ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল "আজ কি সারাদিন ঘর হতে বার হবে না ঠাকুর পো ?"

অমিয় একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমার আর বার হবার মত মুখ আছে বউদি ? তাকিয়ে দেখ দেখি চারদিকে কি হাসিঠাট্টার ঢেউ একটা বয়ে যাচ্ছে ! তুমি কি আমায় সারা গায় এই ঢেউটা মাখতে বল ?"

বিস্মিতা শৈলবালা বলিল "তোমার কথার মধ্যে এমন একটা হেঁয়ালি ভরা থাকে ভাই ঠাকুর পো, যা আমাদের মত সাধারণ লোকে বুঝে উঠতে পারে না। আমি বলি কি, কথাটা অন্ততঃ আমাদের কাছে একটু সরল করে বলো।"

খুব বিষণ্ণ সুরে অমিয় বলিল "আরও খুলে বলতে হবে ?"

শৈলবালা মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল "ও, ছোট বউয়ের কথা বলছো তুমি ? কি করবে ভাই, যার অদৃষ্টে যা লেখা আছে তার তা ফলে যাবেই। আমরা মেয়েমানুষ, লেখাপড়া জানিনে, তাই অদৃষ্টটাকেই মেনে চলি। যেমন রূপ, আহা, তেমনি যদি কথা বলবার শক্তিটা থাকত।"

অমিয় মুখ ফিরাইয়া বলিল "আমি তো এত রূপ চাইনি বউদি। বাবা মা যে জেনেশুনে আমার এই সর্ব্বনাশ করবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া শৈলবালা বলিল "বাবা মা কি জানবেন ?"

কথাটায় বাধা দিয়া তীব্রস্বরে অমিয় বলিল "জানেন সবই। বাবাকে তো খুব ভাল করেই চেন বউদি, তবে আর তাঁর পক্ষ টেনে কথা বল কেন ? পয়সা কেমন করে সঞ্চয় করতে হয় তিনি কেবল সেইটাই চিনেছেন, মানুষের দিকে যে চাইতে হয় তা তিনি আজও জানেন না।

তিনি জানেন মেয়ে বোবা, তা জেনেও নগদ দশ হাজারের লোভ সামলাতে পারেন নি। যার পরে এ ভারটা ফেলে দিলেন তার পানে চাইলেন না, সে এ ভার বহনে সমর্থ হবে কি না তা একবার ভেবেও দেখলেন না। আমি যে সমাজনীতির নিন্দা করি বউদি, তা কি অযথার্থ? আমি যদি নিজে দেখেশুনে বিয়ে করতুম তা হলে কখনই এ রকম একটা বোবা মেয়েকে জীবনের সঙ্গিনীরূপে বরণ করে নিতুম না। পরের চোখে চোখ দিয়ে চাওয়া এক, আর নিজের চোখে দেখা সে এক। বাবা যা করেছেন তা অত্যুৎকৃষ্ট, এ পর্য্যন্ত কোনও বাপে এমন কাজ করতে পেরেছেন কি না তা জানিনে। তিনি যা চান সেই অপর্য্যাপ্ত অর্থ পেয়েছেন, নিয়ে এখন সুখী হোন, আমি বোবা নিয়ে জীবন যাপন করতে পারবই না—এই আমার স্পষ্ট কথা।"

একটু শঙ্কিত হইয়া শৈল বলিল, "মেয়েটীর উপায়?"

অবজ্ঞাপূর্ণ কণ্ঠে অমিয় বলিল "বাবা বিবেচনা করবেন, মা দেখবেন। তুমি যেমন আছ, সেও তেমনই থাকবে।"

শৈল শিহরিয়া বলিল "বালাই, অমন কথা বলতে নেই, আমার মত কপাল যেন আর কারও না হয়, আমি কেবল তাই প্রার্থনা করি। ভগবান ছোট বউয়ের সিঁথের সিঁদুর হাতের লোহা অক্ষয় রাখুন, তাকে অভিশাপ দিয়ো না, তার পরে এত নির্দ্দয় হয়ো না, আহা, সে কি জানে বলো তো? অমূল্য রূপ নিয়েও শুধু যে তার কথা বলবার শক্তিটুকু নেই, এতেই সকলের ঘৃণার পাত্রী হয়েছে। যা হবার তা হয়েছে, তার জন্যে সে বেচারাকে তুমি শুদ্ধ এমন অপমান করো না।"

অমিয় শুধু মলিন হাসিল।

বউভাত দিবার জন্য পিতামাতা উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, চারিদিকে জিনিষপত্রের বায়না দেওয়া হইতে লাগিল, তখন অমিয় প্রবল বেগে মাথা নাড়িল "বউভাত হতে পারবে না।"

মাতা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন "সে কি কথা বলছিস! অনাছিষ্টি আবদার যত। কেউ কখন শুনেছে হিঁদুর ঘরে বউভাত হয় নি!"

দৃঢ়কণ্ঠে অমিয় বলিল "অনাসৃষ্টি আবদারই হোক আর যাই হোক, বউভাত যে হতে পারবে না এটা খুব যুক্তিযুক্ত কথা। আমি বউভাত কক্ষোনো হতে দেবনা।"

তাহার অন্ধকারময় দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখখানার পানে চাহিয়া মা আর জোর করিতে পারিলেন না, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেলেন। বউদি তখন তাঁহার পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল "সে কখনও হতে পারে ঠাকুর পো, বউভাত হবে না?"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে অমিয় বলিল "না।"

শৈল বলিল "কেন হবে না?"

দীপ্তকণ্ঠে অমিয় বলিল "সব কেনর উত্তর দিতে গেলে আমার চলে না বউদি; যার কথা বলবার ক্ষমতা নেই কেন তাকে লোকচক্ষুর সামনে টেনে আনা। সে যেখানকার মানুষ সেইখানেই থাক, আমরা তাকে জাগিয়ে তুলে জগৎ দেখাতে চাই নে, কারণ তার জগৎকে যথার্থরূপে চিনবার ক্ষমতা হলে নিজের হীনাবস্থা মনে করে খুব বেশী রকম সন্তপ্ত হয়ে উঠবে। মুহূর্ত্তের জন্যে তাকে জাগিয়ে তার অন্ধকারে পড়ে থাকার অবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে কোনও ফল নেই বউদি। সেজন্যে আমাদের কাছে সে কৃতজ্ঞ হবে না এ ঠিক জেনো।"

শৈল বলিল "বউভাত দিলেই ও জগৎ চিনবে, নইলে চিনবে না এমন কোনও কথা নেই ভাই ঠাকুর পো। আমাদের দেশীয় লোকাচার যেটা সেটা তো আমাদের পালন করতেই হবে।"

অমিয় বিকৃত মুখে বলিল "ও সব লোকাচারের পক্ষপাতী আমি নই বউদি। যত সব পুরানো আচার বিচার তোমরা আমারই উপর দিয়ে চালিয়ে নিতে চাও দেখছি। আমি সব পুরানো ফ্যাসানের প্রশ্রয় দিতে পারব না।"

শৈল রাগ করিয়া বলিল" যা খুসি তোমার তাই কর গিয়ে ভাই! নতুন ফ্যাসান শিখেছ, সেই রকমেই চলো, পুরোনো নিয়ে কাজ নেই।"

রাগ করিয়া সে উঠিয়া গেল।

মা তখন জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শূন্য নয়নে বাহিরের পানে চাহিয়া ছিলেন, শৈলর আহ্বান শুনিয়া

মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া শৈল বলিল "তুমি কাঁদছ মা?"

মায়ের দুই চক্ষু ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল, রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন "আমায় আর কিছুর মধ্যে জড়াতে এসো না মা, আমি তোমাদের কেউ নই। স্বামীর মন হতে অনেক কাল তাড়িতা হয়েছি, ছেলের মন হতেও এইবার গেলুম, ছেলে আমায় এখন শত্রু বলেই ভাবছে। আমি ছেলেকে অনর্থক প্রশ্রয় দেই বলে স্বামী আমায় দেখতে পারেন না, আবার তাঁর অনেক কাজে বাধা হয়ে আমায় সম্মতি দিতে হয় বলে ছেলে দেখতে পারে না। আমার এরকম ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই ভাল, তা হলে ওরা দুজনেও মুক্তি পেতে পারে।"

শৈলবালা নীরবে রহিল, খানিক পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "এখন বউভাতের উপায় কি হবে?"

মা চোখ মুছিয়া বলিলেন "যা খুসি ওরা করুক।"

শৈলবালা বিফলমনোরথ হইয়া শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল ব্যাপার বিবৃত করিয়া বলিল "কি হবে বাবা?"

অনন্তরাম মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "তাই তো।"

পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন "এ সব কি হচ্ছে?"

একটা কড়া উত্তর অমিয়ের মুখে আসিতেছিল, হঠাৎ তাহা চাপিয়া ফেলিয়া বিনীত ভাবে উত্তর দিল "কেন বাবা, এতে তো ভালই হবে।"

অনন্তরাম বলিলেন "ভাল হবে কি রকম?"

অমিয় বলিল "অনর্থক এই দেশশুদ্ধ লোক খাওয়ানতে বহু টাকা খরচ হবে সেটা ভেবে দেখেছেন কি? সেই অতগুলো টাকা আমি বাঁচাতে চাই, ওটা সুদে খাটালে আরও কত টাকা হবে। আর আমার পড়ার খরচও দিতে হবেনা, ওই টাকার সুদে আমার পড়া হয়ে যাবে, আপনাকে ঘর হতে একটা পয়সাও দিতে হবে না। আপনি তো বলেছেন অনর্থক আর কলেজের বাইনে দেবেন না।"

অনন্তরাম চিন্তাবিষ্টের মত বলিলেন 'হাঁ, তা বলেছিলুম বটে। কিন্তু কি জানো, আমাদের দেশাচার যেটা সেটা করতেই হবে। হাজার খরচ হলেও বলতে পারব না এটা করতে পারব না।"

অমিয় বলিল "লোকনিন্দের এত ভয় করলে চলবে কেন? যদিই কেউ কোন কথা বলে আপনি সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন, বলবেন আমি করতে দেইনি। আর সত্যিও তো সে কথা, আপনি দেবার উদ্যোগ করেছিলেন, আমি করতে দিলুম না।"

এই অবশ্যম্ভাবী অতিরিক্ত খরচের দারুণ ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পিতার আমূল দন্ত বাহির হইয়া পড়িল। বিবাহ দিয়া আসিয়াই বউভাতের খরচ কল্পনা করিয়া তাঁহার জিহ্বা শুকাইয়া উঠিয়াছিল, কোন মতেই তিনি খরচটাকে কমাইবার সুবিধা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তিনি ভীষণ অর্থপিশাচ ছিলেন। গ্রামের কেহ প্রাতে তাঁহার নাম লইত না, কারণ সকলের ধারণা ছিল প্রাতে সে নাম গ্রহণ করিলে বাড়া ভাতেও ছাই পড়িবে।

তাড়াতাড়ি গড়ম জোড়াটা পায় দিয়া খটাখট শব্দে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিয়া তিনি অন্তঃপুরে আসিয়া গৃহিণীকে ডাকিলেন "বলি শুনছো, তোমার ছেলে যে বউভাত মোটে হতে দেবে না।"

ম্লানমুখী গৃহিণী বলিলেন "শুনেছি।"

অনন্তরাম বলিলেন "তা হলে বাধ্য হয়ে আমায় এসব বন্ধ করে দিতে হয়।"

গৃহিণী উত্তর দিলেন না।

বলাবাহুল্য, বউভাতের আয়োজন বন্ধ হইয়া গেল। গ্রামের যাহারা এই উপলক্ষে কৃপণ জমিদারের বাটী একবেলা পেট ভরিয়া খাইবার আশা করিয়াছিল তাহারা হতাশ হইয়া পড়িল এবং গোপনে সহস্রমুখে জমীদারের ঊর্দ্ধ এবং অধঃস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষের নরক গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

উনুন ও হেঁসেল

শ্রী সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বি-এস-সি।

গত মাঘ মাসের (১৩৩২) মাতৃ-মন্দিরে আমি "অন্তঃপুরে রন্ধনশালা" শীর্ষক প্রবন্ধে উনুনের কথা আরম্ভ করিয়াছি। রন্ধনশালায় এই জিনিষটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া আমি এই বিষয়টীকে সহজে ছাড়িতে চাহিনা। আমাদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানায় উনুনই প্রধান যন্ত্র। যাঁহারা রন্ধন করেন, তাঁহাদের কাজকর্ম্মের সুবিধা অসুবিধা ইহার উপরই নির্ভর করে। সেইজন্য আমি এসম্বন্ধে একটু বেশী করিয়া বলিতে চাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের রন্ধনশালার কথা যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহারা এই উনুনটীর দিকে মনোযোগ দেন না। হেঁসেলের সকলদিক ফিট্‌ফাট্-দুরস্ত রাখিবার চেষ্টায় তাঁহারা উনুনের কথা একেবারে ভুলিয়া যান। উনুনটী যেন কিছুই একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। খরচ কমাইতে হইলে তেল নুনের দিকে খুব কসাকসি আরম্ভ হয়, কিন্তু উনুনের উন্নতির দিকে কারুরই খেয়াল হয় না। এবিষয়ে আমি কর্ত্তাদের অপেক্ষা গৃহিণীদের দোষও কম দেখি না। যে সকল পাকা গৃহিণী খুব কাজকর্ম্ম জানেন বলিয়া বড়াই করেন, তাঁহারা কর্ত্তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন না কি যে কয়লা বেশী লাগিতেছে, অথবা উনুনের দোষে রান্না খারাপ হইতেছে? আসল কথা কর্ত্তারা যেমন কিছুই জানেন না,—তাঁরাও তেমনি সকল অসুবিধা নীরবে সহিয়া থাকেন। কয়লার মণ দশ আনা অথবা কেরোসিন তেলের বোতল দশ পয়সা বলিয়া হয়ত কেহ এই সামান্য বিষয়কে গ্রাহ্য করিতেছেন না। কিন্তু আমি বলি, প্রকৃত বুদ্ধিমান যে ব্যক্তি সে বিনা পয়সার জিনিসকেই বা অনর্থক অপচয় করিবে কেন?

খনি হইতে কয়লা ও কেরোসিন কিরূপে তোলা হয়, তাহা বুঝিয়া যিনি একটু ভালরূপে চিন্তা করেন, তিনি বুঝিবেন বাস্তবিক ইহাদের দাম সোণার চাইতে কম নয়। কত সন্দেহ, কত বিপদ, কত বাধা সম্মুখে রাখিয়া মানুষ হাজার হাজার ফিট্ মাটীর নীচে নামিয়া যায়, জীবনের মায়া রাখে না, মৃত্যুকে ভয় করে না; ইহার জন্য কত তোড়জোড়, কত যন্ত্রপাতি, কত বিরাট বন্দোবস্ত, কত কুলী মজুর, কত মূল্যবান্ মানবজীবন পশুত্বের পঙ্কে নিমজ্জিত! একটুকরা কয়লা তুলিতে কত বিপুল আয়োজন। আজকাল এই বৈজ্ঞানিক যুগে সেই কয়লা টুকু হইতে কত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারী হইতেছে—আলকাত্‌রা, নানাপ্রকার রং, চিনি, সুগন্ধি এসেন্স, ঔষধ, কত রাসায়নিক দ্রব্য, সিরাপ, ফিনাইল, এমোনিয়া নেপ্‌থা ইত্যাদি। অথচ এত দরকারী জিনিষ কয়লা কত অশ্রদ্ধায়, কত অবিবেচনায়, কত বে-হিসাবীতে প্রতিদিন নষ্ট হইতেছে! ইউরোপ অথবা আমেরিকার কোন স্বাধীন দেশের নিজ সম্পদ্ এমন ভাবে নষ্ট হইতে গবর্ণমেণ্ট দেয় না। সেখানে গৃহস্থের সর্ব্বপ্রকার অপচয় গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বন্ধ করে। আমরা ভারতমাতাকে রত্নপ্রসবিনী বলিয়া থাকি, কিন্তু মায়ের পাঁজর কাটিয়া কাটিয়া যখন আমরা কয়লা বাহির করি তখন ভুলিয়া যাই রত্নত কাকে অপেক্ষা তাহা কত মূল্যবান।

অন্তঃপুরের গৃহিণীগণ যখন কয়লার কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, তখন অবশ্য তাহা জানিতে পারিবেন। এখন কেবল মাত্র এই বলিতেছি, যে পদার্থ দ্বারা আমাদের আগুন তৈয়ারী হয়, তাহাকে অপচয় হইতে দেওয়া আর আত্মহত্যার আয়োজন করা একই কথা। পঞ্চাশ বৎসর লইয়াই মানব জীবন নহে। মানুষ অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত বাঁচিবে। সুতরাং উত্তর পুরুষগণের ভালমন্দ সে ভাবিতে বাধ্য। কোন রকমে নিজের কয়টা দিন কাটাইয়া যাওয়াই কোন পরিবারের কর্ত্তা অথবা গৃহিণীর লক্ষ্য নহে। তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তাহাও ভাবিবার বিষয় ও

তৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত করা উচিত। তার একমাত্র পন্থা, সকলদিকে অপচয় বন্ধ করিয়া দেওয়া। যত কম অপচয়, তত বেশী সমৃদ্ধি। মানুষের শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবার, দেশ ও জাতি সর্ব্বত্র এই একই নিয়ম।

আজকাল সহরের কয়লার উনুনগুলি সাধারণতঃ যে ভাবে তৈয়ারী তাহাতে অসুবিধা ও অপব্যয়ই বেশী হয়। পাড়াগাঁয়ের কাঠের চুল্লীও সেই প্রকার। কিরূপে যে উত্তাপটাকে বাঁচাইয়া রান্নাবান্নার কাজ সারিতে হইবে একথা কেহ ভাবেন না। অসুবিধার কথাগুলি একে একে বলিতেছি। প্রথমতঃ ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইবার কোন বন্দোবস্ত নাই। একটা চিম্‌নী থাকার দরকার,—তাহা কোথাও দেখা যায় না। ধোঁয়াতে যেন আমাদের অন্তঃপুর-স্থিতা নারীগণের কোন ক্ষতিই হয় না, আর হেঁসেলের চারিদিকে ঝুল কালী লাগিয়া থাকা যেন একটা মনোরম দৃশ্য। আহার করিতে বসিয়া রান্নাঘরের এই সুন্দর দেওয়াল ও ছাদ দেখিলে মন বুঝি খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠে! এই অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে থাকিতে থাকিতে আমাদের গৃহিণীগণের সাধারণ সৌন্দর্য্যজ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ শীঘ্র আঁচ তুলিবার জন্য গৃহিণীরা ধোঁয়ায় হেঁসেলে উনুনের সাম্‌নে বসিয়া অবিরত হাওয়া করিতে থাকেন। অবশ্য আমাদের অন্তঃপুরের রমণীগণের চক্ষুর জল সর্ব্বদাই বহিতেছে,—সুতরাং হেঁসেলের এই নিষ্ঠুর ব্যাপারটা কর্ত্তাদের প্রাণে বড় বিশেষ লাগে না। গৃহিণীরাও অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। আঁচ শীঘ্র না উঠিলে কয়লার দোষ দেওয়া হয়,—আবার যে কয়লার আঁচ শীঘ্র উঠে, তাহার আঁচ শীঘ্র পড়িয়া যায়, সুতরাং সেই দিকেও মুস্কিল, অর্দ্ধেক রান্না শেষ হইতেই আবার কয়লা দিতে হয়। কিন্তু এ কথাটা কেহ ভাবেন না যে, কয়লা যেমনই হউক না কেন, উনুন তৈরী করিতে এমন বন্দোবস্ত করা যায় যাহাতে আমার ইচ্ছামত আঁচ উঠিবে ও পড়িবে। সেই উপায়ের কথা আমি পরে বলিব। কিন্তু সে সব পরামর্শ কেহ গ্রহণ করেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে; কারণ মানুষ শত অসুবিধা ভোগ করিলেও চিরকালের সংস্কার সহজে ছাড়িতে পারে না। তার উপর আলস্য ও উদাসীনতা অপর এক বিষম বাধা।

তৃতীয়তঃ আমাদের হেঁসেলের উনুন গুলিতে উত্তাপের বড় অপব্যয় হয়। চারিদিকে উত্তাপ ছড়াইয়া পড়ে। উনুনে আঁচ উঠিয়া গেলে যে পরিমাণ উত্তাপ তৈয়ারী হইতে লাগিল তার আট ভাগের একভাগেই হয়ত রান্না শেষ হইতে পারে, কিন্তু যে উত্তাপটী চারিদিকে অনর্থক ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তাহার দ্বারা কোন কাজই হইতেছে না। পয়সা দিয়া কয়লা কিনিয়া তাহা হইতে যথাসম্ভব বেশী কাজ আদায় করিয়া লইতে কর্ত্তা অথবা গৃহিণীদের প্রবৃত্তি হয় না কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। মনে করুন একসের কয়লার মধ্যে যে পরিমাণ উত্তাপ লুক্কায়িত আছে, তাহাতে একসের জলকে ০ ডিগ্রি হইতে ৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত গরম করা যায়, কিন্তু সেই একসের কয়লা দ্বারা যদি আমি মাত্র দশসের জল গরম করিয়া লই তবে আমার কি ভয়ানক ক্ষতি হইল। প্রত্যেক দিন এইরূপ যে পরিমাণ উত্তাপ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে যদি গড়ে একপোয়া কয়লার সমান ধরা যায় তাহা হইলে হিসাব করিয়া দেখুন দুই বৎসরে অথবা পাঁচ বৎসরে কি পরিমাণ কয়লা নষ্ট হইয়া যাইতেছে! অনেক স্থলে দেখিয়াছি, গৃহিণীরা একবারে পোড়া কয়লা হইতে বাছিয়া পুনরায় জ্বালাইবার জন্য কয়লা সংগ্রহ করেন। ইহা প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহারা অন্যদিকের ভীষণ অপব্যয় প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন না কেন বুঝিতে পারি না।

চতুর্থতঃ উত্তাপ ইচ্ছামত বাড়াইবার অথবা কমাইবার কোন বন্দোবস্ত আমাদের উনুনে নাই। আঁচ একবার উঠিল ত ব্যস্, ঐ প্রবল আঁচেই ঝোল, সিদ্ধ, ভাজা, চচ্চড়ী, চাট্‌নী, শুক্ত, ঘণ্ট, ডাল, ভাত, অম্বল, এমন কি দুধ এবং চাএর জল গরম পর্য্যন্ত সবই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা কোন মতেই ঠিক নহে, কোন একটা কিছু অগ্নির উত্তাপে তৈয়ারী করিতে হইলে এতগুলি বিষয়ের দিকে নজর রাখিতে হয়,—জিনিসের আকৃতি ও প্রকৃতি, পরিমাণ, যেই পাত্রে রন্ধন করা হয় তাহার আকৃতি, কতক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে, কি পরিমাণ আঁচে উহা চড়িবে ইত্যাদি। ভাত যে আঁচে হইবে, ভাজা সেই আঁচে হইবে না। যে উত্তাপে মাছ হইবে (আবার সকল মাছ সম পরিমাণ উত্তাপে হয় না) সেই উত্তাপে শাক হইবে না। খাইবার

জল যেরূপ গরম হইবে, সেদ্ধ দিবার জল অথবা চাএর জল সেরূপ হইবে না। আবার যে আঁচের উপরে মাটীর হাঁড়ি বসিল, তাহারই উপরে লোহার কড়াই, পিতলের ডেগ্‌চি, এলুমিনিয়ামের প্যান, গ্যালভেনাইজ বাল্‌তি এই সব চাপান হয়। কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর উত্তাপ-সহন ক্ষমতা সমান নহে। উত্তাপের এত জটিল ধরা বাঁধা হিসাব আমাদের গৃহিণীরা রাখেন কি? যদি রাখেন তবে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কয়লার আঁচ একবার যতদূর উঠে তাহাতেই ভাত হইতে আরম্ভ করিয়া অম্বল পর্য্যন্ত কিরূপে রাঁধেন? অথচ একথা মিথ্যা নয় যে আমরা নিশ্চিন্তে ও তৃপ্তির সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাতের সুখাদ্য পঞ্চব্যঞ্জন নিত্য আস্বাদন করিয়া আসিতেছি, কোন দিন কিছু দোষ ধরিতে পারি নাই। আজ কিন্তু নূতন কথা বলিতেছি, গৃহিণীরা তাহা শুনিবেন কেন?

এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই প্রশ্নের উত্তর অন্ততঃ সংক্ষেপে আমাকে দিতে হইবে। সুখাদ্য বিষয়ে আমাদের জিহ্বাই একমাত্র বিচারক নহে। জিহ্বা যাহা উদরের মধ্যে পাঠায়, তাহা অনেক সময় শরীরের সহ্য হয় না—উদর তাহা ফিরাইয়া দেয়। সুতরাং আমাদের শরীরের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য আমাদের সুখাদ্যের শেষ বিচারক। আর এক কথা—আমরা এতদিন যাহা খাইয়া আসিয়াছি, তাহাই যে একেবারে সুখাদ্যের চরম একথা গৃহিণীরা বলিতে পারেন না। কেবলমাত্র মুখের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে রন্ধন তাহা নির্ভুল নয়। যিনি রন্ধন করিবেন, তাঁহাকে মিতব্যয়িতা, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান এই তিনটীর দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; মুখরুচির কথা পরে—তাহা অপ্রধান।

পঞ্চমতঃ আমাদের অন্তঃপুরিকাগণ যেরূপ জড়পিণ্ডের মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রান্না করেন, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া আমি মনে করি। দাঁড়াইয়া রান্না করিলে কাজকর্ম্মের অনেক সুবিধা হয় এবং রন্ধন-কারিণীদেরও অকালে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না। সেইজন্য আমি আমার গতবারের প্রবন্ধে প্রস্তাব করিয়াছিলাম উনুনটী যেন একটা টেবিলের সমান উঁচু হয়। তাহা হইলে বেশ আরামের সহিত রন্ধন করা যায়, নীচে জিনিস পত্রাদি রাখিবারও সুবিধা হয়। সমস্ত উত্তাপ রন্ধন-পাত্রের পার্শ্ব দিয়া উপরদিকে ছড়াইয়া থাকে বলিয়া হাতা অথবা খুন্তী নাড়িতে রাঁধুনীর হাতে এমন কি মুখে ও গায়ে পর্য্যন্ত অত্যধিক উত্তাপ লাগে; একটা হাঁড়ি নামাইলেই পরের চোটে আর উনুনের সাম্‌নে বসা যায় না। এই সকল অসুবিধা ও কষ্ট গৃহিণীগণ অনুভব করেন নিশ্চয়ই, তবে প্রতিকারের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

আমি জানি উনুনের এই সব অসুবিধা দূর করিয়া অপর দেশে ভাল ভাল রকমের নূতন ফ্যাসনের উনুন তৈয়ারী হইয়াছে। আমাদের দেশেও কয়েক প্রকার উনুন বাজারে বাহির হইয়াছে। বিদেশের যে হুবহু অনুকরণ আমাদের করিতে হইবে এমন নহে, কারণ বিদেশের লোকেদের এবং আমাদের খাদ্য, পারিবারিক বিধিব্যবস্থা ও সামাজিক নিয়মপ্রণালী একরূপ নহে। আমি বিদেশীয়দের উদ্ভাবিত উনুন সবগুলি দেখিও নাই। আমি যে সকল অসুবিধার কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিলাম সেইগুলি যাহাতে না থাকে, এরূপ উনুনের মোটামুটী একটা নক্সা মনে মনে ঠিক করিয়াছি, আগামীবারে তাহা দেখাইব। আমার মতলবই যে একেবারে নির্ভুল এ কথা বলিবার সাহস করি না। দেশের মধ্যে বড় বড় ইঞ্জীনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে অগ্রসর হইবেন। আমি আমার নিতান্ত মোটা বুদ্ধি ও বিদ্যা লইয়া যতদূর ভাবিবার সুবিধা পাইয়াছি ততদূরই মাত্র যাইতে সমর্থ হইয়াছি। আবার দেখাদেখি—অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তিগণ এ বিষয় চিন্তা করিবেন, এই আমার আশা।

লেখক উনুন ও রেঁধেদের অসুবিধাগুলি বড় পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার প্রতিবিধান সম্বন্ধে তেমন কিছু দেখাইতে পারেন নাই। ইহাতে গৃহিণীরা লেখকের উপর কতদূর সন্তুষ্ট হইবেন বলা যায় না। গত কার্ত্তিক সংখ্যায় আমরা উনুনের উত্তাপের অপচয় নিবারণের এমন একটি উনুনের উত্তাপের সাহায্যে দুইটি উনুনে পৃথক রান্নার চমৎকার নূতন ব্যবস্থা দেখাইয়াছি। ঐ প্রণালী অবলম্বন করিলে কয়লার খরচ কমিবে এবং অল্প সময়ে অধিক দ্রব্য রন্ধন করা যাইবে।—সম্পাদক।

উদাসী

শ্রী যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এ।

সেবার চট্টগ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কি সুন্দর সহরটী, যেন ছবিখানি। উঁচু-নীচু ঢেউ খেলান ভূমির উপর নানা রঙের গৃহগুলি তুলি দিয়া আঁকা একখানি দৃশ্যপটের মত, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। কত স্থান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন মনোরম স্থান কখন দেখি নাই।

প্রতিদিন বৈকালে সদরঘাটে যাইয়া বসিতাম। প্রশস্ত নদীবক্ষ ভরিয়া কত নৌকা কত ষ্টীমার অনবরত যাতায়াত করিত, দেখিতাম। অনেক দূরে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ নোঙর করিয়া রহিয়াছে, দেখিতাম। সন্ধ্যার সময়ে সূর্য্যাস্তের রক্তিমচ্ছবি যে কি চমৎকার হইয়া উঠিত তাহা আজিও ভুলিতে পারি না।

অনেকে সেখানে যাইতেন। কোন কোন দিন যুবকদল স্থানটীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কলহাস্যে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিত। প্রতিদিন দেখিতাম একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘাটের একটি কোণে আসিয়া বসিতেন। তাঁহার বয়স অনুমান করা বড় কঠিন। শরীর বলিষ্ঠ, মুখে একটি শান্ত জ্যোতি, চোখে কোন সুদূরের এক উদাস স্নিগ্ধ দৃষ্টি সর্ব্বদাই যেন নীল আকাশের ঐ কোণে কি যেন হারানিধি খুঁজিত। কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের আলাপ হইল। শুনিলাম ভদ্রলোক করিমপুরের কোন গ্রামের জমিদার, পূর্ব্বে অবস্থা ভালই ছিল, এখন আর তাহা নাই। আজ কয়েক বৎসর চট্টগ্রামেই স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে চন্দ্রনাথ দর্শনে যান। প্রতিবারে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার নাকি বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। উদাস দৃষ্টি আরও উদাস হয়, এ পৃথিবীর সবই নাকি তাঁহার নিকট নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে।

তাঁহারই এক প্রতিবেশীর নিকট জানিলাম—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাকি ইঁহার স্ত্রী চন্দ্রনাথের মেলায় শিব-চতুর্দ্দশীর দিন নিরুদ্দেশ হইয়া যান। সেই হইতেই নাকি ইনি এইরূপ বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছেন। নানারূপ খেয়ালেই ইনি সময় কাটান। পাড়ার ছেলেরা ইঁহার বন্ধু, সকলেই খেলনা, খাবার ও আদরের প্রলোভনে সর্ব্বদাই ইঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে, ইনি নীরবে হাসিমুখে তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেন। বাড়ীতে কোন লোক নাই, সুতরাং একমাত্র ছোট ছোট ছেলেদের সাহায্য সম্বল করিয়াই এই বালক-বৃদ্ধটির দিন কাটিতেছে।

শুনিয়া বড় দুঃখ হইল। বুঝিলাম ভদ্রলোক বড় বেদনা পাইয়াছেন। ভালবাসিবার কেহ নাই বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলেমেয়েগুলির ভালবাসা সম্বল করিয়া জীবনের বেলাতি চালাইতেছেন।

আমাদের মধ্যে ক্রমে আলাপ জমিয়া উঠিল। ভারী চমৎকার লোক। হৃদয়টী এমন কোমল, একটুকু সহানুভূতিতেই গলিয়া যায়। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কারও সঙ্গে মিশেন না কেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন "কার সঙ্গে মিশ্‌ব, আর মিশ্‌বার দরকারই বা কি? বেশ আছি ত।" বুঝিলাম কোথাও সমবেদনার চিহ্ন না দেখিয়া ক্রমে ইনি নির্জ্জনতা প্রয়াসী হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিনের কথা কহিতেছি। সেদিন বৈকালটী বড় পরিষ্কার ছিল। সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু গলিত স্বর্ণের মত নদী জলে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধকে সেদিন বড় স্ফূর্ত্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধ হঠাৎ বালকের মত গাহিয়া উঠিলেন,—

ওগো পথিক, আজকে আমার
সকল পরাণ ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ কেন
উঠছে কেঁপে কেঁপে!

বৃদ্ধের গলা বড় চমৎকার। জিজ্ঞাসা করিলাম "এত হরষ কেন দাদামহাশয়?"—ইতিমধ্যে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছিলাম।

তিনি উত্তর করিলেন 'হৃদয়ের অভাব কিসে পাগ্‌লা?" —আমি বলিলাম "কি বা এমন খুসী হবার কারণ ঘটেছে?" বৃদ্ধ বলিলেন "কারণ নেই কি রকম?"

তারপর স্বর নামাইয়া কতকটা আপন মনেই বলিতে লাগিলেন "এ কি অপূর্ব্ব খেলা চলছে! শৈশব হতে দেখে আস্‌ছি সবই—আলো, আকাশ, জল, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি, অথচ আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের রূপের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হচ্ছে প্রতিদিন। কিন্তু কিছুই ত পুরাণ হ'ল না!"

একটু বিমনা হইয়া বলিলাম "দাদামহাশয়, পুরাণ হলনা বলছেন? আমার এইটুকু জীবনেই যে বিচিত্রতা খুঁজে পাইনে। এই সন্ধ্যাবেলায় নদীদৃশ্য কি গভীর, কি সুন্দর—কি বিচিত্ররূপিণী শ্যামশ্রী ধরণী, আমার মনে যে কেবল উদাস আকাঙ্খাই জাগিয়ে দেয়।"

—"তবে তুমি ভালবাসনি, জড় প্রকৃতিতে চৈতন্য সঞ্চার হয়নি।"

—"আপনি কি ভালবাসেন সব? আপনাকে ত কেমন একলা একলা মনে হয়।"

—"ভালবেসেছি বৈকি। একলা বল্‌ছ? একলা ত আমি নই। কতবার পেয়েছি, কতবার হারিয়েছি! এই যে ক্ষণে দেখা ক্ষণে অ-দেখা হয়ে চলে যায় সে, এই ত তার স্বভাব! সেদিনও ত এমনি সন্ধ্যা ছিল, সেদিনও আকাশে এমনি করে রঙের সুরধুনী বয়ে গিয়েছিল;" কত মেলা, কত খেলা, কত হাসিখুসী—আমায় কেবল নিরানন্দ করে সে চলে গেল। যাকে দেখতে না পেলে আমার পলকে প্রলয় জ্ঞান হত, তাকে না দেখেও ত আজ এই দীর্ঘ দশ বৎসর বেশ চলে যাচ্ছে! কেবল এই আশা আছে—যেখানেই থাকুক না কেন, আমারই প্রতীক্ষা করে আছে সে; তাই ত সব ভাল লাগে। সে আসে, আসে বৈকি—আকাশ ভরে, হৃদয় ভরে, নয়ন ভরে আসে সে। ওই মেঘের ওধারে কি খেলা মেলেনা তার? ওরই আড়ালে তার বাঁশী বাজে। বৈকালে যখন কাল মেঘের ফাঁকে আলোর রেখা চকল হয়ে ওঠে, বিদ্যুৎ খেলা করতে থাকে তখনই যে তার দেখা পাই আমি!"

আমি অবাক হইয়া বৃদ্ধের এই ভাব দেখিতেছিলাম। হঠাৎ আমার চমক ভাঙ্গিল। তিনি উঠিয়া বলিলেন "এখন আসি ভাই।" দেখিলাম রাত হইয়া গিয়াছে।

কয়েক দিন আর তাঁহার দেখা পাইলাম না। খোঁজ লইতে গিয়া শুনিলাম, কয়েক দিন হইল তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কেহই সন্ধান রাখে না। মন আমার বড় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

বোধন

শ্রী প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

নব বরষের তরুণ প্রভাতে এসেছে মোদের মা,
অঙ্গনে আজি কি রূপ ফুটেছে দেখে-যা রে দেখে যা।
এসেছে করুণা শান্তি ধাত্রী
এসেছে নিখিল জগদ্ধাত্রী
এসেছে মোদের চির স্নেহময়ী চির দয়াময়ী মা,
আজি প্রাণ খুলে করযোড়ে তোরা বন্দনা-গান গা।

মায়ের চরণ পড়িবে বলিয়া কমল ফুটেছে যে,
কুসুম-কাননে চুত শাখে শাখে কে দিল এ রূপ রে!
মা এসেছে তাই পড়ে গেছে ডাক
ঘরে ঘরে বাজে বোধনের শাঁখ
দিকে দিকে নব পুলকের ধারা বহে ধীরে ধীরে বেয়ে,
আয় ভাইবোনে পূজিতে মাতাকে, বড় শুভক্ষণ এ।

তুলসী

ডাঃ শ্রী রাখালচন্দ্র নাগ।

তুলসী হিন্দু মাত্রেরই পরিচিত, পুণ্য ও পূজার উপকরণ। কাজেই তুলসীর অধিক পরিচয় দিবার প্রায় আবশ্যক হয় না। পরম করুণাময় জগদীশ্বর এই অমূল্য ভেষজটীর যে আদর করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই মনে হয় যে তুলসী আমাদের মহোপকারী বৃক্ষ। তুলসীবৃক্ষে ভগবান বাসে আমরা বলিয়া থাকি :—

"যোবিষ্ণবল্লভাং দেবীং তুলসীং কাননার্চিতাম্।
নমামি হরিপ্রিয়াং বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনীম্।"

যদিও আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে বাঙ্গলার মানুষ সেকেলে মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া বর্ত্তমান কালের বিংশ শতাব্দীর নূতন এক অভিনব জীবে পরিণত হইতেছে, তথাপি এখনও পল্লীর প্রতি ঘরে ঘরে, বিশেষ ঠাঁহারা, ধনীর দেবমন্দিরের সম্মুখে তুলসী বৃক্ষ স্থাপিত। প্রতি সন্ধ্যায় ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বিশেষতঃ ঠাকুরমার বয়সী মহিলারা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তুলসী তলায় দীপদান ও বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। ইহার ভিতর বিশ্বস্রষ্টার আর ঠাঁহার ভক্ত অথবা মানব মঙ্গলকারী ঋষিগণের যে কি গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা আজকালের কয়জন বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন? এখনও পল্লীভূমির বিরক্ষ মায়েরা ঠাঁহার কোলের দুলালের মুখে তুলসীতলার মাটী দিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুলসীতলার মাটী-খেকো পাড়াগাঁয়ের ছেলেগুলোর ইকন্যাচীইল লিভার একেবারেই হয় না। তুলসীর সুমধুর গন্ধযুক্ত বাতাস যখন এই পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত কৃষকের নাসিকায় অনুভূত হয়—তখনই সে নারায়ণকে ভাবে আর 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়' বলিয়া ঠাঁহাকে প্রণাম করে। বলিতে পারি না আর কতদিন এমন ভাবে চলিবে। অনেকেই হয়ত বলিবেন—আর কিছুদিন, যত দিন না পাড়াগাঁয়ের কৃষকের ও অন্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে মাত্রেই অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা পাড়ে। অনেকে হয়ত ভাবিবেন, পাশ্চাত্যশিক্ষার নিন্দা করিতেছি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত ভাইগণ! বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি, আপনাদের মধ্যে কয়জন প্রত্যহ তুলসী-বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করেন? তবে আশার কথা এই যে, হাওয়া আবার ফিরিছে, বর্ষপ্রভু বাঙ্গলার দিকে বাঙ্গলার সন্তান আবার ফিরিয়া দেখিতেছে, দেশের ভবিষ্যত আশা ও ভরসার নবীন যুবকগণ ঐ যেন সুরে বলিতেছে—

"বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল,
বাঙ্গলার ফুল, বাঙ্গলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান!"

সেই আশাতেই বুক বাঁধিয়া আজ তুলসীর সাধারণ ব্যবহার অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণে তুলসীর উপকারিতার বিষয় বলিতে সাহসী হইয়াছি।

এ দেশেরই বড়াল-কবি শ্রী-বিহারীলালের পত্র "এষা" নামক গ্রন্থে যে দুঃখময় জীবনের নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারই এক স্থানে আছে :—

"হে পূত তুলসী, বিষ্ণুর প্রেয়সী
বিবর্ণ তোমায় দল;
প্রভাতে আদিয়া, প্রণাম করিয়া,
কেবা তুলে ঢালে জল।
সন্ধ্যায় আসিয়া গলে বস্ত্র দিয়া
কেবা তলে দীপ জ্বালে,
নীরস মঞ্জরী পড়ে ঝরি ঝরি—
মৃত্তিকা ডালে ডালে।
বলিত আমায় নমিতে তোমায়
মুক্ত পুষ্প তিল দিয়া,
তোমার নিশ্বাসে সর্ব্ব রোগ নাশে
যায় দূরে পলাইয়া।"

আজ এই বাঙ্গলাদেশের মা লক্ষ্মীগণ কেহ কি তাঁহার স্বামীকে এই ভাবে তুলসী-বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিতে বলিতেছেন? তুলসীর সেবায় যে সর্ব্ব রোগ নষ্ট হইয়া থাকে; এই জন্য শ্রীভগবান স্বয়ং সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন—হে সত্যভামে! তুমি স্থির জানিও যে,—

"দারিদ্র্য দুঃখ রোগার্ত্তি পাপানি সুমহন্ত্যপি।
হরন্তে তুলসীক্ষেত্রং রোগাণিব হরীতকী।"

অর্থাৎ এক হরিতকী যেমন রোগসমূহ দূর করে তদ্রূপ তুলসীসেবীও দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ, শোক ও সর্ব্ববিধ পাপ আশু নাশ করিয়া থাকে।

এই সমস্ত ভেষজের গুণাবলী না জানিয়া ও কেবলমাত্র পরের মুখ চাহিয়া থাকিয়া আমাদের দুঃখের ও ক্ষতির অবধি নাই। শাস্ত্রের বিধানের অধিকাংশই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে।

তুলসীর ইংরাজী নাম—ওসাইমাম স্যাংটোরাম, পাশ্চাত্য দেশে অনেকে ইহাকে হোলি বেসিল বলেন। ঔষধার্থে ইহার মূল, বীজ ও পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তুলসীর সংস্কৃত পর্য্যায়—সুরসা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা, সুরসা, বনস্থা, সুরভূমুতি, হরকী, বহুমঞ্জরী, মঞ্জরী, হরিপ্রিয়া,

অপেত রাক্ষসী, ভাষা, গৌরী, ত্রিদশ মঞ্জরী, ভূতঘ্নী, ভূতপত্রী, পর্ণাশ, সুরা, কটিঞ্জর, কুটেরক, বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্রপুষ্প, সুলভা, গন্ধহারিণী, সুরভক্ষী, প্রেত রাক্ষসী, সুরহা, গ্রাম্য, সুলভা, বহুমঞ্জরী, দেবদুন্দুভি।

ইহাকে বাঙ্গালায় তুলসী, হিন্দীতে বরুয়া ও তুলসী, মহারাষ্ট্রদেশে তুলসীতে ঝাড়, তেলেগু ভাষায় তুই, তামিলীতে তুলসী, দাক্ষিণাত্যে তুলসী এবং বোম্বাই প্রদেশে তুলস কহে।

আয়ুর্ব্বেদমতে তুলসীর গুণ :—ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষুধ্রতি, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক, বাতশ্লেষ্মানাশক এবং কাস, ক্রিমি ব্যধি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, জীর্ণজ্বর, পার্শ্বশূল ও মূত্রাঘাতের নাশিকারক।

এলোপ্যাথিক মতে তুলসীর গুণ :—তুলসী কফনিঃসারক ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ানাশক। সর্দ্দিঘটিত বিবিধ পীড়ায়, কাস, পার্শ্বশূল, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, এজমা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি পীড়ায় উপকারী। সবিরাম ও অবিরাম জ্বরের ইহা মহৌষধ, প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস হইলে মূত্র করণার্থ ও সিফ করণার্থ ইহার বীজ প্রযোজিত হয়।

এই সমস্ত ক্রিয়াদি দেখিয়া, আয়ুর্ব্বেদে ইহার গুণাবলী পাঠ করিয়া, বর্ষাকালে তুলসীর বিষয় অবগত হইয়া মনে হয় যে, নিশ্চয়ই তুলসীর সংক্রামক পীড়ার বীজাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে। তজ্জন্যই বঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা এপিডেমিকের সময় ইহা বিবিধ উপায়ে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি যে, থাইমল, ইউক্যালিপ্টস প্রভৃতি অপেক্ষা তুলসীর শক্তি কম নহে।

আমি নিম্নোক্ত তিন প্রকার প্রয়োগরূপ প্রস্তুত করিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীগণকে প্রয়োগ করিয়াছিলাম—

১। তুলসীর অরিষ্ট, (টীংচার ওফাইনাম স্যাংটেটোরম বা টীংচার হোলি বেসিল) তুলসীর পত্র ও বীজ চূর্ণ ২।০ আউন্স, শোধিত সুরা ১ পাইণ্ট, এক সপ্তাহ কাল ইহা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ।০—১ ড্রাম।

২। তুলসীর কাণ্ট, (ইনফিউজন ওফাইনাম স্যাংটেটোরম বা ইনফিউজন হোলি বেসিল) শুষ্ক তুলসীর পত্র ১ আউন্স, ফুটিত পরিস্রুত জল ১ পাইণ্ট, অর্দ্ধঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ।০—১ আউন্স।

৩। সিরাপ ওফাইনাম স্যাংটেটোরম, (তুলসীর পাক) তুলসী পাতার রস ১২ আউন্স, বিশুদ্ধীকৃত শর্করা ২ পাউণ্ড, পরিস্রুত জল ৮ আউন্স বা যথা প্রয়োজন। তুলসীর রস ও পরিস্রুত জল একত্রে মিশাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল সাধারণ উত্তাপে ফুটাইবে।, পরে তাহাতে চিনি দ্রবীভূত করিয়া ক্রমশঃ সিরাপের আকারে পরিবর্ত্তিত করিবে। সর্ব্বশেষে ও পাউণ্ড ওজন হইবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

ছেলেদের সর্দ্দি কাশিতে অধিকাংশ সময়ে আমি তুলসীর সিরাপ বা নিম্নোক্ত চাটনী প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি—

তুলসী পত্রের রস—৪ ড্রাম
বিশুদ্ধ মধু—১ আউন্স
আদার রস—২ ড্রাম
মরিচচূর্ণ—২ ড্রাম

একত্রে মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ৩০—৬০ ফোঁটা।

ম্যালেরিয়া জ্বরে তুলসী পত্রের রস ১ তোলা ও আদার রস অর্দ্ধ তোলা মধুসহ সেবনে বেশ উপকার হয়।

তুলসীর মূল পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে রক্তামাশয় আরোগ্য হইয়া থাকে।

কর্ণশূলে ইহার রস বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্তপ্রদর বা হিমাক্রিয়া রোগে তুলসীর রস চিনি সহ সেবনে নিবারিত হইয়া থাকে।

তুলসীপত্রের রস প্রয়োগে প্রসবের পরবর্ত্তী বেদনা আরোগ্য হইয়া থাকে।

ঘন কালীন বমনে জলমিশ্রিত তুলসীর সিরাপ অথবা বিহীর সরবতের সহিত তুলসী পত্রের রস হিতকর।

বরাবর ও তুলসী নিয়মিতভাবে ব্যবহার করিলে বা বসন্তের সময় প্রয়োগ করিলেও পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

তুলসীর বীজ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে শুক্রমেহ বা স্বপ্নদোষ নিবারিত হয়।

গনোরিয়া বা প্রমেহ রোগে ও প্রস্রাবের জ্বালা নিবারণার্থ বহু স্থলে প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইয়াছি।

বক্ষ বা বাহু রোগে ইহার পত্র বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে কাগজী বা পাতী লেবুর রসে পিষিয়া বাহুতে লাগাইতে বলেন।

ছেলেদের হামজ্বরে তুলসীমঞ্জরী, যোয়ান ও আদা একত্রে বাটিয়া প্রয়োগ করিলে ঘাম বাহির হইয়া রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে।

তুলসীমঞ্জরী এক আনা, মৌরি এক আনা ও দুই এক পাই গুড় একত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ জলসহ সিদ্ধ করিয়া সেই অবশিষ্ট জল পান করিলে হাঁপানি নিবারিত হয়।

অনেক সময় তুলসী পত্র উত্তম বায়ুনাশক হইয়া অজীর্ণ, পেট কাঁপা, বমনাদি প্রভৃতিতে উপকার করে।

প্রত্যহ প্রাতে তিনটী তুলসী পত্র, তিনটি গোলমরিচ একত্র সেবন করিলে শরীরে প্রায় কোন ব্যাধি আক্রমণ করে না।

বাড়ীর মধ্যে বেশী পরিমাণে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

তুলসী বহু গুণবিশিষ্ট। সকল গুণের বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। সর্ব্বশেষে তুলসী-গীতায় লিখিত ভগবান-মুখনিসৃত তুলসীর প্রণাম লিখিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রণাম :—দৃষ্ট্বা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্ট্বা বপুঃপাবনী,
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তি-বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ।

অর্থাৎ যাঁহাকে দেখিলে নিখিল পাপসমূহ নাশ পায়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, যাঁহাকে অভিবাদন করিলে রোগরাশি বিদূরিত হয়, যাঁহার সিক্ত জল গাত্রে স্পৃষ্ট হইলে অন্তকভয় বিদ্যমান থাকে না, যাঁহাকে রোপণ করিলে ভগবান কৃষ্ণে প্রত্যাসত্তি জন্মে, যাঁহাকে কৃষ্ণ চরণে অর্পণ করিলে মুক্তিফল লাভ হয়—সেই তুলসীদেবীকে নমস্কার।

—ধাত্রী সমাচার।

রন্ধন-বিদ্যা

কলাইশুটীর খিচুড়ী—

উপাদান :—কলাই শুটী, চাউল, নানিতাল আলু, ঘি, তৈল, হলুদ, জিরে, ধনে কাঁচা লঙ্কা, তেজপাতা, লবণ, আকরাণ ও গরম মসলা।

পাথরের বাটীতে আকরাণকে সামান্য দৈ'য়ের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। কলাই শুটীর উপরের খোসা ছাড়াইয়া ভিতরে যে দানা বাহির হয় তাকে জলে ভিজাইতে হইবে। অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ভিজানোর পরে দানায় যে খোসা আছে তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্টের টিপের সাহায্যে ছাড়াইয়া আলাদা পাত্রে রাখিতে হইবে। এইখানে একটী কথা বলিয়া রাখি, খিচুড়ীতে যত ওজনের চাউল দেওয়া হইবে তার তিন গুণ ওজনের যেন কলাই-শুটী দেওয়া হয়। চাউলগুলি বাছিয়া একখানি পাত্রে রাখিয়া আকরাণ নিষ্ক্রিত দৈ চাউলের সঙ্গে ভালরূপ মাখাইতে হইবে। এখন জিরে, হলুদ, ধনে আলাদা বাটিয়া রাখিতে হইবে। কর্ত্তার পছন্দানুযায়ী কয়েকটী আলুকেও ছাড়াইয়া দুই বা চারি অংশে কাটিয়া রাখিতে হইবে।

পাক প্রণালী :—কড়াতে সরিষা তৈল চাপাইয়া তার মধ্যে কলাইশুটীগুলি ছাড়িয়া দাও এবং ঝাঁঝরার সাহায্যে ভাজিয়া তৈল হইতে একটা পাত্রে রাখিয়া দাও। তারপর নানিতাল আলুগুলি লাল করিয়া ভাজিয়া অপর একটী পাত্রে রাখ। ভাজার কাজ হইয়া গেলে ঐ তৈল আলাদা একটী পাত্রে রাখিয়া দিয়া পুনরায় কড়াতে সামান্য তৈল চাপাইয়া তৈলে কয়েকটী তেজপাতা ও পরিমাণ মত জিরে, ধনে, হলুদ বাটা দিয়া সামান্য ভাজিয়া তার মধ্যে ভাজা কলাইশুটীগুলি ও আকরাণ-মাখা চাউলগুলি দিয়া পরিমাণ মত জল দাও এবং ভাজা আলুগুলি ও কয়েকটী কাঁচা লঙ্কা তার মধ্যে ছাড়িয়া দাও। এখন দেখিতে হইবে কলাইশুটী, চাউল ও আলু সুসিদ্ধ হইয়া জলে গা মাখা হইবে কিনা। যখন জল ফুটিয়া উঠিবে তখন মাপমত লবণ দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। মাঝে মাঝে খুব ভালরূপ নাড়িয়া দেওয়া উচিত, জল যত শুকাইয়া উঠিবে ততই অতিরিক্ত নাড়িতে হইবে—যেন ধরিতে লাগিয়া না যায়। নামাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গরমমসলাগুলি বাটিয়া অতিরিক্ত ঘিয়ের সঙ্গে মিশাইয়া খিচুড়ীর মধ্যে দিয়া নামাইয়া ভালরূপ চাকনার সাহায্যে বন্ধ করিয়া দিলে কড়াইশুটীর খিচুড়ী তৈয়ার হইবে।

— শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায়।

আলুর খিচুড়ী—

কিছু গোল বা নানিতাল আলু সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে খোসা ছাড়াইয়া চট্‌কাইয়া লও। পরে একটী পাত্রে পরিমাণ মত তৈল ও লঙ্কা অগ্নিতে উত্তমরূপে ভাজিয়া অন্য পাত্রের আলু সিদ্ধের সহিত পরিমাণ মত লবণ ও সামান্য গোল-মরিচের বাটনা দিয়া কিছু জল মিশ্রিত করিয়া কড়ায় চড়াইয়া দাও। আলু সিদ্ধটী পাত্‌লা, সুতরাং অগ্নির উপরিস্থিত উত্তপ্ত তৈলে ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাক এবং জল মরিয়া খিচুড়ীর আকার ধারণ করিলে নামাইয়া লও। নামাইবার পূর্ব্বে একটু ঘি ও গরম মসলা দেওয়া দরকার। ইহা অতি মুখরোচক খাদ্য, বর্দ্ধমান অঞ্চলে ইহা একটী ব্যঞ্জন মধ্যে গণ্য। ইহা দ্বারা ওই অঞ্চলের লোকে বেশ ভাত খাইতে পারেন, অন্য তরকারীর আবশ্যক করে না। নাছ করিয়া ইহার সহিত দিয়া মিশাইলে তাঁহাও খাইতে বেশ সুস্বাদু হয়। আশা করি সকলেই ইহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। —শ্রীমতী প্রভাবতী সরকার।

রাগের মাথায়

(ছোট গল্প)

শ্রীমতী আভাময়ী রায় চৌধুরাণী।

(১)

—"দিদি আমায় পাঠিয়ে দাও।"

মহুর কথায় চম্‌কে উঠে, রমা স্নেহসিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "কোথায় পাঠাব রে মহু?"

লজ্জায় আরক্ত হয়ে কুণ্ঠিতভাবে মহু উত্তর দিলে "শাশুড়ীর এই শেষ সময়, আমি একবারটি তাঁকে দেখ্‌তে যাব।"

রমা সজল চক্ষে মহুর দিকে চেয়ে ব্যথাভরা কণ্ঠে বল্‌লে "তোর এ কথা কি করে রাখব মহু?"

মহু দিদির কথার কোন উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে সেখান হ'তে চলে গেল।

রমা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরের জানালার ফাঁকে অসীম নীল আকাশের দিকে উদাসভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে আপনমনে ভাব্‌তে লাগল—'মহু কোনদিন ত আমার কাছে শ্বশুরবাড়ী যাবার কথা মুখ ফুটে বলে নি, আজ সে বলছে। তাকে সেখানে পাঠান না-পাঠান এ এক বিষম সমস্যা। বাবা শেষ সময়ে বলে গেছেন, মহুকে যেন সেই হৃদয়হীন বর্ব্বরের কাছে আর পাঠান না হয়। সেই কথা অনুসারে আমি এতদিন চলে এসেছি। মহুও এতদিন যেতে চায়নি, আমিও ওকে পাঠাবার কোন চেষ্টা করিনি; কিন্তু আজ যাবার জন্যে তার হৃদয় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। শাশুড়ীর এই শেষ সময়, হয়ত তিনি এখন কোন রকমে নিষ্ঠুর নরেশের মতের পরিবর্ত্তন করাতে পারেন, হয়ত এখন সেখানে গেলে সে তার বঞ্চিত অধিকার আবার ফিরে পেতে পারে,—শুধু এই আশায় আমি আজ অতীতের সকল কথা ভুলে গিয়ে মহুকে পাঠিয়ে দেব। তার অবশিষ্ট নারীজীবনকে ধন্য করবার সুযোগ একবার তাকে দিতেই হবে,—তারপর তার অদৃষ্ট।'

এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে রমার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে এল, সে ধরা গলায় ডাকলে "মহু, ও মহু, এদিকে শুনে যা ত ভাই।"

রমার ডাকের একটু পরে ব্যথাকাতর বিবর্ণ মুখে মহু রমার পাশে এসে দাঁড়াল। রমা সস্নেহে মহুর দিকে চেয়ে বল্‌লে "তোর শাশুড়ী ত আর তোকে ডেকে পাঠায়নি মহু, তবে কি করে সেখানে যাবি?"

"এখানে যে কর্ত্তব্য নিয়ে কথা দিদি, তাঁরা না ডাক্‌লেও যে আমার যাওয়া একান্ত উচিত।"

—"কর্ত্তব্যই যদি শুধু হয়, তবে তোমার এ কর্ত্তব্য না কর্‌লেও চল্‌বে; কিন্তু কর্ত্তব্যের ওপর যদি আর কিছু থাকে, তবে—"

রমার কথা শেষ হ'তে না হতেই "দিদি" বলে মহু রুদ্ধ চোখের জলকে আর সামলাতে না পেরে আঁচলে মুখ ঢাক্‌লে।

মহুর ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে রমা তার মমতাভরা বুকে মহুর মাথাটা চেপে ধরে বললে "ভাই মহু, কাঁদলি কেন ভাই? তোর দিদি এত বড় পাষাণ নয় যে, আজ যে আশার আলোক রেখায় তুই হারাধন খুঁজে পাবি বলে ছুটেছিস্, তোর দিদি ইচ্ছে করে সে আলো নিভিয়ে দেবে। তোরই মুখ চেয়ে আজ তোর দিদি অতীতের সব কথা ভুলে গেছে। নরেশ যদিও আমার চেয়ে অনেক ছোট, দরকার হ'লে আজ তোর জন্য পায়ে ধরে তার পাষাণ হৃদয় গলাবার চেষ্টা কর্‌তেও আমার কোন দ্বিধা নেই।"

মহু দিদির প্রগাঢ় বাহুবন্ধনের মধ্যে ছিল, আবেগের সে দৃঢ়বন্ধন যখন একটু শিথিল হয়ে এল তখন সে তা'র

ব্যথার ব্যথী করুণাময়ী দিদির পায়ে হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনার প্রাণফাটা হাহাকার নিয়ে "দিদিগো" বলে লুটিয়ে পড়্‌ল।

রমা মন্থর হাত দুটী ধরে তাকে তুলে বল্‌লে "ছিঃ ভাই, কাঁদে না।" কিন্তু মন্থকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তার নিজের চোখের জলই সকল সান্ত্বনার বাঁধ ভাসিয়ে দিয়ে গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় মন্থকে একজন বুড়ো ঝিএর সঙ্গে নরেশদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে রমা ভাব্‌তে লাগল—'কি জানি কি আমার অদৃষ্টে আছে!'

(২)

আট বছর আগেকার কথা। মন্থ শ্বশুরবাড়ী থেকে রমার সঙ্গে একদিন দেখা কর্‌তে এসে দেখলে রমা সেদিন পুরী যাত্রা কর্‌ছে, মন্থও সেই সঙ্গে পুরী যাবার জন্ত দিদিকে ধরে বস্‌ল। রমা হেসে ছোট বোনটীর গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক করে বুঝিয়ে বল্‌লে "দেখ মন্থ, তুই যখন তোর শাশুড়ীকে কিছু বলে আসিস্‌-নি তখন এবারে থাক, আসছে বারে যাবার সময় তোকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। তোর পুণ্যি করা ত এখনই পালিয়ে যাচ্ছে না, তা ছাড়া নটায় ট্রেন, এখন ভবানীপুর থেকে তোর শ্বশুর বাড়ীর মত আনিয়ে ত আর যাওয়া হয় না, আর আজ না গেলেও ত দোল দেখা হয় না।"—কিন্তু মন্থ কিছুতেই ছাড়্‌ল না। তখন রমা রাগ করে বললে "থাক্‌ আমি যাব না, কি করে আর যাব, তোমার শ্বশুরবাড়ীর মত না নিয়ে ত আর আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পুরী যেতে পারি না; তা'হলে আমার না যাওয়াই ভাল।" দিদি তার ওপর রাগ করেছে দেখে অভিমানে মন্থর চোখ সজল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে জবাব দিলে "দিদি, তুমিই যাও, আমি যাব না। আমার জন্ত তোমার যাওয়া হবে না, সে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।"

দু'বোনের যখন এই রকম রাগ-অভিমানের পালা চল্‌ছিল, তখন পিতা দুর্গাপ্রসাদ বাবু এসে সমস্ত কথা শুনে বললেন "এ আর বেশী কথা কি রমা, মন্থ তোর সঙ্গে যেতে চাচ্ছে, তা বেশ ত থাক্‌না। এর আর মতামত নেবার কি দরকার আছে? আট দিন তো বোটে থাক্‌বে, আর তোর সঙ্গে যখন যাচ্ছে অন্য কারো সঙ্গে নয়, তখন তাদের অমতের কোন কারণই থাক্‌তে পারে না। তুই নরেশকে আর বেয়ানঠাক্‌রুণকে দুখানা চিঠি লিখে দে, দরোয়ান গিয়ে দিয়ে আসুক। আমি বলছি এ অবস্থায় মন্থকে নিয়ে গেলে কোন দোষের হবে না।" বাবার কথাই দুবোনে মেনে নিলে। রমা দরোয়ানকে দিয়ে দুখানা চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে মন্থকে নিয়ে সেই দিনই পুরী যাত্রা কর্‌লে

নরেশ সেদিন ল'ক্লাশ থেকে রাত্রি আটটায় বাড়ী এসে রমার চিঠি পড়ে তখনই মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "মা, এ কি রকম? আমাদের মতের অপেক্ষা না করে শুধু একখানা চিঠি দিয়ে তোমার বৌ পুরী বেড়াতে গেলেন?" নরেশ কোন দিনই স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিল না, বিশেষ তার অমতে তার স্ত্রীর কোন যায়গায় যাওয়া সে আদৌ পছন্দ কর্‌ত না। রমার চিঠি পড়ে যখন সে জান্‌তে পারলে যে বাপ্‌কে দেখতে আসার নাম করে গিয়ে মন্থ বোনের সঙ্গে পুরী গেছে, তাকে পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু বলা বা জানান দরকার বিবেচনা করে নি, তখন তা'র সারা মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল। সে সন্দেহ করলে, নিশ্চয়ই এর ভেতর কোন চক্রান্ত আছে।

নরেশের মা মন্থকে নিজের মেয়ের মত স্নেহ করতেন, তাই তিনি যদিও বুঝেছিলেন যে মন্থর এ কাজটা করা খুব ভাল হয় নি, কিন্তু ছেলের রাগত ভাব দেখে আর তার উগ্রস্বভাবের কথা মনে করে তিনি সে কথা চেপে গেলেন। তিনি বল্‌লেন "আহা, বৌমা ছেলে মানুষ, আমোদ করে দিদির সঙ্গে পুরী গেছে, তাড়াতাড়িতে আমাদের আগে জানাবার কথা ভুলে গেছে, আর জানাবার সময়ও ত ছিল না, এতে আর এমন কি দোষ হয়েছে?"

নরেশ যখন দেখলে যে এত বড় অন্যায় কাজ করা সত্ত্বেও মা বৌএ কোন দোষ ধরলেন না তখন তার রাগের মাত্রা আরও বেড়ে গেল, সে তখনই জোর গলায় বলে উঠ্‌ল "দোষ সোল আনা হয়েছে, যে স্ত্রী স্বামীকে না জানিয়ে ইচ্ছা ও খেয়াল অনুসারে যেখানে-সেখানে যেতে পারে, সে স্ত্রী সব করতে পারে। আমার কাছে পুরী যাওয়ার কথা গোপন করার তাৎপর্য্য কি আমায় বুঝিয়ে বল্‌তে পার? না—আমি ওরকম স্ত্রীর আর

মুখ দর্শন কর্‌তে চাইনে। সে যেখানে খুসী সেখানে থাক, যা ইচ্ছা তাই করুক—আমি আর তার কোন সংস্রবে থাক্‌তে চাইনে। যে আমার কাছে তার কথা বল্‌তে আসবে তাকে আমি আমার পরমশত্রু বলেই জানব।" এই কথা বলে নরেশ রাগে দিশেহারা হয়ে সেখান থেকে জোর পায়ে চলে গেল।

মা ছেলের ভাব দেখে একটু শিউরে উঠ্‌লেন। তার পরই মনে কর্‌লেন, নরেশ বৌ-মাকে যে ভালবাসে, তাই বৌমা কাছ-ছাড়া হয়েছে বলেই এটা অভিমানের রাগ। বৌমা এলেই তখন সব মিটে যাবে। এই ঘটনার দু তিন দিন পরেও যখন নরেশের মা দেখলেন যে, নরেশ কি যেন একটা কথা নিয়ে সদা সর্ব্বদা মনে নাড়াচাড়া কর্‌ছে, তাঁর সঙ্গে আর ভাল করে কথা বল্‌ছে না, অধিকাংশ সময়ই বাইরে পড়ার ঘরে কাটিয়ে দিয়ে রাত্রে শোবার সময় কেবল একবার মাত্র ভিতরে আসছে, তখন তাঁর মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগ্‌ল। তিনি নরেশকে ডেকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু নরেশ কিছুতেই বুঝল না—তার মন মহুর প্রতি আগেকার চেয়ে আরও তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

আট দিন পরে মহু পুরী হ'তে ফিরে এলে যখন দুর্গাপ্রসাদ বাবু নিজে তাকে নরেশদের বাড়ী রাখতে এলেন, তখন নরেশ তাঁদের বাড়ী ঢুক্‌তে না দিয়ে অত্যন্ত অভদ্রভাবে ফিরে যেতে বললে। নরেশের এই ইতর ব্যবহার বৃদ্ধ দুর্গাপ্রসাদ বাবুকে অত্যন্ত আঘাত দিল, তিনি তবুও বিচলিত না হ'য়ে নরেশের হাত ধরে অনেক অনুনয় বিনয় কর্‌লেন—কিন্তু পাষণ্ড নরেশ উত্তর কর্‌লে "আজ হ'তে আমার সঙ্গে আপনাদের কোন সম্বন্ধ রইল না, আমার স্ত্রীকে আজ হ'তে আমি পরস্ত্রী বলে মনে করব।"

এ সংবাদ বাড়ীর ভেতর গৃহিনীর কাছে এলে রাগে, দুঃখে, অভিমানে তিনি কেঁদে বললেন "নাম করা বোস বংশের ওপর এমন করে কলঙ্ক কি কর্‌তে দিলি নরেশ? কি কুক্ষণে যে তুই এ বংশে জন্মেছিস্, তা বুঝতে পারছি নে। ঘরের বৌকে রাস্তায় তুলে দিলি? তোর এ প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়ে আমায় দেখিয়ে লোকে যখন বল্‌বে, 'এর ছেলে বিনা অপরাধে বৌ তাড়িয়ে দিয়েছে' তখন আমি কি উত্তর দেব? এ কলঙ্কের বোঝা আমার মাথায় চাপাবার আগে আমায় বিষ খেতে বল্‌লি না কেন? তা হলে ত আমি পরিত্রাণ পেতুম।"

রাগের মাথায় নরেশের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না, সে তখনই জবাব কর্‌লে "এখনও ত পরিত্রাণ পেতে পার।"

মা ছেলের কথায় স্তম্ভিত হয়ে একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন "তোর মুখে আজ আমায় এ কথাও শুন্‌তে হ'লো, নরেশ? তুই আমার এত অপদার্থ ছেলে হয়েছিস?" বড় ক্ষোভে শেষের কথাগুলো বলে তিনি ঘর হ'তে বেরিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেই দিন রাত্রেই তাঁর বুকে এক অসহ্য রকমের ব্যথা ধরল। কোন চিকিৎসাতেই তাঁর এ ব্যথাধরা রোগ আর সারল না। মাঝে মাঝে তিনি ভাল থাক্‌তেন, মাঝে মাঝে আবার ব্যথার যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়তেন। এর পর মায়ে ছেলেয় মহুর সম্বন্ধে আর কোন কথা হয়নি।

(৩)

নরেশের মা বহুদিন রোগ এবং অশান্তি ভোগে উদ্যত হয়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে মরণের প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলেন। আজ তাঁর বুকের যাতনাটা একটু বেড়েছে। নরেশ মাথার শিয়রে বসে মাকে বাতাস কর্‌ছিল আর তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যূথিকা ডাক্তারের দেওয়া কি একটা ঔষধ শাশুড়ীর বুকে মালিশ করে দিচ্ছিল।

জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে নরেশের মা বল্‌লেন "নরেশ, ডাক্তারি ওষুধ এখন রেখে দে বাবা, নারায়ণের চরণামৃত এনে দে। আর কেন, অনেক কষ্টই ভোগ দিয়েছি, আর নিজেও পেয়েছি। আয় নরেশ কাছে আয় বাবা, আগের মত সেই পাগল ছেলে হয়ে আমার কোলে শো নরেশ। পৃথিবীর সব সাধ, সব আহ্লাদ আমার মিটেছে। কেবল পরপারের পাথেয় করে নিতে চাই মায়ের কাছে ছেলের আব্দারটুকু।"

নরেশ আস্তে আস্তে মায়ের রোগশীর্ণ গলাটি জড়িয়ে ধরে "মা" বলে ডাক্‌তেই তার অনেক দিনের সঞ্চিত পুঞ্জীভূত বেদনারাশি ঝর্ ঝর্ করে চোখের জল হ'য়ে ঝরে পড়তে লাগল। মায়ের চোখ দুটী দিয়েও শ্রাবণের ধারা নেমে

এল। আট বছরের আগেকার ঘটনাগুলো নরেশের চোখের সামনে ফুটে উঠল। সে ভাবতে লাগল—'মায়ের মাথায় আমি কত বড় এক অন্যায় করে বসেছি, নিরপরাধ স্ত্রীকে বিনা দোষে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিয়ে তার নারী-জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছি, মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে তাঁর দুরারোগ্য রোগের সৃষ্টি করে তাঁকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়েছি। আজও যদি আমি তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌তে পারি, তা হ'লে মা শেষসময়েও একটু শান্তি পান। কিন্তু এ কথা ত আমি আগে অনেকবার ভেবেছি, নিজের দুর্ব্বলতার জন্য ত কিছুই কাজে ক'রে উঠ্‌তে পারিনি।'

মা-ছেলের মিলনের আবেগ যখন কমল, তখন গৃহিণী বুঁধিকার হাত ধরে বড় স্নেহ-মাখা গলায় বল্‌লেন "বৌমা, একদিনের জন্যেও তোমায় আদর যত্ন করিতে পারিনি; সেই পোড়াকপালি আমায় কি গুণ করেছিল, তার মুখখানা সদাই মনে পড়ত তাই তোমার দিকে চাইতে পারিনি। বৌমা, আমায় সে জন্য ক্ষমা করো, কোন বিরাগ তোমার ওপর আমার নেই মা। আশীর্ব্বাদ করি, অয়-এয়োস্ত্রী হয়ে—চিরসুখিনী হয়ে ঘর সংসার কর।" তার পর একটু থেমে নরেশের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বল্‌তে লাগলেন, "নরেশ, মন্নুকে আমি বড় ভালবাসি; নিজের মেয়েকেও বোধ হয় লোকে এত ভালবাসে না। এই শেষ সময় একবারটী তাকে দেখতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পাছে তোমার মনে আবার কষ্ট দেই এই ভয়ে সে কথা বল্‌তে পারি নি।"

ঠিক সেই সময় বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে দেহভার একরকম ঝিএর ওপর দিয়েই ঘরের দোরের কাছে এসে মন্নু মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল। খানিক পরে যখন মন্নুর জ্ঞান হ'ল, সে চোখ খুলে দেখলে নরেশের কোলে তার মাথা রয়েছে, আর শাশুড়ীর রোগশীর্ণ চোখ দুটী তারই মুখের উপর ন্যস্ত হয়ে রয়েছে।

অনন্ত-সঙ্গীত

শ্রী পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর কেন স্বপ্ন মোহ? ছিঁড়ে দাও কুহেলিকা
হে বিশ্বনন্দন!
কোন সুখে কোন সাধে এই দুনিয়ার ফাঁদে
সহিব বন্ধন?
সুখ মরীচিকা ছলে ঘুরিনু অনেক পথ,
সুখ পলাতক!
তবু ছুটি পিছে পিছে মুছি নয়নের বারি
অবোধ বালক।
সাঙ্গ কর এ সংগ্রাম; গ্রাস নিয়ে কাড়াকাড়ি
নিত্য মনোভার;
কেন এ বনের খেলা? যাবে না কি এ জীবিকা
হে হরি আমার?

ঘৃণা, দ্বেষ, গর্ব্ব, ক্রোধ—এ সব আগুন কেন
জেলে দাও প্রাণে?
এ কেমন খেলা প্রভু? পুড়ে মরি রাত্রিদিন
আত্ম-অভিমানে।
কোন সুখে কোন সাধে বহিব জীবনভার,
কিছু যে গো নাই;
তোমা হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে দুনিয়ার কোন দাহ
মোরে মোহে নাই।
বিশ্বে যাহা মধুমাখা মাত্র এক মধুচক্র
বল রাধাশ্যাম,
বল সুপ্তোত্থিত জনে বল গো উদাত্ত স্বনে
হরে রাম, রাম।

সাহিত্য-সভানেত্রীর অভিভাষণ*

শ্রীমতী সরলা দেবী, বি-এ।

কাল অগ্রসর হয়েছে—বাঙ্গালাদেশ কালের পশ্চাতে পড়ে নেই। এই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনতরীকে উন্নতি-সমুদ্রে বহুযোজন পথ উত্তীর্ণ করে এনেছে। আজ ১৭ বৎসরের সেই সমুন্নত প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যবিভাগের কর্ণধার মনোনীত হয়ে আমি কৃতার্থম্মন্য বোধ করছি। গত বৎসর ঠিক আজকার দিনে প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য সম্মিলনে সভানেত্রীরূপে আহূত হয়েছিলুম। স্বদেশে যে সম্মান কোন বঙ্গ-দুহিতা আজ পর্য্যন্ত লাভ করেননি, দীর্ঘপ্রবাসের পর বঙ্গে ফিরে আসবামাত্র সেই সম্মানের অধিকারী হয়ে, আজকের সভায় সভানেত্রী পদের গৌরবলাভে আমার দেশবাসী ও আমার ভাষাভাষী ভাইবন্ধুগণের স্নেহের পরিচয়ে অভিভূতহৃদয়ে, আনম্রচিত্তে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমাদের ভাষার জন্ম কবে কোথায় কেমন করে হল কেউ ঠিক বলতে পারে না। এ বিষয়ে অনুমান মাত্র চলে। পণ্ডিতগণের অনুমান এই যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা মানুষের সহজাত। প্রাগ্‌বৈদিকযুগের বঙ্গভূখণ্ডবাসী আদিম মানুষের সহজাত যে ভাষাবীজ ছিল, তাই ক্রমে অঙ্কুরিত ও পুষ্পিত হয়ে বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় পরিণত হয়েছে এই তাঁদের সিদ্ধান্ত। সংস্কৃত যাঁদের কথিত ভাষা ছিল সেই আর্য্যনামধেয় জাতি যখন ভারতে বিস্তার লাভ করেন, তখন আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন প্রদেশে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশীভাষা প্রচলিত ছিল। সেই দেশী ভাষাগুলি বিদেশী সংস্কৃত ও সংস্কৃতপ্রভ প্রাকৃতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও, চেহারায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হলেও আজ পর্য্যন্ত সেই দেশী ভাষাই আছে। গৌড়ীয় ভাষা বা বঙ্গভাষা তাদের অন্যতম। হুকোর খোল ও নলচে দুই বদ্‌লে গেছে, কিন্তু হুকোটি সেই আছে। লিখিত ও কথিত বাঙ্গালা, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত অভিধানের সমস্ত শব্দসম্পদ আত্মসাৎ করেছে অথচ বাঙ্গলাই রয়ে গেছে। বাঙ্গালার নিজত্বের পরিচয় প্রথমতঃ নগণ্যের, শ্রবণসুখের ও যজ্ঞয়ের আবহমান কাল প্রচলিত অভেদে; দ্বিতীয়তঃ তার শরীরে এখন পর্য্যন্ত এমন কতকগুলি আদিম শব্দের অবস্থানে, যাদের সংস্কৃত বা সংস্কৃতপ্রভ কোন শব্দের সঙ্গেই সৌসাদৃশ্য নেই; এবং শেষতঃ কতকগুলি রীতিতে বা ছাঁদে যাকে বৈয়াকরণেরা গৌড়ীয় রীতি আখ্যা দিয়েছেন। বীজ বাঙ্গলার সংস্কৃত হতে স্বতন্ত্রতার সিদ্ধান্ত কল্পনাপ্রসূত নয়, অনুমানসাধ্য। অনুমানও একটি প্রমাণ যা যুক্তিযুক্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্ববিষজ্জনগণের বিচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনার স্থান এ নয়, যাঁদের সে বিষয়ে অভিরুচি জাগ্‌বে তাঁরা যেন স্বয়ং প্রাকৃতব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান খুলে জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করেন।

বুদ্ধদেবের সময়ে, অর্থাৎ অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গলিপির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যে ভাষার লিপি এত প্রাচীন, তার সাহিত্য প্রাচীনতর হবে সন্দেহ নেই। আজ পর্য্যন্ত সবচেয়ে পুরাণ যে বাঙ্গলারচনা পাওয়া গেছে তার বয়স অনুমান এক হাজার বৎসরেরও অধিক। সেটি রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপুরাণ বা শূন্যপুরাণ। সে বাঙ্গালা আধুনিক বাঙ্গালীর দুর্ব্বোধ্য নয়। তার একটুখানি নমুনা দিই:—

নহি রেক নহি রূপ নহিছিল বর্ণ চিন্।
রবি সশী নহি ছিল নহি রাতি দিন।
নহি ছিল জলথল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস।
দেউল দেহেরা নহি পূজিবার দেচ।
মহাপুরু মাত্র পরভুর আর অচ্ছি কেউ।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনী, সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন—মৌলভীবাজার। ২০শে ও ২১শে চৈত্র, ১৩৩৪।

কবি যে তপস্বী নহি নহিক বাহ্মন।
পর্ব্বত পাহাড় নহি নহিক স্থাবর জঙ্গম।
স্থলথল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি নহি দেবতা সকল।
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সূর্য্য নয়।
বস্তা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আধার।
বায়বস্ত ন ছিল কবি যে তপস্বী।
তীর্থ থল নহি ছিল গঙ্গা বরাননী।
ত্রৈরাগ মাধব নহি কি করি বিচার।
স্বর্গ মর্ত্ত নহি ছিল সব ধুন্ধুকার।
দস দিগ্‌পাল নহি মেঘ তারাগণ।
আউ নিত্ত নহি ছিল ঘুমর তাড়ন।
চারি বেদ ন ছিল ন ছিল সাস্তর বিচার।
গোপত বেদ কৈলন পরভু করতার।
ছিধর্ম্ম পদারবিন্দ করিবাক নতি।
রামাঞি পণ্ডিত কহে সুনরে ভারতী।

• • • •

বিদেশী মুন্নাদের সততভাষণে অনেকগুলি পার্শি ও আরবী শব্দ তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করে তাদের বাঙ্গলাকে কিছু বিকৃত করেছে বটে, কিন্তু তা বাঙ্গলাই রয়েছে, উর্দ্দু হয়নি। সেই বাঙ্গলায় মুসলমান চাষী ধান বোনে, সেই বাঙ্গলায় মুসলমান মাঝি দাঁড় টানে, সেই বাঙ্গলায় মুসলমান মা শিশুদের ঘুম পাড়ায়, সেই বাঙ্গলায় মুসলমান যোগী দীক্ষা নেয়। হিন্দুমুসলমান দুয়েরই দরবারী ভাষা হল ফার্সি, ঘরের ভাষা উভয়েরই রইল বাঙ্গলা এবং সেই বাঙ্গলায় হিন্দুমুসলমান দুজনের প্রাণ হতেই নিঃসৃত হল বাঙ্গলা সাহিত্য। কে বলবে নিম্নলিখিত গানটি পূর্ব্ববঙ্গের কোন হিন্দুর বা মুসলমানের রচনা?—

মনমাঝি সামাল্ সামাল্ ডুবল তরী
ভবনদীর তুফান ভারি!
তোর হেলে পেল না জল,
তোর হেলে পেল না জল, কি করবি বল,
কেমনে জোমাবি পাড়ি!
তোর হেলে ছয়খান দড়ি যাচ্ছে ছিড়ি,
ঐ ভাখ্ পোটাস্ পোটাস্ করি!
ডুব্‌ল তোর ভর তরী হায় কি করি
কেমনে জোমাবি পাড়ি!
মাঝি তরঙ্গ হেরি সইতে নারি
তাই তোরে জিজ্ঞাসা করি
বল্ দেখি কোন্ মিত্তিরি শিখায় তোরে
ওয়ওরি এ মাঝিগিরি!

উপনিষদের দেবভাষায় প্রচারিত যে অপরূপ সত্যটি নিজের গানে ফুটে উঠে, বাঙ্গলা ভাষায় ব্যক্ত হয়ে, বাঙ্গালামাত্রের মূর্খ সন্তানদের জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য বিতরণ করছে, কি আসে যায় মুসলমান ভাবুকের চিত্ত হতে তা উদ্ভূত হয়েছে বা হিন্দুর?

রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।

• • • •

ভাষার ঐক্যের উপরই জাতীয়তা নির্ভর করে। বালিকা জোয়ান-অব-আর্ক ফ্রান্সের মুক্তিকল্পে এই কথাটাই হৃদয় হতে অনুভব করেছিল। মূর্খ, গ্রাম্য বোড়শী স্বদেশের দাসত্ব মোচনে অনুপ্রেরিতা হয়ে, ভাবের আবেগে এই একটি সত্যের দর্শন পেয়েছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারে যখন ফরাসী সেনাধ্যক্ষ জোয়ান-অব-আর্ককে জিজ্ঞাসা করলে—"তোমার দেশ কোথায়? লোরেনের অন্তর্গত ডোমরেমিতে না?"

জোয়ান উত্তর দিল—"হাঁ, তাতে কি আসে যায়? আমরা সবাই ফরাসীভাষী।"

সেনাপতি যখন জিজ্ঞেস করলেন—"ইংরেজ সৈনিক কি ভীষণ লড়াই করে দেখেছ?"

বালিকা বল্‌লে—"তারা ত মানুষ। বিধাতা আমাদেরই মত তাদেরও সৃষ্টি করেছেন। তাদের নিজের দেশ ও নিজের ভাষা দিয়েছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রেত কখন নয় যে তারা আমাদের দেশে আসবে আর আমাদের ভাষা বলতে চেষ্টা করবে।"

সেনাধ্যক্ষ উষ্ণ হয়ে বল্‌লেন—"এ সব গাঁজাখুরি কে তোমার মাথায় ঢোকালে? সৈনিকরা তাদের প্রভুর অধীন, সে প্রভু বার্গাণ্ডির ডিউক, ফ্রান্সের রাজা বা ইংলণ্ডের অধীশ্বর যখন যেই হোক! তাদের নিজের ভাষার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?"

জোয়ান উত্তর দিল—"আমি তা বুঝিনে। আমরা সবাই বৈকুণ্ঠের রাজার অধীন। তিনিই আমাদের আপন দেশ ও আপন ভাষা দিয়েছেন, আমাদের তাতেই নিষ্ঠা চান। তা যদি না হত, তবে যুদ্ধক্ষেত্রেও ইংরেজকে মারা নরহত্যা হ'ত, আর নরকাগ্নিতে দগ্ধ হবার ভয় থাকত তোমার! নরপ্রভুর প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভেবো না, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভাবো।"

ব্ল্যাক প্রিন্স ও তার সৈন্যদের কথায় জোয়ান বললে—"ঈশ্বর তাদের জন্যে যে দেশ সৃষ্টি করেছেন, এবং যে দেশের জন্যে তাদের সৃষ্টি করেছেন সেই স্বদেশে ফিরে গেলে ইংরেজরা ঈশ্বরের সুবোধ শিশু হবে। আমি ব্ল্যাক প্রিন্সের কথা শুনেছি। সে যে মুহূর্ত্তে আমাদের দেশে পাদক্ষেপ করে শয়তান সেই মুহূর্ত্তে তার ভিতর প্রবেশ করে তাকে দানব বানিয়ে দেয়, কিন্তু নিজের দেশে—যেখানকার জন্যে সে সৃষ্ট—সে অতি ভাল মানুষ। সব ঘটেই এই কথা। আমিও যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দখল করতে যেতুম, সেখানে বাস করতে ও সেখানকার ভাষা বলতে চেষ্টা করতুম, আমারও ভিতর শয়তান প্রবেশ করত।"

জোয়ান অব্-আর্কের অবিচলিত ধারণা হয়েছিল যে, যে ভাষা যার, সেই ভাষা যে দেশে কথিত হয়, সেই দেশ তার। অতি সহজ সরল কথা। শিশুও বুঝতে পারে, অশিক্ষিত সৈনিকও বুঝতে পারে, গ্রাম্য নরনারীও বুঝতে পারে। আমার ভাষা যে বলে না সে আমার পর, আমার দেশ তার নয়, সে বিদেশী। বিদেশীর আমার দেশে আধিপত্য করা অস্বাভাবিক, এবং আমার দেশকে পরের অধীনতা থেকে মুক্ত করার কামনা আমার স্বাভাবিক।

* * * *

মুসলমানদের মধ্যে যত শিক্ষার প্রচার হবে ততই "মুসলমানী বাঙ্গালা" উৎকর্ষ লাভ করবে, প্রাঞ্জল ও সুললিত হবে। বাঙ্গালায় উর্দ্দু বা ফার্সি শব্দের প্রবেশাধিকার যথেষ্ট আছে—কিন্তু অন্যপক্ষ বুঝে এবং কায়দা করে তাদের প্রবেশ করাতে হবে যাতে বাঙ্গালার গায়ে মিলে যায়, কিম্ভূতকিমাকার না দেখায়, শ্রুতিমধুর হয়। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিতায় অনেক সময় চলিত ফার্সি শব্দ সুন্দরভাবে স্থান পেয়েছে, সংস্কৃত শব্দের অঙ্গে অঙ্গ মেলে দিয়ে তার সঙ্গে মিলে গেছে, কোথাও খট্‌কা লাগায়নি। নিম্নলিখিত গানটি তার দৃষ্টান্ত—

পাগল মানুষ চেনা যায়,
তার হাসি হাসি মুখ শশী
খুসী ফোটে চেহারায়।
সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর,
তার নাহি আপন পর।
সে জানে না দুনিয়াদারী—
ভালবাসে দুনিয়ায়।

এমন আরও অনেক হিন্দুকবি ও লেখক আছেন যাঁরা প্রচলিত ফার্সি শব্দের ভাণ্ডার থেকে অপর্য্যাপ্তভাবে গ্রহণ করেও বাঙ্গালার কায়দ্যুতি নষ্ট করেন নি, কিন্তু মুসলমান লেখকেরা প্রায়ই ওজন ঠিক রাখতে পারেন না, তাঁদের হাতে আরবী ফার্সির অযথাভারে ভারাক্রান্ত হয়ে বাঙ্গালার শ্রী অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। অধ্যাপক বিনয় সরকার তাঁর গদ্য প্রবন্ধে অনেক ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেন, স্থানে স্থানে তাতে ভাষার জোর বাড়ে, কিন্তু কখন কখন বেকায়দা যে হয় না, তা নয়।

প্রয়োজনের ভাষায় তবু নানা দিক্‌দেশ থেকে শব্দ সংগ্রহ চলে, কিন্তু কাব্যের ভাষায় অর্থাৎ ভাবের ভাষায় শব্দনির্ব্বাচনীশক্তির কুশলতা অপরিহার্য্য। কবি নজরুলের সেই কুশলতা আছে। ভাবের তোড়ে তাঁর কবিতা অপ্রচলিত উর্দ্দুশব্দবহুল হলেও খট্‌কা লাগায় না, চমৎকৃত করে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান কবির রচনা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না।

মুসলমানদের সব কিছু কাজেকর্ম্মে 'ফাতেহা' নামক যে বোধনগীতি গীত হয়, কবি গোলাম মোস্তাফাকৃত তার নিম্নলিখিত অনুবাদটি মনোরম ও সর্ব্বজনবোধ্য।

তোমারেই মোরা করি প্রণিপাত,
তোমারেই মোরা পূজি দিনরাত,
তোমারি কাছে যাচি হে শক্তি—
মোরা-যে-শক্তি-হীন।
সরল সঠিক পুণ্য-পন্থা
মোদেরে দাও গো ব'লে,

চালাও সে পথে—যে পথে তোমার
প্রিয়জন গেছে চ'লে।
যে পথে তোমার চির-অভিশাপ,
যে পথে ভ্রান্তি—চির পরিতাপ,
সে পথে যেন গো না চলি কখনো
এ জীবনে কোন দিন।

কিন্তু নিম্নলিখিত কবিতাটির উপরের দুই চরণে মূল আরবী শব্দের ব্যবহারে বাঙ্গলাটী সুন্দর হয় নি—

তুমি হে খোদা, 'রহমান্-রহিম,'
'মালেকে ইয়াও মেদ্দিন্'
শত প্রশংসা তোমারি নামে
হে 'রাব্বিল আল্‌আমিন্'!

'মোহাম্মদী' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় মুসলমান কবিদের দেখাদেখি হিন্দু কবির রচনায়ও 'খোদা' শব্দের ব্যবহার বাঙ্গলাকে ক্লিষ্ট করেছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বাঙ্গলায় 'খোদা'র স্থলে দ্বি-অক্ষর 'বিভু' শব্দ ব্যবহার করে ছন্দের যতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার লালিত্য সাধন করতে পারেন। মনে করে দেখুন খৃষ্টান বাঙ্গালী বাঙ্গলা কবিতা লিখতে গিয়ে ঈশ্বর অর্থে যদি "গড্" শব্দ ব্যবহার করেন তবে সে কেমন বাঙ্গলা হয়? পূর্ব্বোক্ত গোলাম মুস্তাফার "নবযুগ" নামক কবিতাটী বাঙ্গলা ভাষা হিসেবে নির্দ্দোষ। তার দুই একটী চরণ উদ্ধৃত করছি:—

আজকে এ কোন্ নূতন যুগের
নূতন আলোকে
ভারতভূমি উঠল হেসে
পরম পুলকে!
নয়নে মোর পুলক লাগে,
হৃদয় কোণে কি গান জাগে!
কোন্ বাণী আজ ছড়িয়ে গেল
দ্যুলোক-ভূলোকে!
নূতন নূতন—সবই নূতন,
নূতন এ দিনে,
নূতন মানুষ, নূতন গীতি,
নূতন এ বীণে!

• • • •

দেশ, বেশ ও ভাষা এই তিনে এক হয়ে বঙ্গমাতার সব সন্তানগুলি যেদিন পাশাপাশি সৌভ্রাত্রভাবে দাঁড়াবে, ধর্ম্মভেদ যেদিন আর তাদের মর্ম্মচ্ছেদ করতে পারবে না, সেদিন বঙ্গসাহিত্যের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হবে।

প্রেম ও অভিমান

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

প্রেম কহে—"মহাসুধি আমি" সগৌরবে
"আকাশ পরশে মম তরঙ্গ বিপুল,
বিশ্ববাসী হেরে তটে দাঁড়ায়ে নীরবে,—
নাহি সীমা নাহি শেষ অতল অকূল!"

অভিমান কহে—"প্রেম, জান না কি বিধি
সৃজিলেন প্রতিযোগী করি তব মোরে,
তীব্র হিম বায়ু আমি হায় জলনিধি
পলকে পাষাণ আমি করিব তোমারে।
নিঃশ্বাসে নিষ্ফল করি দিব ঊর্ম্মি লীলা
মূর্ত্ত বিভীষিকা হবে মৃত্যুরূপী শিলা!"

টণ্ট পেণী সেলাই

শিল্পী— যোগেশচন্দ্র রায়।

টণ্ট্ পেণী :—এ জাতীয় জামা সকল ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য ব্যবহৃত হয়। মেয়েরা একটু চেষ্টা করিলেই নিজেদের ছেলেমেয়ের গায়ের জামাগুলি নিজেরা কাটিয়া ছাটিয়া সেলাই করিয়া ব্যবহার করাইতে পারেন।

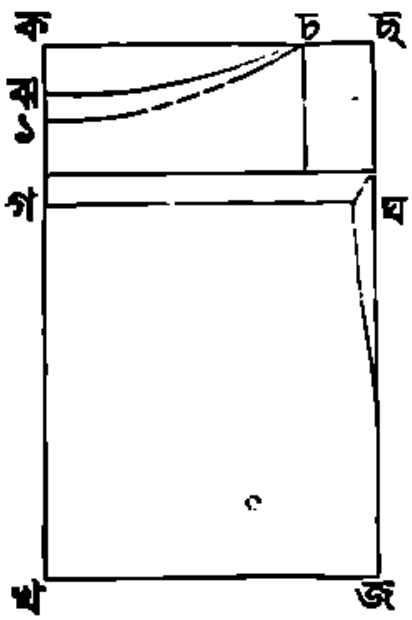

মাপ :—লম্বা ১৪", ছাতি—১৮"

কাপড় কাটিবার নিয়ম :—প্রথমতঃ কাপড়কে লম্বা দিকে ডবল ভাঁজ করিয়া চওড়া দিকে পাল্টা ভাঁজ করিতে হইবে। ক, খ লম্বা ১৪"+১"=১৫" ইঞ্চি ক, ছ ছাতি মাপের অর্দ্ধেক ছ হইতে চ পর্য্যন্ত ২" ইঞ্চি ভিতরে ক, চ গলার অংশ কাটিতে হইবে। ক, ঝ ১½" ইঞ্চি নীচে পেছনের অংশ ক, ১ সামনের অংশ ২" ইঞ্চি নীচে ক, গ ছাতির ¼ অংশ গ, ঘ লাইন টানিয়া ছ, ঘ হাতের মোহোঁড়ার অংশ ঘ, ঙ একটু বাঁকাভাবে চিত্রানুযায়ী দাগিয়া খ, ঙ সংযোগ করিয়া লইবে। এইটী মনে থাকে যেন কাঁধের অংশ চওড়া থাকিবে। চ, ক পেছনের অংশ চ, ১ সামনের অংশ কাটিয়া দাগানুযায়ী কাটিয়া লইলে টণ্ট্ পেণী কাটা হইল।

পেণী সেলাই—গলার অংশ যে কাটা হইয়াছে তা'তে

ফিতা পরানো যায় এমন ডবল ভাঁজে কাপড় জুড়িয়া সামনে ফিতা পরাইবার জন্য মুখ রাখিতে হইবে। গলার অংশ সেলাই হইলে মোহোড়ায় কুচি দিয়া ফ্রিল বা লেস্ অথবা চিকন বসাইয়া পাশ সেলাই করিয়া লইয়া নীচের অংশ মুড়িয়া সেলাই করিতে হইবে; অথবা মোহড়ায় যা দেওয়া হইয়াছে তা দিয়া সেলাই করিয়া লইলে "টণ্ট্ পেণী" সেলাই সম্পূর্ণ হইল।

গায়ে পরাইবার নিয়ম :—গলার অংশে যে অতি বড় ফাঁক রহিয়াছে, সেই ফাঁক অংশ গলায় পরাইয়া ফিতার অংশে গলার উপযুক্ততা হিসাবে কুচি দিয়া গিট দিয়া লইলে অতি সহজ ও সুন্দর হয়।

গৃহচিকিৎসা

শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

আমাশয়ের পীড়া—আমাশয়ের পীড়া দুই রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এক রক্তামাশয় আর এক সাদা আমাশয়। যদি রক্তামাশয়ের সহিত প্রবল জ্বর থাকে এবং অধিক পরিমাণে রক্ত পড়ে, তাহা হইলে গৃহচিকিৎসার উপরে নির্ভর না করিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসক দেখানই উচিত। কেন না ঐরূপ হইলে রোগ প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে। যদি জ্বর না থাকে অথচ আমাশয়ের সহিত রক্ত পড়ে, তাহা হইলে থানকুনির মূল, মুথা ও জামের পাতা পরিষ্কৃত শিলে ছেঁচিয়া, লোহার শিক আগুনে গরম করিয়া, ঐ রস গরম করিতে হইবে। উহা অল্প ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্তামাশয় আরোগ্য হইবে। বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে, কতকগুলি বাবলার পাতা অল্প লবণ দিয়া হাতে রগড়াইয়া, সেই পাতার ছেলাটী চুষিতে দিবে। রোগী উহা চুষিয়া সমস্ত রসটুকু খাইয়া পিটাটী ফেলিয়া দিবে। শিশুকে কচি কচি বাবলার পাতা বাটিয়া এক কণিকা লবণ দিয়া খাইতে দিবে। (বেশী পরিমাণে লবণ হইলে শিশুর পেট ফাঁপে এবং অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা) প্রত্যহ সকালে ও বিকালে এই ঔষধ খাওয়াইলে রোগী তিন চারি দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। জ্বর থাকিলে, গন্ধভাদালী বা গাঁদালের পাতা, থানকুনির মূল ও পাতা, বেলশুঁট আতপচাউল ধোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া বয়স্ক ব্যক্তিকে ছোট কাঁচের গেলাসের এক গেলাস, শিশুকে ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক খাওয়াইলে আরোগ্য হইবে। বয়স্ক ব্যক্তিদিগের আমাশয়ের পীড়ায় (জ্বর না থাকিলে) কাঁচা বেল পোড়াইয়া রাত্রে (ছাদের উপরে বা ঐরূপ কোন স্থানে) শিশিরে রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ইক্ষু চিনি, অভাবে পুরাতন খেজুরে গুড় দিয়া মাখিয়া খাইতে দিবে। ইহা বিশেষ উপকারক। বয়স্ক ব্যক্তিদিগের আমাশয়ের পীড়ায় জ্বর না থাকিলে অন্নই সুপথ্য। পুরাতন চাউলের অন্ন, থানকুনি ও গাঁদালের পাতার ঝোল, গাওয়া ঘৃতে ডালিমের পাতা ভাজা, পুরাতন নালিতার গুঁড়া, মৎস্য খাইলে ক্ষুদ্র জীবিত মৎস্য গাঁদালের পাতা দিয়া ঝোল, এই সকল পথ্য করা উচিত। রাত্রিতে শঠীর পালো, এরারুট প্রভৃতি পথ্য। শিশুদিগকে গাভী দুগ্ধ না দিয়া এরারুট, শঠীর পালো, ছাগ দুগ্ধ দেওয়া উচিত। আমাশয়ের পীড়ায় পেট কামড়ানি হইলে থানকুনি অনেকগুলি বাটিয়া নাভিমণ্ডলে পুরু করিয়া প্রলেপ দিলে কমিয়া যায়। প্রলেপের সময়ে থানকুনি বাটা গরম করিয়া দিতে হয়। নাভিতে সরিষার তৈল দিলেও উপকার দর্শে। আমাশয়ের পীড়া সহজে সারিতে চাহে না। অসুখ আরাম হইলেও রোগী ঠাণ্ডা লাগাইলে, কুপথ্য খাইলে আবার হইয়া থাকে। সেজন্য আমাশয়ের রোগীর এবং স্তন্যপায়ী শিশুর জননীর অনেকদিন সাবধানে থাকা উচিত।

(ক্রমশঃ)

নানাকথা

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে মহিলাদের দাবী—

গত ২০শে ও ২১শে চৈত্র তারিখে বীরভূমে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ১৭শ বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সাধারণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনীতে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানে—চারিটি শাখা বিভিন্ন সভাপতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এবার সাহিত্য শাখার সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সরলা দেবী। তাঁহার অভিভাষণের কিয়দংশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। এই সম্মিলনীটি বাঙ্গালার সাহিত্যিকদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ইহা প্রতি বৎসর বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে হইয়া থাকে। এই সম্মিলনীতে এবার একজন সুযোগ্যা মহিলাকে সাহিত্য শাখার সভানেত্রী করিয়া সম্মিলনী বাঙ্গালার মহিলা-দিগকে যোগ্য সম্মান প্রদান করিয়াছেন। আরও সুখের সংবাদ এই, সম্মিলনীতে এবার যে কয়টি নূতন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার একটি হইতেছে—'সম্মিলনীতে মহিলাদের প্রবেশের অধিকতর সুব্যবস্থা করা হইবে।' ইহার প্রস্তাবক ছিলেন মাতৃ-মন্দির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমর কুমার বসু মহাশয় এবং সমর্থক ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়। আগামীবারে এই অধিবেশন পাবনা সহরে হইবে। মহিলাদের জন্য তথায় পর্দ্দা ব্যবস্থা হইবে। উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য আমরা বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যিক মহিলাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই আহ্বান করিয়া রাখিতেছি।

শিশু প্রদর্শনী—

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বাঙ্গালার বিভিন্ন সহরে শিশু ও মাতৃ-মঙ্গল প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। এই সব প্রদর্শনীতে ধাত্রী, শিশুমঙ্গল, আঁতুর ঘর, স্ত্রীরোগ প্রভৃতি নানা বিষয় ম্যাজিক ও বক্তৃতা প্রভৃতির সাহায্যে বোঝাইয়া দেওয়া হয়। এগুলি বিশেষভাবে মহিলাদের দেখিবার জন্যই করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক স্থলেই পর্দ্দানশীন মহিলাদের আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া দেখিবার উপযুক্ত বিধান করা হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যেক মহিলাকে অনুরোধ করি, ঐ সমস্ত প্রদর্শনী দেখিবার সুযোগ যেন তাঁহারা না হারান।

ডেড্-লেটার—

ডাকে প্রেরিত যে সকল পত্রের মালিক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেইগুলির মালিক অনুসন্ধানের জন্য ডাকবিভাগের ডেড্-লেটার আফিস খুলিয়া একটি কার্য্যালয় আছে। আশ্চর্য্য হইবার কথা, বহু স্থলে একেবারে ঠিকানা না-লেখা চিঠিও ডেড্-লেটার আফিসে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরের মধ্যে মোট সাতানব্বই লক্ষ, উনত্রিশ হাজার, বহুসত্ত তিরিশখানি পত্র ডেড্-লেটার আফিসে জমা হইয়াছিল। শুধু বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইএ প্রত্যহ গড়ে একশত চারিখানি করিয়া শিরোনামাবিহীন পত্র ডেড্-লেটার আফিসে জমা হয়। আমাদের মনে হয়, মহিলাদের লেখা চিঠিই বেশীর ভাগ ডেড্-লেটার আফিসে বন্ধ হয়। অনেক সময় চিঠি পাওয়া যায় নাই বলিয়া আমরা অভিযোগ করিয়া থাকি; এখন বুঝিয়া দেখুন চিঠি যায় কোথায়। চিঠির ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবার জন্য আমরা মহিলাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

মন্দির ও মসজিদ একত্রে—

নদীয়া জেলার রঙ্গরস নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশ, তহটপুর গ্রামে একটি মন্দির ও মসজিদ একই প্রাঙ্গণে অবস্থিত। তথায় হিন্দু ও মুসলমান নির্বিবাদে আপনাপন উপাসনাকল্পে যোগ দিয়া থাকেন। যদি হিন্দুমুসলমানের পরস্পর সহানুভূতি থাকে তবে ধর্ম্মকার্য্য এমন কোন ঘটনা ঘটিতে পারে না যাহার কোন ধর্ম্মাবলম্বী অপর ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে ব্যাঘাতকর। তবে কলিকাতায় এ কি শুনিতেছি? এই যে সম্প্রতি হিন্দুমুসলমানে ভীষণ ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতি হইয়া গেল—ইহা কি কেবল হিংসা-প্রণোদিত নহে? ভগবান উর্দ্ধ হইতে আমাদিগকে ইহার জন্য অভিসম্পাত করিতেছেন না কি?

বীর-নারী চাহে বীর—

একজন ফরাসী বীর তেত্রিশ দিন উপবাস করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পরে একজন জর্ম্মান বীরের উপবাস দিবস যখন তেত্রিশ দিনও পার হইয়া ফরাসী বীরকে পরাস্ত করিল, তখন তাঁহার এই উপবাসের বীরত্ব দেখিয়া পাঁচশত জর্ম্মান নারী তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়াছিল। বীর নারী চাহে বীর।

বাওলা হত্যাকাণ্ড—

ইথোপের মহারাজার অন্তঃপুরে মমতাজ নাম্নী একটি সুন্দরী, যুবতিকা নর্ত্তকী ছিল। তাহার গর্ভজাত একটি সদ্যপ্রসূতা কন্যাকে রাজা শুশ্রূষার ভার দেন এই দুঃখে মমতাজ মহারাজকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার মনের সাধে চলিয়া যায়। পরে মমতাজ বাওলা নামক এক ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করায় মহারাজের ষড়যন্ত্রে বাওলা নিহত হয় এবং মমতাজ আহত হয়। বৃটিশ রাজ সরকারে এই ঘটনার বিচার হওয়ায় হত্যাকারীদিগের ফাঁসি হয় এবং মহারাজ পুত্রকে রাজ্য দিয়া নিজে সিংহাসনচ্যুত হইতে বাধ্য হন। মমতাজ পুনরায় এক ধনী মুসলমান সওদাগরের সহিত শাদীসূত্রে বিবাহিত হইয়া নর্ত্তকীজীবনের পরিবর্ত্তন করিয়া স্বামীর সহিত বিলাতে গমন করিয়াছে। একটি নারীর উপলক্ষে অনেকগুলি বিলাস লীলা ঘটিল—একেত্রে আমরা দোষী করিব পুরুষকে, কি মানিকে তাহা জানিনা। কিন্তু জানিলেও কম এমনই ঘটিয়া থাকে।

সতীর গতি—

বোম্বাই নগরি হাসপাতালে নানসি সাইমন নেরর নাম্নী একটি ছাত্রী কেরোসিনে পরিচ্ছদাদি সিক্ত করিয়া অগ্নিসংযোগে আত্মহত্যা করিয়াছে। নানসি মৃত্যুকালে বলিয়াছে—ডাক্তার আনোয়ার আমাকে বিবাহ করিবার প্রলোভনে ফেলিয়া আমার কুমারীত্ব নষ্ট করিয়া বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায় আমি এই প্রকারে আমার পাপজীবন ত্যাগ করিয়া ধর্ম রক্ষা করিলাম।' ডাক্তার, শমনরাজের মত স্মরণ করিয়া তোমার চিত্ত ভয়াকুল হইতেছে না কি?

মূল্যবান অলঙ্কার ব্যবহারের পরিণাম—

গত ১১ইমার্চ তারিখে দ্বিপ্রহরে কলিকাতা ভবানীপুরের ইন্দিরাবুখার্জ্জী রোডস্থিত এক বাড়ীতে একটি ভীষণ খুন হইয়া গিয়াছে। গৃহকর্ত্রী উকিল কোর্টে গিয়াছিলেন, বাড়ীর অন্যান্য সকলেও কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন, কেবল একটি বার বৎসরের মেয়ে বাড়ীতে ছিল। ঐ সময়ে হঠাৎ দুইজন গুণ্ডা গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ মেয়েটিকে গলা টিপিয়া মারিয়া তাহার গায়ের অলঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান করে। পুলিশ তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। মূল্যবান অলঙ্কারাদি বহুমূল্য বিলাস আবরণ করিয়া অনর্থ ঘটায়, দেখিয়া শুনিয়া আবশ্যক অলঙ্কারের ব্যবহার হইতে মহিলাদিগকে নিবৃত্ত থাকিতে পরামর্শ দিই।

বৃদ্ধ—তরুণী—

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বয়স পোষ্টঅফিসের কেরাণী, বয়স পঞ্চাশ বৎসর। তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুরমা দেবীর বয়স সতের বৎসর। একদিন কোন কারণে বৃদ্ধ ও তরুণীতে কথা হওয়ায় বৃদ্ধ সুরমাকে হাত-পা বাঁধিয়া আটক রাখে এবং তাহার মাথার চুল কাটিয়া দেয়। সুরমা ইহাতে এতই মর্ম্মাহত হয় যে পরদিন সে কেরোসিন বন্ধ করিয়া পরিধেয় সাড়ীতে দিয়াশলাই জ্বালিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। প্রতিবেশীগণ আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার কয়েক মিনিট পরেই তাহার মৃত্যু হয়। বে-আইনী ভাবে স্ত্রীকে আটক রাখিবার জন্য গোপালচন্দ্র সরকারের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছে। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোন বালিকার জীবনের জন্য দায়ী হইতে আশা আছে কি?

সাঁওতালী-বালিকার বীরত্ব—

পুরুলিয়ার "মুক্তি" পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন, মিনি নামে একটি সাঁওতালী বালিকা মহুয়া আহরণ করিবার এক বন্ধুর সহিত জঙ্গলে গমন করিয়াছিল, ইতিমধ্যে একটি ব্যাঘ্র আসিয়া মিনিকে আক্রমণ করে। মিনি সেই মুহূর্ত্তে একখানি প্রস্তর খণ্ড তুলিয়া এমনি জোরে ঐ ব্যাঘ্রকে আঘাত করে, যাহার ফলে ব্যাঘ্রটি মিনির বন্ধুকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মিনির বাম কর্ণ আহত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। ধন্য সাঁওতালী বালিকা, ধন্য শক্তির অংশভূতা, ইচ্ছা করি তোমাকে বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েদিগকে দেখাই—যদি বঙ্গললনার প্রাণে একটু শক্তির সাড়া দেয়। পাঠক পাঠিকাগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, মানভূমের ডিপুটি কমিশনার এই বীর বালিকাকে তাহার সাহসিকতার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিয়া অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

হাসপাতালে মহিলার দান—

ঢাকা জেলার তবারিয়া গ্রামের উপেন্দ্রমোহন তালুকদারের বিধবা পত্নী শ্রীযুক্তা জ্যোতিবালা তালুকদার বাহিরগাঁও গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করিবার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন; এবং হুগলী জেলার শ্রীযুক্তা রাধারাণী দাসী নাম্নী একটি মহিলা অল্পদিনের একটি চিকিৎসালয়ের জন্য হুগলী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান মহাশয়ের হস্তে দুইহাজার টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। দেশের দরিদ্র রোগীদের সেবাশুশ্রূষার জন্য মহিলাদের এত মুক্ত হইবে না ত কি?

শিশুমৃত্যু—

গত পূর্ব্ব বৎসরে সমগ্র বঙ্গের ২৫৫৬৯৪টি শিশু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। গত বৎসরে হইয়াছে ২৫২৩৩৭। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে গতপূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা গত বৎসর ১৩৫৭টি শিশু কম মরিয়াছে। এতাধিক শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী কে? মা-লক্ষ্মীরা অজ্ঞতা অন্ধকার দূর করিতে ব্রত উৎপন্ন হইতে থাকুন।

গৃহীর পালনীয় তথ্য—

১। প্রকৃতি বাহিক সাহায্য ব্যতীত রোগ আরোগ্য করিতে অক্ষম।

২। ভাল চিকিৎসক না পাইলে বিনা ঔষধে থাকা উচিত।

৩। ঔষধ যত কম ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে পার ততই নিরাপদ।

৪। চা, কোকো ওয়াটার, বিয়ার, ব্রাণ্ডি, তামাক প্রভৃতি সুস্থ দেহে ব্যবহার করা না হয়।

৫। যত অধিক ঔষধ ব্যবহার করিবে শরীর তত শীঘ্র তত অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইবে।

৬। সর্ব্বদা মাথা বেশ ঠাণ্ডা রাখিবে।

৭। উদর নির্ম্মল রাখিলে বৈদ্যকে পয়সা দিতে হয় না।

৮। রোগের অধিক মিষ্ট খাইতে দিলে পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়, দাঁত খারাপ হয়।

৯। অর্দ্ধ ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণে পেঁপে, কিসমিস্ ও কলা খাওয়া ভাল।

১০। ম্যালেরিয়ার সময় পানীয় জল ফুটাইয়া শীতল হইলে পান করিবে।

গয়ার বিষ্ণু-মন্দির, এবং ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রে মন্দিরাদি
কীর্ত্তি স্থাপয়িত্রী দানশীলা রাণী অহল্যাবাই।

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৪র্থ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৩ | ২য় সংখ্যা

নিদাঘে

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

নিদাঘের তাপে শীর্ণ সুহৃদ পল্লব,
নীলিমা পাণ্ডুর,
ধরা বক্ষে উচ্ছ্বসিত উৎস শীতিরব
মৌনকণ্ঠ, বেদনা-বিধুর!
তাই আজ গান আর মনে নাহি আসে,
তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস।
চির মনোরম হায় কোথা পরবাসে
নিরুৎসব নিরালা আবাস!
আঁখি ধায় বহু দূর আকাশের পথে
আশায় উৎসুক,
মিলনের সাথী কিগো আসে মেঘ রথে
বাথিতেরে বিলাইতে সুখ?
বিরহ ধূসর বাস মাখে ধরণীর,
মুক্ত কেশভার,
অবিরাম বৃষ্টির চুম্বনে বনানীর
তরু গুল্ম গাহিবে আবার!

মেয়েদের শিক্ষা-সমস্যা।

শ্রীবারিদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

"ভারতে যদি কোন অনুন্নত জাতি থাকে, তবে সেটা নারী জাতি" আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য এবং ইহার মূলে যে নারীজাতির শিক্ষার অভাব তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তবে একটা সুখের বিষয় এই যে, অধুনা কি মাসিক, কি সাপ্তাহিক, কি দৈনিক কোন না কোন কাগজে মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা হচ্ছে। মেয়েদের শিক্ষা যে বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয়ে আজকাল মতভেদ না থাকলেও নরনারীর সমান অধিকারবাদীরা মেয়েদের, পুরুষদের সহিত সমান ভাবে শিক্ষা দেওয়া সমর্থন করেন সুতরাং এই প্রসঙ্গে মেয়েদের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা করা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না।

সমাজ বিজ্ঞানের (Sociology) ইতিহাস আলোচনা দ্বারা আমরা জান্‌তে পারি যে আদিম অবস্থায় মানুষ কৃষিকার্য্য জান্‌ত না—তারা ধাতুপাত্রের ব্যবহার প্রভৃতি কিছুই জান্‌ত না। শিক্ষা, দীক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম, প্রভৃতি তাদের কিছুই ছিল না—নির্দ্দিষ্ট স্ত্রীও ছিল না আর তাদের লাম্পট্য সম্বন্ধও পশুর ন্যায় ছিল। তাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান না থাকায় নারীরা সন্তান পালন ও তার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য বড়ই মুস্কিলে প'ড়ল। অবশেষে নারীদের দ্বারে গৃহের পত্তন হ'ল – আর তাদের চেষ্টায় গৃহটী স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে ও আরামে ভরে উঠল, পুরুষরা যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ ক'রল এবং আরামের জন্যে তাদের কাছে ধরা দিল। গৃহ-ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সূত্রপাত হ'তে লাগল এবং ক্রমে ক্রমে তারা আগুনের ব্যবহার, ধাতুপাত্রের ব্যবহার, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি শিখতে লাগল। অন্যদিকে সন্তানরক্ষার প্রয়োজন হওয়ায় ধাত্রীবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি হ'তে লাগল। যাতে সমাজে দুর্নীতি প্রবেশ কর্‌তে না পারে এবং যাতে সকলে শান্তিতে থাকতে পারে, যাতে মানসিক ও নৈতিক উন্নতি হয়, এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ায় জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মের পত্তন হ'ল। এখন এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে বর্ত্তমান সভ্যতার মূল হচ্ছে নারীর গৃহ পত্তনের ফল। ইহা হ'তে আমরা নারীর দুইটী স্বরূপ দেখতে পাই—একটী তাঁর গৃহিণী-রূপ আর একটী তাঁর মাতৃ-রূপ। সুতরাং তাঁর যে একটা স্বতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্র আছে আর শিক্ষাও যে স্বতন্ত্র হবে তাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

এখন আমাদের দেখ্‌তে হবে, যে শিক্ষা মেয়েদের সুগৃহিণী ও সু-মাতা করে তুল্‌তে পারে, সেই শিক্ষাই তাঁদের পক্ষে উপযুক্ত হবে কিনা। গৃহটীকে স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্য্যে, সেবা-ধর্ম্মে আর ধন-সম্পদে ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'লে মেয়েদের স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন কর্‌তে হবে, সৌন্দর্য্যের সেবিকা হ'তে হবে, পারিবারিক মিতব্যয়িতা শিখ্‌তে হবে—এগুলি কি তাঁদের শিক্ষনীয় বিষয়ের বহির্ভূত হ'তে পারে? কখনই নয়। যদি তাই হয়, তা হ'লে এ প্রশ্ন স্বতই উঠে যে, গৃহটীকে সেবা-ধর্ম্মে ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'লে মেয়েদের স্বতন্ত্র শিক্ষার আবশ্যকতা আছে কিনা। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা দয়ায়, পরসেবায়, সতীত্বে আহত আর্ত্তের সেবায় জগতে অতুলনীয়। তাঁদের শক্তি প্রতিনিয়ত লোকচক্ষুর অগোচরে ব্যয়িত হচ্ছে। জগতে যদি কেহ নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিয়ে, রোগীকে সেবা ক'রে পরম সুখ লাভ ক'রে থাকে তবে সে আমাদের দেশের নারী। দয়া রমণীর স্বাভাবিক বৃত্তি, দান তাহার ফল। সেই বৃত্তি বশতঃ নারীই যুগে যুগে রোগ, শোক, দুঃখপূর্ণ এই ধরা বক্ষে শান্তিবারি বর্ষণ করেছে—বিলাস তুচ্ছ ক'রে পরসেবায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে—যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করেছে—দয়া ও ত্যাগের আদর্শ দেখিয়েছে। সুতরাং তাঁদের আবার নূতন করে শিক্ষার প্রয়োজন কি? এসব কথা সত্য হ'লেও শুধু সেবা কর্‌বার স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি থাক্‌লেই যে যুদ্ধে আহত আর্ত্তের সেবায় শিক্ষার কোন প্রয়োজন হবে না সে কথা তো ঠিক নয়, কেন না শিক্ষা, প্রেরণা ও

সুযোগের অভাবে কোন মানসিক বৃত্তিরই উৎকর্ষ সাধন হয় না।

মেয়েদের সুগৃহিণীর ন্যায় সু-মাতা করে তুল্‌তে হ'লে তাঁদের স্বাস্থ্যপালন, শিশুপালন, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি অল্প বয়স থেকে শিক্ষা ক'র্‌তে হবে—প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার দ্বারা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর ক'র্‌তে হবে- বাল্য বিবাহ ও অকাল-মাতৃত্ব দূর করতে হবে, আর যাতে সুস্থ, সবল ও নিরোগ শিশু জন্মায় তার ব্যবস্থাও করতে হবে। শুধু ইহাই নয়, যাতে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হয় তারও উপায় ঠিক ক'র্‌তে হবে, কারণ বাংলায় শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশী। এখানে প্রতি বৎসর তিনলক্ষের অধিক শিশু মরে—প্রতিদিন ৮১৬টী শিশু মায়ের বুক খালি করে চলে যায়। ইহার উপর প্রসূতির মৃত্যু সংখ্যাও খুব বেশী—প্রতি বৎসর ষাট-সত্তর হাজার প্রসূতি মরে। এই মৃত্যুর কারণ কি? ইহার মূলে কি মেয়েদের সু-মাতা করে গড়ে তোলবার উপযোগী শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব নয়? এই শোচনীয় অবস্থার জন্য আমাদের মেয়েদের মধ্যে শিশু পালন ও ধাত্রীবিদ্যায় অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অবহেলা কি বিশেষ ভাবে দায়ী নয়? শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের প্রাণ স্বরূপ। কোন একটা জাতির ধন-সম্পদ দেখ্‌তে গেলে, সেই জাতির মধ্যে কত সুস্থ ও সবল শিশু আছে, তার অনুসন্ধান ক'র্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়। ঐ শিশুদের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে সঙ্গে একটা জাতির উত্থান ও পতনের সাড়া পাওয়া যায়, কারণ তারাই তো বড় হ'য়ে প্রকৃতির ধনভাণ্ডার থেকে নানাপ্রকার রত্ন আহরণ কর্‌বে। কিন্তু হায়! মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষার অভাবে বাংলা শিশু মৃত্যুতে আজ শ্মশানে পরিণত হ'তে চলেছে। সে যাই হোক্ এখন মেয়েদের সু-মাতা করে গড়ে তুল্‌তে হবে, কারণ তাঁরা ছেলেদের যেমন গড়্‌বেন, শিক্ষা দেবেন ও চালাবেন তারাও ঠিক তেমনি গড়ে উঠ্‌বে, শিক্ষা পাবে ও চল্‌বে। মায়ের স্বভাব-চরিত্র ও মায়ের শিক্ষা-দীক্ষা সে মায়ের কাছ থেকে যতটা পায়, ততটা আর কাহারও কাছ থেকে পেতে পারে না, আর এগুলি তার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতিতে যতটা সাহায্য করে, ততটা সাহায্য আর কোন জিনিষই তাকে কর্‌তে পারে না। এর জলন্ত দৃষ্টান্ত ফ্রান্সের সম্রাট বিশ্ববরেণ্য বীর নেপোলিয়ন, জার্ম্মানীর রাজনীতি-চূড়ামণি বিস্‌মার্ক আর আমাদের দেশের সেবা ও ত্যাগের আদর্শ, দেশপ্রেমিক গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ।

এপর্য্যন্ত আমরা মেয়েদের সু-মাতা ও সুগৃহিণী করে তোল্‌বার শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, এখন কিরূপে তাঁদের জীবনসঙ্গিনী করে তোলা যায় ইহার উপযুক্ত উপায় স্থির করা উচিত ব'লে বিবেচনা করি। আমাদের কর্ম্মজীবনের সঙ্গীরূপে দাঁড়াতে হ'লে তাঁদের সেবাপরা শিখ্‌তে হ'বে, বিবিধ সৎগ্রন্থ পাঠ করতে হবে আর পঠিত বিষয় ভাব্‌তে ভাব্‌তে চিন্তাশীলতারও উৎকর্ষ সাধন কর্‌তে হবে। এখন কথা হচ্ছে, আজকাল শিক্ষাপদ্ধতি তাঁদের চিন্তাশীলতার উৎকর্ষ সাধন কর্‌তে ও তাঁদের বৈশিষ্ট ফুটিয়ে তুল্‌তে কতটা সাহায্য করছে? আজকালকার এই প্রতিযোগিতার যুগে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করা একরূপ দুষ্কর হয়ে উঠেছে—তার উপর মেয়েদের শিক্ষার অভাবে সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু পূর্ব্বে এ অবস্থা ছিল না। তখন স্ত্রী, পুরুষ সবই সুস্থ ও সবল ছিল, সকলেই পরিশ্রম কর্‌ত—কেহই বসে থাক্‌ত না। গৃহকার্য্য শেষ করে অবসর সময়ে তাঁরা নানা শিল্প কাজে নিযুক্ত হ'তেন—কেহ চরকা কাট্‌তেন, কেহ বা বস্ত্র বয়ন কর্‌তেন। এইরূপে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করে তাঁরা যে কেবল জীবন-যুদ্ধের ভার লাঘব ক'র্‌তেন তা নয়—একটা নূতন কুটির-শিল্পের পত্তন ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছিলেন। তাঁদেরই চেষ্টায় তখন প্রয়োজনীয় গৃহশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল এবং দেশের দারিদ্র্য-সমস্যা ও অর্থ-সমস্যার অনেক মীমাংসা হয়েছিল। আমাদের দেশের মেয়েরা কেবলমাত্র যে স্বামীর ভার লাঘব কর্‌তে সাহায্য করেছেন তা নয়—তাঁরা সুখে, দুঃখে, বিপদে, আপদে সকল অবস্থাতেই স্বামীর কর্ম্ম জীবনের সঙ্গিনীরূপে দাঁড়াতে কখনও দ্বিধা বোধ করেন নি। দ্রৌপদী, সীতা, সাবিত্রী, খনরন্তা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা নারীগণ ইহার জলন্ত উদাহরণ। সুতরাং সমস্যাটী কঠিন হ'লেও কার্য্যে পরিণত করা যে সম্ভব তা আমাদের দেশের প্রাচীনকালের মেয়েদের শিক্ষা প্রণালীর ইতিহাস

আলোচনা কর্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। কিন্তু এবিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, মেয়েদের সন্তান প্রতিপালন ও পুরুষদের সুখ স্বচ্ছন্দের স্বরূপে সাহচর্য্য করবার মত শিক্ষা দেওয়াটা কি আমাদের যথেষ্ট হবে? তাঁরা কি শারীরিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনে এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত ও কলাবিদ্যার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হবেন? যদি তাই হয়, তা হ'লে মেয়েদের সু-মাতা, সুগৃহিণী ও জীবন সঙ্গিনীরূপে গড়ে তোল্‌বার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায় যে, পুরাকালে মেয়েরা সৈনিকেরও কার্য্য কর্‌তেন। সমরার্থে রথোপরি উত্তোলনের চেষ্টা, সুচতুরতার সহ পরিচালনা প্রভৃতি বীরোচিত কার্য্য, তারপর ঐতিহাসিক যুগে দুর্গাবতী, তারাবাই, রাণী ভবানী, কর্ণদেবী, সংযুক্তা প্রভৃতি মেয়েদের যুদ্ধ ও রাজ্যশাসনের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কি নৈতিক, কি মানসিক, কি দৈহিক কোন অংশেই নারীরা পুরুষদের অপেক্ষা হীন ছিলেন না, তার জলন্ত প্রমাণ হচ্ছে আমাদের দেশের প্রাচীনকালের মেয়েরা।

তবে এখন কথা হচ্ছে এই যে, মেয়েদের মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক উৎকর্ষ সাধনে যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে তার জন্য পৃথক কোন আয়োজনের সার্থকতা আছে কি না? মনস্তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা আমরা জান্‌তে পারি যে পুরুষরা মেয়েদের অপেক্ষা ভাবপ্রবণ কম এবং মেয়েদের সুপ্তচেতন মন (subconscious mind) পুরুষদের সুপ্তচেতন মন অপেক্ষা অধিক প্রবল। এইজন্য মেয়েরা যতটা সহজে স্বার্থত্যাগ ক'রতে পারেন পুরুষরা ততটা সহজে স্বার্থত্যাগ কর্‌তে পারেন না, অপরের দুঃখ কষ্টে মেয়েরা যতটা কাতর হন পুরুষরা ততটা কাতর হন না। মেয়েদের প্রাণশক্তি পুরুষদের প্রাণশক্তি অপেক্ষা অধিক প্রবল, এ কারণ সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্য মেয়েরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক নিপুণতার সহিত এবং অধিকক্ষণ ধরে কর্‌তে পারেন। ইহা হ'তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মেয়েদের মানসিক ও নৈতিক গুণগুলি পুরুষদের মানসিক ও নৈতিক গুণ হ'তে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন সুতরাং মেয়েদের মানসিক ও নৈতিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের স্বতন্ত্র শিক্ষার যে প্রয়োজন আছে, একটু চিন্তা ক'র্‌লে তা বেশ বুঝতে পারা যায়।

এ কথা খুব সত্য হ'লেও মেয়েদের জীবন সংগ্রামে পুরুষদের সহিত দাঁড়াতে হ'লে তাঁদের বিজ্ঞানের বিবিধ তত্ত্ব জান্‌তে হ'বে—শারীরিক শক্তিরও উৎকর্ষ সাধন কর্‌তে হবে। মেয়েরা যদি সৎশিক্ষা লাভ ক'রে বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা জগতের প্রভূত উন্নতি কর্‌তে পারেন, তা হ'লে সে তো খুব সুখের বিষয়। তাঁরা যদি শারীরিক শক্তির চর্চ্চা দ্বারা পুরুষের সাহায্য ব্যতীত আত্মরক্ষা কর্‌তে পারেন, সে তো খুব সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁরা যদি প্রকৃত শিক্ষা লাভ ক'রে স্বাধীন ভাবে চিন্তা কর্‌তে শেখেন, তা হলে তাঁরা যে কেবল আমাদের অবস্থানুযায়ী বুঝে চল্‌তে পার্‌বেন তা নয়—তাঁরা সমাজের, জাতির ও দেশের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য ক'র্‌তে পারবেন, কারণ নরনারী নিয়েই সমাজ, তাঁরাই সমাজের দুইটী শাখা—সমাজের উন্নতির জন্য উভয়েরই প্রয়োজন। কিন্তু পুরুষদের যথার্থ জীবনসঙ্গিনী করে তুলতে হ'লে, মেয়েদের শিক্ষার আদর্শ এরূপ হওয়া উচিত যাতে ক'রে তাঁদের মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ উপকরণ দেবাধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হয়। কবি যথার্থই বলেছেন :—

"রোগে শান্তি, দুঃখে ধৈর্য্য, শোকেতে সান্ত্বনাজ্ঞান।
আছে এই ধরাতলে রমণীর বুক ;
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ।"

কাম ও রাম

(হিন্দি কবিতা)

যহা কাম তহা রাম নেহি,
নেহি কাম যহা রাম।
কাম রাম কবহু না রহে
দোনহু একহি ঠাম॥

খেয়ার শেষে

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(৩)

যাহাকে লইয়া এত কাণ্ড, সে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। কোনও আঘাত, কঠিন কথা কিছুই তাহাকে চেতাইয়া তুলিতে পারিল না।

ইভা বেশ বড় ঘরের মেয়ে ছিল, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট-দোষে সে জন্মাবধি বোবা। শুধু সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও টাকার লোভে কোনও শিক্ষিত ছেলের পিতা তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। অনন্তরাম জগতের মধ্যে অর্থকেই বেশী চিনিতেন এবং নিরতিশয় ভাল বাসিতেন, তাই অনেক অর্থ পাইবার আশায় তিনি ইভার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার ঠিক করিলেন। কিন্তু বাড়ীতে গোপন করিয়া গেলেন মেয়েটী বোবা।

অনন্তরাম অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, কিন্তু জীবনে কখনও একটী পয়সাও অপব্যয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার একটী মাত্র সন্তান অমিয় বড়, কি অর্থ বড়—ইহা বুঝা বড় কঠিন ছিল। যাহাই হোক, লোকে যে যাহাই বলুক, জগতে এই দুইটীই যে তাঁহার জীবনস্বরূপ ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ ছিল না। অমিয় কোর্থ ইয়ারে উঠিয়া এই বৎসর একজামিনের সময় যখন ফেল হইয়াছিল তখন পিতার ক্রোধ ও মনোকষ্টের শেষ রহিল না। শুধু তাহার ভবিষ্যৎ পানে চাহিয়াই তিনি প্রতি মাসে তাহার মাহিনার টাকা, বইয়ের টাকা দিতেছেন; যাওয়া অবশ্য এক বন্ধুর বাড়ীতে চলিয়া যায়, কিন্তু আর সব খরচই তো লাগে। একটী বৎসর সে যে নষ্ট করিয়া বসিল, এই একটা বৎসরে তাঁহার যে কত টাকা গেল তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়া তিনি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং আর তাহার পড়ার খরচ দিতে পারিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

শৈলবালা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূ। সে বালবিধবা এবং শ্বশুরালয়ে আর কেহই তাহার ছিল না, তাঁহার সংসারে সে মেয়ের মত রহিয়া গিয়াছিল।

ইভাকে দেখিয়া তাহার উপর শৈলবালার স্নেহটা কিছু বেশী রকম পড়িয়া গিয়াছিল। অভাগিনী বালিকা,— হাঁ, তাই বই কি! তাহার সবই আছে, নাই কথা কহিবার ক্ষমতা—সেইটাই যে মানুষকে মানুষের কাছে আনিয়া দেয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহাকে মনুষ্য সমাজ হইতে বিসর্জ্জন করিতে হইবে? সে এই কয়দিন ইভাকে নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার পরিচয় বেশ পাইয়াছে। সে কথা কহিতে পারে না, কিন্তু তাহার বড় বড় চোখ দুটি হৃদয়ের ব্যথাপূর্ণ কথা প্রকাশ করিয়া দেয় যে।

উমা পুত্রবধূর পানে একবার ফিরিয়াও চান নাই, পুত্রের কঠোর বাক্যাঘাতে তাঁহার সারা হৃদয়খানা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু বধূর উপর নয়, সারা জগৎখানার উপর তাঁহার কেমন একটা বিদ্বেষ চাপিয়া গিয়াছিল। পুত্র যে, সে মাতৃস্নেহ বুঝিল না, অনায়াসে স্নেহময়ী জননীকে পর্য্যন্ত সে সন্দেহের চোখে দেখিল, কোন্ মাতৃহৃদয় ইহাতে স্থির থাকিতে পারে?

ইভার সম্বন্ধে শৈলবালা যখন তাঁহাকে বুঝাইতে গেল, তিনি একেবারে অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাপু, জ্বালাতন কর আর আমায়? আমি তো আগেই বলে দিয়েছি আমি সংসারের কিছুর মধ্যে নই। যতটা পার আমায় দূরে দূরে রাখো, কাছে এসো না। কেন আমার কথা শুনতে চাও না তোমরা, তবু কেন আমায়—"

কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া কোনও মতে উদ্বেলিত অশ্রু চাপিতে চাপিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

হতাশভাবে শৈলবালা অমিয়ের সন্ধানে গেল।

অমিয় তখন খুব গম্ভীর ভাবে একটা ট্রাঙ্কের ভিতর নিজের কাপড় জামা সব গুছাইয়া লইতেছিল। বাড়ী আসার সময় কয়েকখানা বই অবসরকালে পড়িবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিল, বিবাহের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে বই কখানা গৃহের একপাশে রাশীকৃত ধূলির মাঝে বিশ্রাম করিতেছিল, আজ সেগুলি উঠাইয়া লইয়া তাহাকেই বাস্তব জীবনে পরম সত্য ধনজ্ঞানে সযত্নে সে রুমাল দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিতেছিল; শৈলবালাকে দেখিয়াই হাসিয়া ফেলিল "বউদি, আজ এখন এখানে, কাল এতক্ষণ কলকাতায়।"

বিমর্ষমুখে শৈলবালা বলিল "তা যাও, তাতে তো দুঃখ নেই কিছু। জন্ম জন্ম পড়তে থাক, তার বেশী আনন্দ আর কিসে আছে? আমি এখন একটা কথা তোমায় বলতে এসেছি; যে নির্দ্দোষী বালিকাটীকে বাড়ী এনেছ, তার একটা উপায় করে যাও।"

বিবর্ণমুখে অমিয় বলিয়া উঠিল "বাঃ, তা আমি কি জানি, যারা এনেছে, তারাই উপায় করবে।"

বিরক্ত শৈলবালা বলিল "ও মামুলি বুলি তোমার কয় দিন হতেই শুনতে পাচ্ছি; কিন্তু ও কথা বললে এখন চলবে না তা জানো কি? মা ইভার পানে একবারও ফিরে চান নি, বাবা তো বাইরেই থাকেন, ভেতরের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর মোটে নেই বললেও হয়। এদিকে পাড়ার মেয়েরা রোজ দুপুরবেলা এসে আসর জাঁকিয়ে বসবে, যাদের কথাই হচ্ছে ইভার সমালোচনা, আর ঘৃণাপূর্ণ হাসি। তোমরা সবাই যদি তার সম্বন্ধে এমনি উদাসীন থাক তবে সে দাঁড়াবে কোথায়? বোবা হলেও তার কি জ্ঞান বুদ্ধি নেই, না, বুঝবার ক্ষমতা নেই? আমি চিরকাল কিছু তোমাদের বাড়ীতে থাকব না, শীগ্‌গিরই বাপের বাড়ী চলে যাব। তোমার স্ত্রীকে দেখবে কে তখন? কলকাতায় যাওয়া বললেই হয় না, তোমার স্ত্রীর যা হয় একটা উপায় করে দিয়ে যাও।"

অমিয় নীরবে রুমাল দিয়া বই ঝাড়িতে লাগিল। তাহার ভাব দেখিয়া শৈলবালা বেশী রকম রাগিয়া উঠিল "এখনও চুপ করে ভাবছ যে? যখন তাকে বিয়ে করেছ তখন তার ভার তোমাকেই বইতে হবে। তুমি তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ কর, তারপর—"

অমিয় সবেগে মাথা নাড়িল "তা পারব না।"

শৈলবালা মুখ ঘুরাইয়া বলিল "তোমার যা খুসি তুমি তাই কর গিয়ে; আমি কোনও দায়ীত্ব রাখতে পারব না তা কিন্তু স্পষ্ট বলে দিচ্ছি ভাই।"

শৈলবালা চলিয়া গেল।

অমিয় খানিক গুম হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া পড়িল, নিচে মায়ের কাছে আসিয়া কোনও ভূমিকা না করিয়াই বলিয়া বসিল "আমি বেশ বুঝেছি মা বউকে এখানে না রেখে নিয়ে যাওয়াই ভালো, তাই আমি ওকে ওর বাপের বাড়ী নিয়ে যাবার কথা বল্‌ছি।"

খুব নিঃশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উদাস ভাবে মা বলিলেন "বেশ।"

অমিয় এবার চোখ তুলিয়া তাঁহার মুখের উপর রাখিল। শুষ্ক সে মুখখানা মুহূর্ত্তে সাদা হইয়া গেল, পরক্ষণে তাহার স্বাভাবিক রং আবার ফিরিয়া আসিল।

অমিয় ফিরিল, ইভা যে গৃহে বসিয়া পান সাজিতেছিল সেই গৃহদ্বারে গিয়া সে দাঁড়াইল। ইভা একবার সচকিতে মুখ তুলিয়া চাহিল, পরমুহূর্ত্তে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া মুখ নত করিল।

হঠাৎ সেই মুখখানা চোখে পড়িতেই অমিয় যেন থতমত খাইয়া গেল। এ দৃষ্টি তো শূন্য নহে, এ যে অর্থ পরিপূরিত।

নিজেকে সামলাইতে তাহার খানিকটা সময় কাটিয়া গেল, তাহার পর একটু এদিক ওদিক করিয়া দুইটা ঢোক গিলিয়া সে বলিল "তোমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও, আমি তোমায় তোমার বাপের বাড়ী রেখে কলকাতায় যাব।"

কথাটী কোনও ক্রমে শেষ করিয়া আর তাহার দিকে না চাহিয়াই সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

বাকশক্তিবিহীনা কিশোরীর সেই দুটি বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল; সত্যই কি তাহার কোনও শক্তি আছে?

কোনও শক্তি থাক বা না থাক, সে দৃষ্টিটা তাহাকে অত্যন্ত আহত করিয়াছিল। মুহূর্ত্তকাল সে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, তাহার পরই তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই সে লজ্জিত হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিল। বোঝা যে, তাহার কি কোনও শক্তি থাকিতে পারে?

কিন্তু সেই অর্থভরা দৃষ্টি; যে ভাষা তাহার মুখে ফুটে নাই, নীরব দৃষ্টিটা যে তাহাই ভরিয়া আনিয়া তাহার কাছে নিবেদন করিয়া দিতে চাহিয়াছিল; সত্যই কি তাই?

না, তাহা কখনই নয়, সেটা অমিয়ের মনের ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে বোবা তাহার আবার জাগরণ, কথাটা মনে করিতেও প্রচুর হাসি আসে যে। তাহার মনটা নেহাৎ কবির মত ভাবপ্রবণ কিনা, তাই একটু চকিতদৃষ্টি দেখিয়াই মনে অমনি একটা কল্পনা করিয়া লইয়াছে।

শৈলবালা আসিয়া বলিল, "তা হলে ঠাকুরপো, ছোট বউকে নিয়েই যাচ্ছো কলকাতায়?"

খুব গম্ভীরভাবে একটা জামা ভাঁজ করিতে করিতে অমিয় উত্তর করিল "তা ছাড়া কি করি? কেউ যখন তার ভার নিতে রাজি নয় তখন অগত্যা তাকে যেখান হতে আমায় আনতে হয়েছে সেখানেই রেখে আসতে হবে।"

শৈলবালা খানিক স্তব্ধ ভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল "তবু তাকে গ্রহণ করবে না?"

অমিয় ধীর ভাবে বলিল "গ্রহণ করার উপযুক্ত যদি দিতে আমি নিতুম। টাকা নিয়ে যারা সিন্দুক পূর্ণ করলেন, আমি যে সারাজীবন এই বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াব, তা পারব না।"

শৈল বলিল "কিন্তু যাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ সে তো যাবে না।"

"কেন, তোমায় বলেছে নাকি?"

শৈল বলিল "তুমি তার কাছে কি বলে এসেছ, কেঁদে ভাসাচ্ছে সে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম কেন সে কাঁদছে, সে শুধু আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতেই লাগল। আমি তাকে ধরে এনেছি ভাই, তোমার যা খুসি বলে দাও।"

কথাটা শেষ করিয়াই সে বাহির হইয়া গেল, পরমুহূর্ত্তেই অবগুণ্ঠনাবৃতা ইভার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিল, ইভা ধরজা চাপিয়া ধরিল।

অমিয় তাহার পানে চাহিয়া বলিল 'বাপের বাড়ী যাবে?"

ইভা নিশ্চল।

বিরক্তভাবে অমিয় বলিল "যা খুসি জানিয়ে ফেল, আমি আটকে থাকতে পারি নে তোমার জন্যে।"

ইভা এবার মাথা নাড়িল।

অমিয়ের মুখে এবার বিরক্তির চিহ্নগুলি স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল,—"মর তবে এখানে, থাক তবে, আমার তাতে কিছুই আসবে যাবে না। আমার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই, স্পষ্ট কথা শুনে যাও। যাও না, ধূমকেতুর মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন, চটপট সরে পড়।"

শৈলবালা বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ইভার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "তোকে বললে চলে যাও, অমনি চলে এলি? ওখানে যে তোর সম্পূর্ণ অধিকার তা বুঝি জানিসনে, নিজের অধিকার হারালে তোর কি থাকবে বল দেখি? ভারি বোকার মত কাজ করেছিস, কেন পা দুখানা জড়িয়ে ধরলি নে?"

ইভা পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিল যাহাতে শৈলবালা বুঝিতে পারিল যে কাহারও পায়ের কাছে আপনাকে নত করিয়া ফেলিতে সে একেবারেই অসম্মতা। নিজের অক্ষমতার কাছে নিজেই সে মাথা নত করিয়াছে, কাহারও নিকট দয়াপ্রার্থিনী সে কিছুতেই হইতে পারিবে না।

ইভা যে পিত্রালয়ে গমনে স্পষ্ট অসম্মতি জানাইয়া গেল, ইহাতে তাহার উপর অমিয়ের আক্রোশটা আরও বেশী রকম জাগিয়া উঠিল। সে যে এখানে নিতান্ত দীনের ভাবেই পড়িয়া থাকিয়া একটু একটু করিয়া স্নেহাকর্ষণ করিতে চায় তাহাতে অমিয়ের একটুও সন্দেহ রহিল না। কি স্পর্দ্ধা এই কিশোরীর। অমিয় যেখানে তাহাকে নত করিয়া রাখিতে চায়, সে সেখানে মাথা

তুলিয়া দাঁড়াইতে চায়; নিজের ললাটে ছাপ দিয়া সে জোর করিয়া জগৎকে জানাইতে চায় সে অমিয়ের পত্নী; যদিও সে বোবা, তথাপি সে-ই অমিয়ের সহধর্ম্মিণী!

অমিয় দেখিল এই ব্যাপারটার সহিত তাহার পিতা মাতা বউদি সকলেই সংশ্লিষ্ট আছেন। অপার রূপের মুগ্ধতার আবরণ দিয়া তাঁহারা ইভার মুকত্বকে ঢাকিতে চাহেন। অমিয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল, থাক সে এখানে, সে আর কখনও এখানে আসিবে না, স্ত্রীর মুখদর্শনও করিবে না।

দারুণ রোষে সে সন্ধ্যার ট্রেনেই কলিকাতা যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মাতার নিকট বিদায় লইতে গিয়া দেখিল তিনি চুপ করিয়া একলাটি বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন; তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সে বলিল "কলকাতায় যাচ্ছি মা।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস অতিকষ্টে প্রশমিত করিয়া মা বলিলেন "যাও—"

প্রতিবারে বিদায়মুহূর্ত্ত হইয়া উঠে অশ্রুময়, এবারে তাহার কিছুই হইল না। মাও ছেলের সম্মুখে আর কোমল হইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাই তিনি প্রাণপণে চোখের অবাধ্য অশ্রুকে শাসন করিয়া রাখিতেছিলেন। যদিও বাহিরে তিনি বড় গম্ভীর, তথাপি হৃদয়খানা তাঁহার বুকের আড়ালে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছিল!

অমিয় আর বাড়ীর দিকে ফিরিয়াও চাহিল না, পিতার পায়ের কাছে শুধু একটা প্রণাম করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

(৪)

অমিয় যাহার বাড়ীতে থাকিত তিনি অনন্তবাবুর একটী অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন; কিন্তু পয়সার তুলনা করিলে এ বন্ধুত্ব যে কেমন করিয়া হইল তাহাই ভাবিতে বিস্ময় আসিয়া পড়ে।

পরেশবাবু পূর্ব্বে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, আজ বৎসর খানেক মাত্র পেন্সান লইয়া আসিয়া বসিয়াছেন। যখন তিনি পুলিশে সাব-ইনস্পেক্টার ছিলেন তখনই অনন্ত বাবুর সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়।

পরেশ বাবু দয়ার্দ্র ও উচ্চ হৃদয়সম্পন্ন লোক ছিলেন। যখন অমিয় বি, এ, একজামিনে ফেল হইল, তখন অনন্ত বাবু কিছুতেই তাহার বোর্ডিং খরচ দিবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন, সেই সময় পরেশবাবু অমিয়কে নিজের বাসায় ধরিয়া আনিলেন। তিনি অনন্তবাবুকে খুব ভালরূপেই চিনিয়াছিলেন, অমিয়কেও বেশ চিনিতেন। অনন্তবাবু যেমন কৃপণ ছিলেন, পুত্রটী তেমনি অপরিমিতব্যয়ী ছিল। মাসিক খরচ পিতা যাহা দিতেন, তাহা হাতে আসিতে আসিতেই অন্তর্হিত হইয়া যাইত। প্রতিবারে যখনই সে বাড়ী আসিত, স্বামীকে লুকাইয়া মা তাহার হাতে যথেষ্ট অর্থ দিতেন, ইহা ছাড়া নিঃসন্তান পরেশবাবুও তাহাকে অনেক সাহায্য করিতেন। অনন্তবাবু যেমন কঠোরহৃদয় ছিলেন, অমিয় তেমনি কোমলহৃদয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার নরম স্বভাবের জন্য সে পরেশবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর বড় প্রিয়পাত্র হইয়াছিল।

অমিয় যেদিন বাড়ী হইতে আসিল সেদিন পরেশ বাবু বাড়ী ছিলেন না, তাঁহার স্ত্রী তাহার আসার খবর পাইবা মাত্র ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অমিয় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে গিয়াই চমকিয়া উঠিল। গৃহের মাঝখানে একটী যুবতী দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে দেয়ালের একখানি ছবি দেখিতেছিল। অমিয়ের পদশব্দ পাইয়া সেও চমকাইয়া মুখ ফিরাইল, তাহার অনুপম মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। অমিয় খানিক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল, জ্ঞান হইবামাত্র নিজেকে ধিক্কার দিয়া দ্রুতপদে সে আবার বাহিরে যাইতেছিল, সেই সময় পাশের গৃহ হইতে কুমুদিনী ডাকিলেন "অমিয়—"

অমিয়ের বুকের মধ্যে রক্তটা তখনও তোলপাড় করিতেছিল, কেন সে চুরি করিতে আসিয়াছিল, ধরা পড়িয়া গিয়াছে; একটা ঢোক গিলিয়া বিশুষ্কমুখে সে বলিল "আমায় ডেকেছেন খুড়ি মা?"

কুমুদিনী হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেন "এসেছ যে বাবা, ডেকে না পাঠালে বুঝি বাড়ী মধ্যে আসতে নেই? বিয়ে করে তো এলে, খুড়িমার জন্যে কি খাবার এনেছ?"

অমিয় একটু হাসিবার জন্ত বৃথা চেষ্টা করিল মাত্র, আপনিই তাহার মুখখানা অবনত হইয়া পড়িল।

কুমুদিনী বলিলেন "তুমি ভারি লজ্জা পাচ্ছো বাবা, কিন্তু লজ্জা পাবার কারণ এতে কিছু নেই। তোমার বাবা আমাদের যাবার জন্তে অনেক করে বলে গেছলেন, কিন্তু আমার বোনঝি হঠাৎ ভারি বিপদে পড়ায় আমাদের যাওয়া হয় নি। আমরা যাইনি বলে তোমার বাবা মা বোধ হয় রাগ করেছেন।"

অমিয় এতক্ষণ পরে আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া পড়িল, একটা প্রণাম করিয়া বলিল "না, রাগ করবেন কেন, তবে দুঃখিত নিশ্চয়ই হয়েছেন। বাবা কেবল আপনাদের কথা বলছিলেন, আমিও প্রতি মিনিটে আপনাদের যাওয়ার প্রত্যাশা করছিলুম।"

দুঃখিত স্বরে কুমুদিনী বলিলেন "কি করব বাবা, আমার ভারি ইচ্ছে ছিল তোমার বিয়েতে যাব। সেই কবে তোমার মায়ের সঙ্গে একটীবার মাত্র দেখা হয়েছিল, আর দেখা হয় নি। ভেবেছিলুম আবার নূতন করে আলাপ করব, নূতন বউমাটীকেও দেখতে পাব—তা অদৃষ্টটাই আমার খারাপ, তাই তোমার মাকে, বউমাকে দেখতে পেলুম না। যাওয়ার উদ্যোগ করছি এমন সময় টেলিগ্রাফ পেলুম পশ্চিমে আমার ভগ্নিপতি মারা গেছেন। নীরার মা, আমার বোন, সে বহুকাল আগেই মারা গেছে, বাপ তাকে মানুষ করছিলেন। টেলিগ্রাফখানা পাওয়া মাত্র তোমার কাকাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলুম, দিন ছয় সাতের মধ্যে তিনি সেখানকার বন্দোবস্ত একরকম ঠিক করে নীরাকে এখানে নিয়ে এলেন। এই সব ব্যাপারে আমাদের কারও যাওয়া হল না।"

অমিয় বেশ বুঝিতে পারিল গৃহমধ্যে এই মাত্র সে যে তরুণীকে দেখিয়া আসিয়াছে সেই কুমুদিনীর ভগ্নিকন্যা নীরা।

সে প্রসঙ্গ সে আর উত্থাপন করিল না, জিজ্ঞাসা করিল "কাকা কোথায় গেছেন?"

"তিনি আবার কাল রাত্রের ট্রেনে পশ্চিমে গেছেন।"

অমিয় জিজ্ঞাসা করিল "আবার গেলেন কেন?"

কুমুদিনী বলিলেন "নীরার বাপ তার নামে অনেক সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেছেন, নীরার কাকা সেখানে গিয়ে কি সব গোল বাধিয়েছেন জানি নে, সেই সব মীমাংসা করবার জন্তে তিনি গেলেন। নীরার কাকাকে একদিন তুমি এখানেই দেখেছ, ব্যারিষ্টার শ্রীনাথ বোস—"

অমিয় বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ, দেখেছি তাঁকে। এখন আপনার বোনের মেয়ে বোধ হয় এখানেই থাকবেন?"

কুমুদিনী একটু বিমর্ষ ভাবে বলিলেন "কি করে জানব বাবা? নীরার বাপ তাঁর বিষয়ের ট্রাষ্টি করে গেছেন তাঁর ভাইকে, অথচ নীরাকে আমার কাছে থাকতে বলে গেছেন; এ রকম কথার মানে আমি কিছু বুঝতে পারছি নে। যাই হোক, তার কাকা এখন তাকে আমার কাছে রয়া করে থাকতে দেয় তাই বুঝি, আমারই বা জগতে আর আছে কে? চিরকালটা পরের ছেলেপুলে নিয়ে দিন কাটাচ্ছি, আমার ঘরে এমন রত্ন তবু আছে। যতদূর মনে হচ্ছে নীরার কাকা ওকে আমার কাছে থাকতে দেবেন না, নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। নিজের বোন, তার মেয়েটীকে কাছে রাখবারও আমার অধিকার নেই।"

তাঁহার বড় বড় স্নেহভরা চোখ দুইটী জলে ভরিয়া উঠিল, চকিতে সে ভাব সামলাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "দেখ বাবা, কি কথা বলতে কি কথা এনে বসলুম; বুড়ো হলে মানুষের কোন জ্ঞান থাকে না। কোথায় জিজ্ঞাসা করব তোমার বিয়ের কথা—তা নয়, নিজের কথা পেড়ে বসেছি। যাই হোক বাবা, সে সব কথা থাক গিয়ে, বউমাটী কেমন হয়েছে? নিজের চোখ দিয়ে তো দেখতে পেলুম না, তোমার মুখেই শোনা যাক।"

অমিয়ের মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল; যে চিন্তাটা মন হইতে শরতের নীল আকাশে শুভ্র একখণ্ড মেঘের মতই মৃদুল বাতাসে দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেই চিন্তাটা আবার আসিয়া পড়িল। তাহার মুখখানা হঠাৎ বিমর্ষ হইয়া যাইতে দেখিয়া কুমুদিনী সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন "আমার মনে হচ্ছে, এ বিয়েতে তুমি সুখী হতে পার নি অমিয়; আমার এ অনুমান কি সত্যি?"

অমিয় নত মস্তকে রহিল, উত্তর দিল না।

কুমুদিনী অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন "কেন সুখী হতে পার নি? বউটী ভাল নয় বেখতে—লেখাপড়া আরো জানে না হয়তো।"

অমিয় এবার মাথা উঁচু করিল "আপনাকে বলতে আমার কিছু বাধা নেই খুড়িমা, কারণ আপনি আমার মায়ের মত। আমার বাবাকে তো আপনারা বিলক্ষণ চেনেন। অর্থলোভ সামলাতে না পেরে একটী আজন্ম মূক মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তিনি ঘরে এনেছেন।"

বিস্ময়ে কুমুদিনী বলিলেন "বোবা?"

অমিয় রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল "হ্যাঁ—"

বিস্ময়ে কুমুদিনী স্তব্ধ হইয়া গেলেন, অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন "বুঝেছি, তাই তুমি রাগ করে চলে এসেছ?"

অমিয় একটু হাসিয়া বলিল "না, রাগ করে আসি নি। আমার আদতে সেখানে পড়া হয় না, আর কলেজও তো খুলেছে, অনর্থক কলেজ কামাই করে লাভ নেই কিছু।"

সে ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

এতদিন বাড়ীর মধ্যে তাহার যে একটা অবাধ অধিকার ছিল, এই তরুণীটি কোথা হইতে আসিয়া তাহার সে অধিকারটীকে সঙ্কোচে জুড়িয়া দিল। সহজে সে এখন বাড়ীর মধ্যে বা উপরে আসিতে পারে না; তাহার মনে হয় বাড়ী মধ্যে সমস্ত স্থানটা জুড়িয়া বসিয়া আছে সেই তরুণীটি, অমিয় কেমন করিয়া তাহার অধিকারের মধ্যে পদার্পণ করিবে!

থাকিতে থাকিতে সে নীরার সম্বন্ধে অনেকখানি কথা জানিয়া ফেলিল। নীরার বয়স উনিশ কুড়ি হইবে, আজও সে অবিবাহিতা। খুড়িমা এই কথায় তাহার মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া সহাস্য মুখে তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, নীরার পিতা যদিও পূর্ণ ব্রাহ্ম ছিলেন না, অর্থাৎ রীতিমতভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন নাই, তথাপি তাঁহার মতটা ব্রাহ্ম ধরণেরই ছিল, এবং তাহার ফলেই নীরা এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিয়া অবাধে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পাইয়াছে। নীরার কাকা শ্রীনাথবাবু সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, নীরার বিবাহের ভার তাঁহারই উপরে। তিনি যদি স্বেচ্ছামত ব্রাহ্মের গৃহে নীরার বিবাহ দেন, নীরাকে ব্রাহ্মই হইতে হইবে, কারণ উইল অনুসারে নীরার বয়স এখনও উনিশ, দুই বৎসর পরে সে সাবালিকা হইলেও তাহাকে এ সব বিষয়ে কাকার অধীনা থাকিতে হইবে। আর হইবেও তাহাই, কারণ হিন্দুর গৃহে এরূপ বয়স্থা কন্যা কেহ গ্রহণ করিতে চাহিবে না এবং নীরাও তাহার আজন্মকালের অভ্যাসগুলি ত্যাগ করিয়া হিন্দুগৃহের বধূ সাজিতে পারিবে না।

নীরার পিতা পাটনায় ওকালতি করিতেন, ইহাতে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। পাছে তাঁহার মৃত্যুর পরে ভ্রাতা শ্রীনাথবাবু বিষয় লইয়া কোনও গোলমাল করেন, তাই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কন্যার নামে চল্লিশ হাজার টাকা ও দুইখানা বাড়ী উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সব টাকায় নীরার অধিকার হইবে বিবাহের পরে।

তাহার বিবাহ প্রস্তাবও অতি অদ্ভুতরূপে উইলে উল্লিখিত ছিল। যদি সে সম্পূর্ণ তাহার কাকার মতানুসারে চলে, তাঁহার ইচ্ছামত পাত্রে আত্মসমর্পণ করে, তবে সে যাবতীয় বিষয় প্রাপ্ত হইবে; আর যদি সে তাহার কাকার মতের বিরুদ্ধাচারিণী হয়, তবে একটী পয়সাও পাইবে না।

খুড়িমা এই বলিয়া কথা শেষ করিলেন—"তা দিক গিয়ে তাদের যার সঙ্গে খুসি মেয়ের বিয়ে, আমার তো তাতে কিছু আপত্তি নেই; যে কয়টা দিন বিয়েটা না হয় সে কয়টা দিন আমার কাছে থাকতে দিলেই আমার যথেষ্ট। বিয়ে হলেই মেয়েমানুষ পরের বাড়ী চলে যায়; নিজের মায়ের সঙ্গেই সম্পর্ক থাকে না, আমি তো মাসী মাত্র।"

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালীর আহার

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রী চুণীলাল বসু, এম্-বি, সি-আই-ই, আই-এস্-ও।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের দৈনিক খাদ্যে যথোচিত পরিমাণ প্রোটীনের অভাব হইলে শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি সম্বন্ধে কিরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, নিম্নলিখিত ঘটনাটীর বিষয় আলোচনা করিলে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। এ বিষয়ে আমি বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকা মাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন একটী গভর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্রাবাসের ছাত্রদিগের খাদ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে পরীক্ষিত হইয়াছিল। ঐ ছাত্রাবাসে বাঙ্গালী ও সাহেব, এই দুই জাতীয় ছাত্র বাস করিত। তাহাদের মধ্যে পড়াশুনা, কারখানায় কায়িক পরিশ্রমের কার্য্য, ব্যায়াম, ক্রীড়া, বিশ্রাম, বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না। দুই দলের মধ্যে কেবল বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। সাহেব ছাত্রদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হইত, তাহা হইতে তাহারা দিবসে ১½ ছটাক প্রোটীন্ জাতীয় সার-পদার্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত, কিন্তু বাঙ্গালী ছাত্রগণের দৈনিক খাদ্যে এক ছটাকের অধিক প্রোটীন্ বিদ্যমান থাকিত না। বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় প্রত্যেক ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া তাহার দৈর্ঘ্য, ওজন ও বুকের ছাতির পরিসর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত এবং তিন বৎসর পরে যখন ঐ ছাত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যাইত, তখন পুনরায় তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হইয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতি লিপিবদ্ধ করা হইত। এই পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ঐ তিন বৎসরের মধ্যে সাহেব ছাত্রগণ বাঙ্গালী ছাত্রগণ অপেক্ষা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহারা প্রায় সকলেই লম্বায় বড় হইয়াছিল এবং তাহাদের ওজন ও বুকের ছাতির পরিসর বাড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই এই সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে শতকরা দুইজন মাত্র সাহেব ছাত্রের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়াছিল কিন্তু বাঙ্গালী ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৪২ জনের এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতে দেখা গিয়াছিল। যিনি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহার মতে দৈনিক খাদ্যে যথোচিত পরিমাণ প্রোটীনের অভাবই বাঙ্গালী ছাত্রগণের শারীরিক বিকাশের অন্তরায় এবং স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, পনির (Cheese), দাল প্রভৃতি খাদ্য প্রোটীন্ খাদ্য বা পেশী-গঠক (Muscle-forming) খাদ্য বলিয়া পরিচিত। এই জাতীয় খাদ্যে প্রোটীন্ বা ছানাজাতীয় সার পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে। দুগ্ধকে কখন এই জাতীয় খাদ্য, কখন বা মাখন জাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গম, যব, চাউল, ওটমীল্, আলু, ফল, মূল, তরিতরকারির মধ্যে অন্যান্য সার পদার্থের সহিত অল্পাধিক পরিমাণে প্রোটীন্ থাকে; এই সকল খাদ্য দ্রব্য হইতেও আমরা অল্প বিস্তর প্রোটীন্ আহরণ করিতে সমর্থ হই। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে শর্করা জাতীয় পদার্থ (Carbohydrates) অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়া ইহারা প্রোটীন্ খাদ্যের শ্রেণীভুক্ত নহে। অবশ্য বাদাম জাতীয় ফলে প্রোটীন্, অধিক পরিমাণ মাখন-জাতীয় সার পদার্থের সহিত বেশী পরিমাণে বিদ্যমান থাকে; সুতরাং ইহাকে প্রোটীন্ শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে।

মাখন জাতীয় উপাদান (Fats)

দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত, চর্ব্বি, মাছের তেল, সরিষা, তিল, চীনাবাদাম ও নারিকেল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তৈল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মাখন জাতীয় উপাদানের প্রধান ক্রিয়া—দেহমধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়া শারীরিক তাপ ও শক্তি উৎপাদন

করা। ছানা জাতীয় বা শর্করা জাতীয় উপাদান দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া যে পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে, মাখন জাতীয় উপাদান তদপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ তাপ উৎপাদন করিতে সমর্থ। শীত-প্রধান দেশে দেহতাপ রক্ষা করিবার জন্য এই জাতীয় খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেশে দিবসে ১ ছটাক মাত্র মাখন জাতীয় উপাদান গ্রহণ করিলেই আমরা সুস্থ শরীরে সহজপরিশ্রমজনিত কার্য্য করিতে সমর্থ হই। মাখন জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে উহার কিয়দংশ অপরিপাক অবস্থায় মলের সহিত দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়। অপরাংশ দেহ মধ্যে মেদ রূপে সঞ্চিত হইয়া দেহকে স্থূল ও অপটু করে।

এই জাতীয় উপাদান সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) শ্বেতসার (starch) এবং (২) শর্করা (sugars)। ইহা ব্যতীত সেলিউলোজ্ (cellulose) নামক আর এক প্রকার শর্করা জাতীয় উপাদান গাছের ডাল পালা, পাতা এবং তৃণাদির মধ্যে অবস্থিতি করে এবং হস্তী, গো, মেষ, মহিষ, হরিণ, অশ্ব, ছাগ প্রভৃতি উদ্ভিদ্ভোজী প্রাণিগণ উহা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। আমরা কিন্তু সেলিউলোজ্ পরিপাক করিতে সমর্থ হই না। চাউল, দাল, ময়দা, যব, এরারুট, সাগু, ওটমীল (জই), আলু, মানকচু, কাঁচা কলা ও অন্যান্য তরিতরকারির মধ্যে শ্বেতসার (starch) যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। গুড়, চিনি, মিছরি, মধু, দুগ্ধ, বিবিধ মিষ্ট ফল মূল, খেজুর রস, আকের রস, তালের রস প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় শর্করা অল্পাধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। আক্ ও বিট্ পালঙের মধ্যে ইক্ষু শর্করা (cane sugar), বিবিধ ফলের মধ্যে ফল শর্করা (fruit sugar) এবং দুগ্ধের মধ্যে দুগ্ধ শর্করা (lactose or milk sugar) প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শর্করা অবস্থিতি করে। ইহাদের মধ্যে মিষ্টত্বে ইক্ষু শর্করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু অধিক পরিমাণে ইক্ষু শর্করা ব্যবহার করিলে দন্তের ক্ষতি ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। আমরা এই সকল পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া উহা হইতে যথোচিত পরিমাণ শর্করা জাতীয় উপাদান আহরণ করিতে সমর্থ হই।

শর্করা বা শ্বেতসার জাতীয় উপাদান (Carbohydrates)

শর্করা জাতীয় খাদ্যের ক্রিয়া মাখন জাতীয় খাদ্যের অনুরূপ। ইহা পেশী ও শারীরিক যন্ত্রাদির গঠনকার্য্যে মোটেই সহায়তা করে না, কেবল তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে মাত্র। এই জাতীয় খাদ্য মাখনজাতীয় খাদ্য অপেক্ষা দেহ মধ্যে সহজে দগ্ধ হয় বলিয়া তাপ ও শক্তি উৎপাদনে ইহা মাখন জাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অধিক উপযোগী। ব্যায়াম ও পরিশ্রম করিবার উপযুক্ত শক্তি আমরা মাখন ও শর্করা জাতীয় খাদ্য হইতে প্রাপ্ত হই, মাংস প্রভৃতি ছানাজাতীয় (প্রোটীন্) খাদ্য হইতে সাধারণতঃ সংগ্রহ করি না। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে মাংসজাতীয় খাদ্য হইতেই শারীরিক শক্তি উৎপন্ন হয়, কিন্তু এক্ষণে ইহা ভ্রান্ত সংস্কার বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। অবশ্য মাংস পেশীর গঠন ও ক্ষয় পূরণ প্রোটীন্ ব্যতীত অপর কোন উপাদান দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না এবং সবল ও পুষ্ট পেশী ব্যতীত শক্তির বিকাশ হয় না; এজন্য অন্য জাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিলেও প্রোটীনের পরিমাণ কম হইলে দেহের বৃদ্ধি সাধন ও পুষ্টিলাভ হয় না এবং উহা শক্তি সম্পন্ন হয় না। বাঙ্গালীর খাদ্যে শ্বেতসার (starch) ও শর্করা (sugar) জাতীয় দ্রব্য অনেক স্থলেই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকিতে দেখা যায় এবং স্থল বিশেষে মাখন জাতীয় উপাদানের (Fats) পরিমাণও প্রাচুর্য্যের দিকে থাকিতে দেখা যায় কিন্তু ছানাজাতীয় উপাদানের পরিমাণ প্রায়ই কম থাকে। এইজন্য বাঙ্গালী দিন দিন হীনস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। অধিক পরিমাণ শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে উহা দেহমধ্যে চর্ব্বিতে পরিণত হইয়া দেহকে মোটা করে এবং যে কার্য্যে অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহাতে বিমুখ করে। এই সকল ব্যক্তির শীঘ্রই বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। অনেকানেক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত এই যে আমাদের খাদ্যের দোষেই এদেশে বহুমূত্র রোগ এত প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়।

আমাদের দেহের তাপ রক্ষার জন্য এবং দেহাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রাদির ক্রিয়া ও বাহিরের যাবতীয় পরিশ্রম ঘটিত কার্য্য করিবার জন্য যে তাপ ও শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা আমরা মাখন ও শর্করা জাতীয় খাদ্য হইতে প্রাপ্ত হই। যদিও প্রোটীন্ খাদ্য তাপোৎপাদন করিতে সমর্থ, তথাপি সাধারণতঃ এই জাতীয় খাদ্য শরীরগঠন ও ক্ষয় নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাপোৎপাদনের জন্য নহে। ব্যায়াম ও পরিশ্রম করিবার যাবতীয় শক্তি আমরা মাখন ও শর্করা জাতীয় খাদ্য হইতে প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই দুই জাতীয় খাদ্যের ক্রিয়া এক হইলেও ইহাদিগের একটী অন্যটীর অভাব সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে পারে না; এই দুই জাতীয় খাদ্যই যথোচিত পরিমাণে পূর্ণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আবশ্যক হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে একজন সুস্থ সবল পরিশ্রমশীল যুবা পুরুষের জন্য দিবসে ২৮০০ ক্যালরি (calorie) পরিমিত তাপ তাহার দৈনিক খাদ্য হইতে সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হয়। ক্যালরি, তাপের পরিমাণ বিশেষ মাত্র। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে ১ ছটাক মাখন জাতীয় খাদ্য (ঘৃত বা তৈল) এবং আধসের পরিমাণ নির্জ্জল (water free) শর্করা জাতীয় উপাদান (শ্বেতসার ও শর্করা) বিদ্যমান থাকিলেই আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং যাবতীয় সহজ পরিশ্রমের কার্য্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তাপ ও শক্তি আহরণ করিতে সমর্থ হই।

দেহের অস্থি, রক্ত, রস প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য বিবিধ লাবণিক দ্রব্যের (salts) প্রয়োজন হয়। অস্থি গঠনের জন্য চূণ ঘটিত লবণের (Calcium salts) বিশেষ প্রয়োজন। দুগ্ধের মধ্যে এই জাতীয় লবণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। শৈশবাবস্থায় যথোচিত পরিমাণ স্তন দুগ্ধ বা গো দুগ্ধের অভাব হইলে শিশুর অস্থি-গঠন ও পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে; অস্থি যথোচিত কাঠিন্য লাভ করে না, অনেক সময়ে সামান্য চাপেই বাঁকিয়া যায়। মস্তকের অস্থিগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত কোমল থাকে বলিয়া মাথা ক্রমশঃ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তুলনায় বড় হয়। ব্রহ্মতালু অপূরন্ত অবস্থায় থাকে এবং ঘুমন্ত শিশুর মাথা ঘামিতে দেখা যায়।

লবণ জাতীয় উপাদান (Mineral Matters or Salts)।

শৈশবাবস্থায় এই ব্যাধিকে ইংরাজীতে রিকেট্স (Rickets) কহে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে অধিকাংশ শিশুই বিকৃত দেহ ও দুর্ব্বল হইয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের দেহ কোন দিনই সম্পূর্ণ পুষ্টি লাভ করে না এবং বেশী বয়েসে তাহাদিগের স্ক্রফিউলা (Scrofula), ক্ষয় রোগ (Tuberculosis) প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। শিশু-খাদ্যে যথোচিত পরিমাণ ভাইটামিনের অভাবে এই রোগ উৎপন্ন হয়। স্তন দুগ্ধে ও গো দুগ্ধে ভাইটামিন্ এবং চূণ ঘটিত লবণ যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। শিশুদিগকে অন্ততঃ ৯।১০ মাস মাতৃস্তন পান করিতে দেওয়া উচিত। যে সকল শিশু অল্প বয়সেই মাতৃ স্তন পানে বঞ্চিত হয় এবং যাহাদিগের যথা সময়ে যথোচিত পরিমাণ বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ পান করিবার সুবিধা ঘটেনা, তাহাদিগকেই সচরাচর এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। আজ কাল অনেক তথাকথিত সভ্য দেশে জননীগণ শিশু সন্তানকে স্তনপানরূপ তাহার প্রকৃতিগত অধিকার হইতে অন্যায়রূপে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। স্তনদুগ্ধের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত নানাবিধ বোতল ও টিনে রক্ষিত খাদ্য শিশুগণকে আহার্য্যরূপে প্রদত্ত হয়। অধিকাংশ কৃত্রিম খাদ্যের মধ্যে শরীর পোষণোপযোগী অন্যান্য উপাদান বিদ্যমান থাকিলেও কেবল একমাত্র ভাইটামিনের অভাবেই উহারা শিশুদেহ পোষণ ও বৃদ্ধির সম্যক সহায়তা করে না। এইজন্য অধিকাংশ শিশু-খাদ্যের ব্যবহারে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে এবং এই জাতীয় খাদ্যের ব্যবহার অনেক শিশুর অকাল মৃত্যুর কারণ। শিশুই সুস্থ ও সবল জাতি গঠনের উপাদান। অসুস্থ ও দুর্ব্বল শিশু হইতে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ জাতি প্রস্তুত হইতে পারে না। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের জননীগণের এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। তাঁহারা যেন তাঁহাদের পাশ্চাত্যদেশবাসিনী ভগিনীগণের এই মহানিষ্টমূলক আদর্শের অনুকরণ না করেন। একেত বিষম দারিদ্র্য নিবন্ধন আমরা আমাদিগের শিশুদিগের

জন্য বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ যথাকালে যথোচিত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই না। তদুপরি যদি তাহাদিগকে অকালে পুষ্টিকর প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে চিরজীবনের জন্য তাহাদের দেহের অপূর্ণতা ও দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায় এবং এই দুর্ব্বলতা-জনিত নানাবিধ অসুবিধা হইতে সারাজীবন আত্মরক্ষা করিতে তাহাদের সামর্থ্য থাকে না।

শিশুজীবন রক্ষার জন্য যাবতীয় কৃত্রিম শিশু-খাদ্য যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আহরণ করিবার সুবিধা হয়, তাহার জন্য দেশের মধ্যে একটা সমবেত মহতী চেষ্টা হওয়া উচিত।

মাতৃস্তন-দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রসূতি-গণের স্বাস্থ্যের প্রতি আমাদের সম্যক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের স্ত্রীজাতির আহার সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান ও চেষ্টার অভাব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় এবং আমরাও তৎসম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন। পরিবারস্থ পুরুষ ও বালকগণের আহার শেষ হইবার পর মাছ, দুধ প্রভৃতি যদি কিছু ভাল খাদ্য অবশিষ্ট থাকে (অসচ্ছলতা হেতু যথাবিত্ত গৃহস্থগণের বাটীতে ভাল খাদ্য অবশিষ্ট থাকিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না), তবে তাহার কিয়দংশ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণের ব্যবহারে আইসে, নতুবা তাঁহারা কেবল মাত্র শাক ভাত দিয়া কোন মতে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থার মূলে আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির যে উচ্চস্তরের আত্মবিস্মৃতি ও পরার্থপরতা নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় হইলেও আমাদের দেশের পুরুষ জাতিকে এ সম্বন্ধে স্বার্থপরতা ও ঔদাসীন্যের অপরাধ হইতে মুক্তি দিতে পারা যায় না; ইহাতে কেবল পুরুষের সুবিবেচনা ও দূরদৃষ্টির অভাবই প্রকাশ পায়। যদি আমরা এদিকে একটু নজর রাখি, তাহা হইলে আমাদের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের এরূপ আহার বিভ্রাট ঘটে না এবং তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণও নিতান্ত দুর্ব্বলদেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। প্রসূতির গর্ভধারণ হইতে স্তনদুগ্ধ দানে শিশুপালনের সময় পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন-সংযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইহাদ্বারা তাঁহার নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে এবং গর্ভস্থ শিশু ও ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের অপ্রতুল ঘটিবে না। আমাদের দেশের জননীগণের উপযুক্ত খাদ্যাভাবজনিত ভগ্ন স্বাস্থ্য অধিকাংশ স্থলেই রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশু সন্তানের জন্ম এবং তাহার অকাল-মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। অন্যান্য সভ্যদেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে শিশুমৃত্যু সংখ্যা যে এত অধিক, ইহা তাহার একটী প্রধান কারণ।

আমাদের রক্তের মধ্যে যে অসংখ্য লোহিত রক্ত কণিকা (Red blood corpuscles) আছে, লৌহ তাহার একটী প্রধান উপাদান। লোহিত রক্ত কণিকা নিশ্বাস বায়ু হইতে অক্সিজেন্ (Oxygen) গ্রহণ করিয়া দেহমধ্যে খাদ্য সামগ্রীর মৃদু দহন কার্য্য সমাধা করে; এই প্রক্রিয়া দ্বারা দেহমধ্যে যাবতীয় তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। আমরা নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য হইতে রক্তস্থিত লোহিত কণিকা নির্ম্মাণের জন্য লৌহঘটিত লবণ সংগ্রহ করিয়া থাকি।

এইরূপে সোডা, পটাশ্, গন্ধক, ফস্ফরাস্, আইওডিন্ প্রভৃতি বিবিধ মূল পদার্থ (Elements) ঘটিত যে সকল লাবণিক দ্রব্য আমাদের শরীর গঠন ও বিবিধ রস প্রস্তুত করণে ব্যবহৃত হয়, আমাদের খাদ্য সামগ্রী হইতে আমরা সে সমস্তই সংগ্রহ করিয়া থাকি।

এতদ্ব্যতীত আমরা বিভিন্ন খাদ্যের সহিত অল্প পরিমাণে খাদ্য লবণ (Common salt) ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা দ্বারা আমাশয় (Stomach) নিঃসৃত গ্যাষ্ট্রিক্ যুস্ (Gastric juice) নামক প্রোটীন্ জাতীয় খাদ্য পরিপাক করিবার এক প্রকার রস প্রস্তুত হইয়া থাকে। দিবসে সর্ব্বশুদ্ধ আধ ছটাক লবণ গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়।

মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতি নানা আকারে জল সর্ব্বদা আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছে। আমরা যে সকল পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটীর সঙ্গে জল অল্পাধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। ইহাদ্বারা এবং যে জল আমরা পানীয়রূপে ব্যবহার করি, তৎসাহায্যে

জল (Water)

আমাদের দেহনির্গত জলের অংশ পূরণ হইয়া যায়। রক্ত, রস প্রভৃতি দেহস্থিত বিবিধ তরল উপাদান নির্ম্মাণে জলের প্রয়োজন হয়। জীর্ণ খাদ্যকে তরল করিয়া দেহমধ্যে উৎপন্ন ও সঞ্চিত যাবতীয় দূষিত ও বিষাক্ত আবর্জ্জনাকে এবং খাদ্যের অজীর্ণ অসার অংশকে মল রূপে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া জলের আর একটী প্রধান ক্রিয়া। সাধারণতঃ সমস্ত দিনে আমাদের প্রায় ১½ সের জল বিভিন্ন আকারে পান করিবার আবশ্যক হয়।

(ক্রমশঃ)

দুঃখিনী

শ্রী সুধীরচন্দ্র সেন।*

কলকাতার কোন একটা পথের ধারের ফুটপাথের উপর একটি দশম বর্ষীয়া বালিকা তার ভিক্ষের ঝুলিটা হাতে নিয়ে, বিষণ্ণ বদনে ঘাড় হেঁট করে চুপ করে বসে ছিল। তার পরণে ছিল একখানি শত ছিদ্র মলিন কাপড়, মুখে তার মাথা হতে উস্কখুস্ক চুলগুলি পরে কেবলই তাকে বিরক্ত কচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে সে কাতর স্বরে "একটা পয়সা দাওনা বাবু" বলে পথিকদের জানাচ্ছিল।

তার পাশ কেটে কত শত বাবু চলে যাচ্ছিল কিন্তু কেউ তার করুণ প্রার্থনাটা শুনছিলনা। যতই বেলা বেড়ে চলছিল বালিকার মুখখানা ততই গম্ভীর আকার ধারণ কচ্ছিল।

অদূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি শুধু তার বিষণ্ণ বদন লক্ষ্য কচ্ছিলুম। তাকে ও অবস্থায় থাকতে দেখে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগল। ধীর পদক্ষেপে তার কাছে গিয়ে হঠাৎ বাম হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লুম "তোমার কি হয়েছে খুকু?" একে ত অস্বাভাবিক দান, তার উপরে আবার স্নেহের স্বর শুনে তার চোখ হতে অশ্রু ঝর ঝর করে পড়তে লাগ্‌ল। মুখ দিয়ে কোন কথা সরলনা। আমি পুনরায় তাকে স্নেহের স্বরে বল্লুম "আমাকে সব কথা খুলে বল, আমি তার প্রতীকার করতে সাধ্যমত চেষ্টা কর্ব।" বালিকাটি আমার মুখ হতে এসব শুনে একেবারে থতমত খেয়ে গিয়েছিল, খানিকবাদে নিজকে একটু সাম্‌লিয়ে নিয়ে বল্লে "সে বাবু অনেক কথা।" আমি বল্লুম "আমাকে সবই বল।" বালিকাটি একটু থেমে বল্লে "আমার ঘরে যেতে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তবে চল, সেইখানেই দুঃখের সব কথা খুলে বল্‌ব।" আমি একটু ভেবে বল্লুম "আচ্ছা, তাই চল, তোমার ঘরে গিয়েই সব শুন্‌ব।"

তারপর বালিকার সঙ্গে অনেকটা পথ হেঁটে শেষে একটা সরু গলির ভিতরে একটি অতি জীর্ণ অর্দ্ধ চাল যুক্ত কুঁড়েতে প্রবেশ কল্লুম। ঘরের এক কোণে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর শুয়ে ছিল তার রুগ্না মা। বয়স তার ৩০।৩৫ এর বেশী নয়। ঘরে আস্‌বাব পত্র একেবারেই ছিলনা বল্লেই চলে। ঘরে ঢুক্‌তেই বালিকাটির মা অতি ক্ষীণ স্বরে তার কাছ হতে একটু জল চাইলে, বালিকাটি তাড়াতাড়ি একটা ভাঙ্গা মেটে গেলাস তুলে নিয়ে কুঁড়েটার সামনের কল থেকে জল ভরে মাকে খাইয়ে বেশী বক্‌তে মানা করে সেই গেলাসটি কে আবার অতি সযতনে হাঁড়িতে রেখে আমার কাছে এসে বস্‌তে আরম্ভ কল্লে :-

---

* লেখক ডাক্তারখানার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এতটুকু ছেলের বালকের পক্ষে এমন ভাল প্রবন্ধ লেখা, উৎসাহ দানার্থে মাতৃ-মন্দিরে প্রকাশ করা গেল। মাঃ মঃ

"আমার নাম মায়া। আমার বয়স যখন আট বৎসর তখন বাপ মরে যান, বাবা-মার একমাত্র সন্তান ছিলুম বলে তাঁরা আমাকে খুব ভাল বাস্‌তেন। তিনি একটি বাবুর বাড়ীর বাগানের মালী ছিলেন। মাসে মাত্র ১৫৲ আন্‌তেন্। সেই থেকে তিনি তাঁর সাধ্যমত আমার জন্য ভাল ভাল কাপড়, জামা, বাক্স ইত্যাদি এনে দিতেন। কিন্তু পেটের দায়ে এখন সব বিক্রী করেছি। অতি কষ্টে আমাদের খাওয়াপরার খরচ তার থেকে হয়ে যেত। তিনি সর্ব্বদাই মাকে বল্‌তেন "না খেয়ে মলেও আমি কখন ভিক্ষে কর্‌তে বের হব না।" সারাদিন বাবুর বাগানের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করাতে হঠাৎ একদিন তিনি একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে আমাদের এই দুঃখের সংসার আরও দুঃখতর করে ও তাঁর অসীম স্নেহ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে মাত্র তিনদিন ভুগে কোথায় একটা হাওয়ার মত ভেসে চলে গেলেন।"

পিতার স্মৃতিটুকু মনে করে মায়া, "বাবাগো, বাবা!" বলে করুণস্বরে তার সেই শত ছিন্ন জীর্ণ বসনখানি মুখে ঢাকা দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমি তাকে নানারূপ সান্ত্বনাসূচক বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লুম। কিছুক্ষণ বাদে মায়া একটা বিষণ্ণতাপূর্ণ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগল "মরবার সময় শুধু তিনি আমার হাত ধরে এই কথাই বলে গেছেন—'আমি ত চল্লুম মা, তুই তোর মাকে খাওয়াস্। কিন্তু একটা কথা রাখিস্ মায়া, ভিক্ষে করে কখনও খাস্ নে।' এইটুকু বলেই তিনি ধীরে ধীরে চোখদুটী চিরদিনের জন্য বুঁজলেন। আজ দু বৎসর হল বাবা আমাদের ছেড়ে গেছেন্ কিন্তু একদিনের তরেও বাবু ভিক্ষে কর্‌তে যাই নি। রাস্তার ভাত কুড়িয়ে এনে তাই খেয়ে কোন রকমে দু'জনে বেঁচে আছি। মাসখানিক হতে চল্ল মার জ্বর হয়েছে। শুধু কেন আর জল তাকে খেতে দিচ্ছি। কিন্তু বাবু আজ ৪।৭ দিন থেকে মার অবস্থা বড়ই খারাপ হয়েছে বলে এ কদিন রোজ দুবেলা ভিক্ষে কর্‌তে যাই। পথের সেই ধারটাতে রোজই বসি। প্রথম কারো কাছে হাত পেতে কিছু চাইতে কেমন হয়েছিল, কিন্তু মার অবস্থা মনে করে ধৈর্য্য হারিয়ে মধ্যে মধ্যে দু" একবার চাচ্ছিলুম। বাবু, মা যদি না বাঁচে, আমার তাহলে কি উপায় হবে? এ জগতে যে মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। বাবু, তোমার কাছে সব খুলে বল্লুম।" এই বলে বালিকা অশ্রুভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি তার এই করুণ কাহিনী শুনে অতি কষ্টে চোখের জল সম্বরণ করে তাকে বল্লুম "তার কি মায়া, আমি তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। আজ যাই, কাল সকালে আবার তোমার মাকে দেখ্‌তে আস্‌ব।" এই বলে আমি সে স্থান ত্যাগ কর্‌লুম। একটু দূরে গিয়ে পিছন ফিরে দেখ্‌লুম্ মায়া আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আর চোখ হতে তার টপ্ টপ্ করে অশ্রু পড়ছে। রাস্তায় যেতে যেতে তার দুঃখপূর্ণ করুণ ইতিহাস মনে করে আমিও দু' তিনবার অশ্রু মুছ্‌লুম্।

* * * *

সকাল থেকেই আকাশটা মেঘে আচ্ছন্ন ছিল ও মধ্যে মধ্যে খুব জোর দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছিল। সেই জন্য মায়ার বাড়ীতে সকালে যাওয়া আর ঘটে উঠ্‌ল না। মায়ার মুখখানি মনে করে কেবলই কান্না আস্‌তে লাগ্‌ল। আর থাক্‌তে পার্‌লুম্ না, বৈকাল হ'তে না হ'তেই ছাতাটা হাতে নিয়ে অতি কষ্টে কাদা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তাদের কুঁড়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগ্‌লুম। অনেকটা পথ হেঁটে শেষে মায়ার কুঁড়েতে ঢুক্‌তেই প্রাণটা ছ্যাক্ করে উঠ্‌ল। দেখ্‌লুম মায়ার মা এককোণে মরে পড়ে রয়েছে আর মায়া তার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গোঁ গোঁ কচ্ছে। আমি কল হতে জল এনে মায়ার মাথায় চাল্‌তে লাগ্‌লুম্। অনেকক্ষণ পরে মায়া একবার মাত্র চোখ মেলে অতি ক্ষীণ স্বরে বলে উঠ্‌ল "বাবু এসেছ?" ব্যস, তারপর মায়াও তার মায়ের মত দুঃখের বোঝা ঘাড় হতে নামিয়ে চিরদিনের তরে সংসারের মায়া কাটিয়ে ধীরে ধীরে চোখ্ বুজে সকল যন্ত্রণার হাত হতে মুক্তি নিয়ে চলে গেল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম্।

বাহিরে তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝম্ ঝম্ করে পড়ছিল্।

মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি

শ্রী বদ্রপতি দাস।

ভগবানের ভক্ত "বজ্রের মত কঠিন, আবার কুসুমের মত সুকোমল।" ভক্তের আবরণে যখন, গোপীপ্রেমরস কালাচাঁদ অঙ্গলীলাচ্ছলে ব্রজের গোপ-গোপীগণ নিয়া করিয়া রাজধানী হইলেন, আবার নবদ্বীপ-সুধাকর বাল্যলীলাচ্ছলে শচীমাতার বক্ষের ভাগ নিমাই স্নেহময়ী মাতার অসীম স্নেহ ও যুবতী ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার অকৃত্রিম প্রেম উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলবাসী হইলেন। ভক্তের চরিত্রের ইহাই বিশিষ্টতা। যাহা হউক, নিমাইচরিত আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাল্যকাল হইতে নিমাইএর মাতৃভক্তির কিছুমাত্র অভাব ছিল না, বরং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি জগতের মাতৃ-স্নেহ একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। নীলাচলে বাস করিলেও তাঁহার হৃদয় ও মন সর্ব্বদাই নবদ্বীপে তাঁহার মাতৃ-সন্নিধেই ন্যস্ত ছিল। মাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তোষার্থ তিনি তাঁহার নিজজনকে নিযুক্ত রাখিয়া মাতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বাল্যলীলায় তাঁহার বালকোচিত চাপল্যের মধ্য দিয়া মাতৃভক্তি স্ফুরিত হইত। শৈশবাবস্থায় একদিন তাঁহার স্নেহময়ী মাতা তাঁহার হৃদয়ের ধন নিমাইকে দুই সন্দেশ খাইতে দিয়া অন্যান্য গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্তা হইলেন, চঞ্চল নিমাই উক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি উপেক্ষা করিয়া মাটি খাইতে আরম্ভ করিলেন। শচীমাতা নিমাইএর এরূপ আচরণ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন, তদ্দৃষ্টে নিমাই সরোষে বলিলেন—

"যে সন্দেশ অন্ন তত মাটির বিকার।
এহো মাটি সেহো মাটি কি ভেদ ইহার।" (চৈঃ ভাঃ)

শচীমাতা বালক নিমাইএর এরূপ অদ্ভুত তত্ত্বজ্ঞান দেখিয়া অন্তরে বিস্মিতা হইলেন, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ মাতৃস্নেহ বশতঃ বলিলেন—

"মাটির বিকার খাজা খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়।" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইও তখন আত্মগোপন করিয়া মাতৃভক্তির ভাষায় উত্তর করিলেন—

"এবে ত জানিনু আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তন দুগ্ধ পিব।
এত বলি জননীর কোলে ত বসিয়া।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।" (চৈঃ—চৈঃ)

বাল্যকালে নিমাই বড়ই চঞ্চল ছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্য পাড়া-প্রতিবেশীগণ সর্ব্বদাই অনুভব করিত। কতকগুলি সঙ্গীর সাহায্যে তাঁহাদের গৃহ হইতে দ্রব্যাদি অপহরণ করেন। তিনি বাগ্মীবর ও বলিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া অন্যান্য বালকদিগকে প্রহার করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। একদিন কতকগুলি বালক শচীমাতার নিকট গিয়া নিমাইএর ব্যবহার নিবেদন করিলেন, শচীমাতা নিমাইকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন, নিমাই তাহাতে আরও অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া গৃহে যত মৃৎপাত্র ও ভাণ্ড ছিল সমস্ত চূর্ণবার করিলেন।

"তবে শচী কোলে করি করায়ন সন্তোষ।
লজ্জিত হইয়া প্রভু জানি নিজ দোষ।
কভু মৃদ্ ভক্ষে কেন মাতাকে ভাড়ন।
মাতাকে মুহিয়া দেখি করয়ে ক্রন্দন।" (চৈঃ—চৈঃ)

এ স্থলেও নিমাইএর বালকোচিত চঞ্চলতা প্রকাশের উদ্দেশ্য যোগ্য।

নিমাইএর অগ্রজ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, নিমাই পিতামাতার সন্তোষ বিধানার্থ সবিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি প্রমাণ স্বরূপ দেখান হইল—

"জ্যেষ্ঠ হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল।
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল বাপা পিতার মন।" (চৈঃ—চৈঃ)

অগ্রজের পিতৃ-বিয়োগের পর নিমাই বালসুলভ চপলতা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া একনিষ্ঠ মাতৃ-সেবক হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মাতার সন্তোষসম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেন এবং মাতার মন যাহাতে সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকে সে বিষয়ে কিছুমাত্র উদাসীন ছিলেন না।

নিমাই যখন বিদেশে অবস্থান কালীন সময়াদেশে তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবীর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে সর্ব্বাত্মবিদ্যা মহাপ্রভু অন্তরে সমস্ত জানিয়া মাতার দুঃখ বিমোচনার্থ সত্বর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

"অন্তরে জানিলা প্রভু মাতে অন্তর্য্যামী।
বেদেতে আইলা প্রভু শচী দুঃখ জানি।
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধন-জন।
তবু কহি কৈলা শচীর দুঃখ বিমোচন।" (চৈঃ—চৈঃ)

সকল বিষয়ে মাতার সন্তোষ জন্মানই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ মাতৃ-সেবক মাতাকে অকূল দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া কেন সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অবশ্যই কারণ আছে এবং ঐতিহাসিকসূত্রে প্রকাশ তাহা নির্ণীতও হইয়াছে, তবু পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

"যত অধ্যাপক আর তার শিষ্যগণ।
সর্ব্ব ভূমি ভরপিল বিস্মৃত গুর্জ্জন।

এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে।
আমি নগরাইলে ভক্তি না পারে হইতে।
বিদ্যাবিতে আইলাঞ আমি হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জ্জনের হৈছে হইবেক হিত।
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।
তবে ইহা সভারে যে ভক্তিলভ্য হয়।
মোর নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার।
অতএব আমি অবশ্য সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ মোরে প্রণত হইব।
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়।
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইব নিস্তার—
আর কোন উপায় নাহি এই যুক্তি সার।" (চৈঃ—৩ঃ)

পণ্ডিত-পাষণ্ডাবতার পরম দয়াল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীব উদ্ধার ও প্রেম ভক্তি প্রচারোদ্দেশ্যেই মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিমুখ দুর্জ্জন প্রকৃতিকে যার দিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয় কেমন করিয়া? কি ভয়ানক অবস্থায়! সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি যে মাতৃস্নেহ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি মাতৃ আজ্ঞাতেই নীলাচলবাসী হইয়াছিলেন। অতঃপর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি একবার শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার মাতার সহিত মিলন কালে মাতৃভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

"প্রভু ত কান্দিয়া কহে শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।
তোমার পালিত দেহ জন্মি তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে।
জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাতে কভু নহিব উদাস।
তুমি যাঁহা কহ মুঞি তাঁহাই রহিমু।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিমু।" (চৈঃ—৩ঃ)

কি ভয়ঙ্করী মাতৃভক্তির মধুর মূর্ত্তি! এরূপ অবিচ্ছিন্ন বাণী শ্রবণে কোন্ মাতৃহারাই স্নেহের অনুভব না করেন? মাতাও তখন নিজ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পুত্রের উদ্দেশে বলিলেন—

"তোমা যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ।
তার বিঘ্ন হয় যদি সেহো মোর দুঃখ।" (চৈঃ—৩ঃ)

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বাটীতে বাস করিবার প্রস্তাব তিনি করিলেন না। তিনি যুক্তি দিলেন মাতৃসন্নিহিত স্থানে যেন নীলাচলেই বাস করেন। তখনকার দিনে নীলাচল ও নবদ্বীপে সর্ব্বদাই লোক যাতায়াত ছিল, তখন থাকিলে তিনি সর্ব্বদাই পুত্রের সংবাদ পাইতেন, মহাপ্রভুর ভক্তগণও মধ্যে মধ্যে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেন এবং তাঁহাদের মুখেও পুত্রের কুশল বার্ত্তা পাইতেন। কখনও বা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে পুত্রও নবদ্বীপে আগমন করিতেন। মহাপ্রভু চিরজীবন মাতৃ আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার মাতৃ-ভক্তি কিরূপ অসীমতা লাভ করিয়াছিল, তিনি প্রথমবার বৃন্দাবন যাত্রা কালীন নীলাচলবাসী ভক্তগণকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"দৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জগন্নাথ প্রভুতী এই দুই মহাশয়।" (চৈঃ—৩ঃ)

নীলাচলে বসে করিয়া তিনি সর্ব্বদাই মাতার নাম গ্রহণ করিতেন এবং পুণ্য শচীর মাতার নিকট গমনও করিতেন। এক বৎসর শ্রীবাস পণ্ডিত নীলাচল হইতে ফিরে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মহাপ্রভু বিজয়তে মহাপ্রসাদ ও বস্ত্র তাঁহার হস্তে দিয়া মাতৃসকাশে কি বলিয়াছিলেন তাহার মধুময় অনুভব করুন—

"এই বস্ত্র মাতাকে দিও এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি কহাইহ অপরাধ।
তার সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ।
তার সেবারূপ আমি তার সেবাধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম।
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে করিবে সন্তোষ।
কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যেকালে সন্ন্যাস কৈল হৃদয় হইল মন।
নীলাচলে আসো মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মাসে মাসে যাই তাঁর চরণ দেখিতে।
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
পুনঃ জানে তিঁহো তাহা সত্য নাহি মানে।" (চৈঃ—৪ঃ)

কি অকপট মাতৃপ্রেম! নীলাচলে বাসকালীন তিনি যে কেবল বাক্যদ্বারা মাতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তিনি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তোষ বিধানার্থে স্বজন বাঁধোয়ার, জগদানন্দ প্রভৃতি নিকটস্থ ভক্তগণকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া মাতার নিকটে বাস করিতে আজ্ঞা দিতেন। বাসোদ্দেশে মাতার নিকট পাঠাইবার কালীন মহাপ্রভু কি বলিয়াছিলেন শুনুন—

"মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কার।
মোর সুখ কথা কহি সুখ দিহ তাঁরে।
নিরন্তর নিজকথা তোমাকে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোর পাঠাইলে ইহাতে।" (চৈঃ—চৈঃ)

—ভক্তি।

শিশু কল্যাণ প্রচেষ্টা

শ্রী শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ।

কবি দুঃখ করিয়াছেন "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়"। কথাটী বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। আমরা দেশপ্রেমের গলাবাজি করি অথচ এদেশে কুষ্ঠ রোগীর সেবা করে খৃষ্টান্ পাদরীরা আর শিশুমঙ্গল কেন্দ্র খোলেন খৃষ্টান মেয়েরা। মিশনারীদের এই অদ্ভুত মানব-প্রেম দেখিয়া একদিকে যেমন অবাক্ হই অন্যদিকে তেমনি নিজেদের ক্ষুদ্রতায় লজ্জা হয়। আমরা এখনও দেশবাসীকে আন্তরিকতার সহিত ভালবাসিতে পারি নাই এই গুলি তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

কেহ হয়ত বলিবেন, "কেন মশাই, আমাদের ছেলেরা বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও অগ্ন্যুৎপাতে কি চমৎকার সেবা করিয়াছে তাহা কি আপনি জানেন না?" আমাদের তদুত্তরে সবিনয় নিবেদন এই যে, উত্তেজনার মুখে ঐ কার্য্যগুলি বেশ চলিয়াছে—যাঁহারা সেবাকার্য্য করিয়াছেন তাঁহারাও নমস্য, কিন্তু স্থায়ী কাজ করিবার মত ধৈর্য্য ও সামর্থ আমাদের বড় কম, তাহারও নজির আছে।"

সমাজ সেবার ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। আমি ব্যাপক ভাবে ও সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া আজ শিশু-মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের দেশে কতটা কাজ হইয়াছে এবং কতটা করিবার আছে তাহারই আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই নিবেদন করিতে চাই যে, এই কার্য্যগুলিতে নিত্য নূতন উত্তেজনা নাই, করিলে হাততালিও বেশী জুটিবে না কিন্তু জাতি-গঠনের পথ সুগম হইবে। শিশুমঙ্গলই জাতির মঙ্গল এ কথাটী স্মরণ রাখিলে এই কার্য্যে উৎসাহও আসিবে। কাজটী অত্যন্ত নীরস, কিন্তু ধীরে ধীরে এই শিশুমৃত্যু-রাক্ষসীকে যদি বাংলা হইতে দূরীভূত করিতে পারি তবে স্বরাজ লাভ সহজ হইবে। পণ্ডিতেরা বলেন যে দেশে সবল শিশু, সুস্থ মাতা ও শক্তিমান্ পিতা আছেন সেই দেশই ধন্য। সকলেই জানেন বিলাতে যত শিশু মরে আমাদের দেশে মরে তার তিন গুণ। বিলাতে হাজার করা ৬০ জন মরে, আমাদের ভারতবর্ষে ২০০ জন। সাধারণ মৃত্যুর হারও এ দেশে বিলাতের দ্বিগুণ; বিলাতে মৃত্যু হার ১৫, আমাদের ৩১, আর গড় পরমায়ুর ত কথাই নাই। তাহারা বাঁচে ৬৬ বৎসর, আর আমরা ২২ বৎসর।

প্রশ্ন উঠিতে পারে কেন এমন হয়? ইহার প্রতীকার কি? অন্য দেশ কিরূপে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে তাহার উদাহরণ দেখাইতে চেষ্টা করিব, পরে আমাদের কথা বলিব। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের অবস্থা ভারতের মতই ছিল। সেখানে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর সংখ্যা এদেশের মতই ভীষণ ছিল। কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টার ফলে, আইন পাশ করাইয়া ও বহুবিধ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাঁহারা দেশকে আজ মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন। কি উপায়ে এই কার্য্য করা হইয়াছিল? স্থানে স্থানে ভাবী মাতৃদের শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইল, তাঁহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হইল এবং শিশুর ও তার মায়ের জন্য চিকিৎসার ও উপদেশ গ্রহণের কেন্দ্র খোলা হইল। ইহার উপর ধাত্রীদের শিক্ষার জন্য বাধ্যতা মূলক আইন (The Mid wives Act) ও জন্ম মৃত্যু জ্ঞাপক আইন (Notification of Birth Acts) পাশ হওয়াতে শিশুদের অকাল মৃত্যুর পথ অনেকটা রুদ্ধ হইল। স্থানে স্থানে মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন (Maternity Centre), পুস্তিকা ও বক্তৃতার সাহায্যে বালিকাদের মাতৃত্ব বিষয়ক জ্ঞান প্রচার ও সর্ব্বোপরি ১৯১৭ সনে National Baby week council স্থাপিত করিয়া দেশবাসী জনসাধারণ তাহাদের জাতীয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিল। ফলে আজ সে দেশের নরনারী বুঝিয়াছেন শিশুমঙ্গলই জাতীয় মঙ্গলের একমাত্র পন্থা।

বিলাতের Braudford নামক একটি সহরের শিশু-কল্যাণ প্রচেষ্টার ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা জানিয়াছি যে, তথায় গর্ভাবস্থায় মায়ের চিকিৎসার কেন্দ্র এবং প্রসবের পর শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র আছে। ভাবী মায়েদের ও সদ্য প্রসূতিদের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে,

মুন্সিপালিটীর দুধের ডিপো আছে এবং শিশুর ও মায়ের তদারকের জন্য একদল স্বাস্থ্যপরিদর্শক আছে। ফলে ব্রাডফোর্ড সহরটীর শিশুমৃত্যু অসম্ভবরূপে কমিয়া গিয়াছে।

এখন সংক্ষেপতঃ শিশুমৃত্যুর কারণ গুলি আলোচনা করিয়া দেখা যাউক—বিলাতে কিরূপে কোন জিনিষটীর প্রতিকার চেষ্টা চলিতেছে তাহারও উল্লেখ করিব।

ক। প্রথমতঃ প্রসবের পূর্ব্বের কারণ গুলি দেখা যাউক :—

(১) অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক—ধোঁয়া ও ধূলি সমাকীর্ণ স্থানে শিশুমৃত্যু বেশী হয়। ইহার দৃষ্টান্ত কলিকাতার ও বোম্বাই সহরের বস্তি সকল।

(২) বিলাতের অধিকাংশ সহরেই কল আছে, তাহাতে ধোঁয়া ও ধূলা বেশী হয়। বিলাতে বাসযোগ্য গৃহেরও অভাব কম নহে। কিন্তু বিলাতবাসিগণ নিশ্চেষ্ট নাই, সেখানে সমবায় প্রণালীতে বাস গৃহ নির্ম্মাণ করা আরম্ভ হইয়াছে (Co-operative Housing) এবং ধোঁয়ারও একটা প্রতিকার চেষ্টা চলিতেছে, সেই উদ্দেশ্যে The committee for the Investigation of Atmospheric Pollution (পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সমিতি) স্থাপিত হইয়াছে।

(৩) দারিদ্র্য ও তজ্জনিত মায়েদের খাদ্যের অভাব ও অতিরিক্ত পরিশ্রম শিশুমৃত্যুর একটী কারণ। মা যদি পুষ্টিকর ও যথেষ্ট আহার না পান তবে শিশু কি করিয়া বাড়িবে? বিলাতে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ভাবী মাতৃত্বের ও প্রসূতির জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করিয়া থাকেন। সেখানে অনেক স্থলে কলে ও ফ্যাক্টরীতে গর্ভিনী কাজ করেন—তাঁহাদের যাহাতে কম সময় কাজ করিতে হয় সে বিষয় আন্দোলন চলিতেছে।

(৪) মাতার স্বাস্থ্যনীতির অজ্ঞতাও শিশুমৃত্যুর জন্য বিশেষ দায়ী। ডাঃ নিউম্যান বলেন—The principal operating influence is the ignorance of the mother and the remedy is the education of the mother. মাতাদিগকে স্বাস্থ্যনীতি শিখাইবার জন্য সে দেশ কি করিয়াছে তাহা শুনুন—মায়েদের মধ্যে সন্তান পালন ও স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বালিকাদিগকে মা হওয়ার জন্য কিরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৫) রক্তের দোষ ও উপদংশজনিত ব্যাধি শিশুমৃত্যুর বিশেষ একটী কারণ। পাশ্চাত্য সমাজ এই ব্যাধির তাণ্ডবে ব্যতিব্যস্ত। ১৯১৪ সালে বিলাতে ১০০০ শিশুর মধ্যে নানা ব্যাধিতে ১০৪টী শিশু মরে, তন্মধ্যে কেবল উপদংশ রোগেই শতকরা ২টী মরিয়াছে। ডাঃ মেরী স্কার্লিচ (Mary Scharlish) মহাশয় এই রোগের একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন—The most frequent cause of infant mortality is Syphilles. উপদংশে গর্ভের সম্ভাবনা নষ্ট করে, অনেক স্থলে গর্ভপাত হয় এবং যাহারা প্রসূত হয় তাহারাও প্রায়ই অন্ধ হয় অথবা চক্ষুরোগে ভুগিয়া অকালে মরে। এই উপদংশ ব্যাধিটীর কারণ ও বিস্তার অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী রয়াল কমিশন (Royal Commission on veneral diseases) বসে এবং স্থানে স্থানে পুস্তিকা প্রচার করিয়া লোকমত গঠন করা হয় এবং চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। আমাদের দেশে ত কলিকাতাতেই প্রায় ২০ হাজার বেশ্যা আছে—পল্লীগ্রামেও হাটেবাজারে ও গঞ্জে বারাঙ্গনার অভাব নাই। উপদংশ বিষে ত দেশ জর্জ্জরিত—তেমন চেষ্টা হইতেছে কৈ? কেবল আইন (Bill for the suppression of Immoral traffic in Calcutta) পাশ করিলে অথবা পুলিশের হাতে অধিক ক্ষমতা দিলেই কি এ পাপ যাইবে? এইজন্য রীতিমত সংঘবদ্ধ কাজ চাই।

খ। প্রসবকালে অশিক্ষিতা নোংরা দাইয়ের হাতে অনেক প্রসূতির ও শিশুর প্রাণ যায়। প্রসূতির বিষাক্ত সূতিকাজ্বর ও শিশুর ধনুষ্টঙ্কার নাড়ী-কাটার দোষে অনেক ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। পেঁচোয় পাওয়ার অর্থ আর কিছুই নহে—শিশুর নাড়ী বাঁধিবার সূতা ও নাড়ী কাটিবার ছুরি ও চাঁচাড়ির সঙ্গে ক্ষুদ্রতম এক জীবাণু বিশেষ শিশুর শরীরে প্রবেশ করিয়া ধনুষ্টঙ্কার রোগ সৃষ্টি করে। বিলাতে এখন আর ওঝা ডাকে না—চিকিৎসক ডাকে এবং Midwives Act ১৯০৫ সনে পাশ হওয়ার পর

সেদেশে সর্ব্বত্রই শিক্ষিতা ধাত্রী পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদের দেশে আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে মাত্র।

গ। প্রসবের পর অনেক শিশু আবার কৃত্রিম খাদ্য খাইয়া, অনিয়মিত খাইয়া এবং অনেক স্থলে দূষিত খাদ্য খাইয়া অকালে মরে। শিশুদের যকৃতের দোষে এই সব কারণেই ঘটে। বিলাতে মায়েরা ঘড়ি ধরিয়া খাওয়ান এবং শিশুর ওজন রাখেন। আমাদের দেশে শিশুদের ওজন করিতে চাহিলে মা-লক্ষ্মীরা সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠেন। বিলাতে কিন্তু শিশুদের প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা ও ওজন করা হয় এবং তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উপযুক্ত খাদ্য, পরিচ্ছদ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

শিশুহত্যার সামাজিক, অর্থনৈতিক অনেক কারণ আছে, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই। কিন্তু বিলাতে উহার কারণগুলিকে লইয়া আলোচনা করা হইতেছে, নিত্যনূতন গবেষণা চলিতেছে, উহার ফলাফল প্রচার করা হইতেছে, প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত হইতেছে—জাতিটী বাঁচিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আমার স্থানাভাব- কেবল একটী সমিতি (The Central Council for infant and child welfare) কি ভাবে কত বিভাগে কাজ করিতেছেন তাহার বিবরণ দিয়া প্রবন্ধটী শেষ করিব। এই কেন্দ্র সমিতির অধীনে নিম্নলিখিত বিভাগ আছে। সমিতিটি বিশাল ও সকলের শীর্ষস্থানীয়। নিম্নলিখিত বিভাগগুলি দেখিলেই ইহার কার্য্যতালিকা পাওয়া যাইবে—

১। মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রসমূহের সমিতি (Association of Infant welfare and Maternity centres)

২। পঙ্গুদের রক্ষা বিভাগ (Central Committee for the care of cripples)

৩। ভ্রাম্যমান তথ্য প্রচার বিভাগ (Child welfare travelling Exhibitions)

৪। ধাত্রীদিগের কেন্দ্র সমিতি (Incorporated Midwives Institute)

৫। দুঃস্থ শিশু কল্যাণ বিভাগ (Invalid children's Aid Association)

৬। মাতৃত্ব শিক্ষা সমিতি (Mother craft Training Society)

৭। অবিবাহিতা মাতাদের কল্যাণ কেন্দ্র (National Council for unmarried mother and her child)

৮। অন্ধ মঙ্গল বিভাগ (Blind Babies Department)

৯। জাতীয় স্বাস্থ্য সমিতি (National Health Society)

১০। শিশু পালন বিদ্যালয় বিভাগ (National Society for Day Nurseries)

আর কত নাম করিব—পুঁথি বাড়িয়া যায়। যে জাতির মধ্যে শিশুর জন্য এমন ধরণ—এত আকুলতা—এত কল্যাণ প্রচেষ্টা, তাহারা যদি না জাগে তবে জাগিবে কে? বাংলায় তেমন কর্ম্মী কৈ, অর্থ কৈ? এই শিশুহত্যার তাণ্ডবনৃত্য কে থামাইবে?

মুক্ত

শ্রী ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুক্ত করিয়াছ তুমি অন্তর তোমার
সুনীল আকাশ সম অনন্ত উদার,
নিত্য দেখা ফুটে কত রামধনু জ্যোতিঃ,
স্বচ্ছ আলো বিকাশিছে শত তারকার!
মুক্ত করিয়াছ তোমা নির্ঝরের প্রায়—
প্রচ্ছন্ন মোহন গীত কত শোনা যায়,

সিক্ত করিলে হিয়া অনাবিল রসে
নব মুকুলিত করি তোমার ধারায়।
মুক্ত করিয়াছ তোমা কুসুমের রূপে
মলয় পরশে চলে' পড়া চুপে চুপে;
মাধুরি মণ্ডিত হ'য়ে পাশে আছ জেগে
রাখিয়া অনন্ত-সুধা তব চিত্ত-কূপে।

হিন্দু-মুসলমান

শ্রী অক্ষয়কুমার নন্দী।

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দু মুসলমানে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং যাহার প্রতিক্রিয়া আজ সারা বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে ইহা কি হিন্দু মুসলমানের আপন আপন স্বধর্ম্মের অনুকূল? যাঁহারা দাঙ্গা করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ইহার পোষকতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিবেন—হাঁ, ইহা আমাদের স্বধর্ম্মের অনুকূল। যে আমার ধর্ম্মের কোন কিছুতে বাধা দেয়, আমি ধর্ম্মরক্ষার্থে তাহার বিরুদ্ধে অবশ্যই দাঁড়াইব—অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান করিব, ইহা না করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা ইহার উত্তর করিবেন—দেশবাসী ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিয়া তুমি তোমার মানব-ধর্ম্মের গৌরব নষ্ট করিতেছ, বিশ্বপতির বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেছ।

কেহ কেহ বলিতেছেন, এই বিরোধ প্রকৃত হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নহে, ইহা কলিকাতার গুণ্ডাদের কাজ। কেহ বলিতেছেন, ইহা দেশবাসী কাহারও চেষ্টায় হইতেছে না, ইহা ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদের শাসননীতির একটি গুপ্ত অভিসন্ধির ফল। আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমরা বলিব—ইহার জন্য আমরা দেশবাসী হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই অপরাধী।

আজ জিজ্ঞাসার দিন আসিয়াছে—হিন্দু ভ্রাতা ভগিনীগণ, আপনারা কি মুসলমান ভ্রাতাদিগকে এ পর্য্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই? মুসলমান ভ্রাতা-ভগিনীগণ, আপনারাও কি হিন্দুদিগকে ভাল বাসিতে পারিয়াছেন? হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করেন মুসলমানের ধর্ম্মের দিক দিয়া নহে, তাঁহাদের বাহ্যিক আচারণের দিক দিয়া। মুসলমানও হিন্দুকে ঘৃণা করেন তাঁহাদের সামাজিক রীতি-নীতির দিক দিয়া। উভয়ের ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতির মধ্যকার মিলনের দিকগুলি বাদ দিয়া আমরা বিরোধগুলিই প্রবল করিয়া তুলিতেছি।

মুসলমান সমাজ হিন্দুর চক্ষে যতই ছোট হউক, মুসলমানের শ্রেষ্ঠতার একটা দাবী আছে—যাহা সারা জগতের মানব-ধর্ম্মের সহিত একতাসূত্রে গ্রথিত। হিন্দু ইহা অন্তরে বুঝিয়াও বাহিরে স্বীকার করিতেছেন না। এক বিশ্বপতির উপাসনা, জগতের মানবমাত্রকেই ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান, আহার-বিহার কোন কিছুতেই কাহাকেও পরিত্যাগ না করা—এ সকল জগতের সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য।

হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তাহা জগতের সর্ব্বজনীন ধর্ম্মেরই অনুকূল, কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজ ঐ সকল শাস্ত্রের বিধান হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। হিন্দুর সামাজিক রীতি-নীতি আচার ব্যবহারে এমন অনেক ভ্রমপূর্ণ বিষয় আসিয়া পড়িয়াছে যাহাতে দিন দিন এই সম্প্রদায় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে; অথচ সেই গুলি সংশোধন করা দূরের কথা—তাহাকেই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বলিয়া গর্ব্ব করা হইতেছে। বলিতে কি—হিন্দুর সমাজ যেন এখন বহু প্রাচীন হইয়া জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে বহু মতবাদ আসিয়া পড়িয়াছে, এইজন্য অ-হিন্দুগণ ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া ইহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। বর্ত্তমানকালে সমগ্র পৃথিবীর মানবের মধ্যে পরস্পর অধিকতর ঘনিষ্ঠতা হইতেছে; এ অবস্থায় ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি নিকট সম্বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু দেব উপাসনা পদ্ধতি, কঠোর জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতির দ্বারা হিন্দু জাতি সমগ্র পৃথিবীর মানবের সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। মুসলমানগণ যে হিন্দুকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, তাহাও ইহারই ফল।

ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির একত্রে বসবাস করিতে হইবেই। এ অবস্থায় পরস্পর বিরোধ না করিয়া সদ্ভাবে চলাই কর্ত্তব্য। বরং ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয় যে সর্ব্ব ধর্ম্মের

ভক্ত সন্তানের বসবাস একমাত্র ভারতমাতার ক্রোড়েই সম্ভব হইয়াছে। ভারত সন্তানগণের ভিতরেই যেমন জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রগুলির অনুশীলন হইয়া থাকে জগতের আর কোন দেশে এমন সম্ভব হয় নাই। ভারতের এই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভ্রাতাগণের মিলনের অভাবেই ভারত আজ এত হীনবল। এর পর বিদেশী শাসন-শক্তির প্রভাবে আমরা দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সহিত একত্রে বসবাসের অনুকূলে আমরা 'মিলন-মন্দিরের নৈবেদ্য' নামে কয়েকটি ধারা প্রকাশ করিলাম, দেশবাসীকে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি—

মিলন-মন্দিরের নৈবেদ্য—

১। বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেই ধর্ম্মের বিশিষ্ট তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অন্ততঃ এক এক জনের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইবে এবং সেই সেই বন্ধুর সহিত মতবিনিময় দ্বারা বিভিন্ন তাৎপর্য্যের সমাজ ও ধর্মনীতি বুঝিতে হইবে।

৩। মিলন-মন্ত্র প্রচারার্থে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে সার্ব্বজনীন ধর্মনীতি সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদিগের মধ্যে শিক্ষা দিতে হইবে।

৪। ধর্ম এবং সমাজনীতির যে সকল অঙ্গ সারা জগতের ধর্ম এবং সমাজনীতির অনুকূল তাহা যথাসম্ভব পালন করিতে হইবে।

৫। জগতের ঐক্য সংস্থাপনার্থ বসনভূষণ আহারবিহার প্রকৃতির বিষয়ের যতটুকু পরিবর্ত্তন করিলে, আমার ধর্মের ব্যাঘাতকর না হইয়াও জগতের সাধারণ ধারার অনুকূল হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৬। আমরা একই বিশ্বপতির সন্তান হিসাবে পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী তুল্য। কাহাকেও ঘৃণা করিলে বিশ্বপতির বিচারে অপরাধ হইবে।

৭। ধর্ম্মী পর-ধর্ম্মী উভয়ের সেবাই বিশ্বপতির সেবার অঙ্গ।

৮। পরিত্র-ধর্মাবলম্বীর সহিত বিদ্বেষাচরণে পাপ, সদ্ভাবে পুণ্য; পাপের ফলে এবং পুণ্যের স্থিতি—ইহা বিশ্বভাবেই বিধান।

৯। আমরা নীতিধর্ম্মের মর্ম্ম না করিয়া প্রেমধর্ম্মের অনুসরণ করিব। পরধর্ম্মাবলম্বী কাহারও প্রতি ক্রোধের সত্য কারণ উপস্থিত হইলেও ক্রোধ করিব না, ক্ষমা করিয়া ক্ষমা করিব।

১০। আমার দ্বারা যেন স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী কিছার না করে।

১১। পরধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা আমরা যেন কার্য্যের দ্বারা দেখাইতে পারি।

১২। আমরা জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর কাছে ঋণী; কারণ প্রত্যেক ধর্ম্মের নীতি সম্মিলিত হইয়া আমাদের জীবনের পুষ্টি সাধন করে।

১৩। সাবধান! পরধর্ম্মের অতিকর অথবা তাহাদের মনোরঞ্জনকারক কোন কর্ম্ম যেন আমাদের দ্বারা সংঘটিত না হয়।

১৪। সকলের প্রতিই আমাদের বিচার নিরপেক্ষ হইবে।

১৫। এই সকল কার্য্যের দ্বারা নিজ আত্মীয়দিগকে অনেক দুঃখ করিতে হইবে, তখন সেই সকল দুঃখ কষ্টকে যেন আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারি।

১৬। পরধর্ম্মীর প্রতি আমাদের ব্যবহার বিচার-বুদ্ধিযুক্ত না হইতেও পারে, কিন্তু সরলতা যেন আমাদের মিলন-মন্দিরের ভিত্তি হয়।

১৭। যেখানে মিলন সেখানে বাধা নাই,—সেখানে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মিলনের ফল প্রেম, আনন্দ, মাধুর্য্য, শান্তি।

১৮। আমি যদি পরের কল্যাণ কামনা করি তবে সেই পরও কি আমার কল্যাণ কামনা করিবে না?

১৯। আমরা বিচ্ছিন্নতায় যেন কত হীন হইয়া রহিয়াছি, অথচ সম্মিলিত শক্তিতে আমরা কত অসাধ্য সাধন করিতে পারি। মিলিত শক্তির সাহায্যে আমাদের মধ্যে তখনই আসিবে, তারতবাসী আমরা জগতে একটা মহীয়ান জাতি বলিয়া গণ্য হইব।

২০। যিনি সারা বিশ্বমানব প্রাণে একই ভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপতির নিকট আমাদের প্রাণের নিবেদন জানাইতেছি। তিনি আমাদের সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়ের নরনারীকে প্রেমের বন্ধনে মিলিত করিয়া এই 'মিলন-মন্দিরের' প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করুন।

নারীগণের আত্মরক্ষার উপায়

শ্রীমতী শ্যামমোহিনী দেবী।

প্রতিদিনই খবরের কাগজ নারীনির্য্যাতনের সংবাদ বাহির হইতেছে তবু লোকলজ্জার ভয়ে কত সংবাদ প্রকাশই হয় না। দেশের মেয়েদের এই অপমান ও লাঞ্ছনার কথা যখনই মনে হয়, তখনই মন বিষাদ ও লজ্জায় অভিভূত হয়। অনেকেই জানেন, অল্পদিন আগে সীমান্ত প্রদেশে যখন একটী ইংরাজ বালিকা অপহৃত হইয়াছিল তখন তাহার উদ্ধারের জন্য ইংরাজ নরনারী কেমন প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল, এবং সমাজ তাহাকে কত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। যে কোন উন্নতিশীল জাতির জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাহাদের ভিতর এই জাতীয় একতা বোধ জলন্ত ভাবে স্বপ্রকাশ।

আমাদের দেশে দিনের পর দিন এই যে অত্যাচার কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে তাহার প্রতীকারের জন্য আমরা ভারতীয় নারীরা কি করিতেছি? পুরুষেরা তবু কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন, আর্য্যসমাজীরা নির্য্যাতিতা নারীগণের বিবাহ দিতেছেন, আর একদল লোক ঐ মেয়েদের স্বপক্ষে মামলা চালাইতেছেন, যদিও তাহাতে অত্যাচারের সংখ্যা বিশেষ হ্রাস হইতেছে না। কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন যে, দেশে দেশে নারীগণের রক্ষার জন্য যুবকদল গঠন করা হউক, কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইবে মনে হয় না। কারণ দেশ নিরস্ত্র, পুরুষেরা নিজেরাই চোর, দস্যু প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাঁহারা কিরূপে অন্যকে রক্ষা করিবেন? যদি তাঁহারা শস্ত্রবলে বলিয়ানও হইতেন তবুও ইহা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। নিজে নিজেকে রক্ষা করার শক্তি যতদিন না স্বাধীনতা হইবে ততদিন এসব কোন যুক্তিই কার্য্যকরী হইবে না।

নিজকে উন্নত করিবার, বিপদ হইতে মুক্ত হইবার, এবং অপরকে মুক্ত করিবার বুদ্ধি ও শক্তির বিকাশ করিতে হইলে দেশের মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বলের চর্চ্চা করা দরকার, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা বিশদরূপে দেওয়া কর্ত্তব্য। জগতে পাশব বল কি? তদ্বারা নারীরা কিরূপে বিপন্না হয় এবং কিরূপেই বা আত্ম রক্ষা করা যায় তাহা তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝান উচিত। মেয়েরা যদি দৈহিক ও নৈতিক বলে বলশালিনী হয় তবে জগতে এমন কোন পাশবিক শক্তি নাই যাহা তাহারা জয় করিতে না পারে। আজ কাল কোন বালকদের কি বালিকাদের স্কুল বা কলেজে এই শিক্ষা দেওয়া যে নিতান্ত দরকার তাহা অভিভাবকগণ বা স্কুল-কর্তৃপক্ষগণ কেহই মনে করেন না। বালকদের পক্ষে ইহাতে আপাতঃ দৃষ্টিতে কোন অনিষ্ট দেখা যাইতেছে না বটে কিন্তু মেয়েদের অপমান ও লজ্জার সীমা নাই। এই বহুজন পূর্ণা ও বহুতর পুলিশ প্রহরী পরিবেষ্টিতা কলিকাতা নগরীর বুকের উপর যদি মেয়েরা নিয়ত ট্যাক্সিতে, গাড়িতে, রিক্সতে, কোন কোন স্থলে বাড়ীতেও বিপন্না হন তবে অন্য স্থানে বিশেষতঃ উপযুক্ত শিক্ষা ও সভ্যতা বিহীন পল্লীগ্রামে যে মেয়েদের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

এই অত্যাচারের প্রতীকারের উপায় আমাদের মেয়েদেরও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যে সকল মেয়ে, উচ্চ শিক্ষা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা ও সাহস অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের উচিত প্রতি পল্লীতে মেয়েদের উন্নতির ও শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করা ও তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারের শক্তির বিকাশ সাধন করা। যে কোন অত্যাচার সমূলে বিনষ্ট করিতে হইলে আগে অজ্ঞানতা অন্ধকার দূরীভূত করিতে হইবে তার পরে অন্য সমস্ত শক্তির চর্চ্চা করিলে সেগুলি বিকাশের পথ সুগম হইবে।

এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রত্যেক নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা যাহাই যখন প্রকৃত শিক্ষা পদবাচ্য, তখন তাঁহাদের মেয়েদের ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করাও

প্রয়োজন। আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইলে কোন শিক্ষাই কার্য্যকরী হইবে না।

বাংলা দেশের মধ্যে কলিকাতায় নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, কাজেই, বেথুন কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রভৃতির কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়া ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন এবং প্রথম পথপ্রদর্শন করেন তবে অপরাপর স্থানেও এই পন্থা নিশ্চয় অনুসৃত হইবে।

এ বিষয়ে বরোদার বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যায়াম বিদ্যালয় দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য। তথাকার স্কুলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে আগত একজন মনস্বিনী নারীর মনে প্রথম এই বিষয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় এবং তিনি তাঁহার ভাইকে বরোদার ব্যায়াম বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া তাঁহার নিকট হইতে নিজেরা শিক্ষা করিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেন। প্রথমে কেহই মেয়েদের এই শিক্ষা দরকার মনে করিতেন না বরং রীতিমত বিরুদ্ধে ছিলেন, পরে সকলেই ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন বরোদার মহারাজাই ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ঐ বিদ্যালয়ের মেয়েরা শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতেছে। জাতীয় জীবনের মূলস্বরূপা মাতৃজাতি যদি সর্ব্বশক্তিসম্পন্না হয় তবে তাহাদের সন্তানগণও শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে নিশ্চয় উন্নত হইবে।

আবাহন

শ্রী শচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল।

এস আজি কল্যাণী করুণার রূপেতে,
জোয়ারের বান তাই ডাকে আজি বুকেতে—
উথলিয়া উঠে প্রাণে 'ভকতির সিন্ধু,
নয়নের কোণে ফোটে মুকুতার বিন্দু;
দশ দিক্ আলো করি স্নেহ লয়ে চক্ষে
এস দেবী আমাদের ব্যথা ভরা বক্ষে।
ডাকে তোমা দুখ্ ভরে শত শত ভক্ত
চন্দন করিয়াছে—দিয়ে হৃদি রক্ত,
মরমের বন হ'তে তুলি ফুল যত্নে,
মালা গেঁথে নিরজনে হৃদয়ের রত্নে
আছো বসে রহিয়াছে,—তোমারই জন্য,
কৃপা করে তুলে নিয়ে কর তারে ধন্য।
মরতের দুখ্ ব্যথা করি তারা তুচ্ছ,
করিয়াছে তোমাকেই জীবনের পূজ্য,
এস আজি স্নেহরূপে নব রস রঙ্গে
এস দেবী! অতীতের নবীনের সঙ্গে;
এস আজি নন্দিত করি সারা বিশ্ব
আঁখি জলে কর যোড়ে ডাকে তব শিষ্য।

কলিকাতার দাঙ্গা

কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হাঙ্গামা বাংলার একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। গত ২২এ হইতে ২৪এ চৈত্র পর্য্যন্ত প্রথম দাঙ্গা হয়। আর্য্যসমাজী হিন্দুদের একটি শোভাযাত্রা বাজনা বাজাইয়া হ্যারিসন রোড দিয়া যাইতেছিল। একটি মসজিদের নিকট দিয়া যাইবার সময় মসজিদের মুসলমানরা বাজনা বাজাইয়া যাইতে নিষেধ করে। এই উপলক্ষে প্রথমে আর্য্যসমাজীদের সহিত মুসলমানদের, পরে হিন্দু সমাজের সহিত মুসলমানের বিবাদ আরম্ভ হয়। এই দাঙ্গায় বহুলোক হতাহত হয়। তিন সপ্তাহ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় দাঙ্গা ভীষণভাবে আরম্ভ হয়। ইহা সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়, এবং ইহাতে দুই পক্ষের প্রায় সাড়ে তিন শত লোক হতাহত হইয়াছে। পূর্ব্ববারে কেবলমাত্র জাকেরিয়া ষ্ট্রীট ও বড়বাজার অঞ্চলেই হাঙ্গামা বিশেষভাবে হইয়াছিল, সেববারে প্রায় সমগ্র কলিকাতা লইয়া দাঙ্গার ভীষণ লীলা চলিতে থাকে। সমস্ত সহরে অত্যন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, সকল দোকানপাটই বন্ধ ছিল, ভয়ে রাস্তায় লোকজনও চলিতে পারে নাই। সহরের উচ্ছৃঙ্খল হিন্দু ও মুসলমান গুণ্ডাদল এই উপলক্ষে তাহাদের স্বভাবের পূরা পরিচয় দিয়াছে। হিন্দু-প্রধান পল্লীতে মুসলমান যাইতে পারে নাই এবং মুসলমান-প্রধান পল্লীতে হিন্দুও যাইতে পারে নাই। বলিতে কি সমগ্র কলিকাতায় এক সপ্তাহকাল দারুণ অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল। পুলিশ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই দাঙ্গা কমাইতে পারিয়াছিল না। কেহ কেহ বলেন প্রথম হইতে পুলিশের এ বিষয়ে যতটা দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল ততটা দেয় নাই। একদিন প্রাতে প্রায় চারিশত মুসলমান অস্ত্রশস্ত্র সহ মেছুয়াবাজার হইতে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। হিন্দুরাও দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। হিন্দুদের মধ্যে অধিক সংখ্যক যুবক ছিল, তাই তাহারা মুসলমানদিগকে হঠাইয়া দিতে সমর্থ হয়। কিছু পরেই মুসলমানরা আরও অধিকতর দলবল জোটাইয়া হিন্দু যুবকদলকে আক্রমণ করে। এই সময় মুসলমানদের ভিতর হইতে একজন পিস্তল ছুঁড়ে এবং সেই গুলির আঘাতে একটি পুলিশ কনেষ্টবলের মৃত্যু হয়। যখন পুলিশও হটিতে উদ্যত—সেই সময় শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ সুর নামক দুইটি বাঙ্গালী যুবক সাহসের সহিত দাঙ্গাকারীদের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে হঠাইতে চেষ্টা করেন। ঐ সময় গোরাসৈন্যদল আসিয়া জনতার উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। উহাতে বহুলোক নিহত ও আহত হয়। ঐ গুলিতে চন্দ্রকান্ত ও যতীন্দ্রনাথ আহত হন এবং হাসপাতালের পথেই উভয়ের মৃত্যু হয়। বাঙ্গালী জনসাধারণ তাঁহাদের সেই বীরত্ব ও আত্মত্যাগের সম্মান স্বরূপ বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া নিমতলার শ্মশানে তাঁহাদের দেহ সৎকার করেন। চিত্তরঞ্জনের শবদেহের শোভাযাত্রার পর শবদেহের শোভাযাত্রায় এত লোক-সমাগম নাকি আর হয় নাই।

এই ভীষণ হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ সহর ও পল্লীর সমস্ত লোকেই বিশেষভাবে অবগত হইয়াছেন। মফঃস্বলের লোকেরা তাঁহাদের কলিকাতাবাসী বন্ধু-বান্ধবদের জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ মফঃস্বলবাসীরা যত ভীত হইয়াছিলেন কলিকাতাবাসীরা কিন্তু বিপদকে ততটা ভয় করেন নাই। দোকান ও বাজার বন্ধ থাকায় অনেকস্থলে খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ অভাব হইয়াছিল। কলিকাতার এই দাঙ্গার সূত্র অবলম্বন করিয়া বাংলার বিভিন্ন স্থলে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা আছে। কোন কোন স্থলে কিছু কিছু ঘটিয়াছেও।

কলিকাতার এই দাঙ্গা হইতে বাংলার হিন্দু মুসলমান সকলেই একটা ভবিষ্যত অশান্তির আশঙ্কা করিতেছেন। ভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের হিন্দুমুসলমান-ভ্রাতা সকলকার মধ্যেই সৌহার্দ্য স্থাপন করুন।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়

১। ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তির একমাত্র কারণ শরীরে এই রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুর প্রবেশ। এই জীবাণু এনাফিলিস নামক এক প্রকার মশক দংশন হইতেই মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে।

২। ম্যালেরিয়া বিষ বহনকারী এই এনাফিলিস জাতীয় মশক হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে পারিলে জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৩। এই মশক বা মশা অন্ধকারে, ঘরের কোণে, গোয়ালে বাস করে, এবং জলের ধারে বা কোন স্থানে জল জমিয়া থাকিলে সেইখানে ডিম পাড়ে, তাহা হইতে পুনরায় এনাফিলিস মশক উৎপন্ন হয়।

৪। মশক কোন ম্যালেরিয়া রোগীকে দংশন করিলে রোগীর রক্তের সহিত ম্যালেরিয়া জীবাণু নিজ শরীরে শোষণ করে, সেখানে এই জীবাণু সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও মশার থুথুর থলিতে আশ্রয় লইয়া থাকে। অন্য সুস্থ ব্যক্তিকে এই মশা দংশন করিলে তখন তাহার শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবিষ্ট হইয়া সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয় ও রক্তের সহিত ছড়াইয়া পড়ে, তাহাতেই জ্বর হইয়া থাকে।

এখন এই মশক দংশন হইতে পরিত্রাণ লাভ করা ও কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করাই ম্যালেরিয়া জ্বর নিবারণের একমাত্র উপায়, যথা।—

১। মশক বৃদ্ধি নিবারণ—

(ক) অব্যবহার্য্য ডোবা পুষ্করিণী সকল কাটাইয়া পরিষ্কার ও ব্যবহার্য্য করা কিম্বা সেগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া, যাহাতে কোনরূপ জল জমিয়া না থাকে।

(খ) অন্যান্য ডোবা ও পুষ্করিণীগুলি পরিষ্কার রাখা, জলের ধারের ছোট ছোট গাছ, ঘাস ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া ফেলা, ডোবা, পুষ্করিণীর পচা জলে কেরোসিন তৈল দেওয়া।

(গ) মশার ডিম সমূহ ধ্বংস করিবার জন্য পুষ্করিণীতে বা ডোবাতে কৈ, মাগুর, সোল, লেঠা প্রভৃতি মৎস্য জন্মান, এই সমস্ত মৎস মশকের ডিমগুলি খাইয়া ফেলে।

(ঘ) বাড়ীর মধ্যে ও সন্নিকটে ভাঙ্গা হাঁড়ি, টীন প্রভৃতি কোথাও না রাখা ও ছোট ছোট গর্ত্তগুলি বুজাইয়া দেওয়া, এই গুলিতে বর্ষায় জল জমিয়া থাকে বলিয়া মশার ডিম পাড়িবার সুবিধা হয়।

(ঙ) বাড়ীর চারিদিকে অধিক গাছপালা, ছোট ঝোপ রাখায় মশার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই গুলি পরিষ্কার করাইয়া রৌদ্র ও বাতাস চলাচলের উপায় করা আবশ্যক।

(চ) বাটীর মধ্যে ও বাহিরে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিয়া রাখিলে এবং বাটীর পার্শ্বে ইউক্যালিপস বৃক্ষ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইয়া থাকে।

২। ব্যক্তিগতভাবে ম্যালেরিয়া হইতে বাঁচিবার উপায়—

(ক) মশক দংশন হইতে শরীর রক্ষা করিবার জন্য মশারি ব্যবহার করা উচিত, মশারির অভাব হইলে বা মশারি খরিদ করিতে অসমর্থ হইলে হাতে পায়ে ও মুখে তেল মাখিয়া গায়ে চাদর আচ্ছাদন দিয়া শুইয়া থাকিবে।

(খ) ম্যালেরিয়া রোগীকে মশারি মধ্যে পৃথক বিছানায় রাখা আবশ্যক।

(গ) ঘরের দরজা জানালা বেশ বড় হওয়া উচিত, যেন যথেষ্ট আলো ও বাতাস প্রবেশ করে।

(ঘ) সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দরজা জানালা অল্প সময় বন্ধ রাখিলে বাহিরের মশা ঘরের মধ্যে প্রায় প্রবেশ করিতে পারে না, সন্ধ্যায় ধুপ ও ধুনা জ্বালাইবার প্রথা বিশেষ হিতকর।

(ঙ) ফুল মরসা প্রভৃতি গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে ও বাটীর জল নিকাশের পথ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

(চ) সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম বা স্বাস্থ্যের হানিকর কার্য্য হইতে দূরে থাকা আবশ্যক, হঠাৎ চাঙ্গা লাগার উচিত নহে।

(ছ) সংযম বিশেষ আবশ্যক, আহারে, বিহারে, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য রোগ নিবারণের প্রধান উপায়।

(জ) ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রমণ করিলেও প্রতিষেধক-রূপে নিয়মিতরূপে কুইনাইন ব্যবহার হিতকর। দরিদ্রগণকে দেশের অনেক সমিতি হইতে বিনা মূল্যে কুইনাইন দেওয়া হয়।

(ঝ) সাধ্যমত সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করা উচিত।

(ঞ) প্রত্যহ প্রাতে তিনটী তুলসী পত্র, তিনটী নিম্ব পত্র, তিনটী বিল্ব পত্র ও দুইটী গোল মরিচ একত্রে সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণ নিবারিত হইয়া থাকে। —বাঙ্গুড়া দর্পণ।

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আমাদের নিকট আসিয়াছে। পাঠক পাঠিকাদের নিকট হইতে আমরা ইহার উত্তর পাইতে চাই। উত্তর দু তিন লাইনের বেশী না হয়, যুক্তি যুক্ত উত্তরগুলি উত্তরদাতার নাম সহ মাতৃ-মন্দিরে প্রকাশিত হইবে।

১। বিবাহে বরকন্যার বয়স কত হওয়া বাঞ্ছনীয়, বিবাহের সম্বন্ধ বরকন্যার ইচ্ছানুযায়ী অথবা অভিভাবকের ইচ্ছানুযায়ী হওয়া উচিত?

২। বালিকাদের শিক্ষা গৃহে হওয়া ভাল, কি বিদ্যালয়ে হওয়া ভাল?

শ্রীদুলচাঁদ মুছড়া, খুলনা।

৩। পরিবারের মধ্যে গৃহকলহের জন্য দায়ী কে, ইহা নিবারণের উপায় কি?

৪। স্বামী স্ত্রীতে 'তুমি' 'তুমি' সম্বোধন, 'আপনি' 'তুমি' সম্বোধন, অথবা 'আপনি' 'আপনি' সম্বোধন—কোন্‌টি বাঞ্ছনীয়?

৫। স্বামী স্ত্রীকে কি বলিয়া ডাকিবেন, স্ত্রীই বা স্বামীকে কি বলিয়া ডাকিবেন? স্ত্রীকে নাম ধরিয়া ডাকা কেমন?

শ্রীমতী রাধারাণী দাস, মনসুখপুর, যশোহর।

৬। স্ত্রী অসতী হইলে স্বামীর কর্ত্তব্য কি? তাহাকে পরিত্যাগ করিবে কি?

শ্রীরামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর।

৭। পতিতাদের মধ্যে যদি কেহ পাপ ব্যবসায় ছাড়িয়া সৎপথে থাকিতে চায়, তবে তাহার ভরণপোষণের উপায় কি?

শ্রীনিবারণচন্দ্র সরকার, বরিশাল।

৮। জারজ সন্তান সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সকল নৃশংস পাপ ঘটিত হয় তাহার সুব্যবস্থা কি হইতে পারে?

শ্রীসুধাময় বসু, মেদিনীপুর।

নারী

শ্রী প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

স্নেহ ধরা করুণার মূরতি উজল,
বদনে উছলে সদা হাসি নিরমল;
সেবা পূজা পর-হিত—লয়ে এই ব্রত
নিজেরে বিলায়ে দেছ হে দেবী সতত।

জননী ভগিনী বধূ—নব নব রূপে
পালিছ সবারে প্রাণ দিয়া চুপে চুপে,
হীন হীন ব্যথিতের মঙ্গলের লাগি
বুকে লয়ে সুধা-ধারা রহিয়াছ জাগি।

বিভিন্ন দেশের নারী-আন্দোলন *

শ্রী মূলচাঁদ মুন্ধড়া।

গত ৯ই জানুয়ারী দক্ষিণ ভারতের অড্যার নামক স্থানের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন দেশের নারীদের এক রাষ্ট্রীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বহু দেশের নারী সে সভায় যোগদান ও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বক্তব্যের মূল বিষয়ে নিজ নিজ দেশের নারী-আন্দোলনের বর্ণনাই উল্লিখিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের নারীগণের বক্তব্যের সার মর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলিত হইল :—

ভারত

প্রসিদ্ধ থিয়োসফিষ্ট পণ্ডিত শ্রীজিনরাজ দাসের পত্নী এই সভায় অধ্যক্ষা ছিলেন। তিনি এই মহতী সভাকে ভারতীয় নারীদের সর্ব্বপ্রথম আন্তর্রাষ্ট্রীয় সভা বলিয়া বর্ণনা করেন এবং ভারতীয় নারী-আন্দোলনের বিষয়ের মধ্যে ভারতীয় নারীদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার এবং রাজনৈতিক কার্য্যের সমুচিত উল্লেখ করেন।

রুস্

মাডাম ক্যামেনস্কী (Kamenskey) রুসের নারী-প্রগতির বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাহস এবং আত্মবিশ্বাস রুসীয় নারীদের বিশেষভাবে আছে। তাঁহারা নিজ শক্তিতে বহু অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুইডেন

মিস্ পলিন (Pallin) সুইডেনের নারীদের কার্য্যাবলীর বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, গত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তথায় নারীদের জন্য সমস্ত সরকারী পদ উন্মুক্ত হয়। চারিজন নারী রাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্টের সদস্য আছেন; উপযুক্ত হইলে তাঁহারা ধর্ম্ম-সচিব পর্য্যন্তও হইতে পারেন।

হল্যাণ্ড

শ্রীমতী বান কেঘন (Ban keghan) বলেন, হল্যাণ্ডের নারীদের বিশেষত্ব—শান্তি এবং স্বতন্ত্রতার প্রতি তাঁদের অগাধ প্রেম।

ব্রিটন

ব্রিটনের নারী-আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া শ্রীমতী ডক্‌ওয়ার্থ (Dock worth) বলেন যে, ব্রিটনের রাজনৈতিক কার্য্যের চাবি তাঁরই হাতে ছিল, যিনি তথাকার নারী স্বতন্ত্রতার দ্বার উন্মুক্ত করেন। দেশে প্রায় ৮০০ নারী সব্-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে আরূঢ় আছেন। ভারতীয় নারীদের বিষয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় নারীদিগকে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া উচিত—যাহাদ্বারা সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকল কার্য্যে যোগ্যা এবং অনুরূপা বিবেচিতা হইবেন।

জাপান

শ্রীমতী লেবার্টন (Laberton) জাপানের নারীদের জীবন ও বিশেষত্বের আলোচনা করেন। তিনি বলেন, জাপানী স্ত্রীদের প্রধান বিশেষত্ব তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। সকল শ্রেণীর নারীর মধ্যেই তথায় ঐক্য আছে। সেখানকার নারীরা সব কাজ, এমন কি বাগানের কাজ করিতে পর্য্যন্ত একটুও পশ্চাৎপদ নন। গৃহস্বামী যখন বাহিরে কাজে যান তখন গৃহস্বামিনী নীরবে তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন। বেশ্যাবৃত্তি কমাইবার জন্য তথাকার নারীগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার নারী শ্রীমতী বেনেট্ (Bennett) তথাকার নারীদের বিষয় অল্প কিছু বলিবার পর উক্ত সভা ভঙ্গ হয়। শেষ সময়ে শ্রীমতী কাজেন্‌স্ (Casins) নারীদের বিষয়ে বলেন,—'যাঁহাদের জীবনে সেবাকার্য্যের বাসনা জাগিয়া আছে তাঁহারা কোন বাধাই প্রাপ্ত হইবেন না।'

---

* হিন্দুস্থানী বহিনদের "চাঁদ" মাসিকপত্রের শ্রীযুক্তবিহারী বর্ম্মার লিখিত প্রবন্ধ হইতে।

নানা কথা

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার কলিকাতা ১৪৮ নং রসা রোডস্থ বাড়ী ও সম্পত্তি জাতীয় কল্যাণে দান করিয়া যান। উহা পরিচালনার্থ একটি কমিটিও গঠন করিয়া যান এবং তাঁহার ঐ বাড়ী ভারতীয় নারীদের রোগী পরিচর্য্যা শিক্ষা এবং রোগগ্রস্ত একটি প্রসবাগার স্থাপনের জন্য দান করিয়া যান। সম্প্রতি ঐ বাড়ীতে "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন" নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও মাতৃ-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সেবাসদনের দারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। আশা করা যায়, এই সেবাসদনে কলিকাতার অসহায় কয় হাজার লোকের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইবে। মাতৃ-নিকেতনে বহু দরিদ্র নিরক্ষিতের প্রসূতিদের প্রসবের ও শুশ্রূষার বিধান করা হইবে।

হাঁসপাতালে মহিলা বিভাগ—

"রাণাঘাট জমাদেতী মিশন হাঁসপাতালে" স্ত্রীলোকদের থাকিবার জন্য পৃথক ভাবে একটি পাকা বাড়ী তৈয়ারীর আয়োজন হইতেছে। উহাতে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ টাকা সংগ্রহে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। নারীদের অভাব অভিযোগের চিন্তা দেশের মানুষের মনে এতকাল পরে সত্য সত্যই জাগিয়াছে; তাই চারিদিকে নারী-প্রতিষ্ঠানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

শঙ্খের কথা—

বাংলার গৃহলক্ষ্মীরা হাতে যে শঙ্খ পরিয়া থাকেন, ঐ শঙ্খের জন্মস্থান কোথায় কেহ খোঁজ রাখেন কি? ভারতের দক্ষিণাংশে তুতাকোরিণ অঞ্চলের সমুদ্র উপকূল হইতে ঐ সব শঙ্খ সংগ্রহ করা হয়। দল বাঁধিয়া জন তুয়েক এক একখানি নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রের ভিতর হইতে শঙ্খ উত্তোলন করে। আশ্বিন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শঙ্খ উত্তোলনের কাজ চলিয়া থাকে। বাংলার শঙ্খ ব্যবসায়ীরা মাদ্রাজের শঙ্খের মহাজনদিগের নিকট হইতে উহা আমদানী করিয়া শঙ্খ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। শঙ্খের কাজ মাদ্রাজের মহাজনদের এবার আড়াই লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। বাংলা ছাড়া আর কোন জায়গায় মেয়েরা শঙ্খ ব্যবহার করেন বলিয়া আমরা জানি না, তাহা হইলে ঐ আড়াই লক্ষ টাকা বাংলার নিকট হইতেই আসিয়াছে।

বাংলার নারী ও চরকা—

ভারতের মুক্তির উপায় সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীকে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছেন,—"বিলাতী কাপড় বর্জ্জন ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবিতে পারি না এবং চরকার ব্যবহারেই ইহা সম্ভব হইবে। চরকা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন বন্ধু নাই। আমি আমার অন্যান্য অনুচর তুলিয়া লইয়া চরকারূপ নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে ভাসিয়াছি, এই নৌকাই আমাদিগকে মুক্তির পারে লইয়া যাইবে। ইহা চালাইবার জন্য কেবলমাত্র আমাদের উৎসাহ এবং সম্মতি চাই।" এই কার্য্যে নারীরাই কি প্রকারে সহায়িকা হইবেন? বাংলার নারীগণ যে এই কার্য্যে নামিয়াও নামিতেছেন না। বাংলার অনেক ঘরে চরকা মাচার তোলা রহিয়াছে। যাহা হউক, দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া কি হইবে। একবার মনের বলের সঙ্গে চরকা লইয়া বাংলার নারীদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে বলি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!—

এইবার বাংলার কালো মেয়েরা সকলেই সুন্দরী হইবেন। "আর্য্যা" পত্রিকা লিখিতেছেন, সিদুর, আলতাই, মসিনা ও গব—এই কয়টি জিনিষ এক সঙ্গে ঘটিয়া গায়ে মাখিলে গায়ের রং ফর্সা হয়। যাহা পত্রিকার লেখকের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ না পাইলে আর আমাদের উপায় নাই, তাহার আমাদের পত্রিকাদের এতটুকু সংবাদে মোটেই তৃপ্তি হইবে না। তাঁহারা এসম্বন্ধে বৃহৎ একখানা বিস্তৃত বই-ই চাহিয়া বসিবেন।

অদ্ভুত নারীচরিত্র—

"সঙ্গিনী" এক মজার সংবাদ দিয়াছেন। আমেরিকার একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তার চুয়াত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যুশয্যায় শুইয়া তাঁহার জীবনের এক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে সকলে পুরুষ বলিয়া জানিত, কিন্তু তিনি স্ত্রীলোক ছিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া পুরুষ বেশে কাটাইয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার দ্বারা কাহারো কোন অসুবিধা বা ক্ষতি হয় নাই। উক্ত মহিলার জন্মস্থান ইংলণ্ড, তাঁহার পিতামাতা অপুত্রক ছিলেন। তাঁহারা এই কন্যাকে বালকবেশে সাজাইয়া রাখিতেন। তিনি তাঁহার শৈশবের এই অভ্যাস বৃদ্ধ বয়সেও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অদ্ভুত নারী চরিত্র বটে। পাশ্চাত্য দেশে সবই সম্ভব হয়, আমরা কিন্তু এ রকম বৈচিত্র্য কল্পনাতেও আনিতে পারি না।

বুদ্ধিমতী গৃহিনী—

মাদারীপুরের অন্তর্গত মরিয়া গ্রামে একটি বিধবা গৃহিণী নিজের প্রত্যুৎপন্ন মতির পরিচয় দিয়া একটি চোর ধরিয়াছেন। তিনি হঠাৎ দেখিতে পান ঘরের ভিতর এক কোণে চোর লুকাইয়া আছে। বাড়ীতে মাত্র তিনি এবং তাঁহার পুত্রবধূ ছিলেন। এখন বাড়ী বসিয়া চোর ধরিবার জন্য প্রতিবেশী অন্য লোক ডাকা চাই। হঠাৎ তিনি বুদ্ধি

ছোটাইয়া বধূকে বলিলেন—"বৌমা, দুঃখের কথা আর কি বলিব, তোমার বাবা মারা গিয়াছেন।" বধূ কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রবণের কারণ জানিতে প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িল। শাশুড়ীর মরণ কিন্তু চোরের পাহাড়ার ঘরের দরজার পাশে নিবদ্ধ ছিল। উপযুক্ত লোক জমা হইলে যাহা তিনি বলিলেন—"বউমার বাপ মরে নাই, ঘরে চোর আছে।" পুরুষেরা গিয়া অমনি চোরকে ধরিয়া ফেলিল। চোর ধরা পড়িল, মারপিট হইল, থানায় চালান দেওয়া হইল। বুদ্ধিমতী গৃহিণী বটে।

শুদ্ধি—

ঘরিশাল জেলার নিবাসী মনোরঞ্জন ঘোষ মহাশয় চার পুরুষে খৃষ্টান। সম্প্রতি তিনি ও তাঁহার স্ত্রী দুটি সন্তান সহ বোগ্য প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। বহু পরমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া শুদ্ধি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এই নব দীক্ষিতদের হাতের জল পান করিয়াছেন। প্রাচীন পন্থী হিন্দুসমাজ ইহাতে তৃপ্ত হইবেন কি না জানি না। কিন্তু অনেকের মতে বর্ত্তমানে এইরূপ হিন্দুসমাজের বলবৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শুধু আত্মরক্ষার দিক্ দিয়াই বা কেন, গ্রহণ করিবার শক্তি যদি হিন্দুসমাজের না থাকে তবে আর সমাজের শক্তি কোথায়?

সন্তান পালনে নূতন কথা—

"ইণ্ডিয়ান" পত্রিকা লিখিয়াছেন, যাহাতে ছেলেরা শরীরে ও মনে দৃঢ় হইয়া ওঠে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অল্প স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সকল সময় আদর ও বিপদের সম্ভাবনা হইতে আঁচল চাপা দিয়া ঘুরে বেড়াইলে কখনও ছেলেরা কর্ম্মঠ এবং বিপদকে বিমুখ করিবার মত শক্তিলাভ করিতে পারে না। বিপদের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াই তাকে বিমুখ করিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়। 'গাছে উঠ না, মাথা কাটবে', 'খেলতে যেওনা পা ভাঙ্গবে', 'সাঁতার দিও না, জলে ডুবে যাবে,' 'রোদ্দুর সেবা ক'রতে যেও না, রাত জেগে অসুখ ক'রবে,' দু মাইল পথ হেঁটে যেও না, পা ব্যথা ক'রবে'—এমনি করিয়াই আমরা ছেলেদের অকর্ম্মণ্য, কষ্টে অসহিষ্ণু এবং দুর্বল করিয়া তুলি; তার ফলে তারা চিরদিন জীবন্মৃত হইয়া থাকে, আমাদের পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে। তাদের এই চরম দুর্ভাগ্য হইতে তবে আমরা রক্ষা করিতে পারিব আমি না।

পরলোকে সৌদামিনী দেবী—

জলপাইগুড়ীর শ্রীযুক্ত কালিকীকুমার রায় মহাশয়ের পত্নী সাধ্বী সৌদামিনী দেবী গত ২২এ চৈত্র তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি জলপাইগুড়ীতে স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের জন্য সারা জীবন অক্লান্ত ভাবে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় জলপাইগুড়ীতে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সমিতি এবং মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। তিনি নানা স্থানে বহু সৎকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। ইহাঁর মহিলার পরলোক গমনে দেশবাসীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

বিধবা বিবাহ—

মাদ্রাজ ও কলিকাতার বিধবা-বিবাহ সভার কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায়, গত ৩১এ মার্চ্চ মাস একটি দিনে ইঁহাদের সহায়তায় সমস্ত ভারতে ১৭৩টি হিন্দু বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। বিধবা-বিবাহের চল ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে।

রায়ের গুরুত্ব—

লণ্ডন সহরে মৃত্তিকার নিম্ন দিয়া বহু রেলপথ আছে। এই সব রেলপথকে Underground or Tube রেলপথ বলে। কলের সাহায্যে সুড়ঙ্গ নিম্নে ট্রেনগুলি চালনা করিতে হয়। এই সব রেলপথ প্রস্তুত করিতে প্রতি মাইলে ছয় কোটি টাকা অর্থাৎ প্রতি গজে প্রায় ৩২০৲ টাকা খরচ হয়। ধনীর দেশে সবই সম্ভব।

কলিকাতার জনসংখ্যা —

কলিকাতার লোকসংখ্যা ৩৪ লক্ষ। এ ছাড়া প্রায় তিন লক্ষ বিদেশী লোক প্রতিদিন কলিকাতায় আসে। কলিকাতাবাসী হিন্দু পুরুষের সংখ্যা চার লক্ষ, তিরিশ হাজার; মুসলমান পুরুষের সংখ্যা এক লক্ষ, চুয়ার হাজার, পাঁচ শ। কলিকাতা সহরে প্রতি সহস্র অধিবাসীর মধ্যে সাতশো নয় জন হিন্দু, দু শো পঁয়তাল্লিশ জন মুসলমান, তেত্রিশ জন খৃষ্টান।

বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ সমিতি—

বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ সমিতি আমাদিগকে জানাইতেছেন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে অনেক শিক্ষিত যুবক বিধবা-বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহাদের নিকট পত্র লিখিতেছেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা সুযোগ্য পাত্র ও পাত্রীর সন্ধান করিয়া কয়েকটি বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। দয়াপরবশ-প্রবৃত্তি অভিভাবকগণের নিকট জানান যাইতেছে, তাঁহারা যদি বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে মনস্থ করেন তবে ১২৬নং বাজা স্ট্রীটস্থ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় উক্ত সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অন্যান্য পরিচয় সম্বলিত পত্র লিখুন। পত্রাদি যথাসম্ভব গোপন রাখা হয়।

বালিকা বিদ্যালয়ে বক্তৃতা—

কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী কোন ডাক্তার সম্প্রতি ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতা বালিকাদের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তিকর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকই মেয়ে মহলে ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে পুরুষের বক্তৃতা দিতে হইলে বড় সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিতে হয়। যতদিন দেশে এই সমস্ত বিষয় শিখাইবার

অন্ত মহিলা কর্মী গঠন না হইবে ততদিন এ সমস্ত বিষয় বিশেষজ্ঞ পুরুষ ডাক্তারদের নিকটেই শিখিতে হইবে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে মহিলা সদস্য—

আমরা সংবাদ পাইলাম বোম্বাইয়ে প্রসিদ্ধ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কমিটী পাথার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে একজন মহিলা সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধনশালী আর্মেনিয়ান খুরুতাদ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মণিবাই খুরুতাদ। ভারতবর্ষে যতগুলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এক ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক ব্যতীত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মত এত বড় ব্যাঙ্ক আর নাই। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের আরও বিশেষত্ব এই যে যাহা অন্য কোনও দেশে কোনও ব্যাঙ্কে নাই তাহা এই ব্যাঙ্কে আছে —ইহাদের মহিলা বিভাগ। মহিলাদিগের সুবিধার জন্য উচ্চশিক্ষিত মহিলাদিগের তত্ত্বাবধানে মহিলা বিভাগ আছে। ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে মহিলার কর্তৃত্ব বোধ হয় ইহাই প্রথম।

পাবনা নারী শিল্পাশ্রম—

গত ২৭শে চৈত্র শনিবার পাবনা নারী শিল্পাশ্রমের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে একটী শিল্প প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল। পাবনার মহিলাদের হাতে প্রস্তুত নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দেখিয়া সকলেই খুব প্রীত হইয়াছিলেন। পাবনা নারী শিল্পাশ্রম বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে ইহার সভ্য সংখ্যা ৭২। আশ্রমের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় মহিলাদিগকে সীবন ও নানাবিধ শিল্পের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কয়েকটী মহিলা ধাত্রীবিদ্যাও শিক্ষা করিয়াছেন। সভ্যাদের মধ্যে আঁতুরঘর, প্রসূতির কর্ত্তব্য ও শিশুপালন সম্বন্ধে উপদেশ বিতরণ ব্যবস্থা আছে। এইরূপ আশ্রম প্রতি জেলায় স্থাপিত হওয়া উচিত।

পশুপক্ষীর প্রেম—

মিঃ কুলীন পশুপক্ষীর প্রেমতত্ত্বের ইতিহাসে অভিজ্ঞ। তিনি বলেন, খুব কম শ্রেণীভুক্ত পক্ষীই আজীবন তার পূর্ব্ব বন্ধুর প্রেমলাভে সমর্থ। কাকাতুয়া আর টীয়া পাখী দুইই খুব প্রেমিক। দেখা গিয়াছে যে, একের মৃত্যুর শোকে অন্যটীও প্রাণ দেয়। ঈগল পাখী কখনো দুই জনের সঙ্গে প্রেম করে না। অন্যান্য পাখীর প্রেম সবই এক বন্ধুতেই শেষ হয়। বসন্তকালে তাহারা সঙ্গী খুঁজিয়া লয়, ডিম পাড়ে, শীতকালে বাসক প্রতিপালন করে, তৎপর যে যাহার পথে চলিয়া যায়। আবার নূতন বসন্তে নূতন প্রেমিক খুঁজিয়া লয়। মিঃ কুলীনের মতে পক্ষীজাতির ভিতর 'ঘুঘুই' সব চেয়ে লম্পট। বসন্তের সঙ্গী খুঁজিবার সময় ইহারা মানুষের মতই প্রেমিকার মন ভুলাইবার জন্য নানাপ্রকার কলা প্রদর্শন করে, কিন্তু বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইয়া যায়। বাঘেরা খুবই ভদ্র, তাহাদের পারিবারিক জীবন খুবই উচ্চ, তারা একে অন্যের প্রতি খুবই অনুরক্ত। পশুরাজ্যে তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দাম্পত্যিক। পশুরাজ সিংহও খুবই প্রেমিক; সে তার প্রেমিকার প্রতি খুবই আসক্ত, তবে এই প্রেম দু-বছরের বেশী স্থায়ী হয় না।

ভারতের শিক্ষিতের হার—

নিম্নে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সংখ্যার শতকরা হার প্রদত্ত হইল—

স্থান	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
বাঙ্গালা	৫·৫	৬·৭	৭·৫	৮·৭
বিহার-উড়িষ্যা	৩·২	৩·৯	৪·১	৫·৩
বোম্বাই	৫·২	৬·২	৬·৭	৯·২
মাদ্রাজ	৬·২	৬·৯	৭·৫	৯·৫
পঞ্জাব	৩·১	৩·৪	৩·৯	৪·২
মধ্যপ্রদেশ	২·৪	৩·১	৩·২	৪·৯
যুক্তপ্রদেশ	২·৮	২·৯	৩·৩	৪·১
আসাম	৩·১	৩·৫	৪·৪	৭·২

দুগ্ধ সংরক্ষা—

১। একটী পরিষ্কার বোতল সদ্য গো-দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহা কোন একটী গভীর জলের পাত্র মধ্যে রাখিয়া জাল দিতে হইবে। যখন দুগ্ধ ফুটিতে আরম্ভ করিবে, তখন একটী ভাল ছিপি দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে এবং ছিপির উপর গালা, মোম বা রজন লাগাইয়া উত্তমরূপে বন্ধ করিতে হইবে। ঐ দুগ্ধে একটু চিনি দিলে আরো ভাল হয়। যদি বোতলের পরিবর্ত্তে টিন পাত্রে দুগ্ধ ফুটান যায় এবং তদবস্থায় রাংতাল দিয়া উত্তমরূপে বন্ধ করা যায়, তবে এইরূপ দুগ্ধ বহুকাল ভাল থাকে। রাংতালা সম্পূর্ণ বায়ুরোধক হওয়া ও ঐ টিনপাত্র শুধু রাংতালা দিয়া প্রস্তুত করা উচিত। এইরূপ দুগ্ধ রেল ষ্টীমারে বা দূর দেশে যাতায়াতে ব্যবহার করা সুবিধাজনক, অল্প অনিষ্টজনক নহে।

২। দুগ্ধ গরম করিয়া তাহার মধ্যে একটু কার্ব্বলেট অব সোডা ও চিনি দিয়া উত্তমরূপে বোতলে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিলে বা ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিলে ৮। ১০ দিন সদ্য অবস্থায় থাকে।

৩। দুগ্ধ প্রথমে উষ্ণ করিয়া শীতল হইলে সোডা ওয়াটারের কল দিয়া অল্পমাত্রায় বায়ু উহাতে প্রবিষ্ট করিয়া উত্তমরূপে বোতলের মুখ ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিলে অনেক দিন দুগ্ধ ভাল থাকে।

যে স্থলে শিশু বেশের দুগ্ধ পরিপাক করিতে অক্ষম, অথচ অল্প পরিমাণে সর্ব্বদা পরিপাক করিতে পারে, অধিক পরিমাণ সর্ব্বদা সেবনে তেমন অসুস্থতার লক্ষণ উপস্থিত হয় না অথচ বেশের পরিমাণ অধিক হইলেই শিশুর অজীর্ণ পীড়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ স্থলেই পূর্ব্বোক্ত গাঢ় দুগ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই গাঢ় দুগ্ধ টাটকা ও অল্পক্ষণের গাভী দুগ্ধের হইলেই ভাল হয়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

VIDYODAYA PRESS, CALCUTTA

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৪র্থ বর্ষ | আষাঢ়—১৩৩৩ | ৩য় সংখ্যা

অর্থকর নারী-শিল্প

শ্রী অক্ষয়কুমার নন্দী।

আমি বাঙ্গলার নারী-শিল্প সম্বন্ধে আজ বিশ বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিয়া আসিতেছি কিন্তু তাহার মধ্যে এপর্য্যন্ত অর্থকর শিল্পের সন্ধান অতি কমই পাইয়াছি। বর্ত্তমানের অর্থকর নারী-শিল্পকে আমি দুই ভাগে দেখাইতে চাই—একটি যাহা আমাদের দেশের প্রয়োজনের দিক দিয়া স্বভাবতঃই গড়িয়া উঠিয়াছে, আর একটি বর্ত্তমানের ভদ্র ঘরের মেয়েরা যা করিতেছেন। এই প্রথমটি অর্থাৎ প্রয়োজন-শিল্প দ্বারা দেশের অনেক কাজ হইয়া আসিতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভদ্র ঘরের মেয়েরা ইহার প্রতি মন দেন নাই। দ্বিতীয়টি যাহা ভদ্র ঘরের মেয়েরা করিতেছেন ইহাকে আমি অর্থকর শিল্প বলিতে চাই না, ইহার নাম এক রকমের আর্ট (Art), ইহার বাঙ্গলা নাম কি হইতে পারে তাহা আমি জানিনা, কারণ বিলাতী অনুকরণ হইতে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। কার্পেট বোনা লেস বোনা, ছবি আঁকা, প্রভৃতি এই শ্রেণীর কাজ।

দেশের প্রয়োজনের দিক দিয়াই শিল্পের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় বিলাস-দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়াও শিল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকে বটে কিন্তু তাহাতে দেশের অপকার বই উপকার হয় না। প্রয়োজনের হিসাবে কেহ যদি শিল্পের দিকে নূতন করিয়া প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে চান, তবে তাহাকে ভাবিতে হইবে দেশের কোন জিনিসটি প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইতেছে; তারপর ভাবিতে হইবে এই আবশ্যক দ্রব্যের মধ্যে তাঁহার পক্ষে কোনটি প্রস্তুত করা সহজ সাধ্য হইতে পারে। এই দুইটি বিষয় চিন্তা করিয়া শিল্পকার্য্যে মন দিলে শিল্পের সফলতা আসিবে, নিজেরও অর্থোপার্জ্জন হইবে।

আমি প্রথমে আমাদের দেশের প্রচলিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় নারী শিল্পের উল্লেখ করিয়া শিল্পের সত্যধারা দেখাইতে চেষ্টা করিব। মনে রাখিতে হইবে যে পুরুষদের শিল্পের কথা বাদ দিয়া কেবল নারীশিল্পের কথাই এখানে উল্লেখ করা হইবে।

প্রথমতঃ সূতা কাটা ও বয়ন। এ সম্বন্ধে বাঙ্গলার উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলবাসী স্ত্রীলোকেরা বিশেষ সফলতা লাভ

করিয়াছেন। নওয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা অঞ্চলের ভদ্র ঘরের মেয়েরা অতি চমৎকার চরকায় সূতা কাটিয়া থাকেন এবং তদ্বারা নিজেরাই এক প্রকার অপ্রশস্ত মোটা কাপড় তৈরী করেন। বর্ত্তমানের খদ্দর আন্দোলনে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ হইতেছে এবং ইহাদ্বারা মহিলারা বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। রংপুরের সতরঞ্চি প্রস্তুতের কার্য্যেও মহিলারা বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। সমগ্র আসামপ্রদেশের মহিলারা সূতাকাটা ও বয়ন কার্য্যে সিদ্ধহস্ত। ইহাতে আসামবাসীদের কর্ম্মকুশলতা বিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় এই খদ্দরের যুগে ভদ্র ঘরের মহিলাদের মধ্যে চরকায় সূতা কাটার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববাঙ্গলা অতি সামান্য মাত্র কাজ কোন কোন স্থানে দেখাইয়াছেন বটে, পশ্চিম বাঙ্গলার মেয়েদের মধ্যে ইহার কোন সুফল দেখা যেল না।

কাপড়ে বুটি তোলা বা চিকনের কাজ (Embroidery) —এই ধরণের কার্য্য ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে হইয়া থাকে। ব্যবসায়ীরা কাপড় ও সূতা গৃহস্থের ঘরে ঘরে দিয়া যায়, ও কার্য্য সমাপনান্তে যথাপ্রাপ্য মজুরী দিয়া জিনিস লইয়া যায়। এই কার্য্যটি যদিও অনেকটা বিলাসিতার পরিপোষক তথাপি ইহার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় জার্ম্মাণী হইতে কলের সাহায্যে নানা প্রকার লতা ফুলের কাজ আমদানী হইয়া এই কার্য্যটি দিন দিন লোপ করিয়া দিতেছে। আজ কাল বিলাতী অনুকরণে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিনীদিগকে কিছু কিছু সূতার কাজ শিখান হয়, তাহা কিন্তু এদেশের পক্ষে কোন কার্য্যকরী হয় নাই। ঘর সাজাবার মত দু-একটি জিনিস তাঁহারা করিয়া খুবই বাহাদুরী নেন বটে কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনের কোন সহায়তা উহাতে করে না।

মাটির পুতুল তৈরী,—পল্লীগ্রামে দরিদ্র ঘরের মেয়েরা অনেকে ছোট ছোট মাটির পুতুল তৈরী করেন, মেলা বা আড়ংএর বাজারে সেগুলি পুরুষেরা বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই সকল জিনিস যেখানে বহুপরিমাণে তৈরী হয়, সেখান হইতে অনেক সময় বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ীরা আসিয়া পাইকারী হিসাবে খরিদ করিয়া লইয়া যায়। যদিও বহুল বিলাতী পুতুল এদেশে আমদানী হইয়া বাংলার সহর পল্লী ভরপুর হইয়াছে তথাপি বাংলার এই শিল্পটি একেবারে ধ্বংশ হইবার নহে। ইহার কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে বিদেশী পুতুল ও খেলনার আমদানী হ্রাস পাইবে। খেলনা পুতুল প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের খেলার জন্য দরকার হইবেই; যদি দেশীয় রুচির ভাল পুতুল পায়, তবে তারা বিলাতী পুতুল কখনই পছন্দ করিবে না।

বিভিন্ন প্রকারের বয়ন বা বুনন কার্য্য,—যে কোন প্রকারের যে কোন জিনিসের হউক, 'বয়ন' কার্য্যটি স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী কাজ। যেমন কাপড় বোনা, লেস্ বোনা, সতরঞ্চি বোনা, ছালা বা চট বোনা, জাল বোনা, মাদুর বোনা, পাটি বোনা, বাঁশের বা বেতের ডালা কুলা চাঙ্গারী বোনা প্রভৃতি। ইহার প্রত্যেক রকমেরই কাজ বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়েরা করিয়া থাকেন এবং তাহার দ্বারা নিয়মিত কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

কুম্ভকারের কাজ,—কুম্ভকারের জাতির মেয়েরা ছোট ছোট সরা মালসা প্রস্তুত করিয়া এমন অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন যে তাহাদের সংসারের অনেক বিধবা নিজের উপার্জ্জিত অর্থেই স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

পিতলের গহনা প্রস্তুত,—বর্দ্ধমান নদীয়া হুগলী প্রভৃতি জেলার কোন কোন স্থানে মেয়েরা পিতলের গহনা প্রস্তুত করিয়া বেশ একটি স্থায়ী ব্যবসায় বহুকাল হইতে চালাইয়া আসিতেছেন। সেই সমস্ত অলঙ্কার কলিকাতার চিৎপুর সিন্দুরিয়া পটির মুসলমান দোকানদারেরা সোনায় গিল্টি করিয়া কেমিকেলের গহনা বলিয়া বিক্রি করিয়া থাকেন। মেলা বা আড়ঙ্গে গরীব শ্রেণীর মেয়েরা কেমিকেলের গহনা কিনিয়া সোনা পরার সখ অনেকটা মিটাইয়া থাকেন, সুতরাং এ শিল্পটি বাংলা হইতে উঠিয়া যাইবার নয়, অধিকন্তু বিলাতী আমদানী নানা প্রকার চুড়ীর প্রচলন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই পিতলের গহনাগুলির ব্যবহার হওয়াই দরকার।

শালপাতা জোড়া ও কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী করিয়া অনেক স্থলে মেয়েরা সামান্য কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এই রকম ছোট বড় অনেক শিল্পকার্য্য বাঙ্গলার মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া পরিবারে অর্থাগমের সহায়তা করিতেছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় ভদ্র ঘরের মেয়েরা হাতে কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লজ্জা বোধ করেন। আজ কাল মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরের মেয়েদের হাতে কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার আবশ্যকতা যে দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে ইহা সকলেই বুঝিতেছেন। আগেকার মত সচ্ছল অবস্থা আর সাধারণের নাই, আয় কমিয়াছে, ব্যয় দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, কাজেই সংসারে অর্থাভাব অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপ অর্থাভাব গোপন করিয়া ভদ্রতা রক্ষা করা আর কত কাল চলিবে ?

এ কথা সত্য যে অনেক পরিবারে মেয়েদের সংসারের কাজ করিয়াই কূল নাই, কিন্তু ইহাও সত্য যে অনেক পরিবারে মেয়েদের হাতে বিশেষ কাজ কর্ম্ম না থাকায় দিছেমিছি গড়িমিসি করিয়া দিন কাটাইতে হয়। অনেক মেয়ে দিন কাটাবার মত অনেক বৃথা কার্য্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাই লইয়া থাকেন।

জগতের সমস্ত সুসভ্য দেশেই নারীগণ শিল্পকর্ম্ম করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, উহাতে বিদেশী শিল্পের আমদানী হইতে রক্ষা পাইয়া দেশকে স্বাবলম্বী হইতে সহায়তা করে। এইরূপে নারীশিল্প দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ হয়। এই জন্য আমি দেশের মা ভগিনীদিগকে শিল্পকর্ম্মের প্রতি মন দিতে অনুরোধ করি। বর্ত্তমানে যদিও তাঁহারা অনেকেই এ বিষয়ে কিছু কিছু মন দিয়াছেন তথাপি অর্থ উপার্জ্জনের মত শিল্পে এখন বড় কেহ হাত দেন নাই।

অর্থকর শিল্প সম্বন্ধে প্রথম কথা হইতেছে—বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা। শিল্পী যে জিনিস প্রস্তুত করিবে তাহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত তাহাকেই করিতে হইলে শিল্পের পুষ্টি হইতে পারে না। উহা বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত অন্য ব্যবসায়ী লোককে করিতে হইবে। শিল্পী ব্যবসায়ীর কাছে তাহার শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিবে, ব্যবসায়ী তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া নিজেও লাভ করিবে। এই অনুসারে বাজারে বিক্রয়ের মত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে একই গঠনের বহু বহু জিনিস প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং তাহা ডজন হিসাবে বা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পরিমাণ হিসাবে পৃথক পৃথক প্যাকেট করিয়া পাইকারী বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেক জিনিসটি একই ভাবের নিখুঁত হওয়া চাই, তবেই লোকানদারের ঐ জিনিসের প্রতি আগ্রহ হইবে। নিম্ন প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যের যতক্ষণ এইরূপের বিক্রয়ের বন্দোবস্ত না করা যাইবে, ততক্ষণ সেইটি অর্থকর শিল্প মধ্যে গণ্য হইবে না, তাহা প্রস্তুত করিয়া শিল্পী কোন লাভবান হইবেন না।

আজ কাল ভদ্র ঘরের মেয়েরা সামান্য ভাবে যে সকল শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন, বিক্রয়ের বন্দোবস্ত না থাকাতে তাহার পরিপুষ্টি হইতেছে না। জিনিসের টান্ (Demand) যদি না দেখা গেল তবে শিল্পী তাহার কোন উৎকর্ষ করিতে উৎসাহ পায় না। এই জন্য মেয়েদের শিল্পদ্রব্যগুলি বাজারে বিক্রয় হইবার মত করিয়া প্রস্তুত করিতে যত্নবান হইতে হইবে।

ধান ভানা, চিড়ে কোটা, মুড়ী ভাজা—নানা রকমের ফলের চাটনী মোরব্বা তৈরী, কাসন্দি তৈরী প্রভৃতি শিল্প কর্ম্মের অন্তর্গত না হইলেও মেয়েদের অর্থোপার্জ্জনে সহায়তা করিয়া থাকে। বাংলার ফলের মোরব্বা চাটনী প্রভৃতি তৈরী করিয়া বিরাট ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু এদিকে বিশেষ ভাবে কাহারও মনযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। যাঁহারা কিছু কিছু আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারা লাভবান হইতেছেন। পূর্ব্ব বাংলায় অনেক স্থলে চমৎকার সুস্বাদু কাসন্দি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোতলে ভাল করিয়া মুখ আটিয়া এই কাজটিকে বেশ ব্যবসায়ে পরিণত করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান কালে নানা প্রদর্শনী ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি দেখা যায়। আমি ঐ সকল শিল্প দ্রব্যগুলি খুবই মনযোগের সহিত দেখিয়া থাকি। ঐ সকল প্রদর্শনী ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রস্তুত যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছ থেকে আনা হয়। ঐ জিনিসের প্রায় সবগুলিই বিলাতের লোকের ব্যবহৃত জিনিসের অনুকরণ মাত্র। যেমন—টেবিল ক্লথ, ব্লাউজ-পিস্, ড্রে, ওয়েণী (ঢাকনা), হাত ব্যাগ প্রভৃতি। এ ছাড়া ঐ সকল প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা অনেক জিনিস উপস্থিত করিয়া থাকেন, সেগুলি আর্ট হিসাবে অতি চমৎকার। আর্টএর দিক দিয়া ঐ গুলিকে খুবই

প্রশংসা করা চলে কিন্তু কেবল ঘরে ব্যবহার ভিন্ন অর্থকরী শিল্পের কোন কিছু সাহায্যই তাহাতে হয় না। এ সম্বন্ধে ঐ সকল মহিলা শিল্পিদের মধ্যে অনেকেই উত্তর করেন যে শিল্পকার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা তাঁহাদের আবশ্যক নাই। কিন্তু আমার কথা এই যে—শিল্পে যদি অর্থাগমের পথ না হইল তবে সেরূপ শিল্পের আদর্শ প্রদর্শনীতে দেখাইয়া দেশের কোন উপকার হয় না।

আজকাল মেয়েদের স্কুল প্রভৃতিতে ও কয়েকটি আশ্রমে শিল্প শিক্ষা দিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে,ইহা বাস্তবিকই সুখের বিষয়,কিন্তু ঐ সকল স্কুল বা আশ্রমের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে অর্থকর শিল্পসম্বন্ধে হাতে কলমের কোন দক্ষতা না থাকায় শিল্প শিক্ষার কোন ভাল উপায় হইতেছে না। যে সকল মেয়েরা ঐ সকল শিক্ষাক্ষেত্র হইতে রীতিমত অধ্যয়ন শেষ করিয়া বাহির হইতেছেন তাহারাও বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করা ভিন্ন আর কোন কাজই করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ইহাতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ গার্হস্থ্য জীবনের নানা প্রতিকূল অবস্থা আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু শিল্প সম্বন্ধে ভাল শিক্ষা পাইলে তাঁহারা ঘরে বসিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতে পারেন,তাহাতে তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবন আরও সুবিধা জনক হইতে পারে।

নারী-শিল্পের প্রধান শত্রু হইতেছে কলকারখানা। মনে করিলে বাংলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দুঃখ হয় যে ধান ভানার জন্যও পল্লীগ্রামে বিলাতী কলের আবির্ভাব হইতেছে। ইহাতে পল্লীর মেয়েদের হাতে যে কাজটি ছিল তাহা উঠিয়া গিয়া মেয়েদিগকে অলস করিয়া তুলিবে, অধিকন্তু কলের মূল্যও চালাইবার জন্য তেল কয়লার একটা অতিরিক্ত ব্যয়ভার বাংলার আপামর প্রত্যেকের ঘাড়ে চাপিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে পল্লীর ঘরে ঘরে গম পেষা, ডাল ভাঙ্গা প্রভৃতি কাজের জন্য জাঁতার ব্যবহার ছিল, বিলাতের সর্ব্বনেশে কলের শক্তি আজ আমাদের মেয়েদের হাত হইতে সে জাঁতা জোড়াটি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে। নাড়োয়ারী মেয়েরা এখনও কলের কবলে বিশেষ পড়েন নাই,তাঁহারা প্রায় সকলেই ধনী, তথাপি ঘরের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসগুলি পারতপক্ষে তাঁহারা নিজেরাই করিয়া লন। তাঁহারা এখনও জাঁতা ছাড়েন নাই, ছেলেমেয়েদের জামাগুলি নিজেরাই হাতে সেলাই করিয়া দেন, ছ-মাসের ব্যবহারের সাবান একদিনে ঘরে তৈরী করিয়া রাখেন।

বিলাতের ইংলণ্ড স্কটলণ্ড অপেক্ষা আয়র্লণ্ড একটু গরীব দেশ, এই আয়র্লণ্ডের ঘরে ঘরে মেয়েদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য ইংলণ্ডের কলের প্রস্তুত শিল্পের আক্রমণ হইতে আয়র্লণ্ডকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিতেছে। ইংলণ্ডের শাসন প্রভাব যেমন তাঁহারা পছন্দ করেন না, ইংলণ্ডের শিল্প প্রভাবও তেমনই তাঁহাদের অসহ্য। ইংলণ্ডের মেয়েরা এক একটা বড় বড় কলে হাজারে হাজারে চাকুরী লইয়াছেন, আর আয়র্লণ্ডের মেয়েরা শান্তির সহিত ঘরে বসিয়া শিল্পকার্য্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। ইংলণ্ডের এই কলকারখানার বাহুল্যে কলের মালিকরা ধনী, আর মজুররা নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। ফলে মজুরদের দারিদ্র্যের হাহাকার আজ কলের ধনী মালিকদের উপর ধর্ম্মঘটের বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দারা ইংলণ্ডে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। তাই বলি দেশে নারীদের দ্বারা কুটির শিল্পের সৃষ্টি না করিলে দেশে ধনাগম হইবে না, ধন রক্ষা হইবে না, দেশে শান্তি রক্ষা হইবে না।

আমার মনে হয় আমাদের মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেমন শিক্ষালয় আছে, অর্থকর শিল্প শিক্ষার জন্য তেমন শিল্প শিক্ষালয় স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। শিল্প শিক্ষাই তাহার প্রধান শিক্ষনীয় বিষয় হইবে। লেখা পড়া শিক্ষা করিবার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থাও তাহার সঙ্গে থাকিবে। এইরূপ শিক্ষালয় স্থাপিত করিবার জন্য বাংলা দেশের লোকের যে নিতান্তই চেষ্টার অভাব পরিলক্ষিত হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক, কারণ যত রকম নূতন চেষ্টা দেশের কল্যাণের জন্য করা হইতেছে তাহার সমুদয় গুলিই শিক্ষিত লোকের দ্বারা হইতেছে—দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই শিক্ষিত লোক প্রায় সকলেই চাকুরি-জীবি। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য চাকুরী ব্যতীত আর কোন দিকেই তাঁহাদের মাথা প্রবেশ করে না; ইহা বাঙ্গালীর মনের দুর্ব্বলতারই পরিচয় দেয়।

দেশের এই দুর্ব্বলতার বিষয় ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, কি করিয়া দেশে ধনাগম হইবে, কি করিয়া বিদেশী আমদানীর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা যাইবে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে দেশের প্রত্যেককেই ইহার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। অর্থকর শিল্পকর্ম্ম হাতে লইয়া বাংলার নারীদিগকে এই কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে।

রাণী জয়মতী

শ্রী বিজয়কুমার ভৌমিক।

ভারতের পুরাণ ও ইতিহাস অসংখ্য সতী রমণীর কীর্ত্তি-কাহিনীতে পূর্ণ। আরও কত শত সতী যে এদেশে লোকচক্ষুর অগোচরে বিন্দু বিন্দু করিয়া জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহার ত ঠিক ঠিকানাই নাই। যাহাদের কাহিনী ইতিহাসাদিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এক একজন স্বামীর জন্য, সতীত্বের গৌরব রক্ষার জন্য যে অমানুষিক সহিষ্ণুতার সহিত নীরবে আত্মদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই একটি দেশ চিরতরে পবিত্র ও স্মরণীয় হইয়া রহিতে পারে। আমাদের রাণী জয়মতীর কাহিনী ইহার অন্যতম।

আসামের অহোম্ রাজবংশের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বংশের রাজা চক্রধ্বজ সিংহের মৃত্যু হইলে উপযুক্ত শাসকের অভাবে দেশে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। মন্ত্রী ও প্রধানগণ নিজেদের খেয়ালমত যে কোনও রাজপুত্রকে দু'চারি দিনের জন্য রাজা করিয়া তাহাদের জীবন লইয়া খেলা করিতে থাকেন। এইরূপে কয়েকজন দুর্ভাগ্য রাজপুত্রের হত্যাসাধনের পর তাঁহারা 'চুলিক্ফা' নামক রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসান। চুলিক্ফা তখনও একরূপ বালকমাত্র। তাঁহার বয়সে তৎপূর্ব্বে কেহ আসামের সিংহাসনে বসেন নাই বলিয়া আসামবাসিগণ তাঁহাকে 'লরা-রাজা' (শিশু-রাজা) বলিত।

'চুলিক্ফা' অল্প বয়স্ক হইলেও পূর্ব্ব রাজপুত্রগণের ভীষণ পরিণামের অভিজ্ঞতায় নিজের অবস্থা বেশ বুঝিতে-ছিলেন। তিনি আত্মরক্ষার জন্য চিন্তিত হইলেন। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যদি কোনও রকমে আসামের রাজপুত্রগণকে অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে অন্য রাজপুত্রের অভাবে প্রধানগণ নিশ্চয় তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে বাধ্য হইবেন। তাই আত্মরক্ষা ও ধনসম্পদের লোভে তিনি মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিলেন; একদল গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়া একে একে অহোম্ বংশের সমস্ত রাজপুত্রকে নিহত করাইলেন। মন্ত্রী ও প্রধানগণ তখন পরস্পরের মধ্যে বিবাদে নিযুক্ত। কেহই তাঁহার এই নৃশংস কার্য্যে বাধা দিল না—তিনি নির্ব্বিঘ্নে রক্তপ্রবাহে নিজের পথ মুক্ত করিতে নিযুক্ত রহিলেন।

অহোম্ বংশে রাজপুত্র আর কেহ রহিল না; লরা-রাজা নিজেকে বিপন্মুক্ত মনে করিতে লাগিলেন। এমন সময় অনেক গুপ্তচর সংবাদ দিল—আসাম রাজা রাজপুত্র-শূন্য হয় নাই; তখনও তুঙ্খঙ্গীয় বংশের রাজপুত্র গদাপাণি জীবিত আছেন। লরা-রাজার সংশয়-খিন্ন মন অতিমাত্র বিচলিত হইল। তিনি গদাপাণিকে হত্যা করিবার জন্য গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিলেন।

গদাপাণি উদার-হৃদয় ও অপরিসীম সাহসী বীর ছিলেন। কিন্তু তিনি নামে মাত্রে রাজপুত্র ছিলেন। এক সুন্দর উপত্যকায় ক্ষুদ্র এক পর্ণকুটীরে তিনি বাস করিতেন। রাজার ঐশ্বর্য্য বা রাজক্ষমতা তাঁহার কিছুই ছিল না। তবে তিনি এক যথার্থই মহীয়সী রাণীর স্বামী হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সেই দেবীর নাম রাণী জয়মতী। এই লক্ষ্মীস্বরূপিনী স্ত্রী ও দুইটি শিশুপুত্র লইয়া রাজপুত্র গদাপাণি দারিদ্র্যের মধ্যেও রাজারও কাম্য স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছিলেন।

গদাপাণি লরা-রাজার ষড়যন্ত্রের কথা সমস্তই জানিতে পারিলেন; কিন্তু তিনি ভীত হইলেন না। একদিন প্রেয়সী পত্নী জয়মতীকে তিনি কহিলেন, "জয়মতি, আমাদের পর্ণকুটীরের এই রাজ্যেও রাজার শ্যেনদৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি আমাদের জন্য গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বভয়হারী ভগবান আছেন, তিনি আমাদের রক্ষা করিবেন।" শুনিয়া জয়মতীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। অহোম্ রাজপুত্রগণের হত্যাকাহিনী তিনি জানিতেন, তাঁহাদের মাতা ভগ্নীর ক্রন্দনরোল তাঁহার কাণে পৌঁছিয়াছিল। তিনি ভীতিব্যাকুল মনে স্বামীকে

বলিলেন, "ভগবান আছেন সত্য, তিনি আমাদের নিশ্চয় রক্ষা করিবেন। কিন্তু আমাদেরও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। আমাদের জন্য ভাবিও না, আমাদের জীবনের প্রতি রাজার লক্ষ্য নাই। তুমি কোনও নিরাপদ স্থানে প্রস্থান কর। তুমি এখানে উপস্থিত থাকিলে আমি কখনও সুস্থির থাকিতে পারিব না।"

বীর গদাপাণি পত্নীর এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইতে চাহিলেন না। জয়মতীও নিতান্ত কাতর হইয়া প্রতিদিন বারবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অহোম্ রাজপুত্রগণের ভয়াবহ স্মৃতি কিছুতেই তাঁহাকে ধৈর্য্য ধরিতে দিতেছিল না। অবশেষে সাধ্বী পত্নীর কাতরতায় বাধ্য হইয়া তিনি সম্মতি দিলেন এবং একদিন পুত্রদ্বয়ের মুখচুম্বন করিয়া, জয়মতীকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার অশ্রুতে নিজের অশ্রু মিশাইয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল জয়মতী একদৃষ্টে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন আর দেখা গেল না, তখন স্বামীকে রক্ষা করার জন্য একমনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, নিজের কথা একবারও তাঁহার মনে উদয় হইল না। গদাপাণি নাগাপর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন এবং শীঘ্রই নিরাপদে সেখানে পৌঁছিয়া আশ্রয় পাইলেন।

গদাপাণির পলায়নের কথা লরা-রাজার কাণে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না; তিনি ক্রোধে ভয়ে পাগল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার লোকেরা যাইয়া জয়মতীর নিকট গদাপাণির সংবাদ জানিতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। তিনি ক্রোধে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া আদেশ করিলেন, "গদাপাণির স্ত্রী জয়মতীকে ধরিয়া আন, তাহার নিকট হইতে যে কোনও উপায়ে গদাপাণির সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে।"

রাজার আদেশে অনুচরেরা বলপূর্ব্বক সাধ্বী জয়মতীকে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন—জীবন যায় তাহাও স্বীকার, তবু কিছুতেই স্বামীর সংবাদ দিবেন না। তাই যখন নৃশংস লরা-রাজা তাঁহাকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া গদাপাণির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সতীত্বের তেজে তেজস্বিনী জয়মতী উত্তর করিলেন, "মূর্খ, সতী-নারীর কি নিজ জীবনের প্রতি কোনও মায়া আছে? স্বামীর জন্য প্রাণত্যাগ করা ত তাহার পক্ষে সুখকর। আমি কিছুতেই আমার স্বামীর সংবাদ বলিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, যাহা সাধ্য থাকে, করিতে পার।" লরা-রাজার ক্রোধের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল; তিনি ভীষণ মুখভঙ্গী করিয়া অনুচরগণকে আদেশ করিলেন, "ইহাকে রাজবাটী হইতে বাহিরে লইয়া যাও; যতক্ষণ না গদাপাণির সংবাদ বাহির করিতে পার, প্রকাশ্য স্থলে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া বেত্রাঘাত করিতে থাক।"

নৃশংস রাজার অমানুষ অনুচরেরা রাজার আদেশ পালন করিল। তাহারা এক একবারে কিছু সময় বেত্রাঘাত করিয়া পর গদাপাণির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। জয়মতী নীরব; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি ভগবানের নিকট স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এত যে অসহনীয় অবমাননা ও অত্যাচার, এত যে ভীষণ যন্ত্রণা, রক্তধারায় পৃথিবী সিক্ত হইতেছে, তবু রাণী জয়মতী স্বামীর মঙ্গলকামনা ভুলিলেন না। অবশেষে তিনি মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িলে সে দিনের মত বেত্রাঘাত বন্ধ হইল।

দিনের পর দিন এইরূপ চলিতে লাগিল। জয়মতীর ন্যায় মহীয়সী নারীর প্রতি এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অমানুষিক অত্যাচারের কথা সমগ্র আসামে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সকলে হায়! হায়! করিতে লাগিল। ক্রমে এ সংবাদ গদাপাণির কাণেও পৌঁছিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; নাগাপর্ব্বত হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন এবং পাগলের ছদ্মবেশে একেবারে জয়মতীর প্রতি বেত্রাঘাতের স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় সত্যই পাগল হইয়া উঠিল। তিনি অদূরে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কাতর স্বরে গাহিতে লাগিলেন, "ওগো দেবী, যা'র স্নেহে আজ তোমার এ দশা, সে যে আর সহ্য করিতে পারে না। বল, বল, তুমি তা'র কথা বল; তোমার এ অসহ্য যন্ত্রণার অবসান হউক। তোমার এ দশা যে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। বল, বল, তুমি বল।"

রাজানুচরেরা দেখিল একটি পাগল বৃক্ষতলে দাড়াইয়া কাঁদিতেছে এবং কি গাহিতেছে; তাহারা গ্রাহ্য করিল না। জয়মতীর কাণেও সে গান পৌছিল না; তিনি তখন ধ্যানমগ্না, এ জ্বালাময় জগতের বহু উর্দ্ধে। সে দিনের মত বেত্রাঘাত বন্ধ হইলে পাগলও কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতেই আবার গদাপাণি সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রহরীরা প্রহারজর্জ্জরিতা মৃতকল্পা জয়মতীকে আনিয়া নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষে বাঁধিল। কাতর গদাপাণি পূর্ব্ববৎ গাহিতে লাগিলেন। আকুল আবেগে ভরা সেই স্বর এবার জয়মতীর কাণে পৌছিল। তিনি চমকাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। রাজ-অনুচরেরা এমন সময়ে তাঁহার নিকট গদাপাণির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল; তাহা তাঁহার কর্ণেও প্রবেশ করিল না। স্বামীকে ভয়ানক বিপদের মুখে উপস্থিত দেখিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন; এত অত্যাচারেও যে হৃদয় বিচলিত হয় নাই, স্বামীর জীবনাশঙ্কায় তাহা বিচলিত হইল। তিনি কাতর অনুনয়ের সহিত গাহিয়া উঠিলেন, "ওগো, দূরে যাও, দূরে যাও। কি এ জ্বালা! কি এ দুঃখ! এ যে সুখ! এ যে শান্তি! স্বামীর জন্য সতীকে শান্তিতে প্রাণ দিতে দাও। আমি চাই না, আর কিছু চাই না। তুমি দূরে যাও, দূরে রহ। আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও। পতির জন্য সতী মরিবে, এ আর বেশী কথা কি? আমার সে সাধে বাদ সাধিও না। ওগো দূরে যাও, দূরে যাও।"

রাজানুচরেরা মনে করিল, প্রহারের যন্ত্রণায় জয়মতী পাগল হইয়া গিয়াছেন, তাই গান গাহিয়া তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কিন্তু গান যাঁহার উদ্দেশ্যে, তিনি সমস্ত বুঝিলেন। প্রেমময়ী সতীর কাতর অনুনয় উপেক্ষা করিবার সাধ তাঁহার হইল না; পতির জন্য প্রাণ দিবার সাধে বাদ সাধিতে পারিলেন না। তিনি পাগল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন; তাঁহার কাণে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল সেই করুণ আবেগভরা অনুনয়, "ওগো দূরে যাও, দূরে যাও।"

জয়মতীর প্রতি অত্যাচার চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে আর কোনও কথা বাহির হইল না। বেত্রাঘাতে শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; রক্তধারায় রাজ-বাটীর সম্মুখভাগ কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল। মানুষের শরীরে আর কত সয়! অবশেষে ষোল দিনের দিন দুর্ব্বল শরীরের উপর বেত্রাঘাত করিতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল; তিনি ভারতের সতীত্বের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য দেখাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সমগ্র আসাম হায়! হায়! করিয়া উঠিল। আবালবৃদ্ধবনিতার চক্ষে অশ্রু বহিতে লাগিল এবং মুখে 'ধন্য ধন্য' রব উঠিতে লাগিল।

সতীর প্রতি অত্যাচার ভগবান্ সহ্য করিলেন না। শীঘ্রই নরা-রাজার রাজ্য,প্রাণ সব গেল। গদাপাণি সিংহাসন পাইলেন। গদাপাণির পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাতার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে রাজপুরীর সম্মুখে যে স্থলে তাঁহার অপূর্ব্ব সতীলীলার অবসান হইয়াছিল, সেই স্থলে একটী বৃহৎ সরোবর ও একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া যথাক্রমে তাহার 'জয়সাগর' ও 'জয়দোল' নাম রাখেন। এই জয়সাগর ও জয়দোল আজিও রাণী জয়মতীর পুণ্যস্মৃতি বুকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

খেয়ার শেষে

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(৫)

নীরা কলিকাতায় মাসির কাছে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পিতা মারা যাইতে না যাইতেই এত অকৃত্রিম সুহৃদের দলে তাহাকে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল, যাহাতে সে সেস্থান হইয়া পলাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। এত সুহৃদ যে তাহার ছিল তাহা পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে সে জানিতে পারে নাই।

সে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল আরও লোকের তোষামোদ করিবার বিদ্যা দেখিয়া। তাহার রূপ আছে বটে, কিন্তু এমন রূপ আরও ঢের মেয়ের আছে। লেখাপড়া সে যাহা শিখিয়াছে এর চেয়ে ঢের বেশী অনেক মেয়ে শিখিয়াছে, কেবল তাহার যে অনেক অর্থ আছে ইহারই কারণে লোকে তাহাকে এত তোষামোদ করিতেছে। ইহাদের এই তোষামোদের ঢৌক দেখিয়া অনেক সময় সে হাসি সামলাইতে পারে নাই, আবার অনেক সময় ক্রুদ্ধও হইয়া উঠিত।

এখানে সে সব আপদ নাই। তোষামোদের অজস্রধারা আসিয়া তাহাকে সিক্ত করিয়া যাইতে পারে না। মাসিমার অনাবিল স্নেহ তাহার তাপদগ্ধ হৃদয়ে বড় সান্ত্বনা ঢালিয়া দিয়াছে। কিছুদিন আগে মনুষ্যজাতি মাত্রকেই স্বার্থপর বলিয়া তাহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, মাসীমার নিঃস্বার্থ স্নেহ তাহার সে ঘৃণাভাব কতকটা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে।

প্রথমটা অমিয়কে দেখিবামাত্র তাহার মনটা একেবারে বিদ্রোহী উঠিল। সে ভাবিয়াছিল নিঃসন্তান মাসীমার কাছে থাকিলে কেহ কোন দিক হইতে তাহাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না। বড় জ্বালাতন হইয়া এখন সে এমনি একটা নির্জ্জন স্থানই অন্বেষণ করিতেছিল, যেখানে ছদ্মতার আবরণ তাহাকে দিতে হইবে না, বেশ সহজ ভাবে হাসিয়া খেলিয়া দিনগুলি সে কাটাইয়া দিতে পারিবে। এখন দেখিল তাহার সে দিন আসে নাই, তাহাকে আবরণের মধ্যেই থাকিতে হইবে। কোনও দিক মুক্ত করিয়া দিলে এখানেও কেহ না কেহ তাহার নিকটে আসিবার সুযোগ পাইয়া বসিবে। সংসারের এই পুরুষজাতিটাকে সে কোনক্রমে এ সুযোগ দিবে না—এই তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

মাসিমার কাছে সে যখন নিজেকে উন্মুক্ত করিয়া দিতে, মনটাকে পাতলা করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছিল, অমিয়কে দেখিবামাত্র সে চেষ্টা বিসর্জ্জন দিয়া সে আবার পূর্ব্বের মতই গম্ভীর হইয়া উঠিল। অমিয়ের সম্বন্ধে সে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইল—অমিয় সাংসার ছাড়া নয়। সংসারের জীব এই মানুষগুলির হৃদয় যেমন ক্লেদ পূরিত, তাহারও তেমনি।

মানুষগুলি যে কেন এরূপ স্বার্থপর হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

কতকগুলি ডাকের সাজ তাহার সর্ব্বাঙ্গে, এ সাজগুলি খুলিয়া ফেলিতে পারিলে সে যে বাঁচে। পিতার মৃত্যুর আগে এ সাজ এত ভারি বলিয়া ঠেকে নাই, সে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়াছে, পিতার মৃত্যুর পর লোকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া নিজের সাজের প্রতি সে চাহিয়াছে।

এ ভগবানদত্ত সাজ, তিনি খুলিয়া নিন, তাহাকে মুক্তি দিন, নীরার আন্তরিক কামনা তাহাই। এ ডাকের সাজ তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সে কিছুতেই সাধারণের সহিত মিশিতে পাইতেছে না।

সেদিন সে চুপ করিয়া বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া সামনের

বাড়ীটার প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে যে লম্বা একটু ফুলের বাগান ছিল, তাহার পানে চাহিয়াছিল। দুপুরের প্রখর রৌদ্রতেজ ফুটা ফুলগুলিকে ঝলসাইয়া তুলিতেছিল। কুন্দফুলের গাছটী আপাদোড়া ফুলে ভরা, উঠিল দুপুরের মাতাল পবন স্পর্শে গাছটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, ঝর ঝর করিয়া রৌদ্রতপ্ত মলিন ফুলগুলি তলা বিছাইয়া পড়িতেছিল।

বাড়ীতে যে দাসীটি ছিল, সে এখন বাড়ী চলিয়া গেছে, কুমুদিনী নিচের দরজা বন্ধ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে আপনা আপনি বলিতেছিলেন "বাপ রে বাপ, কি অসহ্য গরমই না পড়েছে? চারিদিক রোদের তেজে ঝলসে যাচ্ছে। এই যে আষাঢ় মাসের শেষাশেষি হয়ে এলো, একটী দিন যদি আকাশে মেঘ করে থাকে। এবার যে কি কাণ্ডটা হবে তা আর বলতে পারি নে।"

কক্ষমধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াই তিনি নীরার পানে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "এ কি নীরা, তুমি শোওনি এখনও?"

নীরা সচকিতে মুখ ফিরাইল, একটু হাসিয়া বলিল "আমি তো দিনের বেলা শুই নে মাসিমা।"

কুমুদিনী ঠাণ্ডা মেঝের একটা মাদুর বিছাইয়া একটা বালিস লইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলেন "তা এক রকম ভাল বটে। দিনের বেলা ঘুমোনোর মত বালাই দুনিয়ায় আর নেই। আমার যে কি বদ অভ্যেস মা, ভাতটী খেলে আর একটু বসতে পারি নে, খানিকটে না ঘুমোলে কি যে করে শরীরের মধ্যে তা আর কি বলব। তোমার মেসোমশাই প্রথম যখন দারোগা ছিলেন, নিজের কাজের জন্য ওঁকে প্রায়ই বাইরে থাকতে হতো, আমার কি কাজ ছিল আজও সেটা ধরতে পারো।"

নীরা নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া বসিয়া বলিল "ঘুম—নয় কি?"

কুমুদিনী মাথাটা কাত করিয়া বলিলেন "তা বই আর কি। সারাদিনটা আমার প্রায় ঘুমিয়ে কাটতো। ঠাকুর চাকর কোথায় থাকে কি করে, তার কিছু হিসেব রাখতুম না। এই রকমে থাকতে থাকতে আমাদের বাসায় একটা চুরি হয়ে গেল, সেই হতে আর তেমন করে ঘুমুই নে।"

নীরা হাসিতে লাগিল, তাহার পর বলিল "ওখানে অমন করে শুলে কেন মাসিমা, বিছানাটায় শোও না।"

কুমুদিনী শিহরিয়া বলিলেন "বাবাঃ, এই গরমে কখনও বিছানায় শুতে পারা যায়? তুমি তোমার মাসিমার এই সব আজগুবি কাণ্ড দেখে নিশ্চয়ই মনে মনে হাস মা, আমি তা বেশ বুঝতে পারি; বুঝেশুনেই বা কি করব মা, বদ অভ্যেসগুলো কিছুতেই ছাড়তে পারি নে। তোমার মেসোমশাই বড় কম কাণ্ড করেন নি এ সব অভ্যেস ছাড়াতে, কিন্তু ছোটবেলাকার অভ্যেস, এ কি সহজে যায় মা?"

নীরা জিজ্ঞাসা করিল "কেউ এলে কি কর মাসিমা?"

কুমুদিনী হাসিয়া বলিলেন "তা মা, কেউ আমায় ঠকাতে পারে না। গোল আলু যেমন সব তাইতে চলে, আমিও তেমনি সব তাইতেই আছি। বুঝেছি, তোমার ভয় হচ্ছে তোমার বন্ধুবান্ধব এলে তোমার এই অসভ্য মাসিমাটীকে দেখে তারা কি বলবে।"

নীরা প্রবলবেগে মাথা নাড়িল "সত্যি তা নয় মাসিমা, আমি সে ভাবনা মোটেই করি নে।"

কুমুদিনী একটা হাই তুলিয়া আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিলেন "তোমার কাকা, কাকিমা, এঁদের কখনও দেখেছ তুমি?"

নীরা বলিল "কাকা মাঝে মাঝে ওখানে যেতেন, তাঁকে দেখেছি, কিন্তু কাকিমা বা তাঁর ছেলে মেয়ে কাউকেই দেখিনি। তুমি তো জানতেই মাসিমা, বাবা কি রকম প্রকৃতির লোক ছিলেন। এত জায়গা ছিল যাবার মত, এত বন্ধু তাঁর ছিল যাঁরা একবার বাবাকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যেতেন; কিন্তু বাবা কিছুতেই সেই জায়গাটী ছেড়ে যেতে চাইতেন না, আমাকেও কোথাও যেতে দিতেন না।"

কুমুদিনী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সে আমি বেশ জানি। তোমার মা মারা যাওয়ার পরেই আমরা তাঁকে একবার এখানে আসার জন্যে কখানা চিঠি লিখেছিলুম, তিনি একটী উত্তর দিয়ে আমাদের একেবারে চুপ করিয়ে দিলেন।"

উৎসুক হইয়া নীরা বলিল "কি লিখেছিলেন তিনি?"

কুমুদিনী বলিলেন "তিনি লিখেছিলেন, আমায় তোমরা মাপ করো, কারণ আমি এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। এখানে নীরার মাকে আমি শুইয়ে রেখেছি; তাকে অনন্তের পথে পাঠিয়ে আমি প্রতীক্ষায় আছি, কবে তার কাছে যেতে পারব। এই সেই মহাপুণ্য স্থান, সতীক্ষেত্র; আমি একটী দিনের জন্যে এ জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারব না। মরব যখন, আমার মেয়েটীকে তোমরা দেখো।"

নীরার বক্ষভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল "তাই বটে। আমার বাবা মাকে যত ভালোবাসতেন, তত আর কেউ স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবে না। আজ মাত্র তিন বছর মা মারা গেছেন, এই তিন বছরের প্রত্যেক দিনটী বাবা কে কি ভাবে কাটিয়েছেন তা আমি জানি। এই ব্যারাকটার পড়ে প্রতিমুহূর্ত্তে কেন অপেক্ষা করতেন; কেবলই বলতেন 'ওই বুঝি সে এসেছে, দেখ নীরা।' আমি প্রথম প্রথম বুঝতে পারতুম না তিনি কি বলছেন, শেষে বুঝতে পারলুম তিনি আমার মায়ের কথা বলছেন। মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁর মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, আনন্দপূর্ণ স্বরে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন "এসেছে রে, সে আমায় নিয়ে যেতে এসেছে।

নীরার কালো চোখের পাতাগুলি জলে ভিজিয়া চকচক করিয়া উঠিল, সজোরে আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল "মার বোধ হয় মরার পরেও শান্তি হয়নি, বাবাকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন।"

কুমুদিনী তাহার মুখের পানে চাহিয়া সে প্রসঙ্গটা
দেওয়া যায় তাহাই ভাবিতে ছিলেন, বলিলেন
তা ছিলেন তাতে মনে হয় যে
কাকার সঙ্গে তোমার
দেখা হয়েছে?"

নীরা ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিয়া বলিল "না।"

কুমুদিনী একটু থামিয়া বলিলেন "আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি, তোমার বাবা তোমার কাকাকে বিষয়ে ট্রাষ্টি করে রেখে গেছেন, এমন কি তোমার বিয়ে দেবার ভার পর্য্যন্ত তাঁর পরে, তবু মরণের আগে এখানে টেলিগ্রাফ করলেন, তাইকে টেলিগ্রাফ করলেন না কেন?"

নীরা বলিল "এর মানে আছে। আমার বাবার সঙ্গে কাকার বরাবর কিছু সদ্ভীতি ছিল না। কাকা বিলাত হতে আসার পরে কে জানে কেন বাবার ভারি ভক্ত হয়ে পড়েন, তারই ফলে এই উইল খানা তৈয়ারী হয়েছে। আমি পরে শুনেছি বাবাকে কাকা এই বলে বুঝিয়েছেন আমি বুঝতে না পেরে, হয় তো বোধতঃ বিচার না করেই কাউকে বিয়ে করে বসতে পারি, শেষে হয় তো আমায় সব হারিয়ে পথের ভিখারিণী হতে হবে। এই জন্যে কাকার মত না নিয়ে বিয়ে করলে আমি সম্পত্তি পাব না এই রকম লেখা হয়েছে। এটা কাকার উদ্দেশ্য বাই হোক, আমি তাতে একটা কথাও বলিনি। বাবা কাকা মিলে যা ভাল বিবেচনা করলেন তাই হলো। বাবার মৃত্যুর কিছুদিন আগে হতে এই উইল নিয়েই কাকার সঙ্গে মন কষাকষি আরম্ভ হয়, তার পরে বাবার উইল বদলাবার ইচ্ছা হয়, তাতে তিনি বলেছিলেন মেসোমশাইকে ট্রাষ্টি করে যাবেন; কিন্তু মৃত্যু এসে পড়ায় তার কিছুই হল না মাসিমা, বাবার আগেকার উইলই থেকে গেল। এই উদ্দেশ্য নিয়েই মেসোমশাইকে টেলিগ্রাফ করা হয়, তাই কাকাকে তখন জানানো হয়নি, কিন্তু মেসোমশাই যখন গেলেন তখন বাবার শেষ হয়ে গেছে।

কথা শেষ করিয়া নীরা কুমুদিনীর পানে চাহিল। তখন তাঁহার চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল, খুব কষ্টে আপনাকে কতকটা চেতাইয়া রাখিয়া তিনি নীরার কথা শুনিতে ছিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া নীরা ব্যস্তভাবে বলিল "তুমি ঘুমোও মাসিমা, বড্ড ঘুম আসছে তোমার দেখছি।"

কুমুদিনী হাতের পাখাখানা শ্রান্তভাবে পাশে ফেলিয়া বলিলেন "তা তুমি ততক্ষণ না হয় একখানা বই নিয়ে পড়ো গিয়ে মা। এ সব ঘরে একখানি বই নেই, নিচে অমলের ঘরে অনেক বই আছে। সে তো এখন কলেজে গেছে, বাওনা, মা, দু-খানা বই নিয়ে এসো গিয়ে, তার পর বিকেলে সে বাড়ী এলে আমি তাকে বলব এখন খানকতক বই তোমায় এনে দিতে। আর তাকে দেখে তোমার লজ্জা করবার কোন কারণ নেই। সে এখন

আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে গাছে। তোমার যখন যা দরকার হবে, তার কাছে বলবামাত্র সে এনে দেবে। ছেলেটী বড় ভাল, চোখ তুলে কারও পানে তাকায় না।

বাস্তবিক নীরার প্রাণটাও বইয়ের জন্ত বড় ছটফট করিতেছিল। মাসিমা সাংসারিক খুঁটিনাটি কাজ ও খুব লইয়াই মহাব্যস্ত, লেখাপড়ার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। এ সব গৃহের মধ্যে খানকতক সংবাদপত্র মাত্র ছিল; নীরা সেইগুলি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছে। বই বিহনে বাস্তবিক সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল।

মাসিমার আদেশ পাইবা মাত্র এবং উপস্থিত এখনই অমিয়ের ফিরিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া সে নিচে নামিয়া আসিল। অমিয়ের গৃহের দরজায় শিকল খুলিয়া সে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ছোট গৃহখানি বেশ সাজানো। একপাশে একটী স্প্রীংয়ের খাটে অমিয়ের পরিষ্কার বিছানাটী; আর এক পাশে একটী ছোট গোলাকার টেবিল, তাহার পাশে খান তিনেক চেয়ার স্থাপিত। টেবিলের উপর খানকতক বই, খাতা, দোয়াতদানীতে দোয়াত কলম প্রভৃতি বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত সাজান। টেবলের পার্শ্বেই বইরাখা একটী কাঁচের আলমারী, সেটা চাবিবন্ধ ছিল না।

আলমারির দরজা খুলিয়া ফেলিয়া সে বইগুলি দেখিতে লাগিল, এতগুলি বইয়ের মধ্যে সে যে কোনখানা নির্ব্বাচন করিয়া লইবে তাহাই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

বই বাছিতেই তাহার আধ ঘণ্টা সময় লাগিয়া গিয়াছিল, সে তাহা মোটে জানিতেই পারে নাই। অবশেষে সে খান দুই তিন বই নির্ব্বাচিত করিয়া অন্ত বইগুলি তন্দ্রতার অনুরোধে নিপুণহস্তে গুছাইয়া দিয়া আলমারি বন্ধ করিয়া দিল। অন্যমনস্ক ভাবে বইগুলি হাতে লইয়া সে এইবার গৃহ হইতে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিয়া ফিরিতেই দরজার উপর দণ্ডায়মান অমিয়কে দেখিতে পাইল।

এই বিস্ময়জনক কাণ্ডটা দেখিয়া বাস্তবিকই অমিয় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

স্তম্ভিত ভাবে গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া নীরা, চুরির মাল বই দুখানা তখনও তাহার হাতে। পরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়া বেমালুম ধরা পড়িয়া চোর যতদূর সশঙ্কিত ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠে, সে তাহার চেয়ে বড় কম হয় নাই। মুখখানা তার সিঁদুরের মতই রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। পলাইবার পথ সেই একটী ব্যতীত আর নাই সে বই দুখানা সেখানে ফেলিয়া কোনও মতে পলাইয়া সে বাঁচিয়া যাইবে।

মুহূর্ত্তে অমিয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে কুণ্ঠিত ভাবে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। নীরা তাহার পদশব্দ পাইয়া চোখ তুলিয়া দেখিল সে চলিয়া গিয়াছে; তখন সে হাতের বই দুখানার পানে একবার চাহিল। এ দুখানা লইয়া যাইবে না ফেলিয়া দিয়া যাইবে? কিন্তু ফেলিয়া গেলে ক্ষতি তাহারই, ধরা যখন পড়িয়াছে তখন লইয়া যাইতে আপত্তি কি?

বই লইয়া সত্বর পদে সে চলিয়া যাইতে গিয়া এক পলকের দৃষ্টিপাতে দেখিল অমিয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে থামের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; এ লজ্জা যেন তাহারই, তাই সে আপনাকে গোপন করিতে চায়।

দুপ দাপ করিয়া অস্থির চরণে উপরে গিয়া নিজের গৃহে পৌঁছাইয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া একখানা বই লইয়া তাহার পাতাগুলি অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে উল্টাইতে লাগিল, আর নিজের অদ্ভুত ব্যবহারের ফল ভাবিতে লাগিল।

নিজের ব্যবহারে নিজেই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল বড় কম নয়। সে এমন ভাব দেখাইয়া আসিয়াছে যেন সে চিরটা কাল গুণ্ডার আড়ালে কাটাইয়া আসিয়াছে; যেন সে কাহারও চোখের সম্মুখে প্রকাশ্য ভাবে আজ ও পড়ে নাই। তাহার এত সঙ্কোচের কারণ কি? এ জগতে কাহাকেও তো সে এত লজ্জা করিয়া চলে না, কাহারও সম্মুখ হইতে নিজেকে লুকাইয়া রাখিবার জন্ত এত আয়াসও তাহাকে সহ্য করিতে হয় না; আজ অমিয়কে দেখিয়া এতটা লজ্জা সে কেন করিল?

ইহার কারণ যতই সে বুঝিতে পারিতেছিল না ততই নিজের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। অমিয় জানে সে শিক্ষিতা, এত লজ্জা প্রকাশ করা যে তাহার

পক্ষে নিতান্ত অপ্রোজনীয়, তাহা সে নিশ্চয়ই ভাবিবে।

নীরা নিজেকে এত লজ্জিতা করিয়া ফেলিল যাহাতে তাহার মুখ দেখাইতে লজ্জাবোধ করিতেছিল।

দুয়ের ধারে উঁকি দিয়া কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "বই পেয়েছ নীরা?"

নীরা নির্বিষ্ট ভাবে বইয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল "হ্যাঁ পেয়েছি। তোমার যে আজ পাঁচটার অনেক আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেল মাসিমা।"

কুমুদিনী একটু হাসিয়া বলিলেন "সত্যি। এই তো মোটে দু ঘণ্টা ঘুমোতে পেরেছি। ঠাকুরটা বড় চেঁচামেচি করতে আরম্ভ করেছে, সকাল সকাল সে কাজকর্ম সেরে—রাসলীলা না কি হচ্ছে তাদের তাই দেখতে যাবে। কাজেই বাধ্য হয়ে উঠতে হল আমাকে।"

মুখ হাত ধুইবার জন্য তিনি কলতলায় চলিয়া গেলেন।

(৬)

পরেশবাবু পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হল ব্যাপারখানা?"

পরেশ বাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন "ব্যাপার যা সচরাচর হয়ে থাকে তাই হয়েছে; তার চেয়ে একটু বেশীও হয়নি, কমও হয়নি।"

কুমুদিনী রাগত ভাবে বলিলেন "তোমার ও ধরণের কথাগুলো বস্তে ভরে রেখে দাও গিয়ে। বেশ জানো আমি ও রকম হেঁয়ালি ভরা কথা শুনতে মোটে ভাল বাসি নে। যা ইচ্ছে সোজা বলে যাও, ফুরিয়ে গেল লেঠা।"

পরেশবাবু বলিলেন "সোজাই বলছি, তুমি সেটা বেঁকিয়ে নিয়ে গেলে আমি করব কি বল। মানুষ কথা বলে বেশ সোজা করে, কেউ কেউ সেটা—"

কুমুদিনী বলিয়া উঠিলেন "থাক থাক, বেশী বাজে বকো না। তোমার এই বাজে বকুনির জন্যেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসি নে।"

সত্যই তাঁহার বড় বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। মনটা তাঁহার এমন এক জায়গায় গিয়া পড়িয়াছিল সেখানে একটী সামান্য আঘাতেই উদ্ভেজিত হইয়া উঠে। এই যে মেয়েটী মাত্র এক মাসের মধ্যে তাঁহার সকল স্নেহ কুড়াইয়া লইয়া সারা বুকখানা তাহার অনিন্দ্য সুন্দর মুখ খানার দ্যুতিতে ঝলসাইয়া দিয়াছে, হৃদয় অস্থির হইয়াছিল তাহারি জন্য। একবার মনে হইতেছিল সে তাঁহার কাছে থাকিবে, আবার মনে হইতেছিল তাহাকে তাঁহার জন্মের মত হারাইতে হইবে। এ কল্পনাটা মনে আনিতেই কষ্টে দুঃখে হৃদয়খানা তাঁহার ফাটিয়া যাইতেছিল। পরের মেয়ে, পরের কাছে চলিয়া যাইবে, এই কথাটাকে তিনি মনের মধ্যে বর্তমান করাইতে চাহিতেছিলেন, এই সত্যটাকেই তিনি মনের মধ্যে সদা জাগ্রত রাখিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে সে মাসিমা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল, সেই মুহূর্তে সে সত্য যে কোথায় উধাও হইয়া যাইতেছিল তাহার ঠিক নাই।

পত্নীর তীব্র সুরের কথাটা যখন পরেশ বাবু বিশেষ করিয়া অনুভব করিলেন, তখন হাতের কাগজটা হইতে চোখ তুলিয়া তাঁহার উপর রাখিলেন। স্ত্রীর চোখ দুইটী যে জলভারে নমিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত সুরে বলিলেন "বিলক্ষণ! তোমার আজ হয়েছে কি বল দেখি?"

পত্নী উত্তর দিলেন "কি আর হবে?"

পরেশবাবু সে কথা চাপা দিবার চেষ্টায় বলিলেন "শোন তারপর, কি কাণ্ড সে সব। শ্রীনাথবাবু আমার আগেই গিয়ে বাড়ী ঘর অধিকার করে বসেছেন; আমি দেখলুম এর মধ্যেই সে বাড়ীতে ভাড়াটিয়া বসে গেছে। আমি যখন বলতে গেলুম নীরাকে এখবার বলে কাজটা করলে ভাল হতো না কি, তাতে তিনি রেগেই আগুন. স্পষ্ট আমায় বললেন, নীরার মত নিয়ে কাজ করতে তিনি বাধ্য নন। তিনি যখন বিষয়ের ট্রষ্টি হয়েছেন, তার সম্পত্তি দেখবেন শুনবেন, বাড়াবার চেষ্টা করবেন, এতে নীরার মত নেবার কিছু দরকার নেই তাঁর। আমি যে তাঁর আগেই গিয়ে নীরাকে নিয়ে এসেছি এতে ভারি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বললেন তিনি ফিরে এসেই নীরাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবেন, তার বিয়ের যোগাড় করবেন। আমাদের বাড়ীতে, আমাদের কাছে নীরাকে রাখা তাঁর মোটেই ইচ্ছে নয়।"

সন্দেহ ঠিক সত্যেই পরিণত হইল, আর এরূপ সন্দেহ সত্যেই পরিণত হয় বটে। গম্ভীর বিমর্ষ মুখে কুমুদিনী খানিক দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর যেন আপন মনেই বলিলেন "ঠিক, তাই বটে।"

পরেশবাবু পাকা চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "এটা কি তুমি আজ নতুন করে বুঝতে পারলে না কি?"

কুমুদিনী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বুঝেছি অনেক দিনই। তবু মনে একটা আশার কথা মাঝে মাঝে জেগে উঠত মাসির কাছে বোনঝি থাকলে বোনঝির অমর্য্যাদা হবে না, এখানে সে সচ্ছন্দে থাকতে পারে, কিন্তু আজ সম্পূর্ণরূপে আমার সে ভাবনা লঘু হয়ে গেল, আজ জানতে পারলুম মায়ের সম্পর্কে যারা, সত্যিই তাদের কোনও দাবী দাওয়া থাকতে পারে না—তা কেন তারা যতই না ভাল বাসুক, কিন্তু বাবার সম্পর্কীয় যারা—তারা যথার্থ স্নেহ করতে না পারলেও তাদের জোর বেশী হয়। আচ্ছা, বল দেখি তুমি, এ নিয়মটাকে উল্টানো যেতে পারে না কি?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পরেশবাবু বলিলেন "কই তা পারা যাচ্ছে, হতে পারত যদি নীরার বাপ শ্রীনাথবাবুকে ট্রাষ্টী করে না যেতেন; যদি নীরার যাবতীয় ভার তাঁর পরে না দিতেন। আমাদের বলবার মুখ কই বল দেখি? শ্রীনাথবাবু উল্টে আমাদের নামে নালিশ আনতে পারে আমরা নীরাকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ হিন্দু-ধর্ম্মে নেবার চেষ্টা করছি কারণ আমরা হিন্দু।"

কুমুদিনী বিস্ফারিত চোখে বলিলেন "হিন্দু বলে আমরা—"

বাধা দিয়া পরেশবাবু বলিলেন "আইন অনুসারে নীরা এখনও নাবালিকা, একুশ বছর হওয়ার আগে তার কোন কথাই দাঁড়াবে না; তাকে তার অভিভাবকের শাসনের তলে থাকতেই হবে, এতে কোনও কথা বলা চলবে না আমাদের।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কুমুদিনী ফিরিলেন।

নীরা চুপ করিয়া নিজের গৃহে জানালার পাশে মেজের একটা মাদুরে বসিয়া বই পড়িতেছিল; মাসিমা আসিয়া মাত্র মুখ তুলিয়া চাহিয়া তাঁহার মলিন মুখখানা দেখিয়া ব্যগ্রভাবে বইখানা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে মাসিমা, মেসোমশাই ফিরে এসে কি বললেন?"

কুমুদিনী মলিন ভাবে বলিলেন "তুমি তো মা চলেই যাচ্ছো—"

অকস্মাৎ নীরার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, সে বলিল "কোথায়?"

কুমুদিনী উত্তর দিলেন "তোমার কাকার বাড়ী।"

তবু ভাল; একটু হাসি নীরার সমস্ত মুখখানাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল—"হাঁা, কাকার বাড়ী যাচ্ছি; কে তোমায় এ কথা বললে বল দেখি? কাকার বাড়ী আমনি যাওয়া বললেই যাওয়া হয় নাকি? যাকে আমি একরকম প্রায় চিনি নে বললেই হয়, তার বাড়ী এক কথায় আমি যাচ্ছি, আশ্চর্য্য কথা তোমাদের।"

কুমুদিনী বিমর্ষ ভাবে বলিলেন "আশ্চর্য্য নয় মা, বেশ সহজ কথাই এটা। আমি যে তোমার পর, তোমার পরে আমার একটুও অধিকার নেই।"

নীরা সত্যই এবার অনুভব করিল তাঁহার কণ্ঠস্বর কিছু বেশী রকম ভার হইয়া উঠিয়াছে, সে আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার কথাগুলো ভাবিতে ছিল। মাসিমা পর এ কথা আজ যেন সে নূতন করিয়া শুনিল, জিজ্ঞাসা করিল "তুমি পর তবে আমার আপনার লোক এ জগতে কে আছে মাসিমা?"

মাসীমা রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন "আইনানুসারে তোমার কাকা তোমার আপনার লোক মা।"

"তা নয় মাসিমা, স্নেহের কাছে আইন তো চলে না। আইন বাইরের আর স্নেহ যে বুকের ভেতরের জিনিষ মাসিমা, তাকে তো কোন ক্রমেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এ কি একটা ঘা তা কথা মাসীমা, অমনি বলে গেলেই হলো? কাকা আমার কেউ নয় মাসিমা, আমি কাকার কাছে যাব না। তোমার বুকের মধ্যে আমায় লুকিয়ে রেখে দাও, আমায় বের করো না।"

সে দুই হাতে স্নেহময়ী মাসিমার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। মাসীমার দুটি চোখ নিমিষে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি সেই মুখ

খানা আবেগে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন "তাই করব মা, আমার এই বুকের মাঝখানেই তোকে লুকিয়ে রাখব, তোকে আর কারু করব না। সত্যি কথাই বলেছিস রে, স্নেহের কাছে আর সবই যে পরাভব মানে; আইনও এই স্নেহের কাছে নিশ্চয়ই মুষ্ড হয়ে যাবে। মা আমার, তুই ছাড়াই যে জগতে আমার আর আছে কে? আমায় অমন করে ডাকতে যে এ জগতে আর কেউ নেই রে—কেউ নেই!"

নীরা অনেকক্ষণ বাধে ধীরে ধীরে মুখ তুলিল, আঁচল দিয়া তাড়াতাড়ি মুখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল "আচ্ছা মাসিমা, সে যখন হবার তখন হবে, এক্ষুণি তার জন্যে এতটা ভাববার কি কারণ আছে? সেদিন যখন আসবে আমি সব ঠিক করে নেব।"

আর দুই চারটী কথা বলিবার পর কুমুদিনী নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

নীরা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। সে নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়, আঠার বৎসর তাহার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, নিজের সম্বন্ধে ভাবিবার শক্তি তাহার আছে। যদিও তাহার পিতা না হিন্দু না ব্রাহ্ম ছিলেন তথাপি সে শিক্ষা পাইয়াছে ব্রাহ্ম মেয়েদের মতই, তাহার নিজের উপর নির্ভর করিবার শক্তি তাহার যথেষ্ট আছে। সে লজ্জা সঙ্কোচ করিত না, করিবার কোনও দিন আবশ্যকও তাহার হয় নাই। এখানে নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই করিবে, সে এখানেই থাকিবে, কাকার বাড়ী কিছুতেই যাইবে না।

বাতায়ন-পথে বাহিরের পানে সে চাহিয়া দেখিল অমিয় পথের ওধারে ফুলবাগানযুক্ত বাড়ীটার গেটে দাঁড়াইয়া তাহার অনেক বন্ধুর সহিত কি কথা বলিতেছিল।

নীরা স্পষ্টরূপে আজ অমিয়কে দেখিতে পাইল, জানালার কাছে সরিয়া আসিয়া সে অমিয়ের পানে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ সে চাহিয়াছিল তাহা সে জানে না, যখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন অমিয় খানকতক বই বগলে করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; হঠাৎ সে মুখ তুলিয়া বাতায়নের পানে চাহিবামাত্র নীরাকে দেখিতে পাইল, নীরা তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল।

আজ সে নিজের উপর ভারি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল! কিসের জন্য অমিয়কে তাহার এত লজ্জা এত সঙ্কোচ? আজ এক মাসের বেশী হইয়া গিয়াছে তাহারা একই বাড়ীতে বাস করিয়াও কেন তাহারা পরস্পরের কাছে অপরিচিতই থাকিয়া গিয়াছে। হইতে পারে, অমিয়ের ইহাতে লজ্জা করিবার কথা, কারণ জীবনেও হয়তো সে কোনও অপরিচিতা যুবতীর সহিত মিশিবার অবকাশ পায় নাই, কিন্তু সে তো অনেক অপরিচিত যুবকের সহিত মিশিবার অবকাশ পাইয়াছে এবং মিশিয়াছেও, তবে আজ কেন তাহার এ সঙ্কোচ, এ লজ্জা? মাসিমা কতবার পরিচিত করাইয়া দিবার প্রস্তাব করা সত্ত্বেও সে কেন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে? ছিঃ—"

সকল সঙ্কোচ দূর করিয়া ফেলিতে, নিজেই সে আলাপ করিবার ইচ্ছায় বই দুখানা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল। সিঁড়ি দিয়া যখন সে নামিতেছিল, পরেশবাবু তখন উপরে উঠিতেছিলেন, নীরা পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল, তিনি তাহার সামনাসামনি আসিয়া বলিয়া উঠিলেন "এ জায়গাটা তোমার তত ভাল লাগছে না, না মা?"

নীরা উত্তর দিল "বেশ লাগছে মেসোমশাই, পাটনার চেয়ে এখানে আমি খুব ভাল আছি।"

মেসোমশাই একটু হাসিয়া বলিলেন "ওটা তোমার মেহাৎ মনরাখা কথা মা, মন্দ বললে পাছে আমরা কিছু মনে করি। তা মা, এবার তোমার কাকার বাড়ীতে গেলে বেশ ভালই থাকবে তুমি, এখানকার মত বন্ধতা সেখানে নেই।"

নীরা সবেগে বলিয়া উঠিল "না, আমি এখানেই থাকব মেসোমশাই, কাকার বাড়ীতে আমি কক্ষনো যাব না। কাকাকে বলে দেবেন আমি যাব না। সেখানে গেলে আমি মোটে টিঁকে থাকতে পারব না।"

পরেশবাবু বলিলেন "তা কি তোমার কাকা শুনবেন?"

নীরা বলিল "তাঁকে একবার আমার কাছে আসতে বলবেন, আমি বুঝিয়ে বলব তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন।"

সে নিচে নামিয়া গেল। রতন গৃহের দরজার সম্মুখ

দিয়া যাইতে গিয়া দেখিল রামনঠাকুর রাঁধিতেছে, কুমুদিনী নিকটে দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দিতেছেন।

তাহাকে বই হাতে করিয়া যাইতে দেখিয়া কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা যাচ্ছ মা বই নিয়ে?"

নীরা একটু হাসিয়া বলিল "বই দুখানা ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি, আর যদি খানদুয়েক বই পাই তারও চেষ্টা করব। তুমিও এসো না মাসিমা।"

অত্যন্ত উৎসাহিতা হইয়া কুমুদিনী বাহির হইলেন, বলিলেন চল মা যাচ্ছি। তোমার যখন যা বইয়ের দরকার হবে, অমিয়কে একটীবার বললে পরেই সে বই এনে দেবে। ছেলেটার ওই একটা বড্ড গুণ কিন্তু।"

মাসিমা আগে আগে চলিলেন, অমিয়ের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন সে দ্বারের দিকে পিছন করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া টেবলের উপর দুখানা পা তুলিয়া দিয়া নিবিষ্ট চিত্তে বই পড়িতেছে।

"অমিয়—"

অমিয় চমকাইয়া উঠিয়া পা দুখানা টেবিল হইতে নামাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া পিছন ফিরিল, সম্ভ্রমে উঠিয়া পড়িয়া বলিল "আসুন—"

কুমুদিনী কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার পিছনে পিছনে তরুণীটীও প্রবেশ করিল, তাহার হাতে সেই দুখানা বই।

অমিয় ভারি বিস্মিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। এই তরুণীটি যে মাসিমাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহারই সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে আসিয়াছে তাহাতে তাহার একটুও সন্দেহ ছিল না। একবার সে অলক্ষ্যে তাহার পানে চাহিল, সে মুখখানায় সঙ্কোচের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কুমুদিনী একখানা চেয়ার নীরার দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন "বস মা।" তিনি নিজেও একখানাতে বসিয়া পড়িলেন।

নীরা অমিয়ের পানে চাহিয়া বলিল "আপনিও বসুন না অমিয়বাবু, আমি এই বসছি।"

অমিয় চেয়ারখানা সরাইয়া একটু তফাতে লইয়া গিয়া হাসিমুখে বলিল "শেষকালটায় ভাল চেয়ারখানা আমাকেই দিয়ে দও দিলেন আমায়?"

নীরা বলিল "দণ্ড নয়, এ আপনার ন্যায্য সম্মান।"

অমিয় কুমুদিনীর পানে চাহিয়া বলিল "আমার ন্যায্য সম্মান কি করে হলো আপনিই বলুন মাসিমা।"

নীরা বলিল "এ কথার উত্তর মাসিমা কি দেবেন অমিয়বাবু, নিজে হতেই এটা ধারণা করে নিতে হয়। আপনার ঘর, আপনার চেয়ার—"

বাধা দিয়া অমিয় বলিল "আমার জিনিস বলে এমন সময়টাতেও যে আমাকেই ব্যবহার করতে হবে তার কিছু মানে নেই। ভারতবর্ষের নিয়ম হচ্ছে অতিথিকে ভাল জিনিষ দেওয়া। নিজের জন্যে তার চিরকালই একঘেয়ে বন্দোবস্ত করা আছে।

নূতন পরিচয়ের কুণ্ঠিত ভাবটা এমনি হাসি পরিহাসের মধ্য দিয়াই কাটিয়া গেল, উভয় পক্ষই আরাম অনুভব করিল।

নীরা বলিল "আপনার বই দুখানা সেদিন না বলে চোরের মত নিয়ে গেছলুম, আজ পড়া শেষ করে ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি, আশা করছি ক্ষমা মিলবে।"

ব্যস্ত হইয়া অমিয় বলিল "বিলক্ষণ, দোষই বা কি করেছেন তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনাই বা কেন? আপনার যখনি খুসি হবে, আমার এখান হতে বই নিয়ে যাবেন। এখানে অনেক বই রয়েছে দেখে নেবেন, আর নতুন বই যদি চান, আমায় বলবেন, আমি আমাদের কলেজের লাইব্রেরী হতে এনে দেব। আপনি এত বই পড়তে ভালবাসেন তা আমি জানতুম না।"

কুমুদিনী নীরার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "এই আজ তোমাদের আলাপ হয়ে গেল মা, নিজের ভাই মনে করে তোমার যখন যা বইয়ের দরকার হবে অমিয়কে বলে দিয়ো, সে তোমায় এনে দেবে। আমি কতদিন তোমায় এ কথা বলেছি মা, কি যে তোমার লজ্জা তা আমি জানিনে। বিয়ে হয় নি, এত লেখাপড়া শিখেছ, তবু এই লজ্জাটাকে ছাড়তে পারো না।"

নীরা মুখ ফিরাইয়া রুমালে মুখ মুছিবার ছলে হাসিটাকে চাপা দিয়া ফেলিল; তাহার পর বলিল "আজ আপনি কি বই নিয়ে আসছিলেন সামনের বাড়ী হতে, সেই বই আমায় দিন দেখি।"

অমিয় বলিল "ও সব পুরোণো বই, আপনি অনেক কাল বোধ হয় পড়েছেন। ব্রহ্ম য়েনল্ড আর ওয়ানটার স্কট আজকাল পুরোণো হয়ে পড়েছে—"

বাধা দিয়া নীরা বলিল 'তা হোক আপনি দিন না।"

অমিয় খানকতক বই আনিয়া নীরার হাতে দিল, নীরা বলিয়া উঠিল "এই যে মেরি করোলির নভেলও আছে, এখানা বুঝি লুকিয়ে রাখবার মতলব ছিল আপনার।"

থতমত খাইয়া অমিয় বলিল "সত্যি তা নয়, আমি ওখানার কথা ভুলে গেছলুম। তা নিন না আপনি সব গুলো, আমি পরে পড়ব।"

নীরা সোলজার্স ওয়াইফ খানা টেবিলে রাখিয়া বলিল "আপনি এখানা পড়ছিলেন বুঝি? আচ্ছা আজ এখানা পড়ুন, কাল আমি এ বইগুলো দিয়ে ওখানা নিয়ে যাব।"

বইগুলো লইয়া সে উঠিয়া বলিল। এসো মাসিমা—"

মাসিমা উঠিতে উঠিতে বলিলেন "আসতেও যেমন যেতেও তেমন।"

হাসিয়া নীরা বলিল "বা, তা যেতে হবে না? অমিয় বাবু, এখন লেখাপড়া করবেন, না আমাদের সঙ্গে গল্প করলেই ওঁর কলেজের পড়া তৈরী হবে?"

অমিয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিল " না না, আমার কিছু ক্ষতি হবে না।"

নীরা বলিল "আপনি বললে আমি শুনব কেন? ছাত্রজীবন কেবল পড়ার জন্যে তা তো জানেন? আপনাদের এখন গল্প নিয়ে দিন কাটালে কিছুতেই চলবে না, গল্পের জন্যে ভবিষ্যৎ জীবনটা পড়ে আছে। এসো মাসিমা।"

মাসিমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সে চলিয়া গেল।

এমন অনুপমের সৌন্দর্য্য, এমন সুন্দর কথা, এ শিক্ষিতা মেয়েতেই মানাইয়া গিয়াছে। শুধু সৌন্দর্য্য—শিক্ষাবিহীন—সে গন্ধহীন শিমুলের তুল্য।

আর একখানা মুখ তাহার মনের মধ্যে চকিতে জাগিয়া উঠিল। অনিন্দ্য রূপ তাহার—কিন্তু সে সৌন্দর্য্য তার ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, মৃকত্ব তাহার সকল সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিয়াছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে নীরার ত্যক্ত বই দুখানা তুলিয়া লইল। নীরার হাতের পরশ পাইয়া আজ এই নির্জ্জীব বই দুখানাও সরসতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এই বই দুখানি যে তাহারই, ইহা ভাবিতেও তাহার হৃদয়খানা অনির্ব্বচনীয় পুলকধারায় স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

আশীর্ব্বাণী

শ্রী শচীন্দ্রকুমার মৈত্র।

প্রথম সৃজিয়া নারী স্রষ্টা তারে বলেছিল, "ধনি
অন্তর করিনু তব অপরূপ ঐশ্বর্য্যের খনি,
আপনার উপাদানে, নন্দনের শ্রেষ্ঠ যাহা আছে
অর্পিয়া গড়িনু তোমা; সকলই তোমাতে বিরাজে,
সতীত্ব, ভকতি, প্রেম, বাৎসল্য ও রূপ অপরূপ
ঢালিয়া করেছি তোমা সাধ্যমত আপন স্বরূপ।"
লক্ষ শত শতাব্দীর বিধাতার অমোঘ সে বাণী
ধ্বনিয়া তুলুক্ আজি রমণীর অন্তঃস্থলখানি;
জননী, প্রেয়সীরূপে, অকলঙ্ক তনয়ার মত
ভক্তি দাও, প্রেম দাও, স্নেহ দাও অন্তরে সতত,
উষর হৃদয়-প্রান্ত একবার তরঙ্গিয়া যাও,
বিশুষ্ক শাখায় পুনঃ মঞ্জরিয়া কুসুম ফুটাও;
হেরুক মহিমা তব মুগ্ধনেত্রে সর্ব্ববিশ্বময়,
বিধাতার আশীর্ব্বাণী—সে কখনো মিথ্যাকথা নয়।

বাঙ্গালীর আহার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রী চুণীলাল বসু, এম্-বি, সি-আই-ই, আই-এস্-ও।

ভাইটামিন্ (Vitamines) বা "খাদ্যপ্রাণ"—

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত এই অতি প্রয়োজনীয় সার-পদার্থের অস্তিত্ব কেহই অবগত ছিলেন না। স্কর্ভি, বেরিবেরি, রিকেট্ প্রভৃতি অনেক উৎকট ব্যাধির বিষয় অনেক দিন হইতে জানা থাকিলেও, বিভিন্ন জাতীয় ভাইটামিনের অভাবই যে ইহাদিগের উৎপত্তির কারণ, তাহা চিকিৎসকগণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জানিতেন না। এক্ষণে বিস্তর গবেষণা ও পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে প্রোটীন্ প্রভৃতি অন্যান্য সার-পদার্থের সহিত আমাদের খাদ্যের মধ্যে যথোচিত পরিমাণে ভাইটামিন্ নামক পদার্থ থাকার একান্ত আবশ্যক। প্রোটীন্ প্রভৃতি অন্যান্য সার-পদার্থের প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি সত্ত্বেও খাদ্যে যদি ভাইটামিনের অভাব হয়, তাহা হইলে আমাদের শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভের ব্যাঘাত ঘটে, স্বাস্থ্যহানি হয় এবং কতকগুলি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। এজন্য খাদ্যস্থিত এই অত্যাবশ্যক সার-পদার্থ, ভাইটামিন্ (Vitamines) বা "খাদ্য-প্রাণ" নামে পরিচিত।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় ভাইটামিন্ সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা চলিতেছে। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা হইয়াছে মাত্র, সুতরাং এ স্থলে ভাইটামিন্ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে পরীক্ষা দ্বারা প্রধানতঃ তিন জাতীয় ভাইটামিনের অস্তিত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ইহারা যথাক্রমে ভাইটামিন্ "এ" (A), ভাইটামিন্ "বি" (B) এবং ভাইটামিন্ "সি" (C) নামে পরিচিত। প্রথমটীর অভাবে শারীরিক পুষ্টি ও বিকাশ নিবারিত হয় এবং রিকেট্ (Rickat) নামক শিশুরোগ ও কতিপয় নেত্র-রোগ (রাতকাণা) জন্মে। দ্বিতীয়টীর অভাবে দেহবৃদ্ধির অন্তরায় ঘটে এবং বেরি-বেরি (Beri-beri) নামক উৎকট রোগ উৎপন্ন হয়। তৃতীয় ভাইটামিনের [illegible] অভাব ঘটিলে স্কর্ভি (Scurvy) নামক দুশ্চিকিৎস্য রোগ উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতগণ এই তিন জাতীয় ভাইটামিন্‌কে বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্য হইতে পৃথক্ করিতে সমর্থ হইলেও ইহাদিগের রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে এপর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

আমাদের সকল খাদ্য দ্রব্যেই যে এই তিন জাতীয় ভাইটামিন্ অবস্থিতি করে এমত নহে। এমন অনেক খাদ্য আছে (যেমন চিনি), যাহার মধ্যে কোন জাতীয় ভাইটামিন্ মোটেই নাই। পুনশ্চ এই তিন জাতীয় ভাইটামিন্ একত্রে বা সমপরিমাণে সকল খাদ্যদ্রব্যে অবস্থিতি করে না। কোন্ কোন্ খাদ্যে কোন জাতীয় ভাইটামিন্ কত পরিমাণে থাকে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা মোটামুটী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার একটী তালিকা এখানে সন্নিবেশিত হইবে। খাদ্য নির্ব্বাচন করিবার সময়ে উহার মধ্যে ভাইটামিনের পরিমাণ কিরূপ, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখার বিশেষ প্রয়োজন। ভাইটামিন্ যে খাদ্যদ্রব্যে অধিক পরিমাণে থাকে, সেই খাদ্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

সচরাচর দুধ, মাখন, ডিম, মাছ, মাংস, ঘাতাভাঙ্গা আটা, টাট্‌কা তরিতরকারি, শাকসব্জি, কলমূল এবং অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, মটর প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ভাইটামিনের কোন না কোনটী অল্পাধিক পরিমাণে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। কমলা লেবু, লেমন্ (Lemons), পাতি লেবু, কাগজি লেবু, বিলাতী বেগুণ (Tomato), বাঁধা কপি, পালম শাক, আলু, মূলা, শালগম, কলাইশুটী, পিয়াজ প্রভৃতি, ফলমূল তরকারি ও শাকসব্জি

অদল বদল করিয়া প্রত্যহ ব্যবহার করিলে আমাদের খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কল মূলের ন্যায় কতকগুলি তরকারি কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করা উচিত, কারণ রন্ধনকালীন উত্তাপ সংযোগে "সি" জাতীয় ভাইটামিন্ অল্পবিস্তর নষ্ট হইয়া যায়। দুগ্ধ অধিকক্ষণ ধরিয়া জাল দিলে উহার ভাইটামিনের অধিকাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; সুতরাং অধিকক্ষণ জাল দেওয়া দুগ্ধের পুষ্টিকর নিতান্ত কম। দুগ্ধ ফুটিয়া উঠিবামাত্র উহাকে নামাইয়া রাখিলে তন্মধ্যস্থিত ভাইটামিনের ক্ষতি হয় না, অথচ যদি দুগ্ধের মধ্যে কোন সংক্রামক রোগের বীজাণু লুক্কায়িত থাকে, সাধারণতঃ ঐ উত্তাপে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাঁচা দুগ্ধ ব্যবহার করিলে ভাইটামিনের প্রাচুর্য্যহেতু শিশুদিগের দেহের সম্যক্ পুষ্টি সাধিত হয়, কিন্তু এ দেশে গোয়ালা-বাড়ীর কাঁচা দুগ্ধ ব্যবহার করিলে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এজন্য দুগ্ধ অল্পক্ষণের জন্য একবারমাত্র ফুটাইয়া নামাইয়া রাখিলে ভাইটামিন্ সম্বন্ধে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না।

ম্যাকারিসন্ (Mc Carrison) নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ডাক্তার এবিষয়ে বিস্তর গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আমাদের দেহের উপাদানের (Tissues) মধ্যে অল্প পরিমাণে ভাইটামিন্ অবস্থিতি করিয়া আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং ইহারই সাহায্যে আমাদের দেহ প্রোটীন্ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যস্থিত সার-পদার্থের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। শরীর রক্ষার জন্য প্রোটীন্ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সার-পদার্থ যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয় ভাইটামিন্‌ও তদ্রূপ; একতরের একটীর অভাবে শরীর রক্ষা হয় না। শরীর রক্ষার জন্য সকল জাতীয় ভাইটামিনের কার্য্য একরূপ নহে, ভাইটামিন্ ভেদে উহার ক্রিয়া স্বতন্ত্র। "এ" (A) জাতীয় ভাইটামিন্ শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির প্রধান সহায়ক। "বি" (B) জাতীয় ভাইটামিন্ দেহ মধ্যে শর্করা জাতীয় খাদ্যের (Carbohydrate) যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, তাহার সহায়তা করে এবং দেহস্থ কোষ (Cells) সমূহের (বিশেষতঃ স্নায়ুকোষ, Nerve cells) পুষ্টি এবং উহাদিগের ক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন করে। আমাদের দেহস্থ উপাদান (Tissues) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার জন্য উহার মধ্যে যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, "সি" (C) জাতীয় ভাইটামিন্ উক্ত ক্রিয়ায় সহায়তা করে। "এ", "বি" এবং "সি" জাতীয় ভাইটামিনের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সুতরাং এক জাতীয় ভাইটামিন্ অন্য জাতীয় ভাইটামিনের স্থান অধিকার করিতে পারে না। দেহস্থ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক গাবতীয় রসের উৎপত্তি ও নিঃসরণ সম্বন্ধে ভাইটামিন্ বিশেষ ভাবে সহায়তা করে এবং ইহার সংক্রামক রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা আছে। ভাইটামিনের অপ্রাচুর্য্যে দেহস্থ কোষ সমূহের ক্রিয়া ব্যর্থ ও বিপর্য্যস্ত হয়। দেহমধ্যে যথোচিত পরিমাণ ভাইটামিন্ থাকিলে দেহ কোষের (Cells) ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং উহাদ্বারা আহারে রুচি জন্মে। ভাইটামিনের অভাবে খাদ্য পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে, অপরিপাচ্য খাদ্য হইতে নানা প্রকার দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া দেহ-মধ্যে শোষিত হয় এবং শরীরকে বিষাক্ত করে। খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব হইলে আমাদের দেহ, দেহস্থিত পূর্ব্বসঞ্চিত ভাইটামিন্ শোষণ করিতে বাধ্য হয়, সুতরাং ইহার অভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং আমরা বিবিধ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। ভাইটামিনের অভাবে জীবের প্রজনন শক্তি ক্ষীণ হয় এবং অনেক স্থলে উহা লোপ প্রাপ্ত হয়।

ম্যাকারিসনের গবেষণা-প্রসূত ভাইটামিনের উপরোক্ত ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি এবং আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভাইটামিন্ যে কি প্রয়োজনীয় পদার্থ, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। খাদ্য-নির্ব্বাচনের সময় এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। যে যে খাদ্যে ভাইটামিনের পরিমাণ অধিক, অবস্থানুসারে সেই গুলিরই ব্যবহারের বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। যে যে কারণে খাদ্যাদির ভাইটামিন্ নষ্ট বা উহার উপচয় হইতে পারে, সেই কারণ গুলি যথাসাধ্য নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে দেখা যাউক যে আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য কোন্ কোন্ খাদ্য সামগ্রী হইতে আমরা উপরোক্ত তিন জাতীয় ভাইটামিন্ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই।

ভাইটামিন্ "এ"—এই জাতীয় ভাইটামিনকে

ইংরাজীতে Fat Soluble A কহে। দুগ্ধ,মাখন,ছানা,পনির, দধি, ঘোল, ঘৃত প্রভৃতি পদার্থে, ডিমের কুসুমে (পীতাংশে) এবং পালম ও অন্য জাতীয় শাকসব্জিতে (Greens) ইহা যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। অবস্থার বুঝাইলে এই সকল খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তবে দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রী সহর অঞ্চলে সুলভ নহে, সুতরাং সহরবাসী সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এই সকল খাদ্যসামগ্রী যথোচিত পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। বয়স্ক লোক দুধের অপ্রাচুর্য্যে টাট্‌কা শাকসব্জি প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে তাহার দেহ মধ্যে "এ" ভাইটামিনের বিশেষ অভাব হয় না। আমাদের পল্লীগ্রামের কৃষকগণ দুইবেলা খাদ্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে টাট্‌কা শাকসব্জি ভক্ষণ করে বলিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য (অবশ্য যে স্থলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব নাই) সহরবাসীগণের স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক উন্নত। সহরবাসীগণ "শাকপাতাড়" নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে, কিন্তু অধুনা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা "এ" ভাইটামিনের অবস্থিতি হেতু এই 'শাক পাতাড়' যে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। গর্ভিণী স্ত্রীলোক শাকসব্জি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টিলাভ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। যতদিন শিশুসন্তান স্তন পান করে, ততদিন পর্য্যন্ত মাতার খাদ্যে "এ" জাতীয় ভাইটামিন্ অধিক পরিমাণে থাকার বিশেষ আবশ্যক, কারণ মাতৃস্তন্য হইতেই শিশু যাবতীয় ভাইটামিন্ সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং "এ" জাতীয় ভাইটামিনের অভাব হইলে তাহার শরীর যথোপযুক্ত পুষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে গরু কাঁচা ঘাস খায়, তাহার দুগ্ধে, পালিত গরুর দুধ অপেক্ষা অনেক অধিক ভাইটামিন্ থাকে, সুতরাং উহা অধিকতর পুষ্টিকর।

প্রত্যহ কোন না কোনরূপ শাকের তরকারি ভক্ষণ করিলে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবার কথা। ভাইটামিন্ সম্বন্ধে পালম শাক (Spinach) সকল শাকের রাজা।

ভাইটামিন্ "এ" কডলিভার্ অয়েলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে, এজন্য ইহা একাধারে ঔষধ ও পথ্য। নারিকেল তৈল, অলিভ্ অয়েল্ প্রভৃতি কতিপয় উদ্ভিজ্জ তৈলে ইহা অত্যল্প পরিমাণে অবস্থিতি করে। সরিষা তৈল, তিল তৈল প্রভৃতি অপরাপর উদ্ভিজ্জ তৈলে এবং চর্ব্বির (Lard) মধ্যে ইহার অস্তিত্ব এপর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই।

ভাইটামিন্ "বি"—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের খাদ্যে ভাইটামিন্ "বি"র অভাব হইলে বেরিবেরি নামক দুশ্চিকিৎস্য রোগ উৎপন্ন হয় এবং অনেকে এই রোগাক্রান্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সচরাচর ভাইটামিন্ বলিলে আমরা ভাইটামিন্ "বি" বুঝিয়া থাকি। "বি" জাতীয় ভাইটামিন্ স্নেহের পুষ্টি সাধনেও সহায়তা করিয়া থাকে। গম, চাউল, দাল, ওটমীল্, মকাই, পালম শাক, বাঁধাকপি, দুগ্ধ, ডিম্ প্রভৃতি পদার্থে এই জাতীয় ভাইটামিন্ অল্পাধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। কলের ধব্‌ধবে পালিশ করা মিহিদানা এবং বেশী ছাঁটা চাউলে ইহা মোটেই থাকেনা। সুতরাং ধব্‌ধবে ময়দা ও বেশী ছাঁটা চাউলের পরিবর্ত্তে আমাদের গাঁতাভাঙ্গা আটা এবং অল্প ছাঁটা মোটা চাউল ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গমের ভূসির মধ্যে এই জাতীয় ভাইটামিন্ যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। আমরা যদি প্রত্যহ আধ ছটাক গমের ভূসি, দাল বা অন্য কোন তরকারির সহিত সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করি, তাহা হইলে আমাদের অতি সহজে এই জাতীয় ভাইটামিন্ সংগ্রহ করিবার কোন অসুবিধা হয় না। আস্ত ছোলা, মুগ, মটর প্রভৃতি শস্যের বীজ অঙ্কুরিত হইবার হইবার সময়ে এই জাতীয় ভাইটামিন্ তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অঙ্কুরিত ভিজা ছোলা বা মুগ প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে রোগী কঠিন বেরিবেরি রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। গত ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে মেসোপোটেমিয়াতে সৈন্যদিগের মধ্যে ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রাতঃকালে ভিজা ছোলা ও গুড় খাইবার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যপ্রদ। এই প্রথা পুনঃ প্রচলিত হইলে আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতার স্বাস্থ্য যে পুনরায় উৎকর্ষ লাভ করিবে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে। "বাখর" বা তাড়ির বীজ ("ইষ্ট, Yeast) হইতে মদ প্রস্তুত হয় এবং উহা পাউরুটী প্রস্তুত

করিবার জন্যও ব্যবহৃত হয়। বাখরের মধ্যে এই জাতীয় ভাইটামিন্ অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। এই জন্য খাদ্যে এই জাতীয় ভাইটামিনের অভাব হইলে উহার কাথ (Extract) ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভাইটামিন্ "সি"—"সি" ভাইটামিনের অভাবে দুরন্ত স্কার্ভি (Scurvy) রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে রক্ত দূষিত হইয়া চর্ম্মের নীচে এবং শরীরের নানা স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়। পূর্ব্বে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া জাহাজের নাবিকগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। কোন ঔষধ প্রয়োগে এই রোগের উপকার হয় না; টাট্‌কা ফলমূল তরিতরকারি ব্যবহার করিলেই এই রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। লেবুর রস এই রোগের মহৌষধ। টাট্‌কা তরিতরকারি ফলমূলের মধ্যে "সি" জাতীয় ভাইটামিন্ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, এই জন্য এই সকল পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না এবং যাহার রোগ হইয়াছে, সে আরোগ্য লাভ করে। অনেকে বলেন যে "সি" জাতীয় ভাইটামিনের অভাবে দাঁতের গোড়ায় পূঁজ (Pyorrhea) হয়। টোমাটো (বিলাতী বেগুণ), আলু, শালগম, বাঁধাকপি, পালম শাক, ছোলা, সয় বীন্ (Soy bean) প্রভৃতি তরিতরকারির মধ্যে এবং কমলা লেবু, আঙ্গুর, আপেল্, লেমন্, পাতি ও কাগজি লেবু, আনারস, কলা প্রভৃতি ফলের মধ্যে এই জাতীয় ভাইটামিন্ যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। যে উত্তাপে আমাদের রন্ধন কার্য্য সাধারণতঃ সম্পন্ন হয়, তাহাতে ভাইটামিন্ "এ" এবং ভাইটামিন্ "বি" সম্বন্ধে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ঐ উত্তাপে ভাইটামিন্ "সি" বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য রাঁধা ব্যঞ্জন ব্যতীত প্রত্যহ কিছু ফল মূল ও তরিতরকারী কিছু পরিমাণে কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাহেবেরা তাঁহাদের খাদ্যের সঙ্গে প্রত্যহ লেটুস্, সিলারি প্রভৃতি কতকগুলি শাকজাতীয় তরকারি (Salad) কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করেন; ইহাতে তাঁহাদের ভাইটামিন্ সংগ্রহ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। বিলাতী বেগুণ, শশা, কলাইশুঁটী, বরবটী, মূলা, পিঁয়াজ প্রভৃতি কাঁচা তরকারি ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া অল্প পরিমাণ বাটা লেবুর রস, লবণ ও সামান্য পরিমাণে চিনি উহাতে যোগ করিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিবার ব্যবস্থা আমাদের গৃহে সহজেই করিতে পারা যায়। ইহা খাইতে অতি মুখরোচক এবং ইহা দ্বারা ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যতীত প্রত্যহ কিঞ্চিৎ ফল মূল এবং অঙ্কুরিত ভিজা ছোলা, ভিজা মুগ খাইবার ব্যবস্থা করিলে আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার দেহ যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিবার অবসর পায় এবং দেহ মধ্যে রোগ প্রতিষেধ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীগণকে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টী স্মরণে রাখিয়া প্রত্যহ পরিবারস্থ সকলের জন্য এইরূপ খাদ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

কমলা লেবু এবং বিলাতী বেগুণের মধ্যে "সি" জাতীয় ভাইটামিন্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বিলাতী বেগুণ রন্ধন করিলে অথবা উহা শুকাইয়া লইলে ভাইটামিন্ সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হয় না। শীতকালে বিলাতী বেগুণ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সময়ে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে অথবা অল্প তেঁতুল ও চিনি বা গুড় সংযোগে উহার মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে বারমাস উহা আমরা ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন্ সংগ্রহ করিতে পারি।

যে শিশুর দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না বরঞ্চ ক্রমশঃ ক্ষীণ ও ক্ষয় হইয়া যায়, তাহাকে দিবসে দুইবার এক চামচ কমলা লেবুর রস খাইতে দিলে শীঘ্র তাহার শারীরিক উন্নতি হয়। এ বিষয়ে দুর্ব্বল শিশু সন্তানের জননীগণের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি। কমলা লেবুর পরিবর্ত্তে বিলাতি বেগুণের রস খাইতে দিলেও যথেষ্ট উপকার হয়।

তরিতরকারি বহুক্ষণ বাষ্পিয়া সিদ্ধ করিলে তন্মধ্যস্থিত ভাইটামিন্ প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। বেরিবেরির প্রাদুর্ভাব কালে দেখা গিয়াছে যে তিন ঘণ্টাকাল্‌ব্যাপী সিদ্ধ খাদ্য যাহারা খাইত, তাহাদেরই মধ্যে এই রোগ প্রবল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। খাদ্যদ্রব্য ৪০ মিনিট কাল সিদ্ধ করিলে উহার ভাইটামিনের বিশেষ ক্ষতি হয়

না এবং এইরূপ খাদ্য ব্যবহার করিয়া বিস্তর লোকে বেরি বেরি রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। আমাদের রন্ধনশালার অধিষ্ঠাত্রী অন্নপূর্ণাগণকে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

সাধারণ গৃহস্থের গৃহে লেবুর রস ও তেঁতুলের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। এই দুই সামগ্রী প্রত্যেকে প্রতিদিন ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

ক্ষার পদার্থ (Alkali) সংযোগে ভাইটামিন্ নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য সোডা মিশ্রিত জলে রন্ধন করা উচিত নহে।

[ক্রমশঃ]

সমর্পণ

শ্রী অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম্-এ।

লুকায়ে যদি গো রেখে থাকি কিছু,
আজি সবটুকু নাও ;
যদি কোন দিন আপনার ভুলে
নাহি দিয়ে কিছু রেখে থাকি ভুলে,
আজি সব দিব রিক্ত করিয়া
তুমি যদি ফিরে চাও।

যদি কোন দিন দুয়ার রুধিয়া
তোমায় আড়াল করি
বঞ্চনা করি রেখে থাকি কিছু
ভয়ে লজ্জায় মাথা করি নীচু,
আজি ঠেলে দিব সব কিছু তার
তোমার চরণে ধরি ;

ওগো সুন্দর, যদি গো দাঁড়াও
আজি এ শূন্য ভরি।

বরষা শরৎ বসন্ত ভরি
যত কিছু জমা আছে,
শিশীর হেমন্ত শিত পঞ্চমে
যত কিছু ধ্বনিয়াছে,

অশোক বকুল কুঞ্জভবনে
যৌবন যমুনা কল নিস্বনে
কত দিন ধরি, বার মাস ভরি
যত কিছু গাহিয়াছে,

যা কিছু আমার ধরণে ভ্রান্তি,
মোহ অবসাদ, ভ্রান্তি, ক্লান্তি,
ভাল ও মন্দ, সুন্দর, কাল
আজি সবটুকু নাও ;
আজি সব দিব রিক্ত করিয়া
তুমি যদি ফিরে চাও।

বাঙালী মেয়ের আর্থিক অবস্থা

শ্রীমতী লেডী অবলা বসুর মতামত।

বিগত মার্চ্চ মাসে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী শ্রীমতী অবলা বসুর সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল বিশে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

প্রঃ—বিজ্ঞাপনে দেখেছি সেদিন এদিকে নারী-শিক্ষা-সমিতির একটি শিল্প-মেলা খোলা হয়েছিল।

উঃ—হাঁ, নারী শিক্ষা-সমিতির শিল্প-প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই অধমও আরম্ভ হল। অনেক দিন থেকে করবার ইচ্ছা ছিল, ঠিক কি রকম অঞ্চলে মেয়েদের নিকট আসৃত হবে, না জানাতে এতদিন করি নি, তা ছাড়া, আমাদের অর্থের অভাব—টাকা নেই। টাকা ছাড়া এ সব জিনিষ হয় না; তবু সাহস করে আরম্ভ করলুম বলে একটা কৃতকার্য্য হয়েছি। মেয়েদের হাতের কাজ আমি সুন্দর হয়েছে। এ রকম শিল্প-প্রদর্শনীতে খোলা যায় কোন জিনিষটা মেয়েরা ব্যবসা-হিসাবে নিতে পারেন।

প্রঃ সব মেয়েরা কলকাতার মেয়ে?

উঃ—হাঁ, তবে বাইরেরও ছিল, যেমন খোলপুর, যশোর, পাবনা। এরাও আমাদের ছাত্রীসোসাইটির ছিলেন। এই শিল্প প্রদর্শনীতে তিন দিনে প্রায় ৯ হাজার মেয়ে এসেছে, দেখে আশ্চর্য্য মনে হল। এর ঠিক তিন আগে গভর্ণমেণ্ট "বেঙ্গল চেম্বার" করেছিলেন, সেখানে বেশী ভীড় হয় নি। তাদের অর্থের ছড়াছড়ি! আমাদের অর্থ ত নাই বল্লেই হয়, সে রকম বিজ্ঞাপনও হয় নি; খুব কম জানাশোনা হয়েছিল। এমন কি সেই পাশের বাড়ীর লোকেরা অনুযোগ করেছিল, কেন তাদের খবর দিই নি।

প্রঃ—বিজ্ঞাপন দিতে পয়সা লেগেছিল?

উঃ—হাঁ, সব কাগজেই পয়সা নেয়, অনেক কাগজে অর্দ্ধেক নেয়।

প্রঃ—সবাই কি স্কুল কলেজের মেয়ে?

উঃ—না, বৃহৎ পরিবারের মেয়েই প্রায় সব। স্কুল কলেজের মেয়েও আছে, যাদের কাজ ঘর, না স্কুল কলেজের কাজ, বাড়ীর।

প্রঃ—অধিকাংশের বয়স স্কুল কলেজের বয়স পার হয়ে গেছে?

উঃ—হাঁ, তবে স্কুলের মেয়েরাও কাজ পাঠিয়েছে—যেমন মহারাণী বালিকা স্কুল, হিন্দিস্থান ছাত্র স্কুল এবং রাইড স্কুলের মেয়েরা। প্রদর্শনীর সঙ্গে আমরা কোন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা রাখি নি, রাখলে আরও চিত্তাকর্ষক হত। বিলেতে তাই রাখে। আমোদ প্রমোদ ছিল না, এক বাগবাজারের ছিল। এ সব জিনিষে কত টাকা লাগে তা ত জানেন। আমরা খুব কম খরচে এর ছিলুম। শিক্ষা-প্রদ জিনিষও ছিল। আমাদের বাড়ী নেই, রাজা পাবলিক স্কুল কমপাউণ্ডের মত ছোট জায়গা, তবু মেয়েরা খুব আমোদ করেছে।

প্রঃ—খরচ কত হল?

উঃ—ঠিক বলতে পারি না, আমাদের সামান্য চেষ্টা। মোট-কি চার পয়সা করেছি, তাতে ১৭২৲ টাকা উঠেছে। বাইরে কতকগুলি ষ্টল হয়েছিল। বিলিতী জিনিষ ছিল বলে খাদি-প্রতিষ্ঠান তাদের দোকান পাঠান নি। তবে খদ্দর-প্রচার-সমিতি এসেছিল ও বেশ বিক্রী করেছিল।

প্রঃ—দোকান যারা করেছিল তারা সব পুরুষ?

উঃ—প্রায় সব পুরুষ। একটী দোকান ছিল মেয়ের। তার দোকানে সব চেয়ে বেশী বিক্রী হয়। যে মেয়েরা আপত্তি করবেন সে রকম কেহ আসেন নি। পোনপুরের রাণী, বর্দ্ধমানের মহারাণী, কুচবিহারের মহারাণী—এঁরা সাইড পাঠিয়েছিলেন। একজন মাত্র এসেছিলেন—জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পুরুষ থাকবে না ত। বাড়ীর ভিতর পুরুষ ছিল না, বাগানে যে ষ্টল ছিল সেখানে পুরুষ ছিল।

প্রঃ—প্রদর্শনী যে হবে বাঙালী অনেক মেয়েদের জানান হল কি করে?

উঃ—যেখানে যেখানে বিজ্ঞাপন দিয়ে।

প্রঃ—যশোর, পাবনা থেকে যাঁরা এসেছিলেন?

উঃ—কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাতে বলেছিলুম। মফঃস্বলে জানান হয়েছে কি না জানি না। মফঃস্বল থেকে জিনিষ পত্র কিছু পাব সে আশা করি নি। কলকাতায় সকলেই জানে—রাজা পাবলিক স্কুলে প্রদর্শনী হবে—জিনিষ হারাবে না, তাই পাঠিয়েছিল।

প্রঃ—যাঁরা দেখতে এসেছিলেন অথবা জিনিষ পত্র পাঠিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই রাজ?

উঃ—না-না, তা নয়, কয়েক ঘর রাজ ছিলেন বটে, খুব কম।

প্রঃ—এখন আপনাকে আর একটী বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই; সেটী হচ্ছে বাঙালী মেয়েদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে।

উঃ—তাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় হীন।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—আমি বিধবাদের কথা বিশেষ ভাবে বলছি। সধবার দুঃখ আছে, আমাদের দেশে সকলেরই বিয়ে হয়। অনেকের স্বামী পাগল, অনেকের স্বামী রোজগার করে না, ছেলেপুলে আছে? আমার কাছে যারা সাহায্য চাইতে এসেছিল তাদের কাছ থেকে যা জানি তা বলছি। একজন সাহায্যের জন্য এসেছিল তার স্বামী পাগল, ২টী সন্তান, এখন আছে ভাইয়ের কাছে; ছেলেপিলে নিয়ে কতদিন

তাদের কাছে থাকতে পারে? সুবিধা হয় না। বলে—তার জন্ত যেন একটা কিছু বন্দোবস্ত করে দিই। তখনো আমাদের বিধবাআশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আমি বলেছিলুম মার্সিং (রোগীসেবা) শিখতে। সেখানে থাকতে হয়, স্বামীকে রেখে কে? দায়মুক্ত থাকলে তবে এসব কোন কিছু করতে পারে কি না? তাতে ভেবেছিলুম—ডাক্তার যেমে যে রকম একটা ফ্রাস খোলা যায় কি না। তার যোগাড় করছিলুম, কিন্তু গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে পারি নি বলে ছাড়তে হয়। বাঙ্গালী মেয়ে রেটে কেহ যায় না। লাহোরে সুবিধা দেখলুম। সেখানে পর্দা থাকলেও মেয়েরা রেটে যায়। মুসলমানের ভিতর পর্দা আছে, আমাদের মত নয়, ঘরের ভিতর পর্দা, বাইরে নয়। লাহোরে কর্পোরেশনের একটী বড় স্কুল আছে। দেখলুম ১০০টী মেয়ে বসে নানা রকম শিল্প শিখছে। চুমকির কাজ, ব্লাউজ সেলাই, বোনা বোনা—সব শিখছে। কর্পোরেশন থেকে লোক রেখে শিখাচ্ছে কিছু মাইনা দিতে হয় না। কলকাতায় মেয়েদের জন্ত কোন কাজ করতে আরম্ভ করলেই গাড়ী। সেজন্ত এটী হল না। গাড়ীর টাকা কোথায় পাই? অসুবিধা। নইলে সব বন্দোবস্ত করেছিলুম।

প্র:—আপনি বলেন—স্বামী পাগল।

উ:—হাঁ, পাগল। স্বামি-পরিত্যক্তাও এত আছে, নিজে না দেখলে কেউ ভাবতে পারে না। বিয়ে করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে, এই রকম অবস্থার মেয়ে কত আসছে।

প্র:—স্বামী বেঁচে আছে?

উ:—মরে গেছে এমন ত আর পাই নি। প্রায়ই বিয়ে করে' দ্বিতীয়বার হয়ে গেছে। কেহবা আমার ২।৩টী বিয়ে করে' আগের স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে। বিধবা ছাড়া এই শ্রেণীর সধবাদের জন্তও আমাদের বন্দোবস্ত আছে।

প্র:—বিধবাদের আর্থিক দুরবস্থা আপনার নজরে পড়েছে কি?

উ:—এই আর্থিক দুর্গতির জন্তও অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে। পল্লী-গ্রামে এর সংখ্যা কত বেশী আমরা ভাবি না। আমি নিজেও ভাবতুম না, কাজের সংস্পর্শে না আসলে এ জানা হত না। বেশীর ভাগ বিধবার শ্বশুর বাড়ীর কেহ সাহায্য করে না, পড়ে' থাকে, বাপের বাড়ীরও কেহ খোঁজ করে না। প্রতিবেশী আছে মুসলমান, সে এসে দেখে শুনে, অবস্থা খারাপ হলে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। ছেলেপিলে আছে, মেয়ে-মানুষ একলা রয়েছে, ছেলে মানুষ করতে হবে সে ভাবনা রয়েছে, যে বড় বেশী ভয় কাছেই যায়। এই ভয়ে অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে। আমাদের বিধবা-আশ্রমে এই যে ২০।২৫টী বিধবা রয়েছে সকলের অবস্থাই এই রকম খারাপ। আমাদের সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ করতে হয়। জিজ্ঞাসা করতে পারেন—এখন কেন এসব হয়, আগে কেন হত না। আগে যে খরচ চলত, এখন তার চাইতে খরচ অনেক বেড়ে গেছে। আগে লোকে পাঁচ জনকে সাহায্য করতে পারত, এখন পারে না।

প্র:—যৌথ পরিবার বলে যা কিছু আছে, তাতে সাহায্য হয় কতটা?

উ:—ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ বিধবাদের যদি ছেলে-পুলে থাকে। আজ কাল খরচ চলনের বেশী হচ্ছে। ধরুন যার ৪টী ছেলেপুলে আছে তাদের স্কুলের খরচ, কলেজের খরচ, খাবার খরচ কত বেড়েছে। সে কি করে' দেবর ভাসুরের ছেলেমেয়েকে সাহায্য করবে? আগে তা ছিল না। এখন বিধবাদের অবস্থা শোচনীয়। যাদের ছেলেপুলে আছে, এখন অনেক বিধবা কাঁদে, যেন অর্থার্জ্জন করে' তাদের মানুষ করতে পারে।

প্র:—তাহলে আপনি বলতে চান যে,—বিধবাদের ছেলে মেয়ে মানুষ করবার জন্তই দেশের ভিতর একটা আন্দোলন হওয়া দরকার। কেবল মাত্র বিধবার নয়, তাদের ছেলেমেয়েরও সাহায্য দরকার?

উ:—হাঁ, বিধবা ত অনেক আছে, তা ছাড়া, যাদের ছেলেপিলে আছে তাদের ত কথাই নাই। আমাদের মেয়ে বাড়ী ছেড়ে আসবার সাহস মেয়েদের কখনই ছিল না, কিন্তু এখন না ছেড়ে উপায় নাই। অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আসে। পশ্চিম বঙ্গের সমাজ ভয়ানক গোঁড়া। এরা কিছুতেই বাড়ী ছেড়ে আসতে চায় না, না খেয়ে মরবে তবু আসবে না। তারা শুনে সেবাই আশ্চর্য্য হয়—এত মেয়ে বাড়ী ছেড়ে এখানে এসেছে।

প্র:—এরা কোথা থেকে এসেছে?

উ:—বিধবা-আশ্রমে যারা আছে তাদের অধিকাংশই কলকাতার বাইরের অন্তান্ত জেলা থেকে এসেছে। কলকাতায় যে ২।৩টী আছে তারা বিবাহিতা, স্বামিপরিত্যক্তা।

প্র:—অধিকাংশ মধ্যবিত্ত, গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্ম নাই?

উ:—ব্রাহ্মদের এখানে নেই বা। তাদের দরকার হয় না। তারা আগেই অর্থকরী একটা কিছু শেখে, এটা খালি সমাজসেবীদের জন্ত।

প্র:—আপনি বলছেন ব্রাহ্মদের মেয়েরা এখন কিছু শেখে যাতে তারা কিছু রোজগার করতে পারে। কি উপায়ে রোজগার করে?

উ:—বাড়ীতে গিয়ে মেয়েদের শিখায়, শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে, ছেলে-মেয়েদের অভিভাবিকার কাজ করে। আজ কাল রোজগার পাত্র করবার আছে করেছে।

প্র:—কিসের রোজগার?

উ:—নানা বিভিন্নের—যাকে অভিভাবী রোজগার বলে। যে মেয়েটীর কথা বলছি সেটী খুব কর্মিষ্ঠা। এই মেয়েটী স্বামি-পরিত্যক্তা।

প্র:—আচ্ছা, যদি সমাজের ভয়ে বিয়ে করে যাই, তাদের আর্থিক অবস্থা কি রকম হয়ে দাঁড়ায়?

উ:—তাদের অবস্থাও খারাপ। বিয়ে হেমীর ৩টী মেয়ে আছে, আমাদের

শ্রেণীর মেয়েদের চেয়ে তারা বলিষ্ঠ। যে সমস্ত কাজ শিখতে তাই তাতে তথা-কথিত নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরাই নিপুণ। "ভদ্রঘরের" মেয়েরা এত দুর্বল যে তাদের দ্বারা পরিশ্রমের কাজ হয়ে ওঠে না। মনে করুন যে কারার ও কাপড়ে ছাপ লাগাবার কাজ শিখাচ্ছি, যতটী মেয়ের মধ্যে যতটী বলবতী মেয়েকে পছন্দ করতে হবে, তারা তাদ বলে। ব্লাক্ ষ্টোইং (কাঠ-খুদানো) শিখাতে চাই, জাপানিতে আমি মেয়েরা এ কাজ করে, আর এত সস্তায় বেশ কেউ বাজারে টক্কর দিতে পারে না। আমাদের দেশে কেন হবে না? সে জন্য যতটী মেয়েকে দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু আমাদের ছোট বাড়ী, বড় বাড়ী না হলে হয় না, ষ্টোন-প্রাণিংএর জন্যাদি রাখবার স্থান নাই। তারপর মেয়েদি "এক্সিটান" ইত্যাদি শিখতে পারলে মেয়েরা বাড়ী বসে রোজগার করতে পারে। চেষ্টাও করেছিলুম, কিন্তু বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়েরা বড় দুর্বল, খেতে পায়না, বিশেষ বিধবারা মাসের মধ্যে কত উপোস করে। তাই তারা যেন কোন শক্ত কাজই করতে পারে না। কাজের মেয়ে চাইলে যতদূর মেয়ে তাদা হয় না।

প্র:—মুসলমানদের বিষয় কি রকম?

উ:—লাহোরে যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। যায়, তাদের ভিতর বিধবা-সমস্যা নাই, বিধবারা বিয়ে করে।

প্র:—বিধবা-সমস্যা না থাকতে পারে, আর্থিক সমস্যা ত আছে।

উ:—আমি মুসলমানের আর্থিক অবস্থার কথা বলতে পারি না। তবে তাদের উত্তরাধিকার-বিষয়ক আইন খুব ভাল এবং পয়সা থাকলেও তাদের বেশী ভেদ নাই বলে হয়।

প্র:—কোন লোক যদি জিজ্ঞাসা করে—মেয়েদের আর্থিক বিষয়ে স্বাধীন করবার দরকার কি। পুরুষেরাই ত রোজগার করে। তাই, বাপ, স্বামী,—তারা যদি রোজগার করে তা হলেই ত হয়। তাতে আপনি কি বলবেন?

উ:—কি করে হবে? স্বামী চিরকাল থাকে না, এক ত স্বামী। আমার মনে হয় সব মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা থাকা দরকার। তা নয় ত আমরা আবলম্বান-শূন্য হই। ছেলে-মেয়ে মানুষ করা, সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা করা ইত্যাদি মেয়েদের অনেক কাজ আছে। করা না করা আলাদা কথা, ক্ষমতা থাকা দরকার, তা নইলে পুরুষেরা মেয়েদের সম্মান করবে কি?—এ আমার নিজের মত।

প্র:—মেয়েদের স্বাধীন ভাবে টাকা রোজগার করাটাকে আপনি খুব আলোচনা, নূতন একটা কিছু বলবেন কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি—এটা কেবলমাত্র তথা-কথিত ভদ্রলোক সম্বন্ধেই খাটে কি না।

উ:—হাঁ, বিদেশীয় মেয়েরাও স্বাধীন ভাবে রোজগার করছে, খেটে খাচ্ছে। মুটের কাজ, চাষের কাজ, কলের কাজ—যে সব কাজে পুরুষেরা যায় মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে যায়। এ সব ছাড়া লোকদের কথা বর্ত্তমানে আলোচনা করছি না। আমি সাধারণ বাঙালী পরিবারের কথাই এতক্ষণ বলছিলাম। —আর্থিক উন্নতি।

নীড়ের পাখী

শ্রীমতী রেণুকাবালা মুখোপাধ্যায়।

সমাজ-গাছে যে পাখীটী নীড়টি বেঁধে হায়,
দুশ্চিন্ত মনে হেসে কেঁদে চলছে দুজনায়,
বুকের রক্তে রঙিয়ে নিয়ে পরাণ দু'জনার
সংসারটী আলো করে রাখছে অনিবার!
ওরে ও ব্যাধ কোন পরাণে শরটী তুমি হেনে
পতিপ্রাণা সতীকে আজ নিলে ধরায় টেনে!

দেহ তোমার পাষাণ বলে এম্‌নি করে হায়,
শতদলে ফুটচে যে ফুল ছিঁড়বে তুমি তায়!
প্রেমের রাগে প্রাণের আলোয় শত মূর্চ্ছনায়
পূজারিণী সেজেছিল যে সেবার আঙিনায়
তাঁর পূজা আজ স্তব্ধ হ'ল মাঙ্গলিকী সনে
কসাইখানায় স্থান হ'ল তাঁর তোমার পরশনে!

ওরে নিঠুর ওরে অধম কালাপাহাড় ওরে,
খাতার রোষ-বহ্নি জ্বলুক তোমার শিরোপরে!

পল্লীগ্রাম

কুমারী রীভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজকাল পল্লী সকলকে সহরের আধুনিক ছাঁচে বা আদর্শে গঠন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করা হইতেছে। ইহার ভবিষ্যৎ যে কতদূর খারাপ তাহা কেহ ভাবিতেছেন না। আমাদের বিশেষ করিয়া ভাবা দরকার যে পল্লী বলিলে কি বুঝায় ও সহর বলিলেই বা ঠিক কি বুঝায়। অমর কবিদের ছন্দে পল্লীর যেরূপ মনোহর বর্ণনা শুনি, সত্যই কি সেরূপ পল্লী এখনও বঙ্গদেশে আছে? না তাহা সহরের আদর্শে পল্লীকে গঠন করিলেই সম্ভব হইবে?

ম্যালেরিয়ার প্রবল বন্যায় যখন গ্রাম ভাসিয়া যাইতেছে তখন সকলে একবাক্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "যত শীঘ্র পার বন জঙ্গল কাট ও সেই গুলি পুকুরে ফেলিয়া পুকুর বন্ধ করিয়া দাও।" একে ত পল্লীতে জলের দারুণ অভাব, তার পর যদিও বা দুই একটি পচা পুকুর আছে সেগুলি বুজাইয়া দিলে যে কি ভীষণ দুর্দ্দশা হইবে তাহা কল্পনা করা যায় না। কিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে দেশ জলপ্রধান ছিল, আজ কি না তথায় জলের বিন্দুমাত্র নাই। এই ত পল্লীর অবস্থা। ইহাকে আবার সহরে পরিণত করার অদম্য উৎসাহ!

কোন গ্রামে Experimental Post office হইয়াছে দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে শত শত অনুরোধ পত্র আসিতেছে যে, অমুক গ্রামে Post office হইয়াছে অতএব এখানেও হওয়া নিতান্তই দরকার। হয়ত গ্রাম হইতে Station কিছু দূরে, অমনি Rail Companyকে গ্রামের মধ্যে Station করিতে বাধ্য করা হইতেছে। ইহাই হইতেছে পল্লী সংস্কার!

গরুর গাড়ীর পরিবর্ত্তে যাহাতে অশ্ব-যানের গমনাগমনের সুবিধা হয় তাহার জন্য পাকা প্রশস্ত রাস্তার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। গরুর গাড়ী মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি কয়েক জায়গায় প্রান্তর অথবা অসমতল কণ্টকপূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া কেমন নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়, তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তিনি কল্পনা করিতে পারেন না। ঐরূপ স্থলে অশ্বযানের জন্য প্রশস্ত রাস্তা করা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ও বাতুলতামাত্র।

পল্লীতে বড় বড় নাটক নভেলপূর্ণ পুস্তকালয় খোলা হইতেছে। কিন্তু পুকুর কাটিবার কথা হইলে সেখানে একেবারে ব্যয় সঙ্কোচ। উহার আর কি দরকার? প্রশস্ত রাস্তা হইলে, Station মধ্যে হইলে, Post office হইলে সহর হইতে জল ত তখন আপনিই পাইপের মধ্য দিয়া গ্রামে আসিয়া পড়িবে।

ও গ্রামে প্রতাপাদিত্য অভিনয় হইয়াছে অতএব আমাদের না খাইয়া ও দুই তিন শত টাকা খরচ করিয়া সহর হইতে সাজ আনাইয়া চাণক্য অভিনয় করিতেই হইবে। একবার কেহ ভাবিয়াও দেখিল না যে ঐ টাকা যদি কোন জলাশয়ের জন্য ব্যয় করা হয় তাহা হইলে কতকগুলি প্রাণিকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা যায়। হয়ত সেই গ্রামের এমন অবস্থা যে সহসা দুই তিন শত লোক আসিয়া পড়িলে সামান্য জল দিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করার সাধ্য নাই।

কোথায় সেই সরলা বিনীতা পল্লীনারী! আজ সহরের কলুষ বাতাসে তাঁহাদের মধুমাখা সরলতা হরণ করিয়া লইতেছে; আর তাহার পরিবর্ত্তে ঘাবতীয় হিংসা, ভোগ, লালসার বৃত্তি পল্লীময় ছড়াইয়া দিতেছে। পল্লীকে পল্লীর মতন করিয়া গঠন করা দরকার, উহাতে সহরের আদর্শের লেশমাত্রও থাকিবে না, পল্লীর কুটীর, পল্লীর উদ্যান, পল্লীর পুকুর ঠিক পল্লীর মত হওয়া দরকার।

হয়ত এমন দিন আসিবে যখন গ্রামের ছায়া মাত্রও থাকিবে না এবং সহরের ভোগে হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে, তখন ক্ষণিক শান্তির আশায় আবার পল্লীতে ফিরিয়া যাইতে মন কাঁদিয়া উঠিবে। কিন্তু তখন আর তার কোন উপায় থাকিবে না। পল্লী কোথায়, শান্তির স্থান কোথায়? সবই সেই সভ্যতার চরম উৎকর্ষের সহায়ক সহরে। পল্লী যে ক্রমে মরিতে চলিয়াছে!

পল্লীর কথা ভাবিতে গেলে সহরের কথা ভুলিতে হইবে। পল্লীতে পুকুর নাই, কারণ পল্লীবাসিরা পল্লীসংস্কারের আশায় মজা চালিত কলের জলের প্রতীক্ষায় সব বুজাইয়া ম্যালেরিয়া দূর করিয়া দিতেছে।

পূর্ব্বের সেই কথা স্মরণ করিয়া দেখ, যখন পল্লীর প্রতি গৃহে দুইটী করিয়া পুকুর থাকিত। একটী স্নানের অপরটী অন্যান্য কাজ করিবার জন্য। কলের জলের আশায় না থাকিয়া পুনরায় পুকুর কাট, পুরাণ পুকুরের সংস্কার কর, দেবতা আপনি নির্ম্মল জলে তাহা পূর্ণ করিয়া দিবেন। জল ও মৎস্য, যাহা আমাদের বিশেষ দরকার তাহার তখন আর ভাবনা থাকিবে না। সুকঠিন ইষ্টকের গৃহ নির্ম্মাণে কি লাভ, তাহার কথা ভুলিয়া যাও। সহরের চন্দ্রা যাহা অন্ন গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহা দূরে ঠেলিয়া দাও। যখন পল্লীতে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারি তখন কেন সহরের করুণা ভিক্ষার প্রত্যাশী হইতে যাইব?

গ্রামে দিন দিন নাটক অভিনয় ও চাষের উন্নতি আমাদের অবনতির পথ যেমন সোজা করিয়া দিতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আজ নন্দ পিসি আসিয়া বলিলেন, 'তুতোর ছেলে কাল সহরে যাত্রার দলে ঢুকেছে।' বুড়ো মাসি আসিয়া বলিলেন, 'ওমা কি ঘেন্নার কথা ওপাড়ার পচা কাল রাত্রে টলতে টলতে বাড়ী এসেই বমি করলে।' আজকাল পল্লীর সর্ব্বত্র পিতা পুত্রকে বৃক্ষের আড়ালে মুখারি করিতে দেখিয়া লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরিতেছেন। এই সব ক্রমোন্নতির একমাত্র কারণ, পল্লীকে সহরের আদর্শে গঠন করিবার অক্ষম্য উৎসাহ ও সহরের ভোগের বস্তুকে পল্লীর ক্রোড়ে যতনে স্থান দেওয়া।

পল্লী তুমি সহরের কথা ভুলিয়া যাও। সহরের আশায়, মাধুর্য্যে তোমার মন যেন স্খলিত না হয়। পল্লী, তুমি চিরকালই পল্লী থাক। যেন তুমি বলিও না, 'দেখ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমিও সহরের মত হইয়া উঠিয়াছি।' ইহার অপেক্ষা লজ্জার কথা তখন আর কিছুই থাকিবে না। *

তালাক

[ছোট গল্প]

শ্রী সতীন্দ্রমোহন বসু।

সহ্য করার ক্ষমতার একেবারের শেষ সীমায় এসে পড়েছিল সে।

যেদিন সত্যসত্যই মা ছিঁড়ে গেল, সোকিয়া পাড়ার দরগায় মৌলানার কাছে গেল—তার স্বামীর সহিত বিবাহ-বন্ধন ছেদ করতে—তালাক দিতে।

মৌলানা সাহেবও আইন-কানুনের দিকে দৃষ্টি রেখে—হদিসের আদেশ বজায় রেখে তিনবার "তালাক" বলিয়ে সোকিয়া-হবিবরের স্বামী স্ত্রীর বন্ধন খুচাইয়া দিলেন।

এতদিন পরে সোকিয়া যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। সে ভাবল, তার সকল বাঁধন—তার মনে তৈরি করা পীড়ন-পেষণ সবই ঘুচে গেল। এখন থেকে সে নিজ ইচ্ছানুযায়ী কোন শুভ পক্ষ ধরে, শান্তি ও সন্তোষ প্রাণে পোষণ করে সরল ভাবে চলে যেতে পারবে।

• • •

তার ঘরে সে এখন একমাত্র কন্যা, আর কেউ নেই তার কাজে খুঁত ধর্ত্তে।

পড়ার ঘরে—জানালা দরজা নারাঙ্গি রঙের পর্দ্দায় ঢাকা—তার পিছনে নীল আলোর—আলো ও আঁধারে মিলে

---

* উক্ত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যা হোক সহরের কোন প্রয়োজন নাই। সহরের স্থানে সহর হওয়া বিভাগেই দরকার। সম্পাদক।

সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, সেই ঘরের ভিতরটায়। বইগুলি যথারীতি সাজান, দোয়াত কলম যথাস্থানে রক্ষিত। ছত্রছাড়া অবস্থায় যা এতদিন পড়ে ছিল, যাকে তার স্বামী "মূর্খের কাজ" বলে নিন্দা করতো, আজ সে অবাধে নিজের ইচ্ছা ও অভিরুচি মতো সম্পন্ন করছে—প্রাণে তার কত তৃপ্ত, কত না পরিতোষ।

তার নিজের স্নানের ঘরে কতকগুলো ক্ষুর-সাবান ছেঁড়া কাপড় আর নেই। তার তেলের শিশি সাবান স্থানান্তরিত হয়নি। সব জিনিষ দেখেই যেন মনে হয়—তারা অক্ষুণ্ণ হলেও হাসিমুখে কার প্রতীক্ষা করে আছে—কার আসার আশায় তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

তার শোয়ার ঘর। সেখানে আর দুখানা বিছানা নেই। একখানা অতি ছোট বিছানা—সাদা ধব্‌ধবে।

বাগান ফুলে ভরা—রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সব কাজ হয়ে যাচ্ছে অবাধে—গোলমাল নেই, ডাকহাঁক নেই, তর্জ্জন-গর্জ্জন নেই, যেন চলচ্চিত্রের ছবির মতো।

• • •

অতিরিক্ত সুরাপানে মত্ত হয়ে নিশীথ রাতে পাড়ার লোকের ঘুমে ব্যাঘাত করে তার স্বামী যখন বাড়ী এসে তাকে অকথ্য জঘন্য ভাষায় গালি দিত, প্রথম প্রথম সয়েছিল সে—তার সুন্দর চাঁদপানা মুখ দেখে, আগেকার সরল-হৃদয় দরিদ্র যুবক ভেবে।

সোফিয়া ভালবেসে তার সমস্ত সম্পত্তির ভার তারই হাতে সঁপে দিয়েছিল। সে মনে করতো তার জিনিষ তার স্বামীরই জিনিষ, কারণ তার স্বামী তার সব—তার আশা আকাঙ্ক্ষা, তার সুখ-দুঃখ, তার জীবন-মরণ, তার ইহ-পরকাল। সোফিয়া কোনই কথা বলতো না তার স্বামীকে, পাছে সে একটুকুও মনে করবার অবসর না পায় যে, সে তার ঐশ্বর্য্যশালিনী পত্নীর অনুগ্রহ পালিত।

গোলাপের সৌন্দর্য্য বিকাশকলি পর্য্যন্তই, তার পাপড়ি যখন খসে পড়তে সুরু হয়—একটু একটু করে কোথায় চলে যায় সে শোভা, নিভে যায়, ডুবে যায়। প্রচুর অর্থ হাতে পেয়ে কুসঙ্গ জুটল অনেক, অসৎ মতলব এলো ঘুরেই। প্রথম প্রথম ভালবাসার মোহে স্বামীকে সে অনুযোগ করলো। তার পর আস্তে আস্তে বাঁধ ভেঙ্গে যখন অবাধ হয়ে উঠলো—তাকে প্রতিরোধ করা সোফিয়ার মত বালিকার একান্ত দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো।

• • •

চারিদিক ভাঙ্গা-চোরা, প্রয়োজনীয় জিনিষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। দিনরাত গর্জ্জন, গালাগালি, মেরে মারপিঠ—সোফিয়া আর সইতে পারলো না। মাথায় লাঠীর আঘাতে রক্তধারা তার কপোল-গণ্ড বইয়ে ধারায় ধারায় যেদিন বুকে এসে পরলো, ডান হাতখানা থেতলে গেল, সেদিন আর সহ্য করতে পারলো না সে। চলে গেল মৌলানার কাছে উন্মত্ত হয়ে তার স্বামীর সঙ্গে চিরজীবনের তরে সব বন্ধন ছিন্ন করে দিতে।

এখন সে নিজেকে খুবই হালকা মনে করলো। সোজা ভাবে চলতে লাগলো সবই। আর গোলমাল, মারপিঠ, গালমন্দ—এ সব কিছুই নেই। বাতাসের মাথায় চড়ে মেঘ যেমন অবাধে ছুটে চলে যেতে থাকে—সোফিয়ার দিনরাত, তার সব কাজকর্ম্ম, তার ওঠা বসা, তার শয়ন-জাগরণ সবই সেই ভাবে চলে যেতে লাগলো।

সব চেয়ে কষ্ট হ'ত তার স্বামীর "চেস্‌মার" কথায়। তপ্ত-লৌহ-শলাকা শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলে যেমন ঠিক আরম্ভ হতেই যত দূর পর্য্যন্ত শলাকা যেয়ে থামে সর্ব্বত্রই তার অনুভূতিটার তীব্রতা বেশ বুঝতে পারা যায়—সেই রকম হোত তার। ব্যক্তিগতভাবে গাল দিলে সোফিয়ার তত কষ্ট হোত না, বরং সহানুভূতি জাগতো তার স্বামীর পতন দেখে—আক্ষেপও হোত। মিষ্ট কথায় তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করতো।

নিবৃত্তির পথ নেই। প্রতিকে প্রতিনিবৃত্ত করতে গেলেই প্রলয় ঘটে। বাধায় সংগ্রাম, সংগ্রামে ক্ষয়। এই ক্ষয় উভয় পক্ষেরই ঘটে। বিত্তের বিনাশ-প্রতির হ্রাস।

এই সংগ্রামের পর "তালাক্" দেওয়া হয়ে গেলে সোফিয়া মনে বেশ বুঝলে যেন তার কি একটা ক্ষয় হয়ে গেছে—একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে, যার জন্য সে তার জীবনটাকে আর সরস করে, সরল ভাবে খাড়া করে রাখতে পারছে না।

বিলাস-বোধে ছায়াবীথির মাঝ দিয়ে জীবন চালিয়েও সোফিয়ার যেন ক্লান্তি বোধ হতে লাগল, গন্তব্য স্থানের অতি নিকটে এসে পৌঁছানোর বিলম্ব-ক্ষনিত আশোদাত্তির মতো বোধ হতে লাগল।

* * *

"কাহার পরশ বিনা
গোলাপ শুকায়ে যায়।"

সোফিয়ার খুবই ভালো লাগে কবিতাটি পড়তে। কতবার পড়েছে, মুখস্থ হয়ে গেছে—তবুও পড়ে। সহসা মনের বৃত্তিগুলো বিদ্রোহী হয়ে উঠলো—সোফিয়ার দৃঢ়তার বাঁধ ছাপিয়ে উঠলো। একদিন তার স্বামী যেখানে লাঠীর আঘাতে ব্যথা দিয়েছিল — সেই হাত চোখের জলে ভিজিয়ে চুম্বন করেই তরঙ্গ আলোড়িত বক্ষ দু'হাতে চেপে বল্লে—

"ফিরে এসো ওগো ফিরে এসো
আমার সুখ দুঃখ মথন ধন, অন্তরে ফিরে এসো।"

জ্যৈষ্ঠের প্রশ্নের উত্তর

গত জ্যৈষ্ঠের মাতৃ-মন্দিরে আটটি প্রশ্ন উত্তরের জন্য বাহির করা হইয়াছিল। প্রশ্ন কয়টির বহুস্থান হইতে বহু উত্তর আসিয়াছে। কয়েকটি যুক্তিযুক্ত উত্তর উত্তরদাতার নাম সহ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—

কন্যার বয়স পনেরোর উপর এবং উহা বরের বয়স অপেক্ষা অন্ততঃ দশ বৎসর কম হওয়া চাই।

শ্রীমতী বিভা সেন, শান্তিপুর।

বিবাহের সম্বন্ধ বরকন্যার ইচ্ছানুযায়ী হওয়া উচিত কারণ অভিভাবকের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ অনেক সময়ে লোকঠকের হইলেও কি-জানি-কেন শান্তি দিতে পারে না। বরকন্যার ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ হইলেও অভিভাবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাটাজোড় যশোহর।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—

এই প্রশ্নটির দুইদিকের অনুকূলেই যথেষ্ট উত্তর আসিয়াছে এবং প্রত্যেকের উত্তরেই অনেক সত্যতা আছে। বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার অনুকূলে আমাদের উত্তর এই যে, সারা দেশময় একই ধারায় মেয়েরা গঠিত হইতে পারে। সারা দেশের মেয়েদের একমত হওয়া দেশের পক্ষে কল্যাণকর।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—

গৃহকলহের জন্য গৃহকর্ত্রীই দায়ী। একমাত্র প্রেম দ্বারাই গৃহকলহ নিবারিত হইতে পারে।

শ্রীমতী তরুলতা দেবী, প্রোম, বর্মা।

গৃহকর্ত্রী শিক্ষিতা হইলে কলহপরায়ণা অন্যান্য নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া কলহ নিবারণ করিতে পারেন।

শ্রীমতী অমিয়বালা পাল, হাসাড়া, ঢাকা।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর—

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে 'তুমি' 'তুমি' সম্বোধন মন্দ নয়, উহা গভীর ভালবাসারই পরিচায়ক।

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর—

স্বামী স্ত্রীতে কি বলিয়া ডাকাডাকি হইবে তাহা পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাস্য। আমি আমার স্ত্রীকে 'দেবী' বলিয়া ডাকি, তিনিও আমাকে 'দেব' বলিয়া ডাকেন। শ্রীমূলচাঁদ মুদ্দড়া, খুলনাবাজার, খুলনা।

* *

স্ত্রীকে নাম ধরিয়া ডাকা: স্নেহ ও মাধুর্য্যপূর্ণ সম্বোধন, তবে পরস্পরে একটি করিয়া ডাক-নাম গড়িয়া লইলেও মন্দ হয় না। শ্রীমতী সুশীলা নন্দী, কলিকাতা।

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর—

স্ত্রী যদি অসতী হয় তবে স্বামীর তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া সংশোধন করা উচিৎ, নচেৎ সেই স্ত্রীর দ্বারা সমাজ আরও কলঙ্কিত হইবে।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী, সৎসঙ্গ, পাবনা।

অসতী স্ত্রীলোককে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিবার পরও যদি সে ইচ্ছাকৃত অসতী থাকে তবেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, সংশোধিত হইলে পরিত্যাগ করিবে না।

শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত, শান্তিপুর, নদীয়া।

সপ্তম প্রশ্নের উত্তর—

পতিতাদের মধ্যে যদি কেহ পাপ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে থাকিতে চায় তবে তাহার সর্ব্বদা সৎসঙ্গে বাস করা উচিত। চরিত্র ভাল হইলে ভরণপোষণের শত পথ মুক্ত হইবে, তাহার উপায়ের জন্য ভাবিতে হইবেনা।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী, সৎসঙ্গ, পাবনা।

অষ্টম প্রশ্নের উত্তর—

জারজ সন্তানের সম্বন্ধে যে পাপ ঘটিত হয় তাহার প্রতিকারের সুব্যবস্থা হইতেছে—বিধবা বিবাহের নিয়ম কায়েমী করা। শ্রীগণপতি মোহান্ত, সিলেট।

রন্ধন বিদ্যা

চিংড়িমাছের চীনা কাবাব

উপাদান :—বড় চিংড়ি মাছ, পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, লঙ্কা বাটা, ঘি, তৈল, দধি, চিনি, লবণ, গরম মসলা।

রন্ধন-প্রণালী :—প্রথমে চিংড়ি মাছগুলি জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া, শুঁড়গুলি ফেলিয়া দিয়া কড়ায় জল চাপাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইবে। সিদ্ধ হইয়া গেলে মুড়া ও শরীর হইতে মাছের শাঁসগুলি ছুড়ি দিয়া অতি সাবধানে বাহির করিয়া লইবে এবং ঐ খোলাগুলি সাবধানে রাখিয়া দিবে। ঐ শাঁস এক্ষণে বেশ করিয়া চট্‌কাইয়া লইতে হইবে, হাতে চটকান অসুবিধা বিবেচনা করিলে বাটিয়া লওয়াও যাইতে পারে।

এইবার কড়ায় ঘি চাপাইয়া দিয়া পরিমাণ মত পিঁয়াজ বাটা ছাড়িয়া দিতে হইবে। একটু ভাজা ভাজা হইলে উহাতে মাছগুলি দিবে এবং অল্প পরে পরিমাণ মত মসলাও দিবে। যাঁহারা পিঁয়াজের পক্ষপাতী নন, তাঁহারা ওটা বাদ দিতে পারেন। মাছগুলি অল্প ভাজা ভাজা হইলে নামাইতে হইবে; লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন পোড়া পোড়া হইয়া না যায়। বেশী ভাজা হইলে মাছ শক্তও হইয়া যায়। মাছ নামাইবার সময় গরম মসলা দিয়া দিবে।

নামান' মাছ শীতল হইয়া আসিলে পূর্ব্ব রক্ষিত খোলার মধ্যে উহা ধীরে ধীরে ভর্ত্তি করিয়া দিতে হইবে। ইহার পর শেষ প্রক্রিয়া। কড়ায় তৈল চাপাইয়া নবনির্ম্মিত ঐ আস্ত মাছগুলি বেশ লাল করিয়া ভাজিয়া লইতে হইবে। ভাজার কার্য্য শেষ হইলেই "চিংড়ি মাছের চীনা কাবাব" তৈরী হইবে। ইহা অতি মুখরোচক ও সুদৃশ্য খাদ্য। প্রিয়জনকে খাওয়াইবার সময় একটু যত্ন করিয়া এই কাবাব তৈয়ারী করিয়া পাতে দিতে পারিলে আমার ভগিনীগণ খুবই আনন্দ পাইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীমতী প্রমিলাসুন্দরী মিত্র।

বেগুনের কাট্‌লেট্

উপাদান :—তাজা বেগুন, ময়দা, আদা ছেঁচা, পিঁয়াজের কুচি, ছোট এলাচ ছেঁচা, মৌরী, লবণ, ডিমের ভিম, তৈল বা ঘৃত।

রন্ধন প্রণালী :—বেগুনকে আগুনে পোড়াইয়া খোসা ছাড়াইয়া চট্‌কাইয়া লও। চটকান শেষ হইলে উহাতে আদা ছেঁচা, পিঁয়াজের কুচি, এলাচের দানা, মৌরী, লবণ ইত্যাদি পরিমাণ মত দিয়া পুনরায় বেশ করিয়া চট্‌কাইয়া লও। এইবার ঐ চটকান বেগুন কাট্‌লেটের আকারে তৈরী করিয়া একটি পাতে ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া বেশ করিয়া

ফেটাইয়া লও এবং একটি পাত্রে মসলা রাখ। ইহার পর ভাজার কার্য্য। কড়াতে ঘৃত বা তৈল চড়াইয়া এক-একখানি কাটলেট্ ডিমের মধ্যে চুবাইয়া, দুই পিঠ মসলা দিয়া ঢাকিয়া ধীরে ধীরে ভাজিতে থাক। ভাজার পরই পরিষ্কার ঢাকনা দেওয়া পাত্রে রাখিতে থাক। ভাজার কার্য্য শেষ হইলে কাটলেট তৈরী শেষ হইল। ইহা গরম গরম খাইতে অতি সুস্বাদু এবং অল্প পয়সায় একটি অতি সৌখীন ও মুখরোচক খাদ্য। আশা করি মাতৃ-মন্দিরের পাঠিকাগণ সকলেই একবার এই খাদ্যটি তৈরী করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ।

জয়পুরের চুরমার লাড়ু—

ইহা এদেশে প্রস্তুত হইতে দেখি নাই। রাজপুতানায় খুব প্রচলিত। আমাদের ভগিনীগণকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য এখানে প্রস্তুত প্রণালী লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি বাঙ্গলার গৃহলক্ষ্মীদের নিকট পাহাড়ী অঞ্চলের এই খাদ্য একেবারে অনাদৃত হইবে না।

প্রথমে আধসের আন্দাজ আটা-ভাঙ্গা আটায় এক ছটাক ঘি মিশা য়া জল দিয়া শক্ত করিয়া মাখিয়া লেচী কাটিয়া লও। এইবার কড়ায় ঘি চাপাইয়া ঐ লেচাগুলি মৃদু জ্বালে ভাজিয়া ঘিয়ে বেশ করিয়া ভাজিয়া একটু শীতল হইলে হামানদিস্তায় গুঁড়াইয়া লও। গুঁড়া হইয়া গেলে কড়ায় পুনরায় পরিষ্কার ঘি চড়াইয়া ঐ গুঁড়ার সহিত এক পোয়া চিনি, অল্প কিছু গরম মসলা গুঁড়া, সামান্য লবণ ও কিছু বাদাম, পেস্তা, কিসমিস ধোঁতো মিশাইয়া লইয়া কড়ায় ঢালিয়া দিয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে থাক। সমস্ত জিনিষটি বেশ শক্ত হইয়া আসিলে নামাইয়া গরম গরম অবস্থাতেই ইচ্ছামত ছোট বড় করিয়া লাড়ু পাকাইয়া লও। ইহাই "জয়পুরের চুরমার লাড়ু"। ইহা মুখরোচক এবং বলকারক খাদ্য। এলোমেলো বাজারে খাবারের পরিবর্ত্তে ছেলেদের জলখাবারের জন্য ইহার ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয়না। একবার তৈরীর জিনিষ এক সপ্তাহ বেশ থাকে।

শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী।

বাঁশের কোঁড়ার ডালনা—

বাঁশঝাড়ে যখন নূতন বাঁশের কোঁড়া বাহির হইতেছে দেখা যাইবে সেই সময় ঐ কোঁড়ার উপর একটি হাঁড়ী বা অন্য কিছু ঢাকা দিতে হইবে। পাঁচ সাত দিন পরে ঐ ঢাকা খুলিয়া ফেলিলেই অনেকটা কুলকপির মত আকারের সাদা সাদা কোঁড়া পাওয়া যাইবে। ঐ কোঁড়া ছাড়াইয়া কপির মত ছোট ছোট করিয়া কুটিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া লইয়া ডালনা রাঁধিতে হইবে।

রন্ধন-প্রণালী আমাদের সাধারণ ডালনা রাঁধার ন্যায়ই। প্রথমে তৈলে কুচান কোঁড়াগুলি বেশ করিয়া ভাজিয়া লইয়া কিছু ভাজা আলু উহাতে দিয়া পরিমাণ মত জল, হলুদ ধনে, জিরাবরিচ, লঙ্কা বাটা ও লবণ দিতে হইবে। জল মরিয়া বেশ থকথকে হইলে নামান দিতে হইবে এবং নামাইবার পূর্ব্বে গরম মসলা ও ঘি দিতে হইবে।

এই ডালনা বেশ উপাদেয় তরকারী। বর্ষাকাল সামনে, বাঁশের কোঁড়ার প্রাচুর্য্যের দিন আসিতেছে; আশা করি আমার ভগিনীগণ এ সময় একবার এই সহজলভ্য তরকারিটি রন্ধন করিয়া পরিবারের সকলকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

শ্রীমতী প্রভাবতী সরকার।

নানা কথা

শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মিলনী—

গত ২রা ও ৩রা চৈত্র শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে "শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মিলনী"র অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুর ও তৎপরিবর্ত্তী গ্রামের বহু মাননীয় মহিলা যোগদান ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া অধিবেশনের উদ্দেশ্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। 'বঙ্গের আনন্দের কথা'—শান্তিপুরের বহু শিক্ষিতা ও ভদ্র মহিলা যোগদান ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সম্মিলনীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রথম অধিবেশনের দিন অভ্যর্থনা-সমিতির মহিলারাই সাহায্য করিয়াছিলেন। শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মিলনীর উদ্যোক্তৃবর্গ আমাদের একজন মহিলা শিক্ষয়িত্রী মহিলাকে সভানেত্রীর পদে বরণ করিয়া এবং স্থানীয় মহিলাদের সম্মিলনীতে যোগদান ও প্রবন্ধাদি পাঠের প্রস্তাব দিয়া নারীজাতির প্রতি তাঁহাদের যোগ্য সম্মানই প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্মিলনক্ষেত্রে মহিলাদের বসিবার জন্য পৃথক্‌ভাবে বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। আমরা দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতির কর্তৃপক্ষগণকে এই আদর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গলায় সরোজিনী নাইডু —

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বম্বাইয়ে পদে এবার বাঙ্গলায় আসিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলার অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া, অনেক সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া বর্ত্তমান রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব জমজমাট ভাষা ও ভাবভঙ্গীতে বিলাত ও দেশের অনেক সুধীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশে গমন করায় আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির কথা মনে পড়ে। তাঁহার পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় যখন বিলাত হইতে দেশে আসিয়াছিলেন তখন সমাজ ও আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে গ্রহণ না করায় তিনি তাঁহার বাস্তুভিটা বিক্রয় করিয়া বোম্বাইটি হইতে বাস করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় বর্ত্তমানে সমাজে অনেক উদারতা আসিয়াছে। এবার সরোজিনী দেশে গিয়া এক আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। প্রবাসী সকলে তাঁহাকে এবং তাঁহার বর্ত্তমানের উপযোগী সম্মান দিয়াছেন —আমাদের আনন্দের বিষয়। বেশবাসী যদি তাঁহার পিতাকে তখন সমাজে গ্রহণ করিতেন তবে সেও সমাজে বঙ্গবাসী আরও কি অধিক বেশী করিয়া পাইতাম না? দুঃখ করিবার নাই; সেও জননী আজ শুধু বাঙ্গলার নহে তাহার বাণীর কন্যা।

উচ্চশিক্ষায় মেয়ে —

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন কুমারী রামেশ্বরী নেহরু। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মিস্ হুদয় রামস্বামী-বি-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স প্রাপ্ত হইয়াছেন। মেয়েরা একেবারেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পুরুষদিগের উপরে স্থান পাইতেছেন। পুরুষদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, মেয়েদের যদি সেরূপ থাকিত তবে তাঁহারা যে বরাবরই পুরুষদের উপরে স্থান পাইতেন ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহাতে আমরা মেয়েদের বেশী বাহাদুরী দিতে চাই না, কারণ আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার ভিতর মেয়েলী বিদ্যার চেয়ে বেশী কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

বিদুষী মহিলা—

বোম্বাইএর ডক্টর মিস্ কমুদ মেটা এম-বি-এস ডাক্তারীর এম্ এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী বিদ্যায় আরও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এডিন্‌বরা যাইতেছেন। মিস্ মেটা একজন গুজরাটী মহিলা, উঁহার বয়স মাত্র বাইশ বৎসর। বাঙ্গালী মহিলাদের অনেক বিলাত গিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এ সব বিষয়ে উৎসাহ কই?

তমলুক মডেল বালিকা বিদ্যালয়—

তমলুক মডেল বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়টিকে আরও উন্নত করিয়া মধ্যবঙ্গলা পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বর্ত্তমান বৎসরে এই বিদ্যালয়কে এক হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। তমলুক বড় সহর নহে, তথাপি তথায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক মহকুমায় মেয়েদের জন্য অন্ততঃ একটি মধ্যবাঙ্গলা বিদ্যালয় থাকা দরকার।

ভূপালের বেগম—

ভূপালের অধিশ্বরী বেগম সাহেবা নারী হইয়াও এতদিন যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। এইবার তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নবাবজাদা হামিদুল্লা খাঁ সাহেবের হস্তে রাজ্যভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার অবসরগ্রহণও উপযুক্ত বুদ্ধির পরিচায়ক।

কাউন্সিল নির্ব্বাচনে মহিলা—

আমরা সর্ব্বশেষে কাউন্সিলের নির্ব্বাচন-বিধি সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করিয়াছি যে, আসাম কাউন্সিল যদি একমাসের মেয়াদ দিয়া এই মর্ম্মে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, আমাদের মহিলা সদস্য বা মহিলাদের কোন শ্রেণী বিশেষকে কাউন্সিল নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার দেওয়া হউক, তাহা হইলে আমার সরকার সেইভাবে বিধান জারী করিবেন।

পুটিয়ার রাণীর সৎকর্ম্ম —

রাজসাহীর পুটিয়ার রাণী তাহাদের অনেক তর্কক্ষেত্রে মধ্যবর্ত্তিনী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার বুদ্ধিবিচার পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি রাজসাহী সহরের

জন্মের কলের জন্য এক লক্ষ টাকা, এবং মাদ্রাজী জনৈক এম-এ ও বি-এল্ স্বাক্ষর করিয়া জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিবার স্থির করিয়াছেন। বাংলাদেশ ত দিন দিন ধ্বংসের পথেই চলিয়াছে, তবে এইরূপ মহানুভব লোকের চেষ্টায়ই যা কিছু রক্ষা পাইতেছে।

চমৎকার টনিক—

আস্থাসমাচার, ৪৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত আস্থা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা বলেন—হাসো, সতীর দুঃখেও হাসিবার চেষ্টা কর। হাসির চেয়ে চমৎকার টনিক আর নাই। প্রাণ খোলা হাসি পরমায়ু বৃদ্ধি করে, দুশ্চিন্তা ও ভাবনা অর্দ্ধেক আয়ু কমাইয়া দেয়। কাজে অকাজে চিত্তকে আনন্দের রসে রঞ্জিত রাখ, জীবনের সাফল্যের কথা সর্ব্বদা স্মরণ কর। আত্মা তোমার অমর, অপরাজেয়। সুস্থ, শক্তিমান ও সদাকার সুখীর সহিত বসবাস কর। অসুখের ন্যায় সুখও সংক্রামক। কেহ দুঃখবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে 'বেশ ভাল আছি' এই কথা বলিতে অভ্যাস কর।

কুপ্রথার আমদানী—

আস্থাসমাচারে অনিচ্ছাকৃত সন্তান জন্ম না হইবার পক্ষে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ-লেখক প্রমাণ করিতে চান, সন্তান জন্ম নিয়মিত করণ অর্থাৎ ইচ্ছার অতিরিক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ না করা সম্বন্ধে নিয়মাদি প্রত্যেক স্বামী স্ত্রীর জানা দরকার। যাঁহারা বিলাতী ভালমন্দ প্রথাগুলি আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন, এটি তাঁহাদেরই পক্ষের কথা। বিলাতে ডিভসাধনী-কেন্দ্র হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে একটি আইন জারী করা হইয়াছিল যে, গর্ভ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কোন আলোচনা দেশে প্রচারিত হইতে পারিবে না। সম্প্রতি লর্ড বাকমাষ্টার নামীয় এক ব্যক্তির চেষ্টায় উক্ত আইন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিলাতী ভালমন্দ কোন কিছুই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর হইতেছে না, কাজেই ওসব বালাই আমদানী না হওয়াই ভাল।

ইংরাজ-মহিলার ভারত-প্রীতি—

মিস্ ম্যেড্ নামী একটি ইংরাজ মহিলা ভারতে আসিয়া মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যা হইয়া সবরমতী আশ্রমে বাস করিতেছেন। সেখানে তিনি সকল প্রকার বিলাতী ভাব পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় নারীর পবিত্র আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেদাবাদের এক মহিলা সভায় তিনি বলিয়াছেন—'ইংলণ্ডে আমি আশ্রয় পাইতাম না। ইয়ুরোপীয় সভ্যতার বিষয় ভাবিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইতাম। অন্যায়-বোধই যত অনিষ্টের মূল, ইয়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা মানুষের অন্যায়-বোধ ক্রমেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।' মিস্ ম্যেডের এই উক্তি ভারতীয় আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদিগকে অনেক শিক্ষা দিবে।

ভেদনীতি—

রাস্তার প্রবেশের আশপাশের সময়ের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ অস্পৃশ্য লোকদিগকে মন্দিরে যাইবার রাস্তায় চলিতে বাধা দিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি এইরূপ একটি মকর্দ্দমার বিচারে জজ রায়ে লিখিয়াছেন, এই সমস্ত রাস্তা কাহারো নিজের বা পৈত্রিক সম্পত্তি নহে, যাহি যাহারই ইহাতে গমনাগমনের অধিকার আছে। ভারতের দুর্ভাগ্য, এখানে মানুষ এত ভেদবুদ্ধিতে পোষণ করে যে, সে সাধারণ রাস্তায় দেশবাসীর গমনাগমনের বাধা দিবারও প্রয়াস পায়।

অদ্ভুত মেয়ে—

কেন্টাকিতে মেরিডিথ ট্যাবলী টেইলার নামী একটি তিন বৎসরের মেয়ে আছে। তাহার ওজন একশত চৌদ্দ সের। আমাদের দেশের সাধারণ পূর্ণ বয়স্কা মেয়েদের ওজনও প্রায় ঐ রকম অর্থাৎ একশত দশ সের হইতে পঁচিশ সের পর্য্যন্ত।

মোটর বাসের উৎপত্তি—

একশত বৎসর পূর্ব্বে ঘোড়ায় টানা বাসের প্রচলন হয়। মোটর বাসের উৎপত্তি হইয়াছে বিশ বৎসরের অধিক নহে। কলিকাতায় বর্ত্তমানে প্রায় ৪০০ মোটর বাস চলিতেছে। লণ্ডনের মোটর বাসের সংখ্যা বর্ত্তমানে ৩৮২০০।

সন্দেহে পত্নী হত্যা—

আয়ার্লণ্ডের নরফোক নামক এক তরুণ বয়স্ক যুবা তাহার নব পরিণীতা পত্নীকে ছোরায় আঘাত করিয়া, নিজেই পুলিশ থানায় উপস্থিত হইয়া খুনের সংবাদ প্রদান করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ পাঠান হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। বালিকা বধূর চরিত্রের উপর সন্দেহ হওয়াতেই নাকি সে তাহাকে খুন করিয়াছিল।

পত্নী বিক্রয়ের চেষ্টায় দণ্ড—

বরদা গোস্বামী তাহার পত্নী লক্ষ্মীকে কুসুমিনী বৈষ্ণবীর বাড়ীতে লইয়া গিয়া সুরেন্দ্র সাহার নিকট বিক্রয় করায় অভিযোগে এবং কুসুমিনী ও সুরেন্দ্র তাহাকে ঐ কার্য্যে সাহায্য করিবার অভিযোগে দিনাজপুরের মাননীয় জজ মিষ্টার ডি ডিকেন্সের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারক বরদা গোস্বামীকে ৫ বৎসর, সুরেন্দ্র সাহাকে ৩ বৎসর ও কুসুমি বৈষ্ণবীকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন।

শিয়ালে বানরে বিবাহ—

"অমৃতবাজারে" প্রকাশ, নবীগঞ্জ থানার এলাকায় পাঁচপৌকি গ্রাম, হরিয়ারপুর ও অন্যান্য গ্রামে এক বৃহৎ বানর দুইটি শৃগালসহ একত্র অবস্থান করে। প্রায়ই আসরকে একটি শৃগালে আরোহণ ও অপর শৃগালের কাণে ধরিয়া এক সঙ্গে ঘোড়াইতে দেখা যায়। আবার লোকের বাড়ী হইতে হাঁস পাওয়া ইত্যাদি ধরিয়া আনিয়া শৃগাল দুটীকে আহারার্থ দিয়া থাকে।

মাতৃ-মন্দির

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৪র্থ বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৩৩ | ৪র্থ সংখ্যা

আহ্বান

শ্রী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

ফিরে এসো পল্লীমাঝে
পল্লীমায়ের দুলাল সব,
আবার ঘরে উঠুক ফিরে
ঘরের ছেলের কলরব।
মায়ের পূজার আঙিনাটি
ঝাঁটিয়ে কর পরিষ্কার ;
কোথাও যেন ময়লা মাটি
কিছুমাত্র রয় না আর।
ছিটাও পূত প্রীতির বারি,
আজ যে পূজা মহোৎসব ;
এসো আমার মায়ের ছেলে—
এসো আমার ভাইরা সব !
তরুর বীথির ছায়ায় প্রীতি
শান্তি দেবে হিয়ার পর ;
ফুটবে নয়ন বুঝবে তখন,
কে আপন আর কেবা পর !

(২)

ঐ দেখ ভাই, তোমার হেলাই
ভেঙে দিলে মায়ের বুক ;
তা'তেই জীর্ণ শরীর শীর্ণ,
অভাব-কাতর-মলিন মুখ।
মুছাও মায়ের অশ্রু রাশি,
ঘুচাও মায়ের অভাব সব ;
দেখাও আবার সাধন বলে
জাগতে পারে শ্মশান-শব।
স্পর্শমণির পরশ দিয়ে,
সোণায় ভ'রে দাও না ঘর ;
ফুটাও মায়ের মুখের হাসি,
ঘরে এসো অতঃপর !
জাগাও আবার ভাইগুলিকে,
আনাও উষার আগমন ;
চালাও তা'দের কর্ম্মপথে,
দাও না প্রীতির আলিঙ্গন।

(৩)

ঐ দেখ ভাই তা'র কিছু নাই
ছিল যা' এ পল্লীমা'র ;
কোথায় স্বাস্থ্য, কোথায় শক্তি,
কোথায় তেমন হাস্য আর ?
দীঘি-পুকুর শুষ্ক এখন,
দারুণ গ্রীষ্মে নাইত' জল ;
শুষ্ক কণ্ঠের ফুটফুটানি !—
এ যে আজ কর্ম্মফল !
পল্লীবাসীর নাই সে হাসি,
সবাই এখন ম্রিয়মাণ ;
গোষ্ঠে আর ছোটে না ধেনু,
বেণুতে আর নাই সে গান !
কলের মানুষ কলে চলে,
প্রাণের সাড়া পাইনা আর ;
কোন পাপে আর কা'র শাপে আ'জ
পল্লী এমন অন্ধকার !

(৪)

তেম্‌নি আলোর তুফান তুলে
তেম্‌নি উষাই রোজ আসে ;
তেম্‌নি পাখী গায় প্রভাতী,
তেম্‌নি ক'রেই ফুল হাসে।
তেম্‌নি ক'রেই ভোরের পবন,
নাচিয়ে চলে ফুল-পাতা ;
তেম্‌নি আসে জাগরণের
পুলক-পরশ প্রাণদাতা।
কিন্তু এ সব উপভোগের
তেমন মানুষ আর ত' নাই ;
হৃদয় এখন শুষ্ক সবার,
অভাব ভরা জীবনটাই !
তা'র উপরেও নিত্য অভাব
সৃষ্টি করি, দৃষ্টি হীন ;
ধ্বংসলীলার তাণ্ডবে ভাই
জাতির জীবন ক্রমেই ক্ষীণ।

(৫)

ঘরের ছেলে ঘরে এসো,
খুলে পরের মোহ-ফাঁস।
ভাইকে ডাকো, কাছে থাকো,
ঘুচাও ভাইএর সকল ত্রাস।
আসছে ফিরে ঘরের ছেলে,
প'ড়ল সাড়া চা'র পাশে ;
ঐ দেখ ভাই আকাশ-বাতাস
ভ'রে গেছে উল্লাসে !
বিলম্ব আর সহেনা, গাহে
পঞ্চমে পিক আবাহন ;
প্রাণের পুলক রহেনা চাপা,
ভ্রমর করে গুঞ্জরণ।
দোয়েল-শ্যামা গান ধ'রেছে,
তান তুলেছে পাপিয়া ;
পল্লীমায়ের উৎসাহ আ'জ
রাখবে কে আর চা'পিয়া।

(৬)

এসো রে ভাই সবাই মিলাই
পল্লীমায়ের পূজার ঘর ;
বাস্তদেবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা—
ক'র্‌তে হ'বে অতঃপর।
জেগেছে আ'জ প্রাণের ঠাকুর,
চাইছে শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য দান ;
আর কেন ভাই, আগে চল,
মুক্ত কর রুদ্ধ প্রাণ।
ভক্তি ভরা চিত্তে এসো
মায়ের পূজা-আঙিনায় ;
সাধক তোমার সাধক-জীবন,
বৃথা যেন নাহি যায় !
পাওনি কি আ'জ মায়ের সাড়া—
পল্লীমায়ের দুলাল সব ?
আজ যে মায়ের আঙিনাতে
মাতৃপূজার মহোৎসব। *

* শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মিলনীর ৮ম অধিবেশনে পঠিত। ২২শে শ্রাবণ, ১৩৩৩।

শক্তি-সাধনা

শ্রী উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সবভাবে শক্তি পূজিত। যখনই যেখানে শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে তখনই সেখানে দুঃখ, অপমান ও লাঞ্ছনার ঝড় বহিয়াছে। দুর্ব্বলতা সকল দুঃখের আকর। নীতিকার স্পষ্টই বলিয়াছেন 'ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্'। দুর্ব্বলের গৌরব ত নাই-ই, তার বাঁচিয়া থাকাও দায়। শান্তি ও মুক্তির সুরস ফল আস্বাদন করিতে হইলে কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে শক্তিই একমাত্র আশ্রয় স্থল। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যুগে যুগে মানবজাতি সাধনা দ্বারা এই মহাশক্তিকে অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। যে সময়ে যে জাতি শক্তিসাধনায় যত বেশী অগ্রসর হইয়াছে, সে সময়ে সেই জাতির গৌরব প্রভাব তত বেশী পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়া তাহাকে উন্নতির উচ্চাসনে প্রস্থাপিত করিয়াছে। আত্মতত্ত্বান্বেষী ঋষিরাও শক্তির অত্যাবশ্যকতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া শ্রুতিতে জলদগম্ভীর ভাষায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

জগতের যে কোনও কর্ম্মে বেশীই হউক আর কমই হউক শক্তি চাইই চাই। শক্তি ছাড়া কোন কিছু সাধিত হয় না। জগৎসৃষ্টির উৎস এই শক্তি, তাই বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতিকে 'মহাশক্তি' আখ্যা দেওয়া হয়। বৈদিক প্রার্থনার গোড়াতেই আছে "বলমসি বলং ময়ি ধেহি, তেজোঽসি তেজোময়ি ধেহি, বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি, ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি···" এইরূপেই ক্রমে শক্তিপূজা হিন্দু-জাতির অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। শক্তিসাধকদের ধ্যানমগ্ন চিত্তদর্পণে যত শক্তিমূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা দেখি যে সেই প্রণতমুদ্গরত্বৈরিনিহন্ত্রীদুর্গতিহারিণী মূর্ত্তিগুলি যেন স্বীয় শক্তি প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতাকে বিধ্বস্ত এবং অবনমিত করিয়া নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং জগতস্থ সকলকেই এই শিক্ষা অনুশীলনার্থ উৎসাহিত করিতেছেন। এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী বিশ্বজননীই চণ্ডীতে 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' বলিয়া বিঘোষিতা।

অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, কূটস্থ ব্রহ্ম চৈতন্য এবং তাঁর প্রকাশ লীলাশক্তিও তেমনই সম্পূর্ণ অভিন্ন। এই শক্তির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি জগতের প্রত্যেক নারী। জগতে যখনই পাপের মাত্রা বাড়িয়া বিশ্ব বিপত্তি ও অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, তখনই এই নারীজাতির কেন্দ্রশক্তি স্বরূপিনী বিশ্বমাতা উৎপীড়িতদের আর্ত্তনাদে জাগ্রত হইয়া সকল বিপদ নাশ করতঃ জগতকে সুখ ও শান্তিময় করিয়াছেন। জগতে যখনই যা কিছু মহৎ ও গৌরবময় কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে শক্তিরূপা কোন-না-কোন নারীর প্রভাব সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে অন্তর্নিহিত।

নারী শুধু সৌন্দর্য্য বিলাসের পুত্তলিকা অবলা নহেন, নারী মহাশক্তিশালিনী, বীরবরবিলাসিনী, বীরপ্রসবিনী, জগতপালিনী, মাতৃমূর্ত্তি! 'দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলম্'—চণ্ডীর ঋষি জগন্মাতার স্বভাব এইভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। তাই এই মাতৃশক্তিই সর্ব্ব-প্রথমে অসুর-শক্তিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়াছিল। মাতৃশক্তি প্রভাবেই রাঘবেন্দ্র লঙ্কাজয়ী। এই মাতৃশক্তিই পাণ্ডবদিগকে বিজয়গৌরবে বিমণ্ডিত করিয়াছিল। নারী শক্তিই ইসলাম যুবককে কারবালার সমর-মরু-প্রাঙ্গনে ধর্ম্মার্থে মৃত্যুবরণ করিতে সমুৎসাহিত করিয়াছিল। আলেকজেণ্ডার এবং নেপলীয়ানের দিগ্বিজয়-মহাযজ্ঞে এই নারীশক্তিই ঘৃতেক্ষন যোগাইয়াছিল। কার্থেজের বীরকেশরী হানিবল ও স্পার্টানদের জ্বলন্ত বলসঞ্চারণে, মৃতপ্রায় ফরাসীজাতির জাগরণে এবং অভিনব ইংরেজ জাতির অভ্যুত্থানে এই নারীশক্তিই ক্রিয়াশীলা। রাজপুতদের বীরত্বকাহিনী এবং শিখজাতির সিংহবিক্রম নারীশক্তির প্রভাবে মহিমান্বিত! ভারতের ইতিহাসে চিতোরের পদ্মিনী, গরমণ্ডল-রাণী

দুর্গাবতী, টোঙ্কের অধিপতি সুরতনদুহিতা তারাবাই, জয়নগরপত্নী কর্ণদেবী, পুত্তমায়া কমলাবতী, পুত্তসহোদরা কর্ণবতী, পৃথ্বিরাজ-পত্নী তারাবাই, সমরসিংহ-পত্নী কর্ণদেবী, বীরবালা ও বীরেন্দ্রমায়া সংযুক্তা, মালবরাজ্ঞী অহল্যাবাই, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই ও তদীয়া সহোদরা, সুলতানা রিজিয়া, দিল্লীসম্রাজ্ঞী নুরজাহান, দাক্ষিণাত্যের বরারী অধিশ্বরী মালবাই নেসাইন্, আমেদনগরের আদর্শচরিত্রা বীররমণী চাঁদবিবি, তেজস্বিনী অযোধ্যার বেগম, রাণীভবানী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী রাসমণি ইত্যাদি বহু বীররমণীদের কর্ম্মজীবন শৌর্য্যবীর্য্যের পরাকাষ্ঠাতে পরিপূর্ণ! জাতীয় উত্থানে পুরুষশক্তির যত প্রয়োজন তদপেক্ষাও নারীশক্তির অধিকতর প্রয়োজন। বিশেষতঃ জাতি অধঃপতনের অধস্তমস্তরে পৌঁছিলে তাহার ভিতর যখন নারীহরণ, ধর্ষণ ইত্যাদি ভীষণ কলঙ্কর নারীনির্য্যাতন ব্যাপার মুহুর্মুহুঃ সংঘটিত হইতে থাকে, তখন পশুত্বের পদলেহী মানবকুকুরদিগকে সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য পুরুষশক্তি অপেক্ষা নারী-শক্তিই অধিকতর কার্য্যকরী। সকল নারীকেই একথাটা বিশেষ ভাবে বুঝিয়া রাখা দরকার যে, তাঁহাদেরই জাতীয় যে কোন ভগ্নীর অত্যাচার, অপমান হইলে তাহা তাঁহাদের সকল নারীজাতির উপরই হইল। সুতরাং এই অত্যাচারীদিগের পশুত্ব দলনার্থ প্রত্যেক নারীকেই 'দুর্বৃত্ত বৃত্তশমনং তব দেবি শীলম্' এই মন্ত্রের সত্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।

যে সকল দুর্বৃত্ত নারীনির্য্যাতনে সমুৎসুক তাহাদের মাতা, ভগ্নী, পত্নী এবং অন্যান্য নিকট ও দূর আত্মীয়া সকলেরই আছেন। নারীর মান রাখিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়া সকলেই যদি ঐ দুর্বৃত্তকে ঘৃণা, ভৎর্সনা ও শাসন করিতে থাকেন তবে তাহার দুষ্প্রবৃত্তি অনুপলার্দ্ধ কালও তিষ্ঠিতে পারে না। যদি সকল নারীজাতি নিজেদের নারীত্বের লাঞ্ছিত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চান, তবে প্রত্যেকে আবার রণরঙ্গিনীরূপ ধারণ করুন! পুরুষের অভিভাবকতায় ও পুলিশের পাহারায় নারী-নির্য্যাতন দমিত হইবে না—নারীরা নারীদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত বদ্ধপরিকর হইবেন, ততই অত্যাচার অপমান প্রশমিত হইবে। এই বাক্যের ভূরি ভূরি সত্য প্রমাণ জগত ব্যাপারে পরিলক্ষিত হইয়াছে, সংক্ষেপে একটির উল্লেখ করিতেছি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সহধর্ম্মিণী শ্রীমা সারদামণি দেবী একসময়ে কতিপয় আত্মীয় ও আত্মীয়ার সহিত পদব্রজে তেলোভেলো ও কৈকালার সুবৃহৎ জঙ্গলা-কীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিতেছিলেন। ঐসব স্থলে দস্যুদের খুবই উৎপীড়ন ছিল। সেদিন রাত্রি হইয়া গিয়াছিল এবং সকলেই দূরবর্ত্তী তারকেশ্বরের চটীতে পৌঁছিবার জন্য দ্রুত চলিতেছিলেন। সারদাদেবী খুব ক্লান্ত হওয়ায় সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের ঢের পশ্চাতে, এমন কি দৃষ্টির বাহির হইয়া পড়েন। তিনি সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রাণপণে হাঁটিতে লাগিলেন, এমন সময় হঠাৎ এক ভীষণাকৃতি ডাকাত প্রকাণ্ড লাঠিহস্তে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। সারদাদেবী ভয়ে জড়সড় এবং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাবা! বাছা! সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে সঙ্গীদের কাছে পৌঁছাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ডাকাত কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার প্রাপ্তব্য কিছু আছে কিনা দেখিবার জন্য সারদাদেবীকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া গেল; এমন সময় ডাকাতপত্নী যুবতীরমণীর কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া বিদ্যুৎবেগে দৌড়াইয়া আসিয়া স্বামীকে বাধা দিল, এবং ভয় নাই বলিয়া সারদাদেবীকে বুকে টানিয়া লইল। পরে সে তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া ও সেবা যত্ন করিয়া সঙ্গীদের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। ডাকাতপত্নী অসহায়া স্বজাতীয়ার সম্মান রক্ষার্থে ব্যাকুলা না হইলে সে রাত্রে ডাকাতের হাতে তাঁহার কি লাঞ্ছনা হইত কে জানে?

দেশের ও জাতির বর্ত্তমান দুরবস্থার দিনে নারিজাতির ভিতর এবম্বিধ স্বজাতিপ্রীতি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়া একান্ত আবশ্যক। আজকাল প্রায় সকল সম্প্রদায়ের নারীজাতির ভিতরেই সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। খুবই আনন্দের কথা—তবে এমন একটা নারীমহামণ্ডল হওয়া দরকার যেখানে সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের নারীমাত্রেই মিলিত হইয়া, পরস্পরের প্রীতিবিনিময়ে নারীত্বের সমসূত্রে গ্রথিত হইতে পারেন এবং নিজেদের

উন্নতিবিধানে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারেন। নরওয়ের নারীজাতির উন্নতিকল্পে উৎসর্গপ্রাণা এল্স মার্গারেট হোম্‌প্রেন্ তাঁহার ভারতীয় ভগ্নীগণকে সম্বোধন করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তার উপসংহারে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—"যতদিন নারীজাতি সুদৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্মিলনের উপকারিতা উপলব্ধি করিতে না শিখিবে, ততদিন তাহারা কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারিবে না এবং জগতের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া মানবসমাজের চরম কলঙ্কর যুদ্ধ ও অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিবে না। সারা বিশ্বের নারীজাতি যদি শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার জন্য পবিত্র স্নেহপূর্ণ ভগ্নিপ্রেম নিজেদের ভিতর স্থাপন করিতে পারেন তবে দায়িত্বপূর্ণ জননীত্বলাভ অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান কর্ম্ম সাধিত হইবে।" কেবল জুতা, চশমা ও গাউন পরিয়া ভোটের অধিকার পাইলেই নারী-জাতির উন্নতি সাধনের যথেষ্ট হইবে না, অথবা ঘোমটা টানিলেই লাজ মান রক্ষা হইবে না; নারীজাতির মান মর্য্যাদা, ধর্ম্ম ও সতীত্ব রক্ষার জন্য যত কিছু আবশ্যক তৎসমুদয় সাধন করিবার জন্য নারীমাত্রকেই প্রস্তুত হইতে হইবে।

নারীজাতির দৈহিক গঠনের বৃথা দোষ ত্রুটি এবং স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার মিথ্যা কারণ দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে শারীরিক শক্তি অর্জ্জনে বিমুখ করিতে অনেকেই প্রয়াস পাইতে পারেন; কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের দেশেই মেয়েরা কঠোর যুদ্ধাদিতেও অশেষ পারদর্শিতা যুগে যুগে দেখাইয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা দেহ পুষ্টি ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য যথারীতি ব্যায়াম, খেলা ইত্যাদি ত করিয়াই থাকেন, এমন কি সৈনিকদলে ভর্ত্তি হইয়া বন্দুক ইত্যাদি লইয়া যুদ্ধ শিক্ষা বিষয়েও যথেষ্ট অগ্রসর হইতেছেন। আমাদের দেশেও বরোদারাজ্যে, পুণাতে, পাঞ্জাবে, রাজপুতানায় এবং অন্যান্য বহু স্থানে মেয়েরা ডন, কুস্তি, মুগুর ভাঁজা ও অন্যান্য বিবিধ ব্যায়াম রীতিমত অভ্যাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অঙ্গ পুষ্টি ও সৌন্দর্য্য হিসাবে বঙ্গললনাদের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর। কেবল কেশবিন্যাস ও বেশ বিন্যাসেই সৌন্দর্য্য বাড়ে না, প্রকৃত সৌন্দর্য্য পুষ্ট ও সবল দেহেই বিরাজিত। আমেরিকাতে মিস্ রোজালিণ্ড স্মিথ্ নামে এক রমণী 'নিখুঁত সুন্দরী' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন —কেবল মাত্র তাঁহার দেহের অসাধারণ পরিপুষ্টি ও বলিষ্ঠতার জন্য। তাঁহার দেহসৌষ্ঠব নিখুঁত হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—রাত্রে ৯ঘণ্টা খোলা বায়ুতে নিদ্রা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম (আমাদের অবহেলার নাকটেপার প্রাণায়াম), দৈহিক শ্রমব্যায়াম ও মিষ্টান্নপিষ্টক বর্জ্জিত আহার।

আমাদের বাঙ্গালার মাটিতেও এমন মাটি মহিলারত্নের কথা শুনিয়াছি যাঁহারা লাঠিখেলায় বিশেষ পারদর্শিণী। বিজ্ঞানাচার্য্য-সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা অবলা বসুও কিছুদিন নিয়মিত লাঠিখেলা অভ্যাস করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই মেয়েদিগকে এমন ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক যাহাতে তাঁহাদের দেহে শক্তি এবং হৃদয়ে সাহস জন্মে এবং তাঁহারা প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নারীধর্ম্মকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বপ্রকারে আত্মরক্ষার সামর্থ্য বাড়াইতেই হইবে। ব্যায়াম শিক্ষার বইয়ের আজকাল অভাব নাই, তাছাড়া সুপ্রসিদ্ধ লাঠিখেলোয়ার শ্রীযুক্ত পুলিন দাস প্রণীত 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা' বইয়ের সাহায্যে গৃহে থাকিয়া নিজেরাই সব ইচ্ছামত অনুশীলন করিতে পারিবেন। মায়ের জাতিরা শরীর গঠনে ও শক্তি অর্জ্জনে মনোযোগী হইলে আলস্যের ক্রোড়ে তন্দ্রাগ্রস্ত সিংহসম সন্তানজাতি আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিবে এবং স্বতঃই মাতৃপদাঙ্কানুসরণে অভ্যস্ত হইয়া নিজেরাও শক্তিমান্ হইবে।

গায়ে জোর থাকিলে এবং ডন কুস্তির কৌশল জানা থাকিলে অনেক সময় মেয়েরাই যে দুর্ব্বৃত্তদের পিশাচ প্রবৃত্তি দমন করিতে সমর্থ হন তার দুইটি সত্য ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমারই এক পূজনীয়া আত্মীয়া তাঁহার পৈত্রিক গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, এখনও তিনি অন্যত্র এই কাজে নিযুক্তা। তাঁহার শিক্ষাধীনে কয়েকটি বালিকা ব্যায়াম কুস্তি ইত্যাদিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া-ছিলেন। একটি মেয়ের লম্ফপ্রদান ও বিবিধ ব্যায়াম কৌশল আমি স্বচক্ষে দেখিয়া যে কি আনন্দ পাইয়াছিলাম

তাহা অবর্ণনীয়! শিক্ষয়িত্রীর মুখে সেই মেয়েটির সম্বন্ধেই একটি ঘটনা শুনিয়া ততোধিক আনন্দ পাইয়াছিলাম। মেয়েটির বয়স তখন ১৩ বৎসর। তাঁহার শরীরে যেমন শক্তি, ব্যায়ামচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে দেহও তেমনই বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। মেয়েটি একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীর সংলগ্ন একটা বাগানে একলাই বেড়াইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহাদের বাড়ীরই একটা যুবক চাকর আসিয়া বাগানে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া বালিকা প্রথম মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্যই হয়ত ডাকিতে আসিয়াছে; কিন্তু ক্রমেই সে নিকটবর্ত্তী হইয়া কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী করিয়া যেমন বালিকাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল, বালিকা পাষণ্ডের কু-মতলব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে কৌশল ক্রমে প্যাঁচ মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন এবং বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া এম্‌নি জোরে কিল, ঘুষি ও চড় মারিতে লাগিলেন যে, মারের চোটে সেই পাপাত্মা প্রথমে ধীরে ধীরে ও পরে সজোরে 'মাগো গেলাম' বলিয়া চিৎকার করিতে বাধ্য হয়। তচ্ছ্রবণে বাড়ীর লোক আসিয়া সব দেখিয়া ও শুনিয়া পশ্চাধম চাকরকে তৎক্ষণাৎ তাড়াইয়া দেন এবং মেয়েকে অশেষ ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।

নীচের কাহিনীটি শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীগৌরী মায়ের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম সেইরূপই লিখিলাম—

অনেক বছর আগেকার কথা—কালীঘাটের শ্রীশ্রীজয় কালী মন্দিরের অদূরে এক বিধবা ব্রাহ্মণী তাঁহার কয়েকটি ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বাস করিতেন। তখন কালীঘাটে অত ঘন বসতি ছিলনা, খুব বন জঙ্গল ছিল। একদিন গভীর রাত্রে সেই ব্রাহ্মণী ঘরে বসিয়া কোন গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত,এমন সময় দূর হইতে কোনও বিপন্ন রমণীর চিৎকার-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। শুনিবামাত্র তিনি ব্যাকুলা হইয়া তাঁহার যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে আলো ও লাঠি লইয়া অগ্রসর হইতে আদেশ ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তাহারা রাজি ত হইলই না বরং গায়ে পড়িয়া পথের বিপদ মাথায় লইতে ব্যাকুলতার জন্য পিসিমাকে বেশ দশকথা শুনাইল। প্রৌঢ়া পিসিমা তেজবীর্য্যহীন কাপুরুষদের কথায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং আর কথাটি না বলিয়া বিপন্ন স্বজাতীয়ার উদ্ধারের নিমিত্ত নিজেই একহাতে লণ্ঠন ও একহাতে একগাছি মজবুত লাঠি লইয়া ঘটনাস্থলের দিকে ছুটিলেন। পিসিমাকে তদবস্থায় যাইতে দেখিয়া যুবকদেরও কেহ কেহ কোমরে জোর বাঁধিয়া পেছনে পেছনে ছুটিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তিনি উৎপীড়নকারী পশ্চাধমদিগকে যথোচিত 'লাঠ্যৌষধি' দানে বিপন্নার উদ্ধার সাধন করেন।

এইরূপ কাহিনী শুনিয়া কাহার না প্রাণে আনন্দ জাগে? কোন কোন রমণী আততায়ীর প্রাণনাশ করিয়া অথবা পাষণ্ডকে জখম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা হইয়াছেন এরূপ সত্য ঘটনা আজকাল প্রায়ই খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়া দৈহিক শক্তি ও মানসিক সাহসের নিজস্ব ঘোষণা করিয়া থাকে। সত্য সত্য সেইদিনই শক্তি সাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করিবে, যেদিন শক্তিরূপে অবতীর্ণা প্রত্যেক রমণী যথার্থ শক্তিমতী ও বীর্য্যবতী হইয়া নারীধর্ম্মের বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থা হইবেন।

শ্রাবণ-প্রাতে

শ্রীমতী অরুণা দেবী।

আজকে মায়ের রূপ ফুটেছে পল্লী-আঙিনায়
শ্যামল ক্ষেতে মায়ের হাসি উছ্‌লে পড়ে হায়!
কানন রাজি সবুজ শোভায় ভড়িয়ে দেছে কে?—
আজ শ্রাবণের স্নিগ্ধ প্রাতে মা এসেছেন যে।

চারদিকে ওই গড়িয়ে পড়ে মায়ের স্নেহ রাশি,
নদীর বুকে মা'র করুণার বাণ এসেছে ভাসি;
সবার তরে আশীর্ব্বাণী আজকে মায়ের করে,
শ্রাবণ-ধারায় মা'র আঁচলের মুক্তা-ধারা ঝরে।

খেয়ার শেষে

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(১)

সত্যই সংসারে অমিয়ের মা উমার সুখের কোন আশাই ছিল না। লোকে বলে তিনি সুগৃহিণী হইতে পারেন নাই সে কেবল তাঁহার নিজের দোষে। লোকের এ কথা তিনি শুনিয়া যাইতেন, বুঝিতে পারেন না, কি দোষে তিনি সুগৃহিণী হইতে পারেন নাই, কি পাপে তাঁহার সব থাকিয়াও কিছুই নাই। তিনি অল্পভাষিণী ও অত্যন্ত শান্তস্বভাবা ছিলেন, এই তাঁহার অপরাধ। কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না, যে যত অত্যাচার করিত তাঁহার উপর দিয়াই সব চলিয়া যাইত।

অনন্তবাবু ছিলেন অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির লোক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নিজের জিনিষটী তিনি কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতেন, কেহ যেন তাঁহাকে এতটুকু জিনিষ ফাঁকি দিয়া না লইতে পারে, কিন্তু পরের বেলায় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন, পরের কথা কিছুতেই তাঁহার কাণে যাইত না। তাঁহার কথাগুলি ছিল এমনি কঠোর যে কেহ একবার কখনও তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছে সে আর কখনও আসিতে চাহিত না। অবশ্য যেখানে স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে তিনি সে প্রকৃতির মানুষ থাকিতেন না। প্রজা ও বাড়ীর সকলের কাছে তিনিই যে প্রভু এইটা জানাইবার জন্য সদা সচেষ্ট থাকিতেন। প্রজারা এইরূপ পীড়ক জমীদারের জমীতে বাস করিয়া সুখী ছিল না। অনেক সময় তিনি সেকালের ভাবে প্রজাশাসন করিতে গিয়াছেন কিন্তু পুলিসের সহায়তায় প্রজারা তাঁহাকে সেরূপ শাসনে প্রবৃত্ত হইতে দিত না। যদি প্রজারা একটু স্বাধীন মত ব্যক্ত করিত, প্রকাশ্যে না হোক, গোপনেও তিনি তাদের অনিষ্ট করিয়া ছাড়িতেন, প্রজারা জানিতে পারিয়াও প্রমাণ অভাবে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিতে পারিত না। এই কারণে জমীদারকে শত্রু মধ্যে পরিগণিত না করিয়া প্রজারা প্রাণপণে তাঁহার মন যোগাইয়া চলিত।

স্ত্রীকেও তিনি সর্ব্বরকমে দমন রাখিয়াছিলেন। অবশ্য যদি সেরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোক হইত তাহা হইলে এরূপ শান্তভাবে কখনই সে নির্য্যাতন সহ্য করিত না। সতীসাধ্বী উমা স্বামীর সকল প্রকার উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিতেন, গোপনে কেবল চোখের জল মুছিতেন। স্বামীর অবহেলা সহিয়া হৃদয়টা পাগলের মতই হইয়া গিয়াছিল তাঁহার, ইদানিন্তন অত্যাচারগুলো আর সেরূপ গভীর আঘাত প্রদান করিতে সমর্থ হইত না। পুত্র যেদিন স্পষ্ট তাঁহাকে অবহেলা করিল সেদিন তাঁহার মনে হইল কে যেন তাঁহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া সবেগে বহুনিম্নে নিক্ষেপ করিল।

তাহার পর শৈলবালার সহিত অমিয়ের যাবতীয় কথা—সবই তাঁহার কাণে আসিতেছিল। যতই তিনি পুত্রের ঔদাসীন্য অনুভব করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। পুত্র যে তাঁহাকে জননীরূপা অর্থলালসাময়ী রাক্ষসিনী স্থির করিয়াছে, তাহাই ভাবিয়া তিনি হৃদয়ে বড় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অভিমানে সারা হৃদয়খানি তাঁহার পূর্ণ হইয়া উঠিল,—সে এমনিই ভাবিল তাঁহাকে, মায়ের হৃদয় অনুভব করিল না?

সুদীর্ঘ দিনগুলি একে একে কাটিয়া যাইতে লাগিল। অন্তর্যামী অমিয় কলিকাতায় গিয়া দু তিন দিন অন্তর এক এক খানা সুদীর্ঘ পত্র দেয়, এবারে সে গিয়া একখানা পৌঁছান সংবাদও দিল না। পিতার নিকট একখানি কার্ডে পত্র দিয়াছিল মাসখানেক বাদে, কে কেমন আছে সে খোঁজটাও নেয় নাই, শুধু লিখিয়াছিল সে পৌঁছিয়াছে এবং ভাল আছে।

••মায়ের চোখের জল চোখেই শুকাইয়া গেল, কেহ জানিতেও পারিল না মাতৃহৃদয়ে কি অবর্ণনীয় যন্ত্রনা সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে।

কেবল একটু অনুভবে বুঝিয়াছিল শৈলবালা। রাত্রে সে উমার একপার্শ্বে শয়ন করিত, আর একপার্শ্বে সেই হত অনর্থের মূল অভাগিনী বালিকাটী ইহাদের উপর সকল ভার ফেলিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইত। সে এমন নিশ্চিন্তভাবে থাকিত যে সময় সময় শৈল তাহার উপর অনাবশ্যক রাগিয়া বলিয়া উঠিত, "এই পোড়ারমুখীর জন্যে বাড়ীর সব সুখশান্তি চলে গেল, সকলের মুখের হাসি গেল, যত হাসি বাস করছে ওর মুখে, দিন রাতই মরছেন ফিক্ ফিক্ করে হেসে।"

বাস্তবিক ইহার মুখে দিন রাতই হাসি দেখা যাইত। সে যে নিজেই অমঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি, ইহাদের সংসার-গগনে হঠাৎ ধূমকেতুর মত উদয় হইয়া অমঙ্গলের বীজ ছড়াইয়া দিয়াছে, তাহার গায়ের বাতাস লাগিয়া এ বাড়ীর সুখ শান্তি হাসি সব দূর হইয়া গিয়াছে, তাহা সে মোটেই ভাবিত না। শৈল সময় সময় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে সে কথা বুঝাইয়া বলিত, তখন খানিকটা সে গম্ভীর হইয়া থাকিত, তাহার বড় বড় চোখ দুইটী ধীরে ধীরে অশ্রুতে ভরিয়া উঠিত, কিন্তু সে কতক্ষণ? খানিক পরেই চিরাভ্যস্ত হাসিতে তাহার সারা মুখখানি আবার ভরাইয়া দিত।

যাদুড়ীর কাছে একটা দিনের তরেও সে আদর পায় নাই। উমা এই দীর্ঘ পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে একবারও তাহার দিকে ফিরিয়া চান নাই, সে যে জীবন্ত একটা প্রাণী তাঁহারই পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে কথা তিনি আদৌই জানিতে চান নাই। ইহারই জন্য তাঁহার বড় আদরের একটী মাত্র ছেলে অমিয়কে তিনি হারাইয়াছেন, এই কথাটা তাঁহার সারা হৃদয়খানাকে তিক্ততায় ভরিয়া দিয়াছিল।

তাঁহার ভাব দেখিয়া শৈলবালা অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া উঠিল। উমা একেবারেই প্রায় মুখ বন্ধ করিয়াছেন, নেহাৎ কথা না কহিলে যেখানে চলে না, সেখানে একটা ছোট্ট কথা বলিয়া কোনও মতে সরিয়া পড়েন। আহারে তিনি নামে বসেন মাত্র, যেমন ভাত তেমনই পড়িয়া থাকে, দু'চার গ্রাস কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়েন। তিনি তিল তিল করিয়া এই ঘৃণায় আত্মহত্যা করিবেন এটা আর কেহ না জানিলেও শৈলবালা বেশ জানিল। নিজের কার্য্যফলে সে ভারি অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কেন সে অমিয়ের সহিত তাহার কথোপকথন যাহা হইয়াছিল তাহা উমাকে জানাইয়াছিল, যদি সে সব কথাগুলি উমাকে না জানাইত তবে বুঝি ব্যাপারটা এতদূর গড়াইত না।

এখন কি করিলে এ ভুলটা শুধরাইতে পারা যায় তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। অনেক ভাবিয়া সেই দিন দুপুরে আহারাদির পরে চুপি চুপি সে অমিয়কে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিল। তাহার মনে খুব আশা ছিল, মায়ের এই অবস্থার কথা শুনিয়া অনুতপ্ত অমিয় নিশ্চয়ই ছুটিয়া আসিবে, আর পিতার ভয়ে যদি নাও আসিতে পারে, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিয়া নিশ্চয় পাঠাইয়া দিবে; সেই পত্রখানাই মাতা পুত্রের মিলনের হেতু হইয়া দাঁড়াইবে।

পত্রখানা গোপনে সে দাসীর হাতে দিয়া পোষ্ট করিয়া দিল। খুব আশার সহিত সে অমিয়ের পত্রখানা আসিবার পথপানে চাহিয়া রহিল।

সেদিন তাহার সেই আকাঙ্খিত পত্রখানা আসিয়া পড়িল। অনন্তবাবু মফঃস্বলে গিয়াছিলেন, দেওয়ানের কাছে পত্র আসিবামাত্র তিনি দাসীকে ডাকিয়া পত্র দিয়া পাঠাইলেন।

উমা তখন রন্ধনগৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন, শৈলবালা রন্ধন চাপাইয়াছিল। জমীদারের বাটী হইলেও এ বাড়ীতে পাচক পাচিকার মাথা গলাইবার যো ছিল না। বায়কুণ্ঠ অনন্তবাবু অনর্থক এ ব্যয়টা করিতে কিছুতেই রাজি ছিলেন না। ব্যয়ের ভয়ে জমীদার বাটী আত্মীয়স্বজন বিহীন, মাত্র কয়েকটি প্রাণী লইয়াই এ সংসার। তিনি স্পষ্ট বলিতেন "শুধু শুধু আবার একটা মানুষকে ভাত কাপড় মাইনে দিয়ে রাখা আমার ক্ষমতায় হবে না। সে রাখবে—যারা দু হাতে টাকা রোজগার করে—তারা। বাড়ীতে মেয়েদের চুপ চাপ

বলিয়ে রেখে শেষে যে আমায় রাতের ওষুধ আনতে কবিরাজের বাড়ী ছুটতে হবে তাতে আমি ভারি নারাজ।"

নেহাৎ কাজ না করিলে নয় তাই উমা কাজ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার মনটা সর্ব্বদা কোথায় যে পড়িয়া থাকে তাহা তিনিই জানেন। অন্যমনস্কভাবে তিনি তরকারী কাটিয়াই যাইতেছিলেন, সেই সময় দাসী পত্রখানা হাতে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল "আপনার চিঠি বউদি—"

শৈল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল, পত্রখানা হাতে লইয়া উপরের লেখাটার পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই সে বুঝিল, পত্র কোথা হইতে আসিয়াছে, কে লিখিয়াছে!

"কার চিঠি বউ মা?"

কভারটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শৈল পত্রের উপর চোখ রাখিয়া বলিল "বলছি মা, নামটা দেখি আগে।"

শৈল যে এত অনুনয় বিনয় করিয়া মায়ের অবস্থা জানাইয়া তাহাকে একবার আসিবার অথবা মাকে এক খানা মার্জ্জনা পত্র লিখিবার অনুরোধ করিয়াছিল, এই কি তার উত্তর? কি কঠোর কথা সে লেখনীমুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার মনের প্রকৃত ভাব এই পত্রের মধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে; ইহার এক একটী অক্ষর মায়ের বুকে বাজিবে যে বজ্রাঘাতের মতই। হায় সন্তান, এই তোমার কর্ত্তব্য, সন্তানের কর্ত্তব্য কি এতই সহজ? তোমরা লইতে জানো ভালবাসা, স্নেহ, আদর, দিতে জানো বজ্রের তুল্য আঘাত।

পত্রখানা সামনে খুলিয়া ফেলিয়াই বড় অন্যায় হইয়াছে। শৈল পত্র হইতে চোখ তুলিতে পারিতেছিল না, মুখখানা প্রাণপণে সে নত করিয়াই রাখিয়াছিল; তাহার ভয় হইতেছিল মুখ তুলিতে গেলেই সে ধরা পড়িয়া যাইবে। অতবড় সত্যটাকে সে প্রাণপণে চাপিয়া রাখার জন্য যে মিথ্যার অভিনয় করিতে যাইবে, মুখ চোখের ভাব বদলাইবে কি করিয়া, মুখ চোখে হৃদয়ের সেই সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে যে। একটী বিক্ষোভিত-মাতৃহৃদয় সকল আবেগ চোখে জাগাইয়া তাহারি পানে চাহিয়া আছে যে।

উমা পত্রখানার পানে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বউ মা, এ কি আমার অমিয়ের চিঠি নয়?"

শৈল চমকাইয়া উঠিল—অস্বীকার করা থাক্ মিথ্যাকে সামলাইতে গিয়া সত্যই যে ওষ্ঠাগ্রে আসিল—"হ্যাঁ মা।"

"কি লিখেছে, সে ভাল আছে তো?"

শৈল অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল "হ্যাঁ, ভাল আছে।" ইহার বেশী আর কোন কথা বলিতে সে ইচ্ছা করিল না। উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন মাত্র; এই টুকুই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট পাওয়া হইয়াছে, ইহার বেশী আর তিনি কি পাইতে চান? মাতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিতেছিল—আরও চাই, আরও চাই, মায়ের পাওয়া, সন্তানের দেওয়া এই টুকুতেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারেনা। কি কঠোর প্রাণ মায়ের, সন্তানের দারুণ অবহেলা সহিয়া মা তবুও বাঁচিয়া থাকেন?

শৈল আস্তে আস্তে পত্রখানা হাতের মধ্যে গুটাইয়া লইল, হঠাৎ একটা উঃ শব্দ শুনিয়াই উমার পানে চাহিল, তিনি অনেকখানি হাত কাটিয়া ফেলিয়াছেন, দেখিতে দেখিতে বুকে তাঁহার কাপড় অনেকখানি লাল হইয়া উঠিল।

পত্রখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িল, শৈল ব্যস্তভাবে বস্ত্রখণ্ডের সন্ধানে ছুটিল। উমার নিকটেই পত্রখানা পড়িয়াছিল, তিনি বামহাত বাড়াইয়া পত্রখানা তুলিয়া লইলেন।

এ কি, এই কি লিখিয়াছে সে? তাঁহার অমিয়, তাঁহার বুকের ধন একটী মাত্র পুত্র, পুঞ্জিভূত স্নেহধারা যাহার উপর ঢালিয়া দিয়াও তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, এই পত্রখানি কি তাহারই কথা বহন করিয়া আনিয়াছে? ওরে সন্তান, ওরে রাক্ষস,—

বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার ফিট হইত, মাঝে সেটা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। বহুকাল পরে আজ আবার তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, দিনের আলো চোখের সম্মুখ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল, নিমেষে নামিয়া আসিল জমাট বাঁধা অন্ধকার; থর থর কাঁপিয়া উমা পশ্চাতে ঢলিয়া পড়িলেন।

পাশের ঘরে ইভা কি করিতেছিল, সে ছুটিয়া আসিল; রক্তাক্তবস্ত্রা শাশুড়ীকে মাটীতে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে

দেখিয়া সে যেন কি রকম হইয়া গেল, আড়ষ্টভাবে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই সময় শৈল ফিরিল।

"ও মা, একি ব্যাপার—ইভা—"

তাহার সভয় চিৎকারে কি চাকর সবাই আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি উমার হাতটা বাঁধিয়া দিয়া তাঁহার মাথায় জল ঢালা হইতে লাগিল।

তখনও সে পত্রখানার কথা শৈলর মনে হয় নাই। ইভা যখন বিবর্ণমুখে উমার মাথায় জল ঢালিতেছিল, তখন সে উমার মুষ্টিবদ্ধ বামহাতখানা খুলিতেই পত্রখানা দেখিতে পাইল। তাহার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, সে পত্রখানা শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রাঙ্গণে ফেলিয়া দিল।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ চাহিলেন। শৈল ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল "মা—মা", চোখ চাহিয়া উমা একটু হাসিলেন, জোর করিয়া উঠিতে গেলেন,বাধা দিয়া শৈল বলিল "উঠছো কেন মা?"

উমা বলিলেন "তুমি ভাবছ কি বউ মা? এই একটু খানি জ্ঞান হারানতে আমার কিছু হয় নি। তোমরা জানো না আমার এ ব্যারাম আছে তাই ভয় পাচ্ছো। আমার এ ব্যারাম আগে চেয়বার হয়েছে, ওতে আমার কিছু হয় না, সর, উঠি।"

তিনি জোর করিয়া উঠিয়া বসিলেন, শৈল তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। নিজের মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "পাগলী, সারা মাথায় এত জল ঢেলেছ? আমার কত দিন রাত এমনি ভাবে পড়ে থেকে কেটে গেছে, তখন কে করতে আসত আমার, কেউ যে চোখের দেখাটী দেখত না।"

শৈল রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "এখন আমরা তো আছি মা।"

উমা বলিলেন "তুমিও তো বাপের বাড়ী যাবে—"

শৈল ইভার পানে দৃষ্টি করিয়া বলিল "ইভা থাকবে।"

উমা একটু হাসিলেন মাত্র।

সেদিন সারাদিনটা তাঁহার কেমন করিয়া কাটিল তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার পিপাসার্ত্ত মুখে শৈল একবার মাত্র সামান্য একটু দুধ দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সে রাত্রিটা তিনি অত্যন্ত অস্থির ভাবে ছটফট করিতেছিলেন। শৈল তাঁহাকে ডাকিয়া আর বিরক্ত করিল না, সে চুপ করিয়া ইভার পার্শ্বে গিয়া শুইয়া পড়িল।

সে রাত্রে ইভাও ঘুমাইতে পারিতেছিল না। অন্যদিন সে শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে, আজ সেও জাগিয়া ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া আছে।

শৈলও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, যখন বুঝিল ইভা যথার্থই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে সন্দেহটা মিটাইবার জন্য তাহার বালিশে হাত দিয়া দেখিল বালিশটা আর্দ্র হইয়া গিয়াছে।

বিস্ময়ে শৈলবালা হাত সরাইয়া লইল। তবে কে বলে ইভা কোন কথা বুঝিতে পারে না? বোবা বলিয়া তাহার যে জ্ঞান নাই তাহা তো নয়।

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রে—রাত তখন সাঁ সাঁ করিতেছে, হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; তাহার মনে হইল সেই গভীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে ঘরের মধ্যে কে যেন বেড়াইতেছে। ভয়ে তাহার বুকের রক্ত জমিয়া গেল, তাহার মনে হইতেছিল কোনও বিদেহী আত্মা দেহ পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন।

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হইল "ভগবান—"

না, এতো অপরের কণ্ঠস্বর নয়, এযে উমার কণ্ঠস্বর। শৈল ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল, হাত বাড়াইয়া দেখিল বিছানায় উমা নাই, সে ডাকিল—"মা—"

কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। মনে হইল কে যেন মেঝেয় পড়িয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে, সেই আকুল দীর্ঘনিঃশ্বাসে সারা ঘরখানা পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

তাড়াতাড়ি সে আলো জ্বালিল, অদূরে উমা মেঝেয় পড়িয়া।

"মা—ওমা," শৈলবালা আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল।

"আবার, আবার ডাকছিস? ওরে, তোদের জ্বালায় সারাদিনটা কাঁদতে পাইনি, বুকের এই লক্ষ ব্যথা বুকের মাঝেই চেপে রেখেছি, এখন—এই রাতে—তাও কি তোরা আমায় কাঁদতে দিবি নে? ওরে, তোরা আমায়

ছেড়ে দে, আমায় একটু কাঁদতে দে, আমার বুকের ভার হালকা কর্‌তে দে।"

শৈল স্তম্ভিত ভাবে খানিক বসিয়া রহিল, কি বলিবে, এ অবস্থায় কি বলা সাজে তাহা সে ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল "সারারাত এমনি করেই আছড়াবে মা? তোমার পায়ে পড়ি, ওঠো, শোবে চল, আমি তোমার গা পা টিপে দিই, ঘুম আসবে এখন।"

মা উঠিয়া বসিলেন, অঞ্চলে মুখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "ঘুম কি আমার চোখে আছে? আমার চোখ হতে ঘুম চিরকালের জন্যেই বিদায় নেছে। আমার সেই ঘুম—যা আমায় আর জাগতে দেবে না—তাকে নিয়ত চাচ্ছি, কেন তাকে পাচ্ছিনে মা? এ যে ক্ষণিকের ঘুম, সকালে আবার যে জাগতে হয়, আবার যে আলো দেখতে হয়। সে ঘুম আমার আসবে কি—উঃ, কবে আসবে সে দিন?"

শান্তভাবে শৈল উত্তর দিল "দিন না ফুরালে রাত যেমন আসে না—কিছুতেই আসতে পারে না, জীবন না ফুরালে মরণ তেমনি কিছুতেই আসতে পারে না। সময় না হলে অসময়ে সে আসবে কি করে মা?"

উমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল, —"উঃ, আর কতদিন প্রত্যাশা করে থাকব বউ মা? বুকখানা যে আমার কেটে যাচ্ছে, কিছুতেই যে সইতে পারছি নে। অমিয় আমায় বড় দাগা দিলে, আমায় বড় শিক্ষা দিলে। তুমি বুঝি অমিয়কে আমার কথা জানিয়ে পত্র দেছলে বউ মা?"

শৈল রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "হ্যাঁ মা"

"বড় অন্যায় কাজ করেছ মা। সে যখন স্পষ্ট বলে গেল পত্র দেবে না, আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, তবু কেন তাকে আমার কথা জানাতে গেলে?"

মর্ম্মপীড়িতা শৈল বলিল "বুঝতে পারিনি মা। আর কখনও আমি ঠাকুরপোকে যদি পত্র দিই তবে বলবেন। এবারকার মত আমায় ক্ষমা কর মা।"

উমা উঠিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। শৈল আলো নিভাইয়া দিয়া তাঁহার পিঠে গায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সে বুঝিল উমা এবার সত্যসত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তখন সেও শুইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

তরুণের প্রতি

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

ঘরের মাণিক দেশের ছেলে দেশের যারা উজল প্রাণ,
তারাই শুধু কর্‌তে পারে দেশকে দুঃখ হ'তে ত্রাণ।
সবুজ তারা অবুঝ তারা প্রাণ তাহাদের নবীন, কাঁচা,
তাদের পরই ভর করিছে আজ্‌কে দেশের মরা-বাঁচা।
মরণ-সাগর মথ্‌বে তারা, অমৃত যে আন্‌বে হরি'
নতুন জীবন জাগবে আবার জীর্ণ জরা বক্ষ পরি।
আঁধার যখন আসে ঢেকে, মরণ এসে দাঁড়ায় দ্বারে,
হর্ষে তারা যায়গো ছুটে, হাত বাড়ায়ে ডাকে তারে।
দীপ্ত তারা মুক্ত তারা তারাই দেশের আশার স্থল,
ঝড়-বাদলের সম্মুখেতে তারাই চির অচঞ্চল।
ওরে আমার দেশের ছেলে, ওরে আমার তরুণ দল,
দুর্দ্দিনেতে সবার আগে পথ দেখিয়ে তোরাই চল।

দেশের যত আবর্জ্জনা উড়িয়ে দে রে ঘূর্ণিবায়ে,
মিথ্যা যা তা এই যুগেতে চূর্ণ হউক তোদের পায়ে।

রঙ্গালয়ে নূতন ধারা

শ্রী শ্যামলাল গোস্বামী

বাঙ্গলার রঙ্গালয় পূর্ব্বে যতই অশ্লীলতা পূর্ণ থাকুক না কেন, গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে ইহার ধারা যে পরিবর্ত্তিত হইয়া লোকশিক্ষার সহায়ক হইয়া উঠিতেছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণা প্রতাপ","সাজাহান", "মেবার পতন" এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অন্যান্য নাট্যকারের "রাণী দুর্গাবতী", "ছত্রপতি শিবাজী","প্রতাপাদিত্য" প্রভৃতি নাটক বাঙ্গলার যুবকদিগের মনের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। তাহার পূর্ব্বেও স্বর্গীয় নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্রের ধর্ম্মমূলক ও সামাজিক নাটক সমূহ বাঙ্গালীর জীবনে এক ধর্ম্মভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার "বিল্বমঙ্গল" ও "শ্রীচৈতন্য" যেমন একদিকে ভক্তের চক্ষু ভক্তিঅশ্রুতে প্লাবিত করিয়াছিল, তেমনি "বলিদানে" বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের বীভৎস চিত্র লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গিরীশচন্দ্র অথবা তৎপরবর্ত্তী দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকার লোকশিক্ষার মহদুদ্দেশ্য লইয়া নাট্য-সেবায় অবতীর্ণ হইলেও রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য সম্যক প্রতিপালন করিতে পারেন নাই।

আজ কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গলার রঙ্গালয়ে ধর্ম্মমূলক নাটক অভিনয় করিবার একটা ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। প্রথমে মিনার্ভার উপেন্দ্রচন্দ্র এই পথটি প্রদর্শন করেন। সর্ব্বভুক্ হুতাশন পুরাতন মিনার্ভা থিয়েটারটি ভস্মীভূত করিবার পর তিনি নূতন রঙ্গালয়ে "আত্মদর্শন" নাটক লইয়া প্রথমে দেখা দিলেন। "আত্মদর্শন" নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়রিপুর তাড়নায় এবং কুমতির প্ররোচনায় মানুষ বিবেকবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া একেবারে উৎসন্নে যায়, কিন্তু সুমতির প্রেরণায় জ্ঞান-বৈরাগ্য জন্মিলে মানুষ আপন ভ্রম আপনি বুঝিতে পারে। তখন তাহার "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" অবস্থা হয় এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় সে দেখিতে পায় যে তাহাতে ও ভগবানে কোন প্রভেদ নাই। জীবের তখন মুক্তি হয় এবং জীব তখন শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই নাটকখানি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের আখ্যানভাগ অবলম্বনে লিখিত, ইহাতে জানিবার, শিখিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। এই নাটকখানি উপর্য্যুপরি যেভাবে অভিনীত হইতেছে, তাহাতে নাট্যকার ও অভিনেতাদের এবং বাঙ্গালীর সুরুচির প্রশংসাই করিতে হয়। দুঃখের বিষয় এই নাটকখানি লিখিয়াই নবীন নাট্যকার পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার লিখিত আরও ধর্ম্মমূলক নাটক দেখিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারিতাম।

এই প্রসঙ্গে মিত্র থিয়েটারকে একটি কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারি না। তাঁহারা "শ্রীদুর্গার" অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার "বিবাহবিভ্রাট" "হিরণ্ময়ী" "আলিবাবায়" অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন কেন? লোক শিক্ষার সহায়তা করাই যদি রঙ্গালয়ের উদ্দেশ্য হয় তবে এসব গীতিনাট্য স্থান দিবার সার্থকতা কি? একটা স্থির লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে ভাল হয় না কি? মিত্র থিয়েটার বঙ্গের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের পরিচালনায় ও কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। তাঁহাদের নিকট দেশবাসী গতানুগতিকতার আশা করে না, অভিনব প্রণালীতে লোকশিক্ষার বিধানেরই আশা করে।

মিনার্ভা ও মিত্র থিয়েটরের ন্যায় ষ্টার থিয়েটারও ধর্ম্ম ও পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অপরেশচন্দ্রের "কর্ণার্জ্জুন" মহাভারতীয় অতি প্রাচীন কাহিনী হইলেও নাট্যকারের তুলিকায় তাহা এমনই সুচিত্রিত হইয়াছে যে, আড়াইশত রজনী উপর্য্যুপরি অভিনীত হইলেও তাহা "নিত্যই নব"। কর্ণার্জ্জুনের পর ষ্টার নরেশচন্দ্রের "কবির মেয়ে"র অভিনয় করেন।* "কবির মেয়ে" আর্য্যজীবনের একটি বিস্মৃত অধ্যায়। এই নাটকখানি দেখিতে দেখিতে এক একবার মন কল্পনার রথে চড়িয়া

সেই অতীত ভারতের দিকে চলিয়া যায় এবং মনে হয় এই ভারতেই তবে এমন একদিন ছিল যেদিন ধনৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া ভারতের আর্য্য মনীষিগণ গিরিপাদমূলে অগ্নিনাসনে বসিয়া শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে নিমগ্ন থাকিতেন, আর মুনিকন্যাগণ বনের কুরঙ্গ শিশুর অঙ্গে হাত বুলাইয়া অথবা সমাগত বিদ্যার্থীদের পরিচর্য্যা করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।

"ঋষির মেয়ে" নাটকে সাফল্য লাভ করিয়া ষ্টার নবোদ্যমে "শ্রীকৃষ্ণ" নাটকের অভিনয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখানিও অপরেশচন্দ্রের লেখনীপ্রসূত। প্রথমতঃ এই নাটকখানির কলেবর এত বৃদ্ধি করা হইয়াছিল যে, দর্শকগণ ধৈর্য্যের সীমা রাখিতে পারিতেন না। তারপর নাটকখানিকে কাটিয়া ছাটিয়া ছোটখাট করা হইয়াছে। এই নাটকের অভিনয়ে ভীষ্মের ভূমিকায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) স্বয়ং অবতীর্ণ হন। একে ত কৃষ্ণকথা বাঙ্গালীর নিকট চিরমধুর, তার উপর দানীবাবু প্রমুখ প্রতিভাবান্ অভিনেতার অভিনয়-নৈপুণ্যে "শ্রীকৃষ্ণ" বস্তুতঃই অতি সুন্দর হইয়াছে। তবে এই নাটকখানিতে নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র প্রকৃতভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। কোথাও বা তিনি শ্রীকৃষ্ণে ব্যক্তিত্বের আরোপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটা অতিমানুষিক ব্যক্তিতে পরিণত করিয়াছেন, আবার কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাকে বাস্তব জগতের সীমা বহির্ভূত এক অব্যক্ত অচিন্তনীয়রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে নাটকের ধারা ত বজায় থাকেই না, অধিকন্তু সামঞ্জস্যবিহীন নাটকের অভিনয়ে অভিনেতৃগণ বিশেষ সুযশঃ লাভ করিতে পারেন না। নাটকখানি মোটের উপর কালোপযোগী হইলেও ভূমিকা বিতরণে ষ্টারের কর্তৃপক্ষগণ তেমন পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই, যেমন—ভীষ্মের ভূমিকায় দানীবাবু। ইহাতে দানীবাবুর প্রতিভাকে খর্ব্ব করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আশা করি ষ্টারের কর্তৃপক্ষ যেমন একদিকে পৌরাণিক নাটকাদির অভিনয় করিয়া দেশবাসীর চিত্তকে ভগবন্মুখী ও স্বদেশমুখী করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তেমনি তাঁহারা অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্ব্বাচনেও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিবেন।

মিনার্ভা, মিত্র ও ষ্টার—এই তিনটি রঙ্গালয় যে ধর্ম্মমূলক নাটকাদির অভিনয় করিয়া দেশের চিন্তাধারাকে প্রাচীন অভিমুখী করিতে চেষ্টা করিতেছেন, একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি রঙ্গালয়ের কথা বলিব, সেটি "নাট্যমন্দির"। "নাট্যমন্দিরে" শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম, এ অনেক কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের 'সীতা' অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ভাদুড়ী মহাশয় নিজে শ্রীরামচন্দ্রের পাঠ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই নাটকখানির বাল্মিকী ও সীতাকে একটু নূতন ধাঁচে গড়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সীতার মহিমান্বিত আখ্যান বর্ণন অপেক্ষা দর্শকগণের মনোরঞ্জনেরই অধিক চেষ্টা করিয়া ইহার বৈশিষ্ট খর্ব্ব করা হইয়াছে। অন্যান্য রঙ্গালয়ের ন্যায় নাট্যমন্দিরের কর্তৃপক্ষও সুরুচিসঙ্গত ধর্ম্মমূলক পৌরাণিক নাটকের অভিনয় করিয়া সকলকে তৃপ্ত করুন—দেশবাসী ইহাই চায়।

রঙ্গালয় সর্ব্বথা শিক্ষার আলয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেবল হাসি, তামাসা, নাচ-গান দেখানই যেন নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য না হয়। যাহাতে দর্শকগণ অভিনয়ান্তে মনে একটা সৎ অভিপ্রায় ও বাসনা লইয়া ফিরিয়া আসে, নাট্যকার মাত্রের সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য, তবেই ইহার সার্থকতা সম্পাদিত হয়। আজ বাঙ্গলার রঙ্গালয়ের দৃষ্টি কতকটা ধর্ম্মমূলক নাটকাভিনয়ের দিকে পতিত হইয়াছে; রঙ্গালয়ের পক্ষে ইহা যে শুভাস্থর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রঙ্গালয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় দেশের হাওয়া কোন্‌দিকে বহিতেছে। চির অধঃপতিত দেশ যে আজ ধর্ম্মোন্মুখী হইতেছে, একথা স্মরণ করিতে কাহার না আনন্দ হয়? এসময় যাঁহারা ব্যবসায়ের খাতিরে দেশের রুচিকে বিকৃতপথে চালিত করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা যে দেশের মহাশত্রু একথা বলাই বাহুল্য।

আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যে সদুদ্দেশ্য বুকে লইয়া আজ "শ্রীদুর্গার" আবাহন করিয়া "জয়শ্রীর" পতাকা উড্ডীন করিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণের" মোহন মুরলীধ্বনিতে ভক্তের তৃষিত প্রাণকে শীতল করিতেছেন এবং "আত্মদর্শনের" মুকুরে পথভ্রান্ত মানবকে স্বরূপ দেখাইয়া দিতেছেন, সেই সদুদ্দেশ্য যেন তাঁহাদিগকে দিন দিন অধিকতর সাফল্যের দিকে লইয়া যায়।

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, বি-এল্।

আমাদের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শিখিবার আগ্রহ ক্রমেই বাড়িতেছে। ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরও যে লেখাপড়া শেখা দরকার, ইহা আজকাল প্রায় অনেকেই বুঝিতেছেন। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে একটা আশার কথা, সন্দেহ নাই। তবে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন যতটা বাড়িতেছে, সে অনুপাতে প্রকৃত শিক্ষার প্রসার বাড়িতেছে কিনা, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেয়েরা প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতেছেন কি না, ইহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এমন একদিন ছিল যখন কোন মেয়ে সামান্য চিঠিপত্র লেখা ও দু-একখানা বই পড়িতে পারিলেই শিক্ষিতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। সৌভাগ্যের বিষয়, এখন সে দিন গিয়াছে। এখন বাঙ্গালীর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া বিদ্যা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন, ইহা দেশের পক্ষে আনন্দ ও গর্ব্বের কথা। কিন্তু আমরা যতটা আশা করি, ততটা হইতেছে না, ইহাই আমাদের অভিযোগ। দোষ মেয়েদের তত নয়, যত পুরুষদের। মেয়েদের শিক্ষার জন্য আজকাল স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে সত্য, কিন্তু যতটা হওয়া উচিত, তাহার শতাংশের একাংশও হইতেছে না। বড় বড় কয়েকটিমাত্র সহর ছাড়া, অন্যান্য সহরেও মেয়েদের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় নাই। মফঃস্বলের কথা ত বাদই দিতে হয়। ইহা আমাদের পক্ষে যে একটুও শ্লাঘার কথা নয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

একে ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একান্ত অভাব, তারপর যে পদ্ধতিতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে অনেক দোষ ত্রুটি বিদ্যমান। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি মেয়েদের আদৌ উপযোগী নয়, ইহাই আমাদের ধারণা। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা হয় না। ছেলে ও মেয়েদের পাঠ্যপুস্তক প্রায় একরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একই প্রশ্নে উত্তরের পরীক্ষা লওয়া হয়। অথচ কতকগুলি বিষয় আছে যাহা সকলেরই শিক্ষা করা দরকার। দুইএ দুইএ চার হয়, ইহা ছেলেদেরও যেরূপ শিখিতে হইবে, মেয়েদেরও সেরূপ শিখিতে হইবে। কিন্তু সকল বিষয়েই ছেলে ও মেয়ের শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি এক হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আদর্শ হিসাবে স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা এক হইতে পারে না, ইহাই আমাদের মত। পুরুষের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে এখানে কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না। মেয়েরা যাহাতে ভবিষ্যতে আদর্শ জননী, ভগিনী ও গৃহিণী হইতে পারেন, ইহাই স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত। সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষাপদ্ধতিকেও ঠিক এই আদর্শ অনুযায়ী করিয়াই গঠন করা কর্ত্তব্য।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এরূপ করা হয় না। মেয়েদের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দেখিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। আদর্শ জননী বা ভগিনী হইতে হইলে মেয়েদের যাহা যাহা শিক্ষা করা উচিত, তাহার বিশেষ কিছুই আমাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয় না, আমরা কেবল নৈতিক শিক্ষার কথা বলিতেছি না, ব্যবহারিক শিক্ষার কথাও বলিতেছি। মেয়েরাই সংসারের সর্ব্বময়কর্ত্রী। আজ যে স্কুলের ছাত্রী, দুদিন পরে তাহাকেই সংসারের কর্ত্রী হইতে হয়। কি করিয়া সংসার ভাল করিয়া চালান যায়, মেয়েদের এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার। অনেকে হয়ত বলিবেন, স্কুল-কলেজ লেখাপড়া শিখিবার জায়গা—"সংসারী" বা "গৃহস্থালী" শিখিবার জায়গা নয়, গৃহস্থালী শিখিবার স্থান গৃহ। আমরা ইহা অস্বীকার করি না। তবে গৃহস্থালী ব্যাপারটা আমরা যত সামান্য বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক তত সামান্য নয়। বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইহাতে জানিবার এবং শিখিবার এত জিনিষ আছে যে, শুধু গৃহে বসিয়া তাহা জানা সকল সময় সম্ভবপর নয়। এইজন্য ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে স্কুল-কলেজেই মেয়েদিগকে গৃহস্থালী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে—তথায় মেয়েদিগকে সকল বিষয়ে গৃহিণীর উপযুক্ত হইবার শিক্ষা দেওয়া হয়।

সংসারে মেয়েদের স্থান যে কত উচ্চে, সংসারের বিভিন্ন বিষয়ে ভালমন্দ করিবার ক্ষমতা ও প্রভাব মেয়েদের যে কত অধিক, আমরা অনেকেই তাহা তলাইয়া দেখি না। এই জন্যই আমরা মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারি না; করিলেও, সাধারণ শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করি, সংসারের জন্য তাঁহাদের বিশেষ শিক্ষার আবশ্যকতা আদৌ অনুভব করি না।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। সংসারে আমাদের মেয়েদের দুই একটি কাজের কথা ধরা যাউক। প্রথমতঃ সংসারের সকলের আহারের ভার মেয়েদের উপর। মেয়েরা রন্ধনগৃহের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী—এ বিষয়ে পুরুষের বিশেষ কোনই অধিকার তথায় নাই। প্রতিদিন সংসারে কি পাক হইবে, কি ডাল, কি তরকারী, কি ভাজা ইত্যাদি আহারের সমস্ত খুটিনাটি বিষয় মেয়েদের করিতে হয়। আহার স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রধান উপায়। সুতরাং পরিবারের সকল ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষার ভার মেয়েদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ মেয়েরা সমগ্র জাতির হেলথঅফিসার। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হইতেছে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই স্বাস্থ্যহানির মূলে পুষ্টিকর আহারের অভাব কতখানি দায়ী, কি করিলে এই অভাব পূরণ হইতে পারে, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়, ইত্যাদি বিষয় সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। সংসারের সকলের স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার যাঁহাদের উপর সেই নারীজাতির বিশেষ করিয়া ভাবা উচিত। অর্থাৎ তাঁহাদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেবল ঘরে বসিয়া এই জ্ঞান অর্জ্জন করা কঠিন, স্কুল-কলেজে এই জ্ঞানলাভ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। অনেকে বলিতে পারেন, আমাদের পিতামহী প্রপিতামহীরা ত কোন স্কুল-কলেজে যাইয়া এসব স্বাস্থ্য-তত্ত্ব শিখেন নাই, অথচ তাঁহাদের স্বামীপুত্র সকলের স্বাস্থ্য এত ভাল ছিল কেন? উত্তরে আমরা বলি, সেদিন আর এদিন এক নয়। তখন জীবনসংগ্রাম এত কঠিন ছিল না, জিনিষপত্র এত দুর্ম্মূল্য ছিল না, তখন সকল জিনিষে এখনকার মত এত ভেজাল ছিল না, তখন জীবনযাত্রা সহজ ও সরল ছিল। দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং কি কারণে এই অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে না পারায় আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, ইহা বিশেষরূপে জানা দরকার। এই জন্যই বলিতেছিলাম, স্বাস্থ্যতত্ত্ব মেয়েদের একটা প্রধান শিক্ষনীয় বিষয়।

আর একটা বিষয় ধরুন—সন্তানপালন। ইহাও মেয়েদেরই একচেটিয়া জিনিষ—পুরুষের ইহাতে কোনই হাত নাই। শিশুরাই সংসারের ভবিষ্যৎ, জাতির ভবিষ্যৎ; সুতরাং শিশুর পালন ও রক্ষার উপর সমগ্র জাতির হিতাহিত সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অথচ আমাদের দেশের শিশু-মৃত্যুর হার দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে—জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিতে হৃদয় নিরাশার অন্ধকারে ভরিয়া যায়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে হাজার করা ৭০টি শিশু মারা যায়, আর কলিকাতায় ৩১০টি মারা যায়। যে দেশের শিশুমৃত্যুর হার পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে বেশী সে দেশে সন্তান পালনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে? সকল চিকিৎসকেরই মত মাতার অজ্ঞতার জন্য আমাদের দেশে অনেক শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করে। হায়, আমাদের মেয়েরা যদি সন্তানপালন সম্বন্ধে ভাল শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন, তবে বছরে কত হাজার হাজার শিশু যে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সংসারের ও দেশের শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারিত, তাহার কে ইয়ত্তা রাখে? অথচ এ বিষয়ে আমরা কত উদাসীন; আমাদের মেয়েদের শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে এরূপ একটি একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের একটুমাত্রও স্থান নাই! ধিক্ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিকে! ধিক্ আমাদের শিক্ষার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতৃগণকে! শিশুরক্ষাই জাতিরক্ষা—একথা বাঙ্গালী যতদিন না বুঝিবে, ততদিন তার উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

তারপর শিল্পশিক্ষা। এবিষয়েও বিশেষ কোন বন্দোবস্ত আমাদের মেয়েদের স্কুলে নাই। অথচ এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন অনেক কুটীরশিল্প আছে, যাহা অবলম্বন করিয়া মেয়েরা নিজেদের জীবিকার সংস্থান নিজেরাই করিতে পারেন। প্রত্যেক মেয়েরই এরূপ কোন না কোন শিল্পে পারদর্শিতা

লাভ করা উচিত। ইহাতে যে কেবল ভবিষ্যতে সংসারেরই সুবিধা হয় তাহা নয়, ইহাতে মেয়েদের ভিতর স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরশীলতার ভাব জাগিয়া উঠে। আমাদের দেশের মেয়েদের মত এরূপ পরমুখাপেক্ষিতা দুনিয়ার অন্য কোন দেশের স্ত্রীজাতির মধ্যে দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? কার্য্যকরী শিক্ষার অভাবই ইহার প্রধান কারণ। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতিরই ইহা একটা মস্ত বড় অভাব। যে শিক্ষায় শুধুই মেরুদণ্ডহীন গ্রাজুয়েট তৈরী হয়, মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচয় হয় না, যে শিক্ষা আমাদের 'ক'য়ে খেতে' শেখায় না, দুর্দ্দিনে অসহায় শিশুর মত সংসারপথে ছেড়ে দেয়, সে শিক্ষার সার্থকতা কোথায়?

বাস্তবিক আমাদের দেশের মত এমন বাজেছাড়া শিক্ষাপদ্ধতি পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য দেশে নাই। আজ ইয়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপান যে শিক্ষায় দীক্ষায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, বলে ঐশ্বর্য্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাদের উৎকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি ইহার একটি প্রধান কারণ। কেবল মেরুদণ্ডহীন গ্রাজুয়েট তৈরী করাই তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, ছেলে মেয়েদিগকে সর্ব্বাংশে 'মানুষ' করিয়া তোলাই তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। এজন্য তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য।

চিন্তাশীল লেখক ও সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক মন্ত নিহাল সিং জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন, তিনি তথাকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি তথাকার অধ্যক্ষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, অধ্যক্ষ বলেন, "আমরা চাই আমাদের ছাত্রীরা আদর্শ জননী, ভগিনী ও গৃহিণী হন। সকল শিক্ষারই প্রধান উদ্দেশ্য স্বদেশের সেবা দ্বারা নিজের উন্নতি সাধন করা।" তিনি আরও বলেন, "বর্ত্তমান জাপানের উন্নতির মূলে জাপানী মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষাও একটা প্রধান কারণ। জাপানের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বদেশ প্রেম। যে শিক্ষা বালকবালিকাদের প্রাণে স্বদেশপ্রেম জাগরিত করে না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে।" সুতরাং বালকবালিকাদের হৃদয়ে দেশসেবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলাই শিক্ষার সব চেয়ে বড় কাজ। তথায় এমন একটি বই লিখিত হয় না, এমন একটি কবিতা রচিত হয় না, এমন একটি গান গীত হয় না, অথবা এমন একটি কথা শিখান হয় না, যার মূলে স্বদেশ-প্রেমের ভাব নাই। জাপানে স্বদেশপ্রেমই সকল শিক্ষার উৎস।

জাপানের নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী সাহিত্য, ইংরাজী, সঙ্গীত, শিল্পকলা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে সাংসারিক জীবনে যে সকল শিক্ষা ও বিদ্যার অধিক প্রয়োজন, সে গুলির প্রতিই সমধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। যথা, প্রত্যেক ছাত্রীকে নিজ নিজ কাপড় কাচিতে হয় এবং কাপড় পরিষ্কারের জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘোড়া, গরু, হাঁস, মোরগ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু ও পক্ষী রহিয়াছে, ছাত্রীগণকে ইহাদিগকে খাওয়াইতে হয়, রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় ও পশু পক্ষী পালন পদ্ধতি সুন্দরভাবে শিখিতে হয়। গরুর দুধ ছাত্রীগণই দোহন করেন। কি ভাবে দুধকে বহুদিন টাটকা রাখা যায়, দুধ হইতে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করা যায়, ইত্যাদি বিষয় আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের মধ্যে রন্ধনশালা ও ভোজনাগার আছে, তাহার পরিচালনার ভার ছাত্রীগণের উপর, প্রত্যেক ছাত্রীকেই আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত অথচ মুখরোচক আচার্য্যাদি প্রস্তুত প্রণালী হাতেকলমে শেখান হয়। প্রত্যেক ছাত্রীরই একটি করিয়া গ্যাস ষ্টোভ এবং পাকের আবশ্যকীয় বাসনপত্রাদি আছে। এই রন্ধনবিভাগটি অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। তাঁহারা জাপানী ও সাহেবী খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছাত্রীগণ অনেকেই এই ভোজনাগারে অসঙ্কোচে খাইয়া থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি ছোটখাট ব্যাঙ্ক আছে। তাহাও ছাত্রীগণই চালান, ইহা দ্বারা তাঁহারা মিতব্যয়িতা শিক্ষা করেন, উপরন্তু কি ভাবে ব্যাঙ্কের সহিত কাজ কারবার করিতে হয়, তাহাও হাতে কলমে শিক্ষা করেন। ছাত্রীগণের ছোটখাট আবশ্যকীয় দৈনিন্দিন সওদাপাতির জন্য একটি ছোট দোকান আছে। এই দোকান মেয়েরাই চালান। তথায় তাঁহারা বেনাবেচার নিয়মকানুন, হিসাবপত্র রাখার পদ্ধতি প্রভৃতি হাতেকলমে শিখিতে পান। বিদ্যালয়ে মেয়েদের

একটি মাসিক পত্রিকা আছে, তাহার লেখক, প্রকাশক, পরিচালক প্রভৃতি সবই ছাত্রীরা, ছাপাখানার পরিচালকও ছাত্রীরা - কম্পোজ তাঁহারাই করেন।

সহরের বাহিরে একটি সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর বিদ্যালয়টী অবস্থিত। ইহার চারিদিকে অনেক জমী আছে, এই জমীতে নানাবিধ শাকসব্জী, ফল ও ফুলের বাগান আছে। এই বাগানের পরিচালকও ছাত্রীরা স্বয়ং; প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য টুক্‌রা জমী নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাতে ছাত্রীগণ ইচ্ছামত শাকসব্জী ও ফুলের গাছ করেন।

বিদ্যালয়ের মধ্যে একটী আদর্শ ব্যায়ামাগার আছে। তথায় ছাত্রীগণ লাঠিখেলা, ডাম্বেল মুগ্দরভাঁজা প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়া থাকেন। পিয়ানো, অর্গেন ও বেহালার সুরলয় যোগে ছাত্রীগণ প্রত্যহ ড্রিল অভ্যাস করেন। ছাত্রীগণকে ব্যায়াম চর্চ্চার সময় যে সকল আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে কোন দুর্দ্দান্ত পুরুষের সাধ্য কি সহজে তাঁহাদের গায়ে হাত তুলে। আজ জাপান যে উন্নতির পথে এত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছে, জাপানী মহিলাদের শিক্ষাদীক্ষাও ইহার পক্ষে কম সহায়তা করিতেছে না।

আমরাও যদি প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে চাই তবে আমাদের মেয়েদিগকেও মেয়েদের উপযোগী শিক্ষা দান করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচারিত তাহা মেয়েদের উপযোগী নয়, ইহাই আমাদের মত। কেবল কতকগুলি বই মুখস্থ করিলেই বিদ্যাশিক্ষা পরিসমাপ্তি হয় না—অর্জ্জিত বিদ্যাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিবার প্রণালী জানা দরকার। সাংসারিক জীবনে মেয়েদের যে সকল জ্ঞানের প্রয়োজন, বিদ্যালয়েই তাহা অর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করার দরকার। আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন, খুবই প্রয়োজন; তবে সে শিক্ষা পুরুষোচিত না হইয়া মেয়েদের উপযোগী হওয়া আবশ্যক, ইহাই আমাদের বক্তব্য। মেয়েরা বিদুষী হউন, কিন্তু তাঁরা মেয়েই থাকুন, পুরুষ হইয়া কাজ নাই, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

জীমূত-বরণ

শ্রী রামেন্দু দত্ত।

ওগো, শাওন মেঘ,
আজি, তৃষিত চাতক ডাকে,—এস গো!
তব, বিপুল বেগ
বল, আজি কে ধরিয়া রাখে?
আজি, তৃষিত চাতক ডাকে,—এস গো!
হের, শুকালো বারি তপন-তাপে
তরল অনল অনিলে বহে,
আশার বাহন এস শ্যামঘন
তৃষাতুরে ভালবেসো হে
এস হে।
আজি, ধূলার বসুধা ভাবিছে সৃষ্টি
বজ্র চমকে এলোনা বৃষ্টি,
মলিনা ধরার মাধুরী শুকালো,
দানবের লীলা নেশো হে।
এস এস হে।

আমি চাতকের প্রায় চুকারিয়া উঠি
তৃষিত, ধরার পথে;
তুমি এস নেমে এস কাজল-বরণ
তোমার বিমলী রথে!
কঠিন পাষাণে আছাড় লাগিয়া
গিয়াছে আমার বক্ষ রাঙিয়া
তপ্ত ব্যথিত সঘে তনু-চিত
যাতনায় যাচি শেষ হে
এস, এস হে!
আজি, কল-কোলাহলে ভরেছে জগৎ
স্তব্ধ করিয়া আনো তব রথ,
অবিশ্বাসীর হেলার হাসির
কলুষ-উৎস নেশো হে!
ধূলি-বিমলিন পাপে তাপে হীন
ধরণীর বুকে এসো হে।

চিঠি

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

ভাই বেণু,

তোমাকে লিখেছিলাম আমরা 'বড় পাহাড়ে' আছি, এবার এ জায়গাটার সমস্ত বিবরণ দিচ্ছি। কাল্‌কা থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে একটী ছোট পাহাড়ী পল্লীই এই 'বড় পাহাড়'। বেশ সুন্দর জায়গা, বড় বড় পাহাড়-গুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে গায়ে পাইন গাছগুলি দিনরাত বাতাসে দোল খায়। নীচে একটা ঝরণা একটানা ছুটে চলেছে, ধারের চিবি চিবি পাথর-গুলোতে জল বেধে কেমন ফোয়ারার মত ছিট্‌কে ওঠে—সেখানে সূর্য্যের কিরণ এসে কত রঙের খেলা খেলে মিলিয়ে যায়। সকালের রোদ ওঠা আমরা দেখতে পাই না, সান্ধ্য সূর্য্যের অস্তমিত রশ্মিও আমাদের মুখে এসে পড়ে না। যখন বেলা ন'টা বাজে তখন সেই পাহাড়গুলোর মাথার উপর দেখ্‌তে পাই উঁকি দিচ্ছেন আমাদের সূয্যি মামা; আর যখন চারটা বাজে, তখন আমাদের এই ছোট গাঁ খানি অন্ধকারে ঢেকে আসে। এদেশে কত রকমের ফুল কত প্রকার গাছ-পাতায় কেমন সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে, তা আমি ঠিক বল্‌তে পার্ব্ব না। ছোট ছোট ঝাঁশগুলি সবুজ পাতার ভারে পাহাড়ের কোলে লুটিয়ে পড়েছে, তারই আসে পাশে একটুখানি সমতল ক্ষেত্র গম-ছোলায় ভরপুর,—যেন ঠিক্ কোন্ এক স্বপ্নপুরীর ইন্দ্রজাল।

এ পাহাড়টার একটা প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছি। কোন্ কালে নাকি এক ভাইনী বুড়ী এখানে বাস ক'র্ত্ত, সে নাকি রামরাবণেরও আগেকার লোক ছিল, তখন এখানে আর কেউ ছিল না। সে এই পাহাড়টিতে আঙ্গুরের চাষ ক'র্ত্ত আর তাই খেয়েই পাকা আমটির মত হয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটিয়ে দিত। কিন্তু দূরে ছিল এক গন্ধর্ব্বদের দেশ, সন্ধ্যা হলেই তাদের যত ডানপিটে মেয়েগুলো এসে বুড়ীর ক্ষেতের সমস্ত আঙ্গুর খেয়ে গাছ গুলো ভেঙ্গে পালিয়ে যেত। বুড়ী খুব ক্ষমতাশালিনী হলেও ঐ গন্ধর্ব্বদের মেয়েগুলোকে পেরে উঠ্‌ত না। একদিন রেগে পাহাড়কে বল্‌লে "তুই এত উঁচু হ' যেন তোর মাথা আকাশে গিয়ে ঠ্যাকে, আর যেন মেয়েগুলো এদিকে না আস্‌তে পারে।" বলামাত্রেই তাই হল, সেই থেকেই পাহাড়টি এত উঁচু হয়ে আছে। আরও নাকি উঁচু ছিল, কেবল মেঘের ঘাত-প্রতিঘাতে অনেক খ'য়ে গিয়েছে; মন্দ নয়। তাইনি বুড়ীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন নিদর্শন পাইনি, তবে এ দেশের মেয়েরা ছোট ছেলেমেয়ের অসুখে-বিসুখে এখনও সেই বুড়ীর উদ্দেশে পুজো দেয়।

মেজু কিন্তু তোমাকে একটুকুও ভুলতে পারেনি, সে তোমাকে বড্ড ভালবাসে; কাল রাতে বায়না নিয়েছিল তোমার কোলে শুয়ে ঘুমুবে। খোকাবাবু ভাল আছেন, মা-বাবার শরীর একটু ভাল বলেই বোধ হয়; বুধুয়া আর হরিসিং ঠাকুর বলে কি না, "দিদিবাবু আপনারা আর এদেশ ছেড়ে যাবেন না।"

এখানে এসে একটা নতুন ঘটনা ঘটেছে, তোমাকে লিখিনি বোধহয়। এই গাঁয়ের সীমান্তে একটা পাহাড়ের গুহায় এক হনুমানজী ঠাকুরের আস্তানা ছিল, আমরা প্রায়ই সেদিকে বেড়াতে যেতাম। এই ঠাকুরটিকে নিয়ে এক বৃদ্ধ সেই গুহায় থাক্‌ত; সঙ্গে ছিল সদ্য ফোটা গোলাপের মত তার একমাত্র নাতিনীটি,—এই তিনেই তার সংসার। বেশ মানুষটি, আমাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। তার নাতিনীটি বড় সুন্দর আধ আধ হিন্দীতে আমাদের সঙ্গে কথা কইত, আমাদের দেখ্‌লেই ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে প'র্ত্ত একটা বাঁধভাঙ্গা নদীর কলগানের মত উদ্দাম—নৃত্যচপল হয়ে। বুড়োও আমাদের সঙ্গে অনেক কথাই বল্‌ত কিন্তু সে বড় করুণ, বড়ই দুঃখের; আমি খুব সাবধান হয়েও চোখের জল রুখ্‌তে পারিনি। তার সেই অতীত জীবনের ইতিহাসে, যেখানে তার সমস্ত আশা-ভরসার মূলে একদিন অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়েছিল, সে কথাগুলোতে শুধু একটা কান্নার জমাটবাঁধা অন্ধকার

বই আর কিছুই ছিল না; তবু আমি খুব প্রাণ দিয়েই শুনেছি।

একদিন বলেছিল, যেদিন সে সব হারিয়ে তার মেয়েটিকে নিয়ে পথে এসে দাঁড়াল, সেদিন সে একেবারে কপর্দ্দক হীন। গ্রামান্তরে একজন বিশিষ্ট অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে গরুর রাখালের কাজে নিযুক্ত হয়,—এ শুধু মেয়েটির জন্যেই। সেখানে বাপে মেয়েতে আবার নতুন করে সংসার বাঁধে। এক রকম কেটে যাচ্ছিল মন্দ নয়, কিন্তু সে সুখটুকুও বেশীদিন ভোগ ক'র্ত্তে পারনি সে। তার মেয়েটি ছিল একটা আগুনের ফুল্‌কি, যেমনি রং তেমনি গড়ন। দুএক বছর যেতে না যেতেই যৌবনের সোণার কাটির ছোঁয়া লেগে সে আরও সুন্দর হয়ে উঠ্‌ল। গৃহকর্ত্তার একটী ছেলে ছিল, সে তাকে সাদরে বরণ ক'রে নিলে—এ কেউ জান্‌লে না, শুনলেও না। মেয়েটিও এ প্রলোভন ত্যাগ ক'র্ত্তে পারে না, তার তুচ্ছ রূপযৌবনের সঙ্গে প্রাণটিও পুষ্পাঞ্জলির স্বরূপ দিয়ে দিলে সেই ছেলেটির পায়ে।

কালক্রমে এ কথা প্রকাশ হয়ে গেল। তখন কর্ত্তাবাবুটি তাকে আদরে বধূরূপে গ্রহণ করা দূরে থাকুক,বাপ-মেয়েকে উত্তম মধ্যম পুরস্কার দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বুড়ো তখন মেয়েটিকে নিয়ে চায়পুঞ্জি বলে একটা জায়গায় চলে যায়; সেখানে গিয়ে তার মেয়েটি একটি কন্যা প্রসব করে মারা যায়। সেই অবধি সেই মা-হারা মেয়েটিকে নিয়ে এইখানেই সে থাকত, আজ আর সে নেই,আছে তার সেই ছোট্ট তিন বছরের নাত্‌নীটি। বুড়ো মৃত্যুর সময় বাবার হাত ধরে ছোট্ট মেয়েটিকে দিয়ে বলে গিয়েছে—"আমার মেয়ে, স্বর্গের অনাঘ্রাত পারিজাত সে, তাকে প্রলোভনে ভুলিয়ে পায়ে দলে মেরেছে। তাড়িয়ে দেওয়ার পর একটিবার সে খোঁজও নেয় নি, একখানা চিঠি লিখেও বড় করেনি; সেই দুঃখে অভিমানে মেয়ে আমার মরেছে, শুধু মরেনি—আত্মহত্যা করে মরেছে তার চার মাসের শিশু মেয়েটিকে এই বুড়োর বুকে চাপিয়ে দিয়ে। সে আমার সকল জ্বালা জুড়িয়েছে, আমিও এইবার জুড়ুলাম।" সে অভিসম্পাত দিয়ে গেছে পুরুষ হয়েও পুরুষকে, নরক বাসের স্থায়ী বাসিন্দা হতে। সে হবে কিনা জানিনা, তবে মনে হয়, বিধির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের উপাদান-সমষ্টি এই নারী, না জানি কত মনোরম মাধুর্য্যই না তার ছিল; সে সব নষ্ট করেছে ঐ একমাত্র পুরুষ তার নির্ম্মম নিষ্পেষনে—অসঙ্কোচ কশাঘাতের বেদনা-কালিমায়।

যাক্, মেয়েটি এখন আমাদের কাছেই আছে; বেশ দেখ্‌তে তাকে, কাঁচা সোণার রং তার সারা গায়ে, তেমনি হৃষ্টপুষ্ট নাদুস্‌নুদুসটি। মাথায় একমাথা কালো-কটায় মিশান কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বাতাসে বাতাসে উড়ে এসে তার চোখ-মুখ ঢেকে দেয়। ঠোঁট দুটি দুধে আলতায় গোলা লাল, চোখ দুটি যেন টলটলে পদ্ম। সব চেয়ে মিষ্টি তার চাউনিটি, সে যখন চায়, তার জলভরা বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে টপ্ টপ্ করে ফোটার পর ফোটাগুলো গড়িয়ে আসে,—সেই দৃষ্টিতে কি করুণ গানই না বাজে, যেন সেই তার মার দুঃখ পূর্ণ জীবনের অবসান ছবিটি; যেন সে ভগবানকে স্মরণ করে কাঁপিয়ে যাচ্ছে নিচেকার উদ্দাম ধরণীর বুকে; যেন একখানি সন্ধ্যার ম্লান সূর্য্য সীমান্তরালে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে।

দাদামহাশয় তার নাম রেখেছিল বাচ্চি, এদেশে খুকিকে বাচ্চি বলে; আমরা কিন্তু নাম রেখেছি নিহারীকা, বাবাই পছন্দ করে এ নাম দিয়েছেন। সে আমাদের সংসারে এমনি আপনার হয়ে গিয়েছে যে, খোকাবাবু তাকে না পেলে দুধ খেতে চান্ না, সে কাছে না বস্‌লে বাবার গড়গড়ার আগুন নিভে আসে, কোলে না পেলে মার ঘুমই আস্‌তে চায় না, সঙ্গে না থাক্‌লে আমার বেড়িয়ে আনন্দ হয় না।

এইবার হনুমানজীর প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারে মনোনিবেশ কর্ব্ব ঠিক করেছি, অনেক উপকরণও যোগাড় হয়ে গেছে, ফলাফল পরে জানাব। আজ বিদায়। ইতি

তোমারই—নিরুপমা।

আসামের হিন্দুমহিলাদিগের কৌলিক প্রসঙ্গ

শ্রী বিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী।

কামরূপের ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির লোকেরা আদ্য ঋতুকে "পুষ্পোদগম" এবং অন্যান্য জাতির লোকেরা "পানী ধোলনী" আদি বলেন।

আদ্য ঋতুর দিন হইতে চতুর্থ দিনের দিন ঐ তিন জাতির মহিলাদিগের মধ্যে যে উৎসব হয় তাহাকে "পুষ্পোৎসব" বলা হয়। যেদিন আদ্য ঋতু হয়, সেই দিন হইতে দ্বিতীয় দিন পর্য্যন্ত ঐ তিন জাতির কন্যাকে ফলাহার ব্যতীত আর কিছুই খাইতে দেওয়া হয় না এবং তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত বয়স্থেষ্ঠীয় হিন্দুকন্যার মত সূর্য্যের মুখ দেখা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। কোন অসমীয়া কন্যা ঋতুমতী হইলে ঘরের পশ্চাৎভাগে একটী কলাগাছ পোতা হয়। বাড়ীর লোকে একটী অথবা দুইটী কলাগাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া সেখানে বিছাইয়া রাখিয়া দেয়। স্বচ্ছল ভদ্রঘরের কন্যা হইলে, বাড়ীর কি এবং নিম্নশ্রেণীর ঘরের হইলে তাহার আপন জ্যেঠাই, খুড়ি অথবা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া চতুর্থ দিবসে তাহাকে ঐ খণ্ডিত কলাগাছের উপর বসাইয়া স্নান করাইয়া দেন। সেখানে গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক যথাসময়ে একত্রিত হইয়া গীত গাহিয়া থাকেন। স্নানান্তে কন্যাকে ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর ৭টী যজ্ঞ ডুমুর, ৩টী পান, খানিকটা "খুরি" (কচি) কলাপাতা, ৩।৪ অঙ্গুলি প্রমাণ দীর্ঘ খড়—এইগুলিকে একত্র করিয়া তিনটী বিভিন্ন রঙের সূতার দ্বারা বাঁধা হয়। কামরূপীরা ইহাকে "কানাই" অর্থাৎ ছেলে কৃষ্ণ বলেন। এই কানাইকে কন্যার হস্তে দেওয়া হয়। কন্যা তাহার প্রত্যেক প্রতিবেশীনীর হস্তে উহা প্রদান করে। তাহারা উহাকে চুম্বন করেন এবং যথাসাধ্য উপহার সহ কন্যাকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনিচ্ছুক স্ত্রীলোকেরা "কানাই" গ্রহণ করেন না।

অসমীয়া হিন্দু কন্যার দ্বিতীয় সংস্কার

আপার আসাম অঞ্চলেও এইরূপভাবে "কানাই" করিবার প্রথা আছে। কিন্তু নিম্ন-আসামে কানাইয়ের পরিবর্ত্তে একখানি কাটারী উপরিউক্ত দ্রব্যাদি সহ এক-খানি গামছায় বাঁধিয়া পূর্ব্বমত করা হয়। এই কাটারীর সহিত একটী দাড়িম্ব ফলও বাঁধা হয়। নিম্ন-আসামের অসমীয়ারা ইহাকে "ফল কাটারি" বলিয়া থাকেন। এই কানাই ও ফলকাটারী যত্ন পূর্ব্বক ঘরে রাখিয়া দেওয়া হয়। স্থিরীকৃত দ্বিতীয় বিবাহের দিন বিবাহসভায় বর ও কন্যার মধ্যভাগে একখানি কাপড় বা পর্দ্দা ধরা হয়। কন্যা ঐ কানাই অথবা ফলকাটারীকে পর্দ্দার উপর দিয়া বরের দিকে ফেলিয়া দেয়। কন্যাও কাপড় পাতিয়া বর প্রত্যার্পিত ঐ কানাইকে ধরিয়া লয়। তিন অথবা পাঁচ বার এইরূপ করাই দেশীয় প্রথা। আসামের নামতি ও উত্তরীয়া অঞ্চলে ইহাকে "কানাই সলেয়া" বলা হয়। অসমীয়া ভাষায় 'সলেয়া' অর্থে অদল-বদল বুঝায়।

এক্ষণে আমরা দরঙ্গ জেলার কথা বলিব। সেখানে সাধারণ শ্রেণীর কন্যা ঋতুমতী হইলে গ্রামস্থ এবং নিকটস্থ আত্মীয় কুটুম্বের স্ত্রীলোকেরা সপ্তম দিবসে একত্রিত হইয়া তাহাকে স্নানান্তর নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এই কার্য্যে পুরোহিত আসিয়া শান্তিজল দেন। দরঙ্গ জেলার তেজপুর অঞ্চলে এই অনুষ্ঠানকে "পাণি-তোলানী" বলে।

কামরূপ অঞ্চলে বর প্রথম বিবাহ করিতে কন্যার পিত্রালয়ে গিয়া থাকেন, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ করিবার জন্য সেখানে যান না। কন্যার পিতা, ভ্রাতা কিংবা কোন নিকটস্থ আত্মীয় ডুলিয়া, খুলিয়া ও গ্রামের কতিপয় স্ত্রীলোক এবং কন্যাসহ বরের বাটীতে যান। সেখানে ঐ কন্যার "দ্বিতীয় বিবাহ" হয়। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য যে সকল জাতির লোকেরা পূর্ব্বে কুমারী বিবাহ করিয়াছিল, সেই কন্যা বড় হইয়া পুষ্পবতী হইলে উক্ত প্রথানুযায়ী স্বামীর ভিটায় তাহাদেরও "দ্বিতীয় বিবাহ" হইবে। কলিতা, কেওট আদি যে সকল জাতির লোকেরা কন্যা বিবাহ করে তাহাদের দ্বিতীয় বিবাহ

অসমীয়া হিন্দু বরকন্যার দ্বিতীয় বিবাহ

নাই—এবং বিবাহেই শেষ। এই বিবাহে বর, কন্যার বাড়ী গিয়া থাকেন। উজনীয়া অঞ্চলের সকল শ্রেণীর লোকেরা বাঙ্গালীদিগের ন্যায় কন্যার বাড়ীতে গিয়া দ্বিতীয় বিবাহ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

একণে অন্য আচরণীয় অসমীয়া হিন্দুকন্যা বা মহিলাদিগের রজঃস্বলার কথা বলা যাউক। কামরূপ অঞ্চলের কোন উচ্চশ্রেণীর রমণীর রজঃস্বলা হইলে ৩ দিন পরে স্নান করেন। এই দিবস ত্রয়ের মধ্যে তাঁহাকে সংসারের কোন কাজ করিতে, এমন কি খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিতে, মৎস্য কুটিতে পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না। অন্নাদি ভোজনের অসমীয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের যে স্বতন্ত্র ঘর থাকে তাহাও স্পর্শ করা তাঁহার একেবারে নিষিদ্ধ। তৎকালে ঐ রমণী তাঁহার স্বামীকে পান দিতেও পারিবেন না। চতুর্থ দিনে স্নানান্তে তিনি জল আনিতে কিংবা গোয়াল ঘরে যাইতে পারেন; কিন্তু রন্ধন করিতে অথবা কাহাকেও খাদ্যদ্রব্য কিংবা পান দিতে পারেন না। পঞ্চম দিনে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইলে এই সকল বিষয়ে তিনি অধিকারিণী হন এবং তাঁহার বাটীর কাজকর্ম্ম নিয়মমত করেন। উজনীয়া অঞ্চলের কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বলা হইল না।

অসমীয়া হিন্দু কন্যার রজঃস্বলা।

বর্ষা-নিশীথে

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

আকাশ জলদে ভরা,
তমোময়ী বসুন্ধরা,
চারিদিকে আলোকের লেশমাত্র নাই;
ঊর্দ্ধে নীহারিকা-পথে
গভীর তমসা-স্রোতে
অগণ্য জ্যোতিষ্ক রাশি বিলুপ্ত সবাই।
ঝর ঝর বারি ঝরে,
বায়ু বহে তার স্বরে,
ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছে বিজলী জ্বলিয়া;
সে তীব্র আলোক-আভা
বাড়ায় মেঘের শোভা,
ধরণীর ম্লান মুখ ওঠে উজলিয়া।
নাই জন-কোলাহল,
প্রাঙ্গনে জমিছে জল,
পড়ে আছে রাজপথ পথিক-বিরল,
উন্মাদ সমীর-বেগ,
আকাশে ডাকিছে মেঘ,
স্ফীত বক্ষ খাত আজি হয়েছে প্লবন।
কাঁদে নীড়-হারা পাখী,
হেলিয়া পড়িছে শাখী,
পুরাতন গৃহগুলি উঠিছে কাঁপিয়া,
আবর্ত্ত, পুষ্কর আজ
পরিয়া রুদ্রের সাজ
দিতেছে প্রলয়-স্মৃতি মনে জাগাইয়া।
দাঁড়াইয়া বাতায়নে
বিস্ময়-চকিত মনে
হেরিতেছি প্রকৃতির ভীষণ মূরতি;
আঁধারে আবৃত দিশা,
দ্বিতীয় প্রহর নিশা
ম্লান মুখে জলধরে করিছে আরতি।

বাঙ্গালীর আহার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

** রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রী চুণীলাল বসু, এম্-বি, সি-আই-ই, আই-এম্-ও, এফ্-সি-এস্।

কোন্ খাদ্যদ্রব্যে কোন্ জাতীয় ভাইটামিন্ অবস্থিতি করে এবং মোটামুটী তাহাদের পরিমাণই বা কত, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে প্রতীত হইবে। যে খাদ্যদ্রব্যে ভাইটামিনের পরিমাণ যৎসামান্য মাত্র, উহা একটী যোগচিহ্ন (+)দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ ভাইটামিন্ থাকিলে দুইটী যোগচিহ্ন (+ +) এবং উহা প্রচুর পরিমাণে থাকিলে উক্ত পরিমাণ তিন (+ + +) বা চারিটী (+ + + +) যোগ চিহ্ন দ্বারা তালিকা মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল খাদ্যদ্রব্য এদেশে নিত্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদেরই ভাইটামিনের পরিমাণ এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল। ভাইটামিনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে উহা জিজ্ঞাসা সূচক-চিহ্ন (?) দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

১ম তালিকা।

খাদ্যদ্রব্যে ভাইটামিনের পরিমাণ।

খাদ্যদ্রব্য	ভাইটামিন্		
	"এ" (A)	"বি" (B)	"সি" (C)
চাউল (আছাটা)	+	+ + +	•
ঐ (কলে ছাটা, Polished)	•	•	•
আটা (যাঁতাভাঙ্গা, Wholemeal)	+	+ + +	
ময়দা (ধব্‌ধবে, White)	•	•	
দাল (Pulses)	+ ?	+ +	
বরবটী		+ + +	
যব (Barley)	+	+ + +	?
গমের ভূষি	+	+ + +	•
মকাই বা ভূট্টা	+	+ + +	?
অঙ্কুরিত শস্য	+	+ +	+ +
চীনাবাদাম (Ground nut)	+	+ +	
চিনি	•	•	•
দুগ্ধ (কাঁচা, fresh unboiled)	+ + +	+ + +	+ +
ঐ (বহুক্ষণ জাল দেওয়া)	?	+	+
দধি বা ঘোল	+	+ + +	+
মাটা (Cream)	+ + +	+	•
মাখন (Butter)	+ + + +	•	•
পনির (Cheese)	+ +	+	?
ঘন দুগ্ধ (Condensed Milk)	+ +	+	•
ঘৃত	ঘৃতে মাখনের অপেক্ষা কিছু কম পরিমাণ ভাইটামিন্ থাকে। ঘৃত অত্যধিক উত্তপ্ত হইলে উহার অধিকাংশ ভাইটামিন্ নষ্ট হইয়া যায়।	•	•

খাদ্যদ্রব্য	ভাইটামিন্		
	"এ" (A)	"বি" (B)	"সি" (C)
মাংস	+	+	
মৎস্য	+ +	+ +	?
মাছের ডিম্	+	+ +	?
লেটে (Liver)	+	+	+ ?
মস্তিষ্ক (Brain)	+ +	+ + +	+ ?
মাছের তেল	+ +		
কড্ লিভার অয়েল (Cod liver oil)	+ + + +	•	
গো-মেদ (Beef fat)	+	•	
শুকরের চর্ব্বি (Lard)	• ?	• •	
ডিম (Eggs)	+ + + +	+ +	
ডিমের কুসুম (Yellow of egg)	+ + + +	•	?
উদ্ভিজ্জ তৈল	• ?	•	•
আলু		+ + +	+ +
কলাই শুঁটী	+	+ +	+ + +
বাঁধাকপি	+ + +	+ + +	+ + + +
ফুলকপি	+ +	+ + +	+ +
বিলাতী বেগুণ (Tomato)	+ +	+ + +	+ + + +
পালম শাক (Spinach)	+ + +	+ + +	+ + +
লেটুস (Lettuce)	+ +	+ +	+ + + +
বীচ্ পালং	+	+	+ +
পিয়াজ		+ + +	+ + +
কমলা লেবু (Oranges)	+ +	+ + +	+ + + +
লেমন্ (Lemons)		+ + +	+ + + +
পাতি বা কাগজি লেবু (Limes)		+ +	+ +
আপেল্		+ +	+ +
আঙ্গুর		+	+
কলা	?	+	+ +
তালপাতি		+ +	+ +
নারিকেলের শাঁস	+ +	+ + +	
কিস্‌মিস্		+	+
বাদাম	+	+ + +	
আখরোট		+ + +	
চেস্‌নট্ (Chesnuts)	+ +	+ + +	
মধু		+ +	
পাউরুটী (White bread)		+ ?	
ঐ (Wholemeal bread)	+	+ + +	?

আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ভাইটামিন্ ব্যতীত যথেষ্ট পাঁচ জাতীয় সার-পদার্থ শতকরা কত পরিমাণে থাকে এবং আধ ছটাক (এক আউন্স) বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য হইতে দেহমধ্যে কত তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। এই তালিকার সাহায্যে, দিবসে এই সকল বিভিন্নজাতীয় খাদ্যদ্রব্য কোনটী কত পরিমাণে গ্রহণ করিলে

আমাদের দেহ-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে এবং দেহ-তাপ ও কর্ম্মকরিবার শক্তি আমরা যথোচিত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তাহা গণনা দ্বারা সহজে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

২য় তালিকা।

খাদ্যদ্রব্যে সার-পদার্থের শতকরা পরিমাণ।

	ক্যালরি—এক পাউণ্ড দ্রব্যে কত তাপ উৎপন্ন হয়।	জল	ছানাজাতীয় উপাদান (Protein)	মাখনজাতীয় উপাদান (Fat)	শর্করাজাতীয় উপাদান (Carbohydrates)	লবণজাতীয় উপাদান (Salts)
চাউল ...	২৪	১১.০৬	৬.৭১	০.৯০	৮৫.১০	০.৯৮
দাল ...	২২	১১.৩০	২৩.৯০	২.২৯	৫৫.১০	৭.১০
ময়দা ...	১০৬	১৫.০	১১.০	২.০	৭১.২০	০.৮০
যব (Barley) ...	১০১	১১.৩০	১২.৭	২.০	৭১.১০	৩.০
ওট্ মীল্ ...	১০৬	১৫.৪০	১২.৬০	৫.৬০	৬৩.০	৩.০
পাউরুটী	৯০	৪০.০	৮.০	১.৫০	৫৩.১০	১.৩০
রুটী (হাতে গড়া)		১৭.৩৩	৯.৪৩	৩.৭১	৬১.২০	০.৩৩
গো-দুগ্ধ	২০	৮৬.৮৭	৩.২৭	৪.২৮	৪.৮২	০.৬০
মাখন	২২২	৭.৫০	১.০	৯০.৫০	...	১.০
ঘাটা (Cream)		২৮.৬৭	৪.০৫	৬৫.০১	১.৭২	০.৪১
ছানা	৭৬	৫৭.০২	২২.৩৩	১৮.৬৪	০.৩৮	১.৬১
দধি ...	১৭	৮৭.৮৪	৭.৭৭	৩.৫৭	২.৪	০.৬২
পনির (Cheese) ...		৩৬.০	৩১.০	২৮.৫০		৪.৫০
মাংস (গড়ে) ...	৫৪	৭৭.৪০	২০.৫০	৩.৫০		১.৬০
মৎস্য (গড়ে) ...	৪০	৭৮.০	১৮.১০	২.৯০		১.০
ডিম	৫০	৭৩.৫০	১৩.৫০	১১.৬০		১.০
আলু ...	২৫	৭৪.০	২.০	০.১৬	২১.০	১.০
কলাইশুঁটী ...	৩১	৭৮.৪৪	৬.৩৬	০.৫৩	১২.০	০.৮১
শ্লেষ্ম বীজ ...		৯০.০২	২.৭৩	১.১৮	৫.১৬	০.৭২
অন্য তরকারী (গড়ে) ...	১০	৯১.০	২.০৫	০.৩৪	৫.৩৩	০.৮১
চীনা বাদাম (Ground nut)...	১৬১	৮.৩০	২৫.০	৪৪.৩০	১৭.০	১.৯০
নারিকেলের শাঁস ...	১৯০	১২.৩০	৫.৩৪	৫৩.১৪	৫.৪৬	১.৩২
বাদাম ...	১৪২	৬.০	২৪.১	৫৪.০	১০.০	৩.০
কলা (গড়ে) ...		৭৬.৪৭	১.৮	০.১৩	১৪.১৫	৩.৯৭
বিস্কুট (Biscuit) ...	...	৮.০	১৫.৬	১.৩	৭৩.৫	১.৭

একজন সুস্থ সবল যুবা পুরুষের দেহপুষ্টি, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং সহজ পরিশ্রম ঘটিত যাবতীয় কার্য্য করিবার শক্তিলাভের জন্য দিবসে ১½ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় সার পদার্থ, ১ ছটাক নির্জ্জল মাখনজাতীয় সারপদার্থ, ৮½ ছটাক নির্জ্জল শর্করাজাতীয় সারপদার্থ এবং ½ ছটাক লবণজাতীয় সার পদার্থের প্রয়োজন হয়। ইহা দ্বারা দেহতাপ-রক্ষা ও পরিশ্রম-

ঘটিত কার্য্য করিবার জন্য দেহমধ্যে দিবসে ২৮০০ ক্যালরি (Calorie) পরিমিত তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিম্নে বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্যের দুইটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাঙ্গালীর খাদ্যে সাধারণতঃ প্রোটীনের অভাব লক্ষিত হয় এবং যথোচিত পরিমাণ প্রোটীনের অভাব বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম কারণ। যে বয়সে শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে আমাদিগের ছাত্রগণ যথোচিত পরিমাণ প্রোটীন্ প্রাপ্ত হয় না বলিয়া তাহাদিগের মাংসপেশী সুদৃঢ় এবং সুপুষ্ট হয় না এবং তাহাদের দেহ সহজেই রোগপ্রবণ হইয়া পড়ে। কলিকাতার অনেক ছাত্রাবাসের খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহার মধ্যে প্রোটীনের পরিমাণ কম থাকে। আমাদের ছাত্রদিগের খাদ্যের সংস্কারের একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। মাছ, মাংস, দাল, ডিম, দুধ প্রভৃতি পদার্থের পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দিলেই এই অভাব পূর্ণ হইয়া যায়। যে সকল ছাত্রের আর্থিক অবস্থা উন্নত নহে, তাহারা যদি মাছ মাংস ও দুধের পরিবর্ত্তে দাল কিছু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে এবং জল খাবারের সহিত ছানা ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাদের খাদ্যে প্রোটীনের অভাব পূর্ণহইয়া যায়। অনেকের ধারণা যে দাল সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। এই ধারণা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে। দাল ঠিক ভাবে প্রস্তুত হইলে উহা পরিপাক করিতে বিলম্ব হয় না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে যথারীতি প্রস্তুত মসুর দালের প্রোটীন্ শতকরা ৯২ ভাগ আমরা সহজে পরিপাক করিতে সমর্থ হই। মাংস এবং দুধের প্রোটীন্ শতকরা ৯৭ ভাগ পরিপাক প্রাপ্ত হয়। দাল এরূপভাবে সুসিদ্ধ হওয়া উচিত যে উহার বীজ মোটেই পৃথক্‌ভাবে দেখা যাইবে না এবং উহা ক্ষীরের মত ঘন হওয়া উচিত। দাল হইতে এত প্রকার মুখরোচক পুষ্টিকর খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করা যাইতে পারে যে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ যদি প্রত্যহ সিদ্ধ দাল ব্যতীত দালের দুই চারি প্রকার রসনাতৃপ্তিকর পিষ্টক বা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে বিভিন্ন আকারে দাল কিছু অধিক পরিমাণে খাইবার অসুবিধা হয় না। আমাদের গরীব দেশে দাল ভাত বা দাল রুটীর ব্যবস্থা চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে। দেশ কাল পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সঙ্গতপর বলিয়া মনে হয় না এবং এই সনাতন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকও নাই। এই ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া ইহার মধ্যে যাহা দোষদুষ্ট, তাহাই পরিহার করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাঁহারা নিরামিষাশী, তাঁহারা দাল ভাত বা দাল রুটীর সঙ্গে অল্প পরিমাণ দুগ্ধ পান করিলে অথবা দধি বা ছানা ভক্ষণ করিলে তাঁহাদের শরীরের পুষ্টিলাভ, বলবিধান এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কোন অসুবিধা ঘটিবে না। আমাদের খাদ্যে সাধারণতঃ শর্করাজাতীয় উপাদানের (Carbohydrates) পরিমাণ অত্যন্ত অধিক এবং ছানা জাতীয় উপাদানের (Proteins) পরিমাণ কম থাকে। ভাত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি শর্করাজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ আবশ্যকমত কমাইয়া দাল, মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতি প্রোটীন্ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দিলেই আমাদের দৈনিক খাদ্যে বর্ত্তমানে যে দোষ আছে, তাহা কাটিয়া যাইবে। বাঙ্গালীর আহারের এরূপ সংস্কার সাধন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের অন্নদাত্রী গৃহলক্ষ্মীদিগের মনোযোগ এবিষয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

নিম্নে যুবক ছাত্রদিগের জন্য দৈনিক খাদ্যের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। যাহারা মাছ মাংস স্পর্শ করে না, তাহারা আমিষ দ্রব্যের পরিবর্ত্তে যথোচিত পরিমাণ দুধ বা ছানা ব্যবহার করিলে সমান ফল প্রাপ্ত হইবে। এই পরিমাণ পদার্থ দিবসে তিন বা চারি ভাগ করিয়া খাওয়া উচিত। অপরাহ্ণে জল খাবারের সহিত কিছু ফল খাওয়া আবশ্যক এবং প্রাতে প্রত্যেক ছাত্রকে কিছু ভিজা ছোলা বা মুগ, গুড় অথবা আদা ও লবণের সহিত খাইতে অনুরোধ করি। এই পরিমাণ খাদ্য হইতে ছাত্রগণ ১½ ছটাক (৯০ গ্রাম্*) নির্জ্জল ছানাজাতীয় (Protein) ১ছটাক (৬০ গ্রাম্) মাখনজাতীয় (Fats) এবং ৮½ ছটাক (৭০ গ্রাম্) শর্করা জাতীয় (Carbohydrates) উপাদান এবং দেহ-তাপও পরিশ্রম করিবার শক্তি লাভ করিবার জন্য ২৮০০ ক্যালরি (Calorie) পরিমিত তাপ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। টাট্‌কা তরকারি এবং ফল মূল হইতে যথোচিত পরিমাণ ভাইটামিন্ সংগ্রহ করিবার অসুবিধা হইবে না। এই পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য মাসে ১৫।১৬ টাকার অধিক খরচ হইবে না।

* এক গ্রাম্ (Gramme), ১৫·৪৩২ গ্রেণের (Grain) সমান। প্রায় ৩০ গ্রামে এক আউন্স (Ounce) হয়। এক ছটাক প্রায় দুই আউন্সের সমান।

৩য় তালিকা।

বাঙ্গালী যুবক ছাত্রগণের দৈনিক খাদ্যের তালিকা।

খাদ্যদ্রব্য (কাঁচা অবস্থায়)	পরিমাণ	প্রোটীন্ (গ্রামের পরিমাণে)	দাহনজাতীয় উপাদান (গ্রামের পরিমাণে)	শর্করাজাতীয় উপাদান (গ্রামের পরিমাণে)	ক্যালরি (তাপের পরিমাণ)
চাউল	৩ ছটাক	১২·৪	০·৭২	১৩৪	৫৭৪
আটা	৫ „	৩৬	৮·৭	২০১	১০০০
দাল	১½ „	১৮	২·৪	৪৬	২৭৬
মৎস্য *	২½ „	২০	১১·০	৫	২৭৮
আলু	৩ „	০·৪	৩·০	৩৬	১৪০
অন্য তরকারি	৪ „	৩·০		২০	৮০
ঘৃত	½ „	০	১৪·৫	০	১১১
সরিষা তৈল	½ „	০	২৯	০	২২২
চিনি	½		২৭৩	০	১০৯
লবণ	½ „				
মসলা	যথাপরিমাণ				
	২০½ ছটাক	৯০ গ্রাম্	৬৯·৩২ গ্রাম্	৪১৮·০ গ্রাম্	২৮০০ ক্যালরি

৪র্থ তালিকা।

সহজ পরিশ্রমশীল পূর্ণ বয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ।

খাদ্যদ্রব্য (কাঁচা অবস্থায়)	পরিমাণ
চাউল	৩ ছটাক
আটা	৫ „
দাল	১½ „
মাছ * মাংস	২½ „
আলু	২ „
অন্য তরকারি	২ „
ঘৃত	½
সরিষা তৈল	½ „
দুগ্ধ	৮ „
লবণ	½ „
মসলা	যথা পরিমাণ

দেড় মণ ওজনের বাঙ্গালীর পক্ষে এই পরিমাণ দৈনিক খাদ্য যথেষ্ট। দেহের ওজন বেশী হইলে, প্রতি ১ সের ওজনে ১/১০ ছটাক প্রোটীনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

স্ত্রীলোকদিগের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা ১/১০ গুণ কম হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

* উপরোক্ত তালিকার মৎস্যের পরিবর্ত্তে মাংস ব্যবহার করা যাইতে পারে। যাঁহারা নিরামিষাশী, তাঁহারা মাছ মাংসের পরিবর্ত্তে আধ সের দুধ অথবা উপযুক্ত পরিমাণ ঘি এবং ডাল ব্যবহার করিতে পারেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণের তালিকা

(১৯২৬)

ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয় :—

প্রথম বিভাগ—রমা চট্টোপাধ্যায়, মৌলিমা সরকার, ইলা দাসগুপ্ত, সত্যবতী চক্রবর্ত্তী, সুরমা দত্ত, কমলা সেন, মৌলিমা গলিহা, উমা বসু, কমলা সেন গুপ্ত, চারুবালা গুহ।

দ্বিতীয় বিভাগ—শোভনা সিংহ রায়, জ্যোৎস্না দাস গুপ্ত, পরিমল রায়, মীহারবালা গুপ্ত, রেণুকণা চন্দ গুপ্ত, লেইলা এলিস্ এথিনস্।

তৃতীয় বিভাগ :—মাধুরী বিশ্বাস।

সেণ্ট মার্গারেট্ স্কুল :—

দ্বিতীয় বিভাগ—অমিয়াবালা দাস, অনিতিমা কমলাবালা সেন।

তৃতীয় বিভাগ—চারু রায়, রুথ শীতল।

বেথুন কলেজিয়েট্ স্কুল :—

প্রথম বিভাগ—মায়া ঘোষ, অমিয়া রায়, কমলা সেন গুপ্ত, লীলা মজুমদার।

দ্বিতীয় বিভাগ—বীণা বসু, প্রকৃতি সিংহ।

ইউনাইটেড্ মিশনারী গার্লস্ হাই স্কুল :—

প্রথম বিভাগ—সরলা নন্দী, হেমলতা মণ্ডল, উর্ম্মিলা বিশ্বাস, সুষমা গুহ, সুহাসিনী বৈরাগী, কণিকা মিত্র, মিনুপ্রভা দাস।

দ্বিতীয় বিভাগ—কমলা নন্দী।

ঘার্জ্জিলিং মহারাণী স্কুল :

প্রথম বিভাগ—সুষমা বসু, প্রভাতা বসু, জ্যোতির্ম্ময়ী দাস গুপ্ত।

ডায়োসেসন্ কলেজিয়েট্ স্কুল :—

প্রথম বিভাগ—বীণিকা বেজবড়ুয়া, হেমলতা রাহা, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, এডলিন স্টেলা ম্যাকীন্ত, বীণাপাণি রায়।

দ্বিতীয় বিভাগ—অপোলা রায়, ইউজাইন ইউলেংবিয়া মিলিপস।

ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন :—

প্রথম বিভাগ—রমা দত্ত, লীলা সে, কিরণ রায়।

দ্বিতীয় বিভাগ—সুধাংশু রায়।

খৃষ্ট চার্চ্চ গার্লস্ হাই স্কুল :—

প্রথম বিভাগ—জ্যোতিকা বসু, বেলাতরঙ্গ সিংহ।

দ্বিতীয় বিভাগ—নয়নী বিশ্বাস, বীণাপাণি সরকার।

ঈডেন গভর্ণমেণ্ট গার্লস্ হাই স্কুল :—

প্রথম বিভাগ—চারুনলিনী সিংহ, কমলা গুপ্ত।

দ্বিতীয় বিভাগ—সুধালতা দাস।

ভিক্রুগড় গভর্ণমেণ্ট গার্লস্ হাই স্কুল :—

প্রথম বিভাগ—বনলতা সেন গুপ্ত।

দ্বিতীয় বিভাগ—স্নেহপ্রভা বাগচীবোহাই, চারুলতা বড়ুয়া, স্বর্ণলতা ডেকা বড়ুয়া।

শিলচর মিশন্ গার্লস্ স্কুল :—

প্রথম বিভাগ—সুরমা দাস গুপ্ত।

দ্বিতীয় বিভাগ—চারুলতা সান্যাল।

বরিশাল সদর গার্লস্ স্কুল :—

প্রথম বিভাগ—প্রমা দাস, পারুল চট্টোপাধ্যায়, রত্ন সেন, দুর্গা লাহিড়ী, শোভনা গুহ।

দ্বিতীয় বিভাগ—জ্যোতির্ম্ময়ী দাস।

চট্টগ্রাম ডাঃ খাস্তগীরস্ গার্লস্ হাই স্কুল :—

প্রথম বিভাগ—বিনয়বালা গুহ, মণিকুন্তলা দত্ত, রেণুকণা সেন গুপ্ত, জ্যোৎস্না গুপ্ত, চারুলতা দাস গুপ্ত।

ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী হাই স্কুল :—

প্রথম বিভাগ—জ্যোৎস্নাকুমারী দেবী, অনিন্দ্যসুধা ঘোষ, ইন্দিরা মল্লিক, প্রতিভা রায়, সুশীলাবালা সেন, আশালতা সেন, তাপসী চট্টোপাধ্যায়, আশা চক্রবর্ত্তী।

দ্বিতীয় বিভাগ—সান্ত্বনা বিশ্বাস, শান্তিপ্রভা রায়, পারুলবালা সরকার।

প্রাইভেট্ ছাত্রী

প্রথম বিভাগ—সুলেখা সেন, বিভা দেবী, অনন্তপ্রভা মিত্রাণী, সুচরিতা দেবী, প্রতিমা রায়, কমলাবাই ওয়েলিঙ্কার, সুশীলা প্রসাদ, শান্তি সেন, প্রতিভা সেন, চন্দ্রকলা বর্দ্ধা, সুধাকণা বসু, অমিয়া বসু, ডরথি ডোরকুস্, মেরাপুস্ত্র গ্রেস্ চাটার্জ্জী, ষ্টেফেনের ভ্র:, ফরিবাই খোরেস, মাহিলেস ডিন, শান্তিলতা মল্লিক, মেহলতাবাহন, হেমাঙ্গিনী সিংহ, বিভা সেন গুপ্ত, সুধাতা সেন, সুধন্যা মাথুর, শেফালিকা সেন গুপ্ত, এলিস্ পিটো, এডনা ব্যাজেল মৌরী দেবী, মেহলতা দাস গুপ্ত, শান্তিসুধা বসু, শেফালী মজুমদার, সান্ত্বনাময়ী রায়।

দ্বিতীয় বিভাগ—সুধাতা দেবী, শোভনা সেন গুপ্ত, প্রতিভা দাস, অমিত পাত্র, শান্তি দাস, জ্যোৎস্না রায়, প্রতিভাময়ী রায়, সুবর্ণ ঘোষ, বিভূতী শর্ম্মা, অমিতা চক্রবর্ত্তী, তাপসী দাস, মমতা সেন, সরযূবালা মিত্রিয়াম্ রুকস্, সরোজিনী বসু, প্রেমলতা সাহু, লীলা জোয়া ওয়েলং, শৈলবালা দাস, সরযূ বসু।

তৃতীয় বিভাগ—জ্যোতির্ম্ময়ী সেন, এলা রমলা ভট্টাচার্য্য, মায়াময়ী ম্যাকডোনাল্ড, মাধুরীবালা গুহ।

উত্তীর্ণা—মেরী কর্ম্মা।

আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা

(১৯২৬)

প্রথম বিভাগ :—

লীলা রায়	ডায়োসেসন কলেজ।
শান্তিসুধা ঘোষ	বরিশাল বি-এম কলেজ।
সান্ত্বনা মল্লিক	বেথুন কলেজ।
সুরমা মিত্র	বেথুন কলেজ।
লিলি সেন	ডায়োসেসন কলেজ।
ক্যাথলিন আহ্লিট	লরেটো হাউস।
ওয়েলেট্ ব্রিস্টো	লরেটো হাউস।
মেজোরী দাস	বেথুন কলেজ।
সুধা ব্রিস্টো	লরেটো হাউস।
মীরা মুখে সাধন	ডায়োসেসন কলেজ।
সুধা ঘোষ	ডায়োসেসন কলেজ।
মিনা ইউসুফালি	বেথুন কলেজ।
শোভনা চৌধুরী	ঐ
জেন হেলেন	লরেটো হাউস।
এলিজাবেথ ...	লরেটো হাউস।
অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ...	বেথুন কলেজ।
মণিকা বসু ...	ঐ
মোহাম্মলিনী বসু ...	ঐ
হেলেন্ ওয়েষ্ট	লরেটো হাউস।
ইন্দিরা গুপ্তা ...	বেথুন কলেজ।
ডায়োসেট বিরূপাক্ষ রায়	ঐ
জ্যোৎস্না গুহ ...	বরিশাল বি-এম্ কলেজ।

দ্বিতীয় বিভাগ :—

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ...	বেথুন কলেজ।
এগনেস্ মৌর	লরেটো হাউস্।
রাজর্ষি বড়ুয়া	মৌলভীবাজার হিন্দু একাডেমি।
রত্নাবলী বেরুবড়ুয়া	ডায়োসেসন কলেজ।
বিনোদা বিশ্বাস	বেথুন কলেজ
রমলা বিশ্বাস	ঐ
দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়	ঐ
অরুণা দাস	ঐ
ভবেশবালা দাস	ঐ
কমলা দাস গুপ্ত	ঐ
লক্ষ্মীঠী দাস গুপ্ত	ঐ
মলিনী দেবী	মন-কনেজিয়েট।
সুপ্রভা বসু	বেথুন কলেজ।
অরন্ধতী গুপ্তা	বেথুন কলেজ।
বেলি ব্রহ্মণ	মন কনেজিয়েট।
এলি ঘোষেফ	ডায়োসেসন কলেজ।
লুইস লঁ	ডায়োসেসন কলেজ।
মনোরমা মল্লিক	ডায়োসেসন কলেজ।
হেমলতা বিশ্বাস	বরিশাল বি-এম্ কলেজ।

তৃতীয় বিভাগ :—

নীলিমা রায়	ডায়োসেসন কলেজ।
মালিকা সরকার	মন-কনেজিয়েট।
সুলেখা সেন	বেথুন কলেজ।

অভাব অভিযোগ

বাংলার স্ত্রীলোক যেমন সামাজিক আইন-কানুনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে রয়েছে, এমন বোধ হয় জগতে আর নেই। পাশ্চাত্যদের কথা বাদ দিয়ে শুধু ভারতের কথা ধরলেও দেখা যায়, ভারতের সমস্ত প্রদেশের মেয়েরাই বাংলার মেয়েদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। একে বাঙ্গালী জাতিটাই পরাধীনতা-প্রিয়, তাতে আবার মেয়েমানুষ! পরাধীনতার এত চাপে মানুষ কি আর মানুষ থাকে?

আমাদের বাঙ্গালী গৃহস্থের বাড়ীর বৈঠকখানাটি মেয়েদের আড্ডা থেকে যথাসম্ভব দূরে তৈরী করা হয়; ফলে বাইরের যে পাঁচরকম আলোচনার ভিতর দিয়ে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধিতে পুষ্ট হয়, মেয়েরা সে সব থেকে একেবারে বঞ্চিত থাকেন। সেখানে অনেক আমোদ-প্রমোদ, সঙ্গীতাদিও হয়ে থাকে, মেয়েদের এমনই ভাগ্য যে তার একটুও ভোগ করবার তাঁদের অধিকার নেই। কেন, বৈঠকখানাটি এমন জায়গায় কি হতে পারে না, যাতে মেয়েরা অন্দরমহলে থেকেও সেখানকার আলোচনাদি একটু ভোগ করতে পারেন?

আমাদের ঘরের ঝি-বৌদের আমরা এমনই লজ্জাশীলা হতে শিক্ষা দিয়েছি যে, পুরুষ লোক বাড়ীতে না থাকলে যদি আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু বান্ধব বাড়ীতে উপস্থিত হন তবে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে, বা বসবার জন্য একটু আসন দিতেও আমাদের ঝি-বৌরা কুণ্ঠিতা হন। অনেক স্থলে অতিথির অন্ন-পরিবেশন পুরুষদের করতে দেখা যায়, স্ত্রীলোকদের তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অন্ন-পরিবেশন করতে দিতেও আমরা সম্মানের লাঘব মনে বোধ করি। এই রকম লজ্জা বা সম্মানের মূল্য কি?

আহার সম্বন্ধীয় রীতি পদ্ধতির ভিতর মেয়েদের উপর অনেক অবিচার করা হয়। পুরুষদের আহার সম্পন্ন করিয়ে অনেক বিলম্বে মেয়েদের আহার করতে হয়। এ প্রথাটা পুরুষদের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক হলেও মেয়েদের পক্ষে যে কত অনিষ্টকারক হয়, সেটা বোধহয় আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালীর চিন্তা করবার সুযোগ হয় নি। রন্ধন করবামাত্রে ভোজন করলে খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা যতটা উপকার পাওয়া যায়, বিলম্বে ঠাণ্ডা করে ভোজন করলে আর সে গুণ থাকে না। পরম পরম খেলেই খাদ্যের সম্যক ফল হয়। কিন্তু মেয়েদের ভাগ্যে তা কখনই ঘটে না। আচ্ছা, মেয়েদের আর পুরুষদের খাওয়া একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে হতে পারবে না কেন? সকলের আহার একই সময়ে হলে কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়, সময়ও অনেক বেঁচে যায়।

বিদেশে পথ চলতে মেয়েদের দুর্দ্দশার সীমা নেই। রেল-ষ্টীমারে মেয়েদের জন্য স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। ষ্টীমারে মেয়েদের বন্দোবস্ত অতি মন্দ—কখনও বা পুরুষের ঘেঁষাঘেঁষির মধ্যে, কখনও বা সঙ্কীর্ণ আবদ্ধ স্থানে তাঁদের অতি কষ্টে সময় কাটাতে হয়। কলকাতার ট্রাম গাড়ীতে মেয়েদের জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নেই। মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে ট্রামগাড়ীর সম্মুখের কয়েকখানি বেঞ্চ মেয়েদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঐ সব স্থান খালি থাকলেও পুরুষদের বসবার অধিকার নেই। বাংলায় এত বড় কলকাতা সহরে, যেখানে দৈনিক লক্ষাধিক লোকের গতিবিধি সেখানেও মেয়েদের জন্য ট্রামে কোন পৃথক আসন নেই! মেয়েদের এইসব অসুবিধার জন্য রেল, ষ্টীমার, ট্রাম কোম্পানীরা যতটুকু দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী কি বাংলার শিক্ষিত পুরুষগণ নহেন?

নারীর উপর সামাজিক নির্য্যাতন কি পরিমাণে দোরাত্ম করছে তা বলে শেষ করা যায় না। তারই ফলে বাংলার ঘরে এত শিশুমৃত্যু, তারই ফলে বাঙ্গালী এমন ক্ষয়োন্মুখ জাতি। ঘরে বাইরে বাংলার নারীর উপর আজ যে পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে, তাও নারীদের প্রতি আমাদের তাচ্ছিল্যের ফল। বাঙ্গালী আমরা যদি জগতে বেঁচে থাকতে চাই—যদি অনাচার-অত্যাচার হতে বাংলাকে মুক্ত করতে আমাদের ইচ্ছা থাকে তবে সর্ব্বাগ্রে নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করতে যত্নবান হতে হবে!

নানা কথা

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল ১৯২৬ :—

১ম বিভাগ ৪৭৫৬, ২য় বিভাগ ৩৭৫১, ৩য় বিভাগ ৭৩১, এক বিষয়ে পাশ ৫৯, মোট—১৩১৭ জন। ইহার মধ্যে মহিলা প্রথম বিভাগে ৮৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৩ জন, এবং তৃতীয় বিভাগে ৭ জন। মহিলাদের ফল অতি সন্তোষজনক।

মহিলাদের উচ্চশিক্ষার প্রসার :—

চট্টগ্রাম কলেজে মহিলা ছাত্রদিগকে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদের জন্য একটি বিশ্রামকক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাংলার সর্ব্বত্রই মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, এ অবস্থায় সমস্ত কলেজগুলিতেই যদি মেয়েদের প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয় তবে বাংলার বহু পল্লী পরিবারেই মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

মহিলা শিল্প ভবন :—

মেয়েদের শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা নারীশিক্ষা-সমিতিকে বার্ষিক ৫২৪০৲ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন পূর্ব্বক ঐ অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—লেডি বসু, (আচার্য্য জগদীশ বসুর সহধর্ম্মিণী), মিসেস্ লীলা রায়, মিস্ জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, প্রফেসর চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মিঃ অক্ষয়কুমার মৈত্রী, মিঃ যতীন্দ্রনাথ সেন, মিঃ কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক। বাঙ্গলার অসহায় নারীদিগকে, বিশেষতঃ বিধবা নারীদিগকে আমরা উক্ত মহিলা শিল্প ভবনের বিশেষ বিবরণ জানিতে অনুরোধ করি। ঠিকানা—সেক্রেটারী, নারীশিক্ষা সমিতি,১০১,আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

দার্জ্জিলিং মহারাণী বালিকা বিদ্যালয় :—

দার্জ্জিলিং মহারাণী উচ্চইংরাজী বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহ ও বোর্ডিংএর উন্নতিকল্পে সরকার ৫০,০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে আরও ২৫০০০৲ টাকা সংগ্রহ করার আবশ্যক হওয়ায়, স্থানীয় লোকদের নিকট অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ একটি নাটক অভিনয় করতঃ উহার টিকিট বিক্রয় করিয়া দর্শকগণের নিকট হইতে দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া পুরস্কার তহবিলে জমা দিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের এইরূপ সৎসাহস এবং কর্ম্মকুশলতা বাংলার নারীকুলের একটি চমৎকার আদর্শ দেখাইয়াছে।

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয় :—

এই বিদ্যালয়টির নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার ও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে কলিকাতার দক্ষিণস্থ বেহালা বাসস্থ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সেখানে ১০০ শত ছাত্র ছাত্রীর বাস ও শিক্ষার স্থান করা হইয়াছে। লেখা পড়া, শিল্প কার্য্য ও গীত বাদ্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী আছে, আরও ৫০ জন (৩০টী বালক ও ২০টী বালিকা) এখনি গ্রহণ করা যাইতে পারে। অভিভাবকদিগের ক্ষমতানুযায়ী বেতন ধার্য্য হয় এবং দরিদ্র ও উপযুক্ত ছাত্র ছাত্রীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত আছেন। অভিজ্ঞান শিক্ষক মূল বিদ্যালয় আবাসে থাকেন। বালিকারা শিক্ষয়িত্রীদের তত্ত্বাবধানে থাকে। তাহাদের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কয়েকটি ব্রিষ্ট বোর্ডের মূর্ত্তি খোদিত আছে। আশা করি, যাঁহাদের অন্ধ পুত্র বা কন্যা আছে তাঁহারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া জীবনে সুখী করিতে তৎপর হইবেন। আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত লালবিহারী শাহ মহাশয় অন্ধদিগের শিক্ষার্থে উক্ত বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। প্রিন্সিপাল, কলিকাতা অন্ধবিদ্যালয়, বেহালা, দক্ষিণ কলিকাতা—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিশেষ জানিতে পারা যায়।

ইডেন হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগ :—

মেডিক্যাল কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহার জারী করিয়াছেন,—জনসাধারণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট, কলিকাতা ইডেন হস্পিটালের সহিত একটি প্রসূতি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত চৌহদ্দির মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহের গর্ভবতী এবং প্রসূতিদিগের চিকিৎসা করা হইবে :—উত্তরে—বেহালাবাজার ষ্ট্রীট, দক্ষিণে বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, পূর্ব্বে আপার এবং লোয়ার সারকুলার রোড, পশ্চিমে আপার এবং লোয়ার চিৎপুর রোড ও বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। গর্ভাবস্থার সপ্তম মাস হইতে চিকিৎসা আরম্ভ করা হইবে। এ সময় রোগিনীদিগকে ইডেন হস্পিটালের চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে একখানি করিয়া মুদ্রিত কার্ড প্রদান করা হইবে। রোগিনীগণ প্রসব বেদনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ কার্ডে মুদ্রিত উপদেশাবলী অনুসারে কার্য্য করিবেন। প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে ইডেন হস্পিটাল সংলগ্ন প্রসূতি বিভাগের হাউস সার্জ্জেনের নিকট এই কার্ড প্রেরণ করিতে হইবে। অতঃপর যাহাতে রোগিনীর নিজ বাড়ীতে যাইয়া চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,—মেডিক্যাল কলেজ হস্পিটাল, কলিকাতা

ঢাকার বেগমের হিন্দু সহানুভূতি :—

ঢাকা অনাথ আশ্রমের একটী হিন্দু বালিকার বিবাহের সাহায্যার্থে কমিটী ঢাকার ধনীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ৮।৯টী মেয়ের বিবাহ জন্য টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। কিন্তু এবার তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন না। বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত কমিটী স্বীকার করিতেছেন যে, স্বর্গীয় নবাব সার আসানুল্লার পত্নী শ্রীযুক্তা খোবাইদা বেগম নিজেই ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বাংলার হিন্দু মুসলমানে এত বিরোধ সত্ত্বেও বেগমসাহেবার হিন্দু বালিকার প্রতি এই সহানুভূতি বহুদের পরিচায়ক।

নারীর গবেষণা :—

মিস্ গারোড নাম্নী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী একটি মানুষের খুলির হাড় পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, উহা বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বকার মানুষের। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবের পরিচায়ক। সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত বিশিষ্টমুখী কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য আমরা বঙ্গের শিক্ষিতা মহিলাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

বিলাসিতায় পাপ :—

ইন্দোর রাজ্যে মহারাজার চিত্তবিনোদনার্থে প্রতিবৎসর ২২ হাজার টাকা ব্যয়ে বর্ষাকীয় বল রাখা হইত। সম্প্রতি এই পাপ পোষণের ব্যয় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায়, সহরের ধনীসন্তানদের মধ্যে যে দু-একটি উল্লুখল প্রকৃতির লোক দেখা যায় তাঁহারা এই দৃষ্টান্তে একটু সংযত হইবেন।

বায়স্কোপের চিত্র নির্ব্বাচন :—

জনৈক পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সম্প্রতি বর্ত্তমানের প্রচলিত বায়স্কোপের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সমাজের বালকবালিকা, যুবকযুবতীগণকে দুর্নীতির পাপ হইতে রক্ষা করিতে হইলে বায়স্কোপের সিনেমার সংশোধন করা আবশ্যক। বায়স্কোপের চিত্র নির্ব্বাচনের জন্য এরূপ একটি কমিটি হওয়া দরকার, যাঁহারা সমাজের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল চিত্র মনোনীত করিবেন।" কিন্তু তাহাতে এই সকল দিকে লক্ষ্য রাখিবার লোক কই? যাহা হউক, বিলাতীয় বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিবার জন্য আমরা বিশেষ অভিমত সম্মানীত করিয়া লইতে গৃহের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করি।

বালিকার কৃতিত্ব :—

উপযুক্ত শিক্ষা ও সম্যক্ সুযোগ পাইলে নারী যে অনেক বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারে তাহার পরিচয় পাশ্চাত্য দেশের বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি ইংরাজ বালিকা সম্প্রতি যে ব্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। ইউরোপীয় বিভাগে সহরে মোটর-কার দ্রুত চালনার সম্প্রতি এক প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বিখ্যাত মটর-কার-চালকরা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। মেয়র সাহেবের এতকাল উৎসবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন বরাবর করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় এবার তাঁহার এক নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছিলেন একটি ইংরাজ বালিকা, নাম কুমারী জয়সেট কয়ডারি, বয়স ২৩ বৎসর। ৩০ জন বাছাই করা ড্রাইভার ১৫,৬০০ মাইল পথ পড়ে ঘণ্টায় ৬০ মাইল হিসাবে গাড়ী চালাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যে এই বালিকাটির গাড়ীর গতি ইহার অধিক ছিল,ইনি সকলকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পাইয়াছেন।

মুচী বিদ্যালয় :—

ঢাকা সহরে চৌধুরী বাজারে প্রায় ১২৫ ঘর মুচীর বাস। তাহাদের অবস্থা অতি দুর্দ্দশাপন্ন এবং স্ত্রীপুরুষ সকলেই প্রায় নিরক্ষর। কয়েক বৎসর হইল স্থানীয় ক্রিশ্চান আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত মুচীদের মধ্যে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩০, এবং উত্তরোত্তর উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সকলের দৃষ্টি এই বিদ্যালয়, বিশেষতঃ অনুন্নত বিদ্যালয়ের মধ্যে।

বাল্যবিবাহ :—

কোলাপুর রাজ্যে বাল্যবিবাহ রহিত করিবার বলিয়া মহারাজ রাজ সরকার কর্ত্তৃক এক ঘোষণাপত্র প্রচার করা হইয়াছে। আমাদের বাংলায় যে বার তের বৎসরের বালিকা সন্তানের মা হইয়া নিজের এবং সন্তানের স্বাস্থ্য নাশ করিয়া আজীবনের জন্য সংসারটিকে তিক্ত করিয়া তুলেন—এইরূপ অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কোন্ ঘোষণাকারীর প্রতিক্ষা করিব?

ঠাণ্ডা দুধের অপকারিতা :—

বীজাণু ও জীবাণুবিদ পণ্ডিতেরা সকলেই এক বাক্যে বলেন, কখনই ঠাণ্ডা দুধ পান করিবে না এবং শিশুদিগকে পান করিতে দিবে না। কি বায়ুমণ্ডলে কাঁকে কাঁকে নানা জাতীয় ব্যাধির বীজাণু ও জীবাণু অদৃশ্য ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ঠাণ্ডা দুধ তাহাদের অতি প্রিয় বাসস্থান, তাহারা কাঁকে কাঁকে দুধের উপরে আসিয়া আশ্রয় লয়, এবং দুধ বিষাক্ত করিয়া ফেলে। এই দুধ পানে নানাবিধ ব্যাধির বীজ দেহ মধ্যে প্রবেশ করে ও দুগ্ধপায়ীকে পীড়াক্রান্ত করে এবং তাহাকে মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়। এ কথা আমাদের দেশের সকলেই জানেন, ইহা অতি পুরাতন কথা; কিন্তু জানিয়াও অলসতার বশবর্ত্তী হইয়া দেরেরা অনেক সময়

বিশুদ্ধিকে এই দুধ পান করিতে দেন। তাহার ফলে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি বিশিষ্টদের দেহে প্রবেশ করে এবং তাহারা অকালে জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। টাকা দুধের জন্য অতি প্রত্যুষে গৃহস্থ বিধবা নীল মিশ্রিত করিয়াছে। যদি দুধ উত্তম করিবার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহা বিষবৎ দূরে নিক্ষেপ করা উচিত। সর্ব্বত্র মনে রাখিতে হইবে যে টাকা দুধ পান করা অপেক্ষা দুগ্ধপোষ্যাভাব-জনিত রোগ সহ্য করা সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয়। আশা করি সন্তানের জননীগণ এ বিষয়টি মনে রাখিবেন।

পরলোকে চিত্তরঞ্জন :—

পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন ১১ই আষাঢ় শনিবার রাত্রি ১২টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শোক শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী এখনো সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তাহার আবার এই একমাত্র পুত্র চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু। বিধাতার বিধানের মহত্তোদ্ঘাটন কে করিবে? চিত্তরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর এই অকাল বৈধব্যের জন্য গভীর করিয়া আমরা শোক বেদনা সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমরা এইরূপ বিষয়কে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানিনা, তবে এইটুকু বলিতে পারি বৈধব্যেরও একটা মূল্য আছে। দেশসন্তানদলের মাতৃত্বের দাবী করিতে বিধবার যে অধিকার আছে তাহা সীমন্তিনীর পক্ষে দুর্লভ।

স্বামীর অত্যাচার :—

গত ১লা জৈষ্ঠ মাদুরপুর নিবাসী উমেশচন্দ্র বিশ্বাসীর দুশ্চরিত্রতার জন্য তাহার স্বামী স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা হওয়ায় সে স্ত্রীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করে। এই অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া ঐ দিন তাহার স্ত্রী দ্বিপ্রহরের সময় একটী ঘরের মধ্যে ঘরজা বন্ধ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র কেরোসিনে সিক্ত করিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। ঐ সময় তার দেবর গ্রামের কয়েকটী লোক ঐ বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আগুনের শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর যাইয়া ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, প্রায় শেষ। ইতিমধ্যে পরলোকের নিকট নালিশ নির্য্যাতিতা বালা তাহার স্বামীর অমানুষিক ভয়াবহ অত্যাচার-কাহিনী সমূহ বিবৃত করিয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চিরশান্তি গ্রহণ করিয়াছেন।

নারী-নির্য্যাতন :—

কলিকাতায় হিন্দুমুসলমান-দাঙ্গার পর হইতে মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু নারীর নির্য্যাতন অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, বহুস্থান হইতে আমাদের নিকট ভীষণ আতঙ্কের সংবাদ আসিতেছে। সংবাদপত্রাদির ভিতর দিয়াও আমরা বহু নারী নির্য্যাতনের সংবাদ পাইতেছি। সম্প্রতি খুলনা ও পাবনার অনেক স্থান হইতে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান কর্ত্তৃক নারী নির্য্যাতনের বেদনাদায়ক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সমস্ত বাঙ্গালার হিন্দুগণ বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। গুণ্ডাদের কবলের জন্য যে সমস্ত ঊষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে তাহার কিছুই কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা যাইতেছে না। আমরাও মাতৃ-মন্দিরের ভিতর দিয়া দেশের নৈতিক বল বৃদ্ধি করণ চেষ্টা প্রভৃতির পরামর্শ ইতিপূর্ব্ব হইতেই দিয়া আসিতেছি। কিন্তু বলাবাহুল্য, ইহাও কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। ভগবান জানেন ইহার বিধান কি! হিন্দুমণী, তোমরা পবিত্রা ও জগন্মাতার দেশের মেয়ে, তোমরা কি জাননা অত্যাচারীর হাতে পড়িবার সময় কেমন করিয়া ঐসব সতীরা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন? তাঁহারা ত সতীই দেখাইয়া গিয়াছেন সতীর উপর অত্যাচার করিতে জগতে কাহারও সাধ্য নাই। পিশাচের হাতে সতীত্ব হারের পরিবর্ত্তে তোমরা কি মরিতেও জাননা? পাশুটীয় অত্যাচারে, নরকের অত্যাচারে বুঝি স্বামীর অত্যাচারে তোমরা ত কত জনে আত্মহত্যা করিয়া হিন্দু সমাজকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তুলিয়াছ; পাশব সতীত্বনাশকারীদের অত্যাচার কি তাহা অপেক্ষা শত সহস্র গুণ ভীষণ অহে?

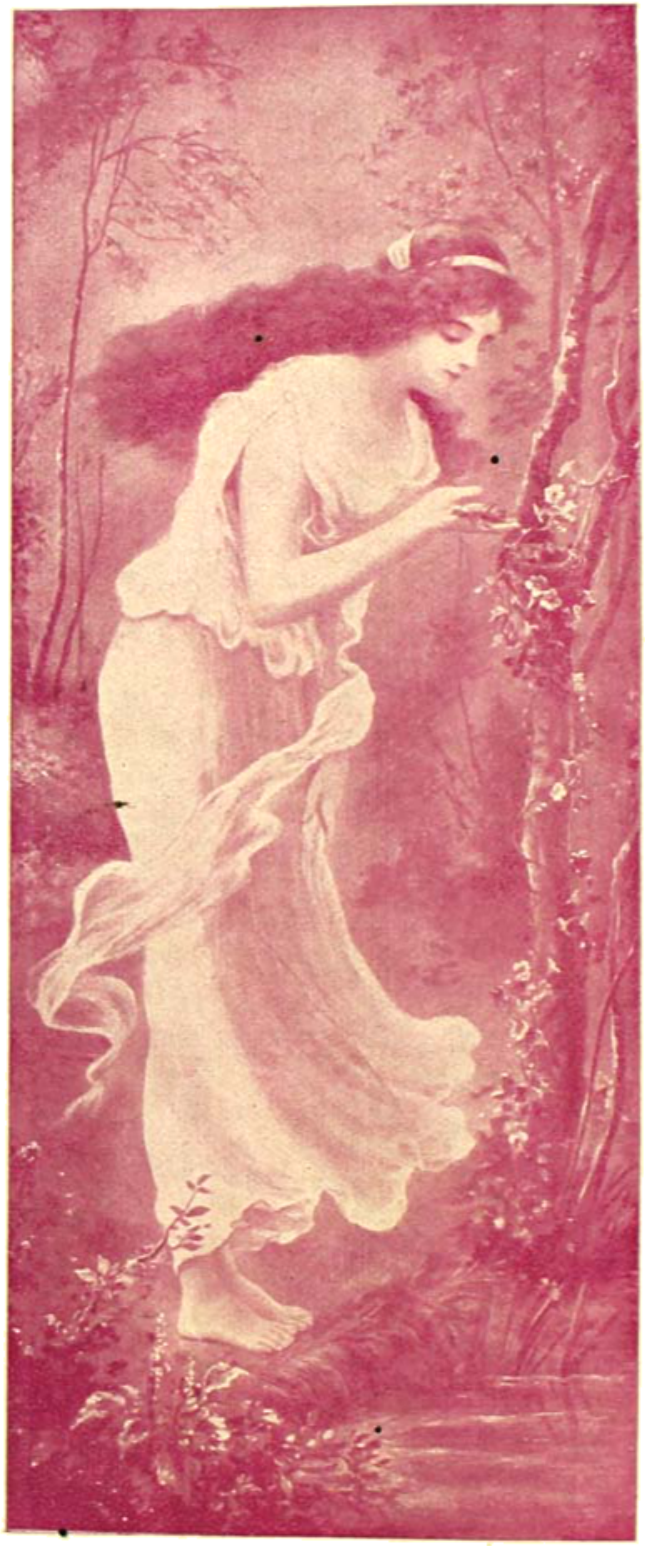

দয়া।

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৪র্থ বর্ষ | ভাদ্র—১৩৩৩ | ৫ম সংখ্যা

শ্রাবণ-শেষে

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

শ্রাবণ-শেষের আজি বরষায়,
জীবনের মোর সব সুখ দুখ
লঘু হয়ে ভেসে যায়,
অমল কোমল মেঘের মতন
অবাধ গগন গায়।
ব্যথা যদি জাগে, নাহি মানে বাধা ;
ফোটা কত জল ঝরে পড়ে যায়,
আপন অবুঝ টানে,
শিশিরের মত নীরব ধারায়,
ব্যথিত ধরার পানে।
চকিত-চপলা, ত্বরিত চাহনি
হানে যদি অকারণে,
দুরু দুরু বুকে জেগে ওঠে সুখ
অধির হরষ সনে,
সহসা আসিয়া সহসা হাসিয়া
লুকায় গগন কোণে।

ছায়া ভেসে আসে সুনীল আকাশে,
রহে সে নিমেষ কাল,
ঢাকা পড়েনাক রবির কিরণ
উদার গগন ভাল,
আকুল উধাও উতলা সমীরে,
কেঁপে শুধু ওঠে বন,
ভাঙে না ছেঁড়ে না তরুলতা তৃণ
রহে না অনেক খ'ণ।
সহসা আসিয়া চলে সে ভাসিয়া
কোথা আপনার মনে,
তটিনী উরসে উলসি লহরী,
মিশায় সাগর সনে।
শ্রাবণ-শেষের ঘন-বরষায়,
জীবনের মোর সব সুখ দুখ
লঘু হয়ে ভেসে যায়।

নারীর অধিকার

শ্রী তমোনাশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এম-এ।

এদেশে নারীজাতির অধিকার লইয়া আজকাল অনেক কথা শুনা যাইতেছে। কেহ বা স্ত্রীস্বাধীনতার নামে একপ্রকার স্বেচ্ছাচারিতার পথ মুক্ত করিতে চাহিতেছেন —কেহ বা স্ত্রীকে অসূর্য্যম্পশ্যা অবস্থায় ঘরের কোনে রাখিবার মত প্রচার করিতেছেন। উভয় দলেই স্ত্রীপুরুষ উভয়ই আছেন। উভয় দলই স্ব স্ব মত প্রবর্ত্তনের ইচ্ছায় হয় শাস্ত্রীয় যুক্তি নয়তো পাশ্চাত্য উদাহরণের আশ্রয় লইতেছেন। কথাটা যখন উঠিয়াছে তখন নীরবে তৃতীয়পক্ষ সাজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া বরং সমস্যার সমাধানের জন্য যথোচিত শক্তি নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। অবশ্য এই শক্তি সত্য নির্দ্ধারণের দিকেই আরোপ করা উচিত হইবে, নতুবা কতকগুলি সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য ইহা শুধু বৃথা বাগাড়ম্বর ও মিথ্যা যুক্তিজালের সৃষ্টি করিবে মাত্র।

এখন দেখিতে হইবে কথাটা উঠিয়াছে কেন? আমরা বিষয়টীকে শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় কোন ভাবেই আপাততঃ দেখিব না। দেখিব শুধু মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের দিক হইতে, দেখিব শুধু দেশকাল পাত্রভেদে—অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সমাজে বিপ্লবের হেতু না হইয়া — ইহা কি ভাবে মঙ্গলের সৃষ্টি করে—সেই দিক হইতে। যদি এইভাবে না দেখি তবে শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় কোন যুক্তিই সমস্যা সমাধান করা দূরে থাকুক বরং ঘোর অনিষ্টের হেতু হইবে।

সমাজ পরিবর্ত্তনশীল। আগে যাহা সমাজে চলিত এখন তাহার সবটাই সমাজে চলিবে না। এখন যাহা সমাজে চলে তাহার সবটাও হয়তো ভবিষ্যতে চলিবে না। এইতো জগতের নিয়ম। সমাজ অনেকটা ব্যক্তির সহিত তুলনীয়। আমরা কাল যাহা ছিলাম আজ ঠিক তাহা নাই, আবার আজ যাহা আছি ভবিষ্যতেও ঠিক তাহা থাকিব না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত সৃষ্টিস্থিতি লয় হইতেছে। এই ভাঙ্গা গড়াতেই জগত চলিতেছে। যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রমের প্রয়াসী হই তবে বুঝিব আমরা স্রোতধারাকে পুনরায় গোমুখীর দিকে ফিরাইতে বৃথা প্রয়াস পাইতেছি।

কেহ কেহ ভাবিতে পারেন পরিবর্ত্তন যখন হইবেই তখন যত শীঘ্র সেই দিকে ধাবিত হওয়া যায় ততই ভাল। আবার ভিন্ন মতও আছে। এইরূপ রক্ষণশীল আর উদার-নৈতিক দল চিরকাল সব সমাজে সব সময়ে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—সবক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব করিয়া আসিতেছেন। তবে বিস্ময়ের বিষয় এই যে কাহারও কথা সবখানি টিকে নাই। যেমন বন্যা পঙ্কিল ডোবা সমূহ বুকিগত করিয়া দেশের উপকার করে, পুনরায় উহাই আবার ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা দেখাইয়া মহা অপকারও করিয়া থাকে।

কেহ বলিবেন জগত উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, কেহ তাহার বিপরীত উক্তি করিবেন। জগতের সব অংশের অবস্থা সব সময়ে যে একরূপ হইতেছে না একথা নিশ্চয়ই ঠিক। পরিবর্ত্তন উন্নতির নামান্তর কিনা তাহাও বিবেচ্য, আবার প্রাচীন রীতির প্রতি অন্ধভক্তিও উন্নতির কতদূর সহায় তাহাও দেখিতে হইবে।

বর্ত্তমানে সবদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। ইহার অর্থ কি? বিজিত জাতিসমূহ মাথা তুলিতে চাহিতেছে, মুসলমানগণ স্বীয় সমাজ একতা-বদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, (Pan-Islamic move-ment) জগতের শক্তিমান জাতিসমূহ (Powers) সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তারে উপযোগী হইয়াছেন, পাশ্চাত্য মহাদেশে মজুরগণ মাথা তুলিয়াছে, দেশে দেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে—এমতাবস্থায় নারীজাতিই বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন কেন? তাঁহাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে —তাঁহারাও নারীজাতি এবং পুরুষজাতির পরস্পরের অধিকার সম্বন্ধে একটা বোঝা পড়া করিতে চাহিতেছেন। জগতের অপরাপর অংশে যেমন আন্দোলন হইতেছে

এদেশেও তেমন তাহার ঢেউ অল্প বিস্তর আসিয়া লাগিতেছে। ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে উল্লিখিত আন্দোলন সমূহ যেন পরস্পর জড়িতভাবে রহিয়াছে, কেননা ভেদগুলি খুব সুস্পষ্ট নহে। এই সব আন্দোলনের ভিতর একটি বিরাট বিষয় আছে বলিয়া বোধ হয় যাহা তথাকথিত বিভিন্ন আন্দোলনের মূল। ইহা মানবের স্বাভাবিক অধিকার লাভের প্রচেষ্টা,—সে ব্যক্তিত্ব হিসাবেই হউক আর সঙ্ঘ হিসাবেই হউক। এই কারণে নারীজাতির স্বাভাবিক অধিকার পাইবার যে আকাঙ্খা ও তজ্জনিত যে চাঞ্চল্য ইহা আমরা কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

বর্ত্তমান যুগের এক বিশেষ লক্ষণ—কেহই নিজ নিজ অধিকার ছাড়িতে কিছুতেই রাজী নহে। সকলেই স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত—সে ব্যষ্টি হিসাবেই হউক আর সমষ্টি হিসাবেই হউক। এই লক্ষণ ভাল নয় বলিলে চলিবে কি? বিধিদত্ত অধিকার সকলেই ভোগ করিবে না কেন? তবে এই পর্য্যন্ত করিবে যেন তাহাতে অপরের কোনরূপ অসুবিধা না হয়। এখন অধিকার (Rights) ও কর্ত্তব্যের (Duties) যুগ। পুরুষ ও নারী—উভয় সম্বন্ধেই ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। গায়ের জোরে এই অধিকার লাভের ইচ্ছাকে দমন করা যায় না। প্রাচীন স্বেচ্ছাচারিতার যুগ আর নাই, এখন সমঝোতা মানিতে হইবে। এমতাবস্থায় পুরুষগণ শাস্ত্রীয় যুক্তি, সামাজিক অধিকার, শারীরিক বল, দেশাচার ও রাজবিধি দ্বারা শত কঠিন নিগড়ে নারীজাতিকে বদ্ধ করিলেও প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি বাইরণ বর্ণিত চিলন কারাগারস্থ বন্দীর ন্যায় নারীর মনকে ও ভগবদ্দত্ত অধিকার লাভের স্বাভাবিক আকাঙ্খাকে কিছুতেই নষ্ট করিতে পারিবেন না। সত্য বটে সুদীর্ঘকাল যাবৎ পুরুষের অধীনতায় নারীর স্বাতন্ত্র্য লাভের আকাঙ্খা হয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে নয় কমিয়া গিয়াছে, তবুও যদি আবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে তবে পুনরায় 'শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে'। যাহা প্রকৃতির অনুকূল তাহা মানিয়া চলিলেই হিতকারি হইয়া থাকে, তাহার বিরুদ্ধে গেলে মহাকালের ত্রিশূল মানব সমাজের খেলাঘরকে তাদের ঘরের ন্যায় নষ্ট করিয়া দিবে, ইহা নিশ্চিত কথা। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

সত্য বটে পাখীকে খাঁচা হইতে মুক্ত করিলে প্রথমে তাহার উড়িতে কষ্ট বোধ হয়, সত্য বটে মুক্তির পথায় যথেচ্ছাচারিতা মুক্তির নির্ম্মলতাকে কতকাংশে নষ্ট করিয়া দেয় তথাপি বলিব ইহা স্বল্পকাল স্থায়ী, সুতরাং বর্জ্জনীয়। নূতন প্রচেষ্টা সবস্থানেই বিকৃত হইয়া পড়ে। তবে তাহা ক্ষণিক। ইহার হেতুও আছে। বৈজ্ঞানিকের যুক্তিতে বলিতে গেলে একটি বল যে জোরে একটি প্রাচীরে আঘাত করিবে, উহা ফিরিয়া আসিবেও তত জোরে। এইতো প্রকৃতির নিয়ম। পুরুষ যদি নারীর উপর কোন অত্যাচার করিয়া থাকেন তবে তৎপরিমানে অপরপক্ষ হইতেও তাহার শোধ যাইবে। নারী অধিকার লাভে ব্যগ্র হইয়াছেন মানে পুরুষ এই ব্যগ্রতার হেতুস্বরূপ হইয়াছেন। রাজশক্তির যে অত্যাচারের ফলে ফরাসীবিপ্লব হইল তাহার ফলভোগ ফরাসী রাজশক্তিকে করিতে হইল। বোধ হয় এই নীতি জগতের সার নীতি।

এখন দেখিতে হইবে বর্ত্তমানে নারী পুরুষের কাছে কি চাহিতেছেন, তাহা দেশকাল পাত্রোপযোগী হইতেছে কিনা। যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে তাহা টিকিবে না। কতখানি অধিকার নারী এখন পাইবেন তাহা পুরুষ ও নারী উভয়ে মিলিয়া মীমাংসা করিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন। নারীর ন্যায্য অধিকার, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, পুরুষকে দিতেই হইবে, নতুবা সমাজ ধ্বংস হইবে। অধিকার না দিলেই সমাজ ধ্বংস হইবে—অধিকার দিলে নহে।

বর্ত্তমানে সমাজের গোঁড়া সম্প্রদায়ের ধারণা নারীর এখনকার অবস্থা ব্রহ্মার সৃষ্টি হইতে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ তাহাই কি? এ বিষয়ে ইতিহাস কি সাক্ষ্যদান করে? ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে নারীকে সামান্য লেখাপড়া শিখাইলেও যে সমাজ উচ্ছন্ন যাইবার ভয়, সেই সমাজে নারীগণ এককালে বেদমন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। অথচ পরবর্ত্তী যুগে ইহারা সে অধিকার হইতে এমন বঞ্চিতা হইয়াছেন যে, স্ত্রী এবং শূদ্র সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে এক পর্য্যায়ভুক্ত—তা তিনি ব্রাহ্মণ কন্যাই

হউন আর ব্রাহ্মণেতরের কন্যাই হউন। এই বাঙ্গলাতে এমন এক যুগ ছিল যখন ডোমপত্নী লক্ষ্মী দৈহিক বলে ও যুদ্ধবিদ্যায় পুরুষগণকে লজ্জা দিয়াছিলেন, রাজকন্যা কলিঙ্গা, বল্লিকা প্রভৃতি কত রাজপুত্রকে রণক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া পুরুষদিগের বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সব কাহিনী প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ ও উপকথার অন্তর্ভুক্ত হইলেও বিষয় গুলি যে বাঙ্গালীর কোন বিস্মৃত যুগের ঘরের কথাই ব্যক্ত করিতেছে তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। নিতান্ত অহিন্দু ও হাড়ি ডোম প্রভৃতি নীচ জাতির গৌরবকথাপূর্ণ কাব্যকথা লিখিয়া বহু চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধী-ধারী খাঁটি কুলীন সন্তানগণ কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা সন্দেহ নাই। ধর্ম্মমঙ্গল নামে প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগুলি ইহার প্রমাণ। বিদ্যাসুন্দরের গল্পের বিদ্যার ন্যায় বহু বিদ্যার উচ্চশিক্ষার পরিচয় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আছে। ইহা ছাড়া চিত্রবিদ্যা, সূচিকার্য্য, আলিপনা, নৃত্যগীত, রন্ধন প্রভৃতিতে সেকালের বঙ্গনারী যে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ইহার প্রমাণ দিবে। এখন এসব কথা স্বপ্নবৎ বোধ হইতে পারে। যাহা হউক এখন আগেকার দিনের মত নারীকে হাতি ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিতে দেওয়া সঙ্গত হইবে কি ঘরের কোণে শুধু রন্ধন ও গৃহস্থালীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখা সমীচীন হইবে তাহা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। প্রাচীন ময়মনসিংহ গীতিকায় আমরা সমাজের যে ছবি পাইতেছি তাহাতেও অনেকে চমকাইয়া উঠিবেন। এক সময়ে সমাজের বয়স্থ ছেলে মেয়ে যেরূপ অবাধ প্রেমের পরিচয় দিয়া পরে বিবাহ বদ্ধ হইত তাহা এখনকার সমাজের রক্ষণশীল দলের ভীতি উৎপাদন করিবে নিশ্চয়। অপরদিকে প্রাচীন মতে কৌলিন্য প্রথা, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ (এবং আধুনিক বরপণ) প্রভৃতি প্রথাগুলি কেমন? সতীদাহে কতটী বিধবা স্বেচ্ছায় আর কতটী বিধবা অনিচ্ছায় সহমরণে গিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? যাহা হউক সেকালে মন্দ যাহা কিছু থাকুক না কেন, প্রাচীন আদর্শে গঠিত হিন্দু পরিবারে অন্নপূর্ণা ও লক্ষ্মীর জীবন্ত প্রতিমাস্বরূপ বধূর ত্যাগের ভাব যে একালের পক্ষে কত উচ্চ আদর্শ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শেষকথা আমরা এই বলিতে চাই, নারীকে তাঁহার ন্যায্য অধিকার পুরুষকে রীতিমত বুঝাইয়া দিতেই হইবে, তবে তাহার পরিমাণ কি তাহা সদ্‌বুদ্ধি ও আন্তরিক সহানুভূতি দ্বারা উভয়ের মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে।

বাদল-সন্ধ্যায়

শ্রীমতী ভক্তিসুধা হার।

আজি বরষা-ক্লান্ত সন্ধ্যা-আঁধারে বিরহ পরাণে না সহে
অন্তর মাঝে ক্ষুব্ধ বেদনা,
করিয়া রেখেছে মুগ্ধ চেতনা
বাদলের হাওয়া কাঁদায় তাহারে কোথা প্রাণপ্রিয়, এসহে।

আজি এ আকুল, পাগল বাদরে কেন প্রাণবঁধু, ঘুরে গো,
এ যে প্রিয়, শুধু মিলনেরি ধন
বিরহ বেদনা কেন অকারণ,
আবরিতে হৃদি আমারি আঁচলে এলো এ গোপন পুরে গো!

বাহিরের কাজে আজিকে ভুলিলো আসিছে মিলন-যামিনী,
শুধু আজ তুমি মুগ্ধ-সোহাগে
মোর পাশে বসি' ভরা অনুরাগে
বীণাখানি ল'য়ে গভীরে তুলিয়ো মেঘ-মল্লার রাগিণী।

এযে মধুময় মিলনেরি বেলা শোন, দেয়া ডাকে গগনে,
শূন্য এ হৃদি বেদনা-ব্যাকুল,
আশা দিশাহারা করিছে আকুল,
বঁধু, তারে আজি করিবে কি হেলা, বাদল-সন্ধ্যা-লগনে?

শিশুশিক্ষার ক-খ-গ

ডাঃ শ্রী নৃপেন্দ্রকুমার বসু, এম্-আর-এ-এস্, এম্-বি।

কখনো মনে চিন্তা কোরো না যে, শিশুরা তোমাদের (পিতা-মাতার) সাহায্য ব্যতিরেকেই আপনা আপনি গড়ে' ও বেড়ে উঠ্‌বে, বিপথে যাবে না, আদর্শ সন্তান হবে। মনীষীরা বলেছেন—একটি শিক্ষিতা মাতা শত সুশিক্ষকের সমান। শিশুকে মানুষ কর্ত্তে হোলে, আগে তোমাদের মানুষ হোতে হবে।

খোকাকে দিন-রাত বোকো না—গালাগালি কোরো না। পুনঃ পুনঃ কোনো জিনিস চিন্তা কল্লে ও বল্লে, সেটা কিছুদিন পরে কার্য্যে পরিণত হোয়ে যায়। বদ্মাইছাড়া, বেয়াড়া, হাজিল, বদমায়েস্, পাজী—এই সব সম্ভাষণ কর্ত্তে কর্ত্তে ছেলে একদিন সত্য সত্যই তা'তে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়।

গাধিলতি কোরো না—তোমাদের শিশুকে সর্ব্বদা কোনো কার্য্যে নিযুক্ত রাখতে। যতক্ষণ সে জেগে থাকবে, ততক্ষণ সে লেখাপড়ায় হোক, ছবি দেখায় হোক, খেলায় হোক, বেড়ানোয় হোক—যেন নিবিষ্ট থাকে। সাহেবেরা বলেন—অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।

ঘরের মধ্যে দিন রাত ছেলেমেয়েকে কয়েদ্ কোরে রেখো না। বিলেতের ডাক্তাররা স্থির কোরেছেন—যখন বালক-বালিকাগণ বাড়ীর বাইরে রৌদ্র ও নির্ম্মল বাতাস পায়, তখন তাদের হজম-শক্তি ঘরের ভিতরে থাকা কালিন অপেক্ষা চব্বিশ গুণ বৃদ্ধি পায়।

চোখ রাঙানি দিয়ে শিশুর চিত্ত জয় কর্ত্তে যেয়ো না। লাঠৌষধির ব্যবস্থা সুকুমার পেলব শিশুর বেলায় নয়—যদিও বা সে মূর্খ হয়। তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করবে, মিষ্ট কথায় বোঝাবে, খেলনা ছবির বই বা মিষ্টান্নের লোভ দেখিয়ে অভীষ্ট পথে চালিত করার চেষ্টা করবে; তাতে যদি ফল না হয়, তখন স্থল বিশেষে চোখ্-রাঙানি, ধম্‌কানি বা কানমলা পর্য্যন্ত উঠতে পারো। প্রতিবাসীর উপর রাগ কোরে শিশুদের পিঠে লাঠি ভেঙো না।

ছেলেকে সদাসর্ব্বদা সময়ে অসময়ে 'হবে না' 'পাবে না' 'কোরো না' ইত্যাদি 'না-না' বোলো না। শিশুর কাছে যদি কোনো প্রতিজ্ঞা কর, তা' রক্ষা কর্ত্তে কখনো পশ্চাৎপদ্ হোয়ো না। যদি তাকে চাঁদ ধোরে দেব বোলে আশা দিয়ে থাকো, তাহ'লে যে কোরে পারো দিতে হবে; নচেৎ ছেলের কাছে এমন আস্‌বানী প্রতিজ্ঞা কোরো না।

ভূত, ভূত-প্রেত, হুতুম-পেঁছা, হানুম-বুড়ো প্রভৃতির ভয় ছেলেপুলেকে কখনো দেখিও না। তাদের আত্মনির্ভরশীল, নির্ভয়, সাহসী ও সত্যবাদী হ'তে শিক্ষা দিবে। ভূতের গল্প, আষাঢ়ে রূপকথায় মনের পর্দ্দায় একটা চিরস্থায়ী আঁচড় কেটে যায়; পরবর্ত্তী জীবনে এই ভয়-ভয় ভাব আমাদের মানসিক ও দৈহিক বৃদ্ধির বিপক্ষে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

ঝগড়া কাঁটি, সাংসারিক ও সামাজিক খুঁটিনাটি আলোচনা ছেলেদের কাছে যত কম পারো করবে। নচেৎ এর পরে বুড়ো মানুষের ভিতর কাজিল কথা বলতে তারা সাহসী হোয়ে উঠে। স্বদেশের কথা, ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবন-কথা, পৌরাণিক কাহিনী গল্প কোরে শোনাবে। নিজের দেশ, নিজের দেশবাসী, নিজের সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোতে শিক্ষা দেবে।

টেনে হিঁচড়ে তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে শিশুকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না অথবা সকল শিশুকে ঠিক একভাবে পালন বা তাদের সঙ্গে একভাবে ব্যবহার কোরো না। প্রত্যেক শিশুটিরই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ভিন্ন ভিন্ন রকমের সংস্কার ও জন্মগত প্রবণতা আছে; শিক্ষার বলে তার অনেকটা পরিবর্ত্তিত হোলেও সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং তাদের ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালন কর্ত্তে হবে। নিজের আশানুযায়ী সব ছেলে কয়টিকে উকীল, ডাক্তার বা হাকিম তৈরী কর্ত্তে গেলে বিফল হোতে হবে।

ঈশ্বর দেবতাকে ছেলেবেলা থেকে ভক্তি করতে শিখিও। সাঁতারে প্রবিপাত করলে শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতি

হয়—তা নয়, অঙ্গ-সৌষ্ঠব সাধনে কিছু সহায়তা করে। প্রভাতে ও শয়নের পূর্ব্বে প্রত্যেক খোকা-খুকী যেন ভগবানের নাম-গান কর্ত্তে শিখে। ছেলেবেলা থেকে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় বিশ্বাস করতে শিখালে, পরবর্ত্তী জীবনে অনেক দুঃসাধ্য কাজ ও নিবিড় বিপদকে সম্পন্ন ও লঙ্ঘন কর্‌বার একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মে।

ভাই। মিথ্যা কথা কখনো ছেলেপুলের কাছে বোলো না। তাদের নিকট মিথ্যা কভু বল্‌বে, পরোক্ষে তাদের মিথ্যা কথা বল্‌তে শিখানো হয়। মিথ্যাকে যখন তারা মিথ্যা বলে' চিন্‌তে শিখ্‌বে, তখন তারা তোমার প্রতি হয় শ্রদ্ধা হারাবে, নতুবা সেই মিথ্যাকে সত্য বলে অপরের কাছে জাহীর্ কর্‌বার্ চেষ্টা কর্‌বে।

ভাক্ বাজিয়ে কখনো নিজের ছেলের প্রশংসা বা নিন্দা কোরো না—বিশেষ কোরে সেই ছেলের সামনে; দুই দিয়েই ছেলের মাথা খাওয়া হয়। তাকে সব সময় অবিশ্বাসের চোখে দেখো না। তাহ'লে সে তোমায় ফাঁকী দেবার চেষ্টা করবে। তোমার সন্তানকে প্রীতি ও বিশ্বাস দাও, সে তোমাকে ভক্তি ও বিশ্বাস দানে করবে।

তাস, পাশা, গোলোক ধাঁধা, লুডো, সতরঞ্চ প্রভৃতি স্থানবদ্ধ খেলায় ছেলেদের একেবারেই উৎসাহ দেবে না, দেখলে খুব ধম্‌কে দেবে। এতে তাদের ধীরে ধীরে অলস, অদৃষ্টবাদী ও অত্যধিক সুবিধালিপ্সু কোরে গড়ে' তোলে। ছেলেকে ভবিষ্যতে সিগারেট, জর্দ্দা, তামাক, মদ, ভাঙ্ থেকে নিষ্কৃত রাখতে হোলে বাপ-মাকে সর্ব্বাগ্রে এই কদভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করতে হবে। শিশু—বানরের প্রকৃতি ভাবাপন্ন এবং পিতামাতার ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলি তার চরিত্রকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করে।

ঝোঁকে যেয়ো না কোনো রকমে—শিশুদের প্রতি-নিয়ত প্রকাশমান প্রতিভা ও অসহিষ্ণু বুদ্ধিবৃত্তিকে। তার জীবন-কমলকে সার্থক, সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গ-প্রস্ফুট- করতে হোলে নূতন নূতন ক্ষেত্র ও পাত্র নির্ব্বাচন কোরে দিতে হবে। তার জীবনকে কোনো রকমে একঘেয়ে কোরে তুলো না। নূতন নূতন লোকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে, নূতন নূতন পড়ার বই কিনে দেবে, নূতন নূতন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, নিত্য নূতন গল্প প্রভৃতি শোনাবে।

দুষ্টু ছেলে-পুলের ছায়া পর্য্যন্ত নিজের ছেলেদের মাড়াতে দেবে না। ছেলেকে (অন্ততঃ পনেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত) সদাসর্ব্বদা নিজের কাছে বা বাপ-জ্যেঠার কাছে রাখতে চেষ্টা করবে। তার সমস্ত প্রাণের সুখে, দুঃখে, সমতায় ও সস্নেহে সমব্যথী বা অংশীদার হবে। যতদিন পার, ছেলেদের স্কুলের বাইরে রেখে নিজেরা তাদের লেখা পড়া শিখাবে। ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েই বা তার পশ্চাতে গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত কোরে দিয়েই নিশ্চিন্ত হোয়ো না। যদি নিজের সাধ্যায়ত্ত হয় ত মাঝে মাঝে নিজে বা পিতাকে দিয়ে তার ক্রমোন্নতির পরীক্ষা নেবে বা নেওয়াবে। ঝি-চাকরের কাছে ছোটো ছেলে-মেয়েকে বেশী ছেড়ে দিও না। এমন কি তাদের কোনো দূর সম্পর্কীয় নিকট আত্মীয় বা গৃহ-শিক্ষকের নিকট নিদ্রার স্থান নির্দ্দিষ্ট কোরো না।

জোর'-বেঁধে কখনো কচি ছেলেদের বইয়ে মনোনিবেশ করাবার চেষ্টা কোরো না। ছেলেদের যেমন প্রত্যহ সময় বিশেষে "পড়ো পড়ো" বোলে তাড়া দেবে, তেমনি "খেলো খেলো" বোলে সময় বিশেষে তাড়া করাতে হবে। জেনো—খেলাও তাদের মানুষ হবার একটা প্রধান সোপান। আদরের দুলাল ভেবে বাঁচলে ছেলেদের গোপন রাখার প্রয়াসেই বাংলার জননীরা বাঙালীকে এমন "অন্নের মুখ-চাওয়া অন্নের কাঙাল" কোরে গড়ে' তুলছেন।

নিগূঢ় বা অশ্লীতিকর কোনো প্রশ্ন করলে, শিশুর নিকট তার একটা সন্তোষজনক জবাব দেবার চেষ্টা করবে, ধম্‌ক দিয়ে তার স্বভাব-কুতূহল চিত্তকে দমিত কর্ত্তে যেয়ো না। সে অন্য কোন নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন কোরে বা দুর্নীতি-পরায়ণ চাকর-বাকরদের নিকট জিজ্ঞাসা কোরে তার প্রশ্নের একটা সমাধান করার চেষ্টা করবেই। শিশু তোমার কাছে কোনো কিছু জানতে চাইলে, তৎক্ষণাৎ বিষয়টি শিশুর সুবোধ্য ভাষায় জানিয়ে দেবে; বিষয়টি যদি গুরুতর ও জটিল হয়, তা হোলে স্বনামধন্য উইলিয়ম জোন্সের মাতার মত বলবে "বাছা, লেখাপড়া শেখো—ক্রমে জানতে পারবে (Read and you will know.)

পতি-পত্নী যেখানে এক শয্যায় শয়ন করেন, সেখানে কখনো পাঁচ বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক ছেলেদের শয়ন কর্ত্তে দেবে না —অন্ততঃ এক বিছানায় ত নয়ই। জেনো রেখো—যৌন-সংস্কার (Sexual instinct) প্রচ্ছন্ন ও অস্ফুট অবস্থায় সকল শিশুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে; একটু আভাস পেলে ঐ নিদ্রিত সংস্কার অকালে মাথা নাড়া দিয়ে জেগে উঠে। শিশুর পাছায় কখনো চড় মেরো না, কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার চেষ্টা কোরো না, গোপন অঙ্গে হাত দিয়ে আদর কোরো না। খুব বুড়ো বা জরাব্যাধিগ্রস্ত লোকের কাছে শিশুদের শুতে দেবে না।

ক্ষুদ্র যূথিকার মতো শিশুর কোমল দেহ-মন-প্রাণ, একটু ভারেই নুয়ে পড়ে বা বৃন্ত চ্যুত হয়। রোগ-শয্যায় তাদের প্রতি যতখানি যত্ন নাও, সুস্থাবস্থায় তার চেয়ে বেশী যত্ন ও সতর্কতা গ্রহণ করবে। ছেলেই জাতির আশা—মানুষের প্রত্যক্ষ ঠাকুর—ভাবী পুরুষের পিতা! পয়সার হিসাব, রাঁধা-বাড়া, ঘর-কন্নণা, কেশ-বেশ-প্রসাধন, লৌকিকতা রক্ষণ, পাড়া প্রতিবাসিনীদের সহিত গল্প গাছা, অলঙ্কারের স্পৃহা, নাটকোপন্যাস পাঠ প্রভৃতির মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও ভুলে যেয়ো না—তোমার বুকের রক্ত দিয়ে গড়া, ত্রিদিবের প্রাণবন্ত স্বপ্ন—অস্ফুট শিশুর অভাব-অভিযোগের কথা!

বালক বালিকা যে আপনা আপনি খারাপ হয়—তা' ভেবো না। বাহিরের কোনো দৃষ্টাদৃষ্ট প্রভাবের অভাব স্বত্বেও তারা যখন আদর্শের বিপরীত পথে চলতে শিখছে দেখবে, তখন মনে মনে বেশ কোরে নিজেদের গালি পেড়ো, আর খাটি জেনো—"বাপকো বেটা সিপাইকো ঘোড়া, কুছ নেহি তবভি থোড়া থোড়া!"

দেবী

শ্রী ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাগরের কক্ষ ছাড়ি লয়ে' করে অমৃতের থালা
মোহিনে মোহনী বেশে—ওগো দেবী, মুকুতার মালা
উর্ম্মিতে উর্ম্মিতে দুলে, পদপ্রান্তে প্রসন্ন কমল
অনন্তের বিভা বুকে বিতরিল সৌন্দর্য্য অমল।
কুণ্ঠার গুণ্ঠনে বুঝি আনন্দের ছিল অপ্রকাশ—
শতদল দলে দলে আজি হেরি সে হাসি আভাস।
নিতি জাগে নভোকোণে মেঘে মেঘে যে অমল হাসি
প্রথম আননে তব উঠেছিল তাহা যে উদ্ভাসি।
তোমার অন্তর-স্নেহ করুণার পঙ্ক কূপে রয়
তোমার বরণগীতি নিতি জাগে এ ভুবনময়।
বনে বনে গাহে পাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে অলি গুঞ্জরণ
নভোবাটে রামধনু সাজাইছে প্রবেশ তোরণ।
নবদুর্ব্বা দেছে পাতি পথমাঝে শ্যামল আঁচল
আলিপনা আঁকিতেছে তার মাঝে শুভ্র যূথীদল।
আঁচলেতে ভরি এনে নন্দনের ঐশ্বর্য্য সম্ভার—
ধরণীর দিকে দিকে করিয়াছ শোভার সঞ্চার।
সুপ্ত মৃত্তি-হিয়াখানি জাগায়েছ শ্যামল ফসলে
নির্ঝরে জাগিল প্রাণ গূঢ় ছিল পাষাণের তলে।
তোমার পরশ লভি সরসিয়া উঠে সারা ধরা
নারিকেলে নব জল, ধানে ধানে সারা মাঠ ভরা।
গভীর আঁধারে তব স্নেহসুধা করেছে সঞ্চয়—
সবুজ -অঞ্চল তব ধীরে ধীরে উড়ে বিশ্বময়।
সোণার পরশ দিয়ে চারি দিক করেছ সুন্দর।
প্রীতি প্রেম স্নেহভারে মোহিয়াছ মানব অন্তর।

ভগ্ন নীড়

(গল্প)

শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসতুতো-বোনের পিসতুতো-ভায়ের ছেলের সহিত সম্বন্ধটা খুব নিকট-সম্পর্কীয় না হইলেও অনুপমা যেদিন তাহার ভারটা হাসিমুখেই নিজের মাথায় বরণ করিয়া লইল, সেদিন আত্মীয়-স্বজন হইতে সুরু পাড়াপ্রতিবেশী অনেকেরই দিন কয়েক ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়া গেল। সকলেই এই একগুঁয়ে মেয়েটীর আচরণে স্তব্ধ এবং অকারণ খানিকটা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

কথা কহিলেন না শুধু নীরোদবাবু; তিনি সকলের নিকটের এই অদ্ভুত ব্যাপারটাকে তুচ্ছ ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলেন। আর বিশেষ বলিবার যিনি, তিনি তখন কলিকাতায় এম-এ পড়ায় এতটা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। বড়বৌ চিন্তাকুল গ্রীবা হেলাইয়া কহিলেন,—"এ পরের বোঝা তোর এত বইবার সাধ হ'ল কেন ছোট-বৌ? বয়সও যায়নি যে, নিরাশ হয়ে পড়েছিস্!"

ছোট-বৌ হাসিতে হাসিতে কহিল,—"আর যায়নিই বা বলি কি করে দিদি, কুড়িতেই ত বাঙ্গালীর মেয়ে বুড়ী হয়ে যায়; আমার ত একুশ পার হ'তে চল্‌ল।"

বড়বৌ রাগিয়া কহিলেন,—"থাম্‌লো থাম্, তোর ও বুড়োপনা কথা শুন্‌লে হাড় জ্বলে যায়; ওবাড়ীর উষির কত বয়স হয়েছিল বল ত? তিরিশের ওপর। তার এই পরশু ত একটী ছেলে হয়েছে। অমন অলুক্ষণে কথা আর যদি কখন মুখে আন্‌বি, ত তোর একদিন কি আমারই একদিন!"

ছোটবৌ বলিল,—"না দিদি, মনে-মুখে হুয়েই আন্‌ব না; এখন যে আমি মা হ'তে চলেছি।"

বড়বৌ কহিলেন,—"অনেক তফাৎ লো, অনেক তফাৎ। পরের ছেলে নিয়ে মা হওয়া, আর পেটের ছেলের মা হওয়া, আকাশ আর পাতাল তফাৎ।"

ছোটবৌ সে কথার উত্তরে কোন কথা বলিল না; ছেলেটার গালে মৃদু ঠোনা দিয়া কহিল,—"তাই না কি রে পাখি? আবার হাস্‌ছে, দাঁড়া ত।"

(দুই)

দিন-দশেক যাইতে না যাইতেই খোকার নামকরণ হইয়া গেল—অরুণকুমার। বড়বৌ কহিলেন,—"বেশ নামটী দিয়েছিস্ কিন্তু ছোট। অরুণের মতই সুন্দর বটে ও।"

গদগদকণ্ঠে ছোট-বৌ কহিল,—"তা নইলে কি আর রেখেছি দিদি? এই নামটী ভাবতে অন্ততঃ সাত দিন আমার ঘুম হয়নি; শেষে কি একটা যা-তা নাম রেখে বস্‌ব? আর, তোমাদের যা ডাকার ছিরি! যদি রাখ্‌লুম বিশ্বেশ্বর, ডাক্‌তে থাক্‌বে 'বিশে'; মাগো, ভাবলেও রাগ ধরে।"

বড়বৌ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"ও বাবা! তোর তা হ'লে এতটা ভাব্‌তে হয়েছিল। ধন্যি মেয়ে বটে।"

ছোটবৌ গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল,—"ভাব্‌তে হবে বইকি দিদি, ছোঁড়াটাকে যেকালে আশ্রয়ই দিতে হ'ল, তার ভাল-মন্দটা আমি না দেখ্‌লে কি পাড়ার পাঁচজনে দেখ্‌তে যাবে?"

সেদিন ভোরে উঠিয়াই ছোটবৌ বড়র নিকট আসিয়া কহিল,—"তোমরা আর আমাকে এখানে থাক্‌তে দেবে না দেখ্‌ছি!"

বড়বৌ অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তারপর বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে ছোট?"

গম্ভীর ভাবে ছোটবৌ কহিল,—"কি আর হবে! ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো আছি আমি, যত পার সইয়ে নাও তোমরা। বারবার বলে দিয়েছি—আমার ঘরে কাউকে থাক্‌তে হবে না; তবু ওই ক্ষেন্তির মাকে পাঠাও কেন বল ত?"

"কি হয়েছে তাতে?"

"হবে আর কি, মাগীর যেমন আক্কেল! কখন হয়নি, বুঝ্‌বে কেমন করে ছেলে মানুষ কর্‌তে হ'লে কত কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়! পই পই করে বলে দিলুম,—'জান্‌লা খুলে শুস্‌নি, খোকার অসুখ কর্‌বে।' তার ঠিক সেইটুকু করা চাই-ই চাই। এখন জ্বর হয়ে যে বেচারী পড়ে রইল, কি হয় বল ত তার?"

ক্ষেন্তির মা কোথায় ছিল কে জানে, ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"অবাক্ কর্‌লে বৌদি। এই বোশেখ-জ্যৈষ্ঠি মাসের দিনে লোক জান্‌লা খুলে না শুয়ে কি গরমে পচে মর্‌বে? আর, তাও ত তুমি শোও খাটে, আমি থাকি দোরের দিকে; হাওয়াই বা যাবে কি করে? ছেলেপুলের অমন জ্বরজ্বাড়ি হয়েই থাকে; তোমার কোন ভাবনা নেই।"

ছোট রাগিয়া কহিল,—"দেখলে দিদি, ক্ষেন্তির আক্কেল! যত ভাবনা ওরই, আমি যেন নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকি।"

বড় কহিলেন,—"ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ছোট, অমনধারা অসুখ-বিসুখ সবারই হয়; দু-দিন থাক, তারপর না হয় ডাক্তার-টাক্তার দেখান যাবে।"

"না, না, আর অত আস্তিতে কাজ নেই তোমাদের; তুমিও মাগীর হয়ে উকীলি কর্‌তে এসেছ দেখ্‌ছি!"—বলিয়া মুখ সোজা করিয়া ছোট-বৌ সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

(তিন)

নীরোদবাবু দ্বিতলের একটা কোণের ঘরে বসিয়া জমীদারীর হিসাব পত্র দেখিতেছিলেন। বড়বৌ অদূরে বসিয়া কি একটা কাজ করিতেছিলেন। হঠাৎ দরজার শেকলটা নড়িয়া উঠিল। বড়বৌ চাহিয়া দেখিলেন—ছোটবৌ।

নীরোদবাবু মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে?"

বড়বৌ কহিলেন,—"ছোট-বৌ।"

তাড়াতাড়ি কাগজটা নামাইয়া রাখিয়া নীরোদবাবু কহিলেন,—"বৌমা এসেছেন, কেন কি চাই ওঁর?"

বড় হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"কি করে জান্‌ব।"

নীরোদবাবু ব্যস্তভাবে কহিলেন,—"যাও, জিজ্ঞেস কর,—বসে রইলে যে?"

বড়বৌ উঠিলেন না, হাসিতে লাগিলেন। রাগে ছোটবৌয়ের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে নিজেই দরজার আড়াল হইতে মৃদু কণ্ঠে বলিল,—"খোকার জ্বর হয়েছে, ডাক্তার-টাক্তার যদি দরকার হয়—"

নীরোদবাবু চঞ্চল ভাবে কহিলেন,—"নিশ্চয়ই, যে দিন-কাল পড়েছে; এতক্ষণ খবর দাও নি কেন মা? যাচ্ছি, আমি এখনই সরকারমশাইকে ডেকে বলে দিচ্ছি। কই, এ বিষয় তুমি ত কিছু বল নি বড় বৌ?"

বড়বৌ কহিলেন—"তুমি ত ভাদ্দর-বৌয়ের কথায় একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌লে, ক'দিন জ্বর হয়েছে না হয়েছে খোঁজ নেওয়ারও দরকার বুঝ্‌লে না। আচ্ছা লোক যা হ'ক! এই সবে আজ একটু গা গরম হয়েছে, অত ব্যস্ত হলে চল্‌বে কেন? ও ছেলেমানুষ না হয় ব'ল্‌তে পারে, তোমারও বুড়ো হয়ে বাহাত্তুরে ধর্‌ল না কি?"

"হ্যাঁ, তোমার বুদ্ধি তোমাতেই থাক,—যাও বৌমা, আমি এখনই বন্দোবস্ত কর্‌ছি।" বলিয়া নীরোদবাবু চটি জুতার পট্ পট্ শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

(চার)

দিন-দুই রাগে-অভিমানে অনুপমা আর বড়জার সহিত কথা কহিল না। ডাক্তার দেখিয়া গেলেন। ছেলেটীও সারিয়া উঠিল। চিন্ময়ী সেদিন সকালে বারাণ্ডায় বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন, অনুপমা আসিয়া 'থপ্' করিয়া পাশে বসিয়া কহিল,—"আমার সঙ্গেই নয় রাগারাগী ছিল দিদি, কি বলে তুমি ছেলেটারও খোঁজ নিলে না একবার, তাই বল ত?"

"যার ছেলে সেই নেবে জানি, কাজেই।"

"ঐ জানাজানিটা কিন্তু মস্ত বড় অন্যায় দিদি, একটা লোক মাথায় নিয়েছে বলেই যে আর কারুকে দেখতে নেই, এ কেমন বিচার তোমরাই জান!"

ধীরকণ্ঠে চিন্ময়ী কহিলেন,—"কপাটটা কি সকালে আরও একটু পাকিয়ে নিতেই এসেছিস্ ছোট-বৌ?"

হঠাৎ বড় বৌয়ের পায়ে মাথা রাখিয়া ছোটবৌ কহিল,—"তোমার সঙ্গে কি আমার ঝগড়ার সম্পর্ক দিদি? যদি কোন অন্যায়ই করে থাকি, ছোট বোনের কি ক্ষমা নেই!"

তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া বড়বৌ কহিলেন,—"এসব পাগলামি শিখ্‌লি কোথা থেকে বল ত? দশবছর বেলা থেকে যে তোকে নিজের পেটের মেয়েরই মত করে বড় করে তুলেছি অনি! তোর দোষগুণ বিচার কর্‌বার শক্তি যে আমার অনেক দিনই চলে গেছে, তাকি ভুলে যেতে আছে? নে, ওঠ।"

অনুপমা উঠিয়া বসিল।

সেদিন এম-এ পরীক্ষা শেষ করিয়া নিশানাথ বাড়ী ফিরিল; ব্যাপার দেখিয়া বলিল—"তাই বুঝি আজ ক-মাস ধরে একখানা চিঠি লিখেও খোঁজ নিতে পারনি অনু? বেশ, বেশ, আমার মায়া ত তুমি কাটাতে পেরেছ, দেখা যাক্, আমি কতটা পারি।"

বড় বড় চোখ দুটি মিনতিভরে অবনত করিয়া ছোট-বৌ কহিল—"অন্যায় যে তা-ত স্বীকার কর্‌ছি, কিন্তু এর যে দেখবার কেউ নেই—বাপ-মা-মরা ছেলেটা……" বলিতে বলিতে তাহার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পত্নীকে আদর করিয়া টানিয়া লইয়া নিশানাথ কহিল —"কিন্তু, অরুণকে ডাক্‌লেই নিশিকে ভুল্‌তে হবে, এটা যে ভগবানের নিয়মেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় অনু—"

জিব কাটিয়া স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া অনুপমা কহিল,—"ওসব বাজে বকো না কিন্তু, আমি এখান থেকে চলে যাব। গুরুজন হও, আর কি ঠাট্টা কর্‌বার বয়স আছে আমাদের? ছেলেপুলের সংসার হয়েছে যে!"

(পাঁচ)

মাস কয়েক যাইতে না যাইতেই অনুপমা কিন্তু লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। বড়বৌ হাসিয়া বলিলেন—"কি লো, কল্‌ল ত; তখন খুব বুড়োপনা হয়েছিল, এখন?"

ছোটবৌ সবেগে ঘাড়টা অন্যদিকে ফিরাইয়া বলিল—"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, এখন মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে ত; ঠাকুর বাড়ী পূজো পাঠাও।"

বড়বৌ কহিলেন—"পাঠাবইত ত, জলপিণ্ডের অধিকারী আস্‌ছে, পাঠাতে হবে বই কি।"

ছোটবৌ মুখ গোঁজ করিয়া উঠিয়া গেল। অরুণকুমার আপন-মনে খেলা করিতেছিল, ছোটবৌ তাহাকে টানিয়া আনিয়া একেবারে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। খোকা অবাক্ হইয়া মাতার এই ভাব বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিল; তারপর বলিল—"বারে, আমি খেলা কর্‌বা না, এখন বুঝি শোয়?"

ছোটবৌ কহিল,—"আচ্ছা অরু, তোর ভালবাসার যদি কেউ ভাগীদার জোটে, কি কর্‌বি বল ত?"

অরুণকুমার ভাবিবার মুহূর্ত্তমাত্র অবসর না লইয়া বলিল,—"হুঁ, জুট্‌লেই হ'ল কি না, আমি তাড়িয়ে দেব না!"

অনুপমা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল,— "তাড়িয়ে দিবি কি করে বাবা, সে যদি তোর ভাই হয়, তোর……"

বালক উল্লসিতকণ্ঠে কহিল—"ভাই, কই মা?"

ছোটবৌ হাসিয়া কহিল,—"দূর পাগল,কোথায় আবার, এমনই বল্‌ছিলুম। তাকে নিয়ে খেলা কর্‌তে পার্‌বি ত? —কি বল?"

বালক বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"হ্যাঁ।"

নিয়মিত সময়ে একটী নবজাত শিশু আসিয়া তাহাদের সংসার আনন্দ-মুখর করিয়া তুলিল। অরুণকুমার বিস্ময়-উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল,—তাহার একান্ত আপনার কোলটি আজ অধিকারের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে বিষণ্ণমুখে ঘুরিতে দেখিয়া অনুপমারও প্রাণটা চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে বলিল,—"আয় অরু, আমার কাছে আয়।"

অরুণকুমার একছুটে অনুপমার বুকের মধ্যে গিয়া মুখ লুকাইল। বড়বৌ দুধ দিতে আসিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন; বিরক্তস্বরে অনুযোগ করিলেন,—"এ সব কি অনাছিষ্টি হচ্ছে ছোটবৌ, বুড়োহাবি ছেলেটাকে আঁতুড়ে ঢোকালি যে, স্নান না করে ত আর ঘরে ঢুক্‌তে পাবে না।"

অরুণের ছোট হৃদয়টী কাঙালের মত হা-হা করিয়া

ফিরিতেছিল ; তৃপ্তির উল্লাসে এতক্ষণ পরে তাহার জ্বালাটা ক্রমে বিদূরিত হইয়া আসিতেছিল। চিন্ময়ীর দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়াই সে মাথাটা ঘুরাইয়া লইল। ছোট বৌ তাহাকে আরও বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল,—"ওর এতদিনের অধিকার একদিনেই ছাড়ে কি করে দিদি ?"

"করবে আমার মাথা !" বলিয়া বড়বৌ রাগে গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ঘণ্টাখানেকের পর একেবারে অগ্নিমূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—"পারব না এতবড় অন্যায় সয়ে এখানে থাকতে আমি ছোটবৌ।"

অনুপমা উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে কহিল,—"কি হ'ল, দিদি ?"

"তোমার গুণধর পুত্তুর আমার ঘর-দোর সব নষ্ট করে দিয়েছে। ও বেনোজল ঘরে ঢোকাতে গেলি কেন বল ত মুখপুড়ী ?"

ছোটবৌ ধীর কণ্ঠে কহিল,—"কোথায় গেল সে ?"

"যাবে আর কোথায় ! ওইটুকু ছেলের পেটে প্যাচ গজ গজ করছে, বকুনি খাবার ভয়ে বাইরে পালিয়েছে। আজ কিন্তু আমি দেখে নেব, কত বড় পাজি সে !"

ছোটবৌ স্থির-কণ্ঠে কহিল,—"তোমরা কিছু বলো না দিদি, আমিই তার ব্যবস্থা করব'খন।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি পা ফেলিয়া অরুণকুমার একেবারে অনুপমার কোলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। অনুপমা কহিল,—"দিদির ঘরে কি করেছিস্ হতভাগা ?"

কোলের উপর বসিতে বসিতে বেশ প্রফুল্লমুখেই বালক বলিল,—"কই, কিছু ত করিনি মা। জেঠাইমা বললেন—তোমায় ছুঁলে চান করতে হয়, তাই সব জিনিষই ছুঁয়ে দিয়ে এসেছি।"

তিরস্কার ভুলিয়া অনুপমা তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিল,—"খুব বুদ্ধির কাজ হয়েছে ; আর করো না কিন্তু।"

(ছয়)

একটি দিনের অত্যাচারেই বাড়ীময় অসহিষ্ণুতার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল ; অনুপমা শুদ্ধ হইয়া উঠিতে সকলেই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এতদিন অরুণের আদর-আব্দার কোন মতে সহ্য করিয়া চলিলেও এখন সকলেরই পক্ষে তাহা ভার বোধ হইতে লাগিল। নিজের এই অনায়াস-লব্ধ দাবীটুকু নাকচের চেষ্টা দেখিয়া বালকও যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল।

মধ্যাহ্নকাল। সকলেই বিশ্রাম লইতেছিলেন। কি খেয়ালে অরুণ রান্না ঘরে ঢুকিয়া চুপে চুপে খোকার দুধটা নিঃশেষ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, চিন্ময়ী কি একটা কাজে হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়ায় তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইতে গিয়া তাহার হাত হইতে সমস্ত দুধ মেঝের উপর পড়িয়া গেল। বালক ভয়ে পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল, 'খপ্' করিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বড়-বৌ কহিলেন—"কি হচ্ছিল সর্ব্বনেশে ; হিংসুটে স্বভাব যাবে কেমন করে, যেমন বংশে জন্ম !"—বলিয়া তিনি তাহার পিঠে দুম্ দুম্ করিয়া কিল বসাইয়া দিলেন।

অনুপমা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়া কহিল,—"তোমরা আমায় তাড়ালেই কি সুখী হও দিদি ?"

তাহার এই গম্ভীর প্রশ্নের উত্তরে আজ আর বড় বৌ নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁ হই, ও আপ.....

বাধা দিয়া ছোট বৌ কাতরকণ্ঠে কহিল,—"তাই হবে দিদি, সেই ব্যবস্থাই আমি করব। যেখানে ছোট ছেলের মাথায় বংশের খোঁটা তুলে গালাগাল দেওয়া হয়, সেখানে অন্ততঃ তাকে রাখা আমার আর সম্ভব হবে না।" বলিয়া অরুণকে টানিতে টানিতে সে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

বড় বৌ নির্ব্বাক, পলকহীন-নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

(সাত)

অনুপমার অন্তর কেহ বুঝিল না। তাহার প্রস্তাবটা সকলের নিকট শাপে বরেরই মত হইল। নিশানাথ কহিল "বেশ ত, বোর্ডিংয়ে থেকে মানুষ হওয়াই ত ভাল।

এখানে বয় ছেলে পুলের সঙ্গে মিশে খারাপও ত হয়ে যেতে পারে।"

অনুপমা একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল মাত্র, কোন প্রতিবাদই করিল না। তাহার হৃদয়টা তখন শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহিল। অভিমানের জ্বালায় সে না হয় কথাটা বলিয়াই ফেলিয়াছিল, কিন্তু সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যাঁহারা তাহার ভিতরকার সত্যটাকে জোর করিয়া মুছিয়া ফেলিতে চাহেন, তাঁহাদের বলিবার আর কি আছে?

পরদিন প্রভাতেই অনুপমা নিশানাথকে বলিল,—"আজই তবে তুমি একে নিয়ে গিয়ে বন্দোবস্ত করে এস, বুঝেছ?"

"আজই, চোত মাসে!"

"না, না, দেরী করা ভাল নয়,—বাপ মা-মরা অভাগার আবার চোত মাস কি? তা ছাড়া, যেনোজল যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়, ততই ভাল। তুমি ঠিক হয়ে নাও, যেতেই হবে তোমায়।" বলিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। চোখের জল অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুতেই সে তাহাকে রুদ্ধ করিতে পারিল না।

নীরোদবাবু জমীদারি দেখিতে যাইতেছিলেন; বড়বৌ ছোটকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিলেন,—"চল্‌লে ত, এদিকে যে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়, তার কি ব্যবস্থা করছ, শুনি?"

"অকল্যাণ!" নীরোদবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন,—"বল কি, অকল্যাণ হবে কেন?"

বড়বৌ স্বামীর এই সদা সরল চিত্তটীকে আজ আর বরদাস্ত করিতে পারিলেন না, কহিলেন,—"আমার মাথা হবে! ছেলেটাকে যে ছোটবৌ এই অ-মাসেই বাড়ীর বার করে দিচ্ছে, তার খোঁজ রেখেছ?"

"বের করে দিচ্ছেন; কে বৌমা? তা বেটী বেশ করছে। ও যখন এনেছিল, তখন কেউই ত দেখতে যাওনি; এখন যদি বেরই করে দেয়, তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। কি বল, বৌমা?" নীরোদবাবু আপন মনে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অনুপমা মাথা নত করিয়া ধীর কণ্ঠে কহিল,—"মানুষ করে তুলতে গেলে সব দিক দেখা চলে না। তাই..."

কোন দিনই গভীর চিন্তার আবশ্যক নীরোদবাবু অনুভব করেন নাই, আজও করিলেন না। বেশ প্রফুল্ল মুখেই বলিলেন,—"মানুষ, হ্যাঁ, মানুষ করতে হবে বই কি মা। তুমি যা করবে, তাই ঠিক। বুঝেছ গিন্নি, বৌমা—" গৃহিনী তখন রাগিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

অনুপমাকে সকলেই চিনিত, কাজেই তাহার স্নেহ বঞ্চাই রহিয়া গেল। অরুণকে লইয়া নিশানাথ কলিকাতার দিকে রওনা হইল। বালক এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না। অনুপমা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। তাহার বাক্যপথ তখন একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

রাত্রে শরীর খারাপ হওয়ায় অনুপমা উপবাস করাই সঙ্গত বোধ করিল।

পরদিন নিশানাথ আসিয়া খবর দিল—তাহাকে ভাল স্থানেই রাখিয়া আসিয়াছে। অরুণও তাহারই মত বহু বালক সঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

অনুপমা ভালমন্দ কিছুই বলিল না।

* * *

দিন কয়েক পরে বোর্ডিং হইতে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল—"আপনাদের ছেলেটী পলাইয়াছে, কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।"

অনুপমা কাঁপিতে কাঁপিতে নবকুমারকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। মানুষের বাঁধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির বাঁধন দৃঢ় হইয়া উঠিল।

সকলে বলিলেন,—"ছেলেটা বোম্বেটে ছিল বটে!"

(আট)

দীর্ঘকাল পরের কথা। অনুপমার পুত্র নবকুমারের বিবাহ-উৎসব। সারা পল্লী জুড়িয়া আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নীরোদবাবু চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিতে তুলিতে অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"বৌমা, বৌমা?"

অনুপমা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল,—"কি বলছেন?"

"দেখ, দেখ, চিন্তেই পারলে না বোধ হয়? হুঁ আমি কিন্তু একবারেই জেনে ফেলেছি বাছাধনকে! সাহেব সেজে লুকুবে কোথায়?—সেই অরু গো, আমাদের অরুণ!" বলিয়া বিজয়োল্লাসে নীরোদবাবু হাসিয়া উঠিলেন; পরক্ষণে কর্ত্তব্যকর্ম্মের 'ইতি' হইয়াছে ভাবিয়া ধীরে ধীরে বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

অনুপমা সম্মুখে সাহেবী-পোষাকে সজ্জিত অরুণকুমারকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল। তাহার হৃদয়টা তখন কোন এক অননুভূত পুলকে স্পন্দিত হইতেছিল, সে বুকটার উপর হাত চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অরুণ অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া জানাইল—আজ কিছুদিন হইল সে বিলাত হইতে আসিয়াছে; নবকুমারের বিবাহ সংবাদ পাইয়া দেখা করিতে ও বরবধূকে সামান্য কিছু উপহার দিতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছে।

অনুপমা কহিল—"আয়, ঘরে বসবি আয়।"

অরুণ উঠিল না, মাথা নত করিয়া কহিল,—"আমি আর ও ঘরে ঢুকতে পারব না মা, আমি ক্রিশ্চান।" বড়বৌ ও অন্যান্য অনেকেই সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ছোট শিহরিয়া উঠিল—'ক্রিশ্চান!"

"হ্যাঁ মা, আমি ক্রিশ্চানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে মিশনারীদের খরচে বিলাত থেকে 'সিভিল সার্ভিস' পাস করে ফিরে এসেছি।"

অনুপমার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে কহিল—"ধর্ম্ম! আমাদের ধর্ম্ম কি জান দিতে অক্ষম হয়েছিল অরুণ?"

অরুণ আরও মাথা নীচু করিয়া কহিল,—"না মা, আমায় স্নেহ দিয়ে বেঁধে রাখতেই শুধু অক্ষম হয়েছিল। তোমার কোল ছাড়া হয়ে না বাঁচাটাই ছিল আমার লক্ষ্য; তাই, মরতে গিয়েছিলুম। কিন্তু এক পাদ্রী আমায় মরতে দিলেন না, বাঁচালেন; তাই নিজের ওপর এই প্রতিশোধটাই নিয়ে নিলুম!"

অনুপমা কিছুতেই আর উদ্গত অশ্রুকে ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না, তাহার চক্ষে বন্যা নামিয়া আসিল। পূর্ব্বদিনের মত আদর করিয়া অরুণের মাথাটা বুকের নিকট টানিয়া লইয়া কহিল,—"বেশ করেছিস অরুণ।"

অরুণের নেত্রও শুষ্ক ছিল না। মাতার বসনে বার বার সে চক্ষু মুছিতে লাগিল -পরে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বুকপকেট হইতে একখানি "গীতা" ও একখানি "বাইবেল" বাহির করিয়া কহিল—"এই দুটী আমার বড় প্রিয় মা, তাই ভায়ের বিয়েতে উপহার দিলুম। আর বৌমা." বলিয়া একটী বহুমূল্য হীরক-মণ্ডিত হার ও একখানি "বিন্নুর ছেলে" বই অনুপমার হাতে দিয়া বলিল,—"তাঁকে দিও; "বিন্নুর ছেলে"র জন্ম সার্থকই হয়েছিল কিন্তু, হতভাগা…"

অনুপমা তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"ভুল বুঝিস নি অরু; তোর মায়ের হৃদয় যদি দেখাবার হ'ত অনেক 'বিন্নুর ছেলে'ই এতে সৃষ্টি হয়ে উঠত বাবা!"

অরুণ তাহার পায়ের উপর মাথাটা লুটাইয়া দিয়া বলিল,—"আমার অন্তরে সে বিশ্বাস আছে বলেই আজ আবার এখানে আসতে পেরেছি। কিন্তু বাইরের যে ব্যবধান এ জীবনের মত পাষাণ-প্রাচীর তুলে দিয়েছে, আশীর্ব্বাদ কর, পরজন্মে যেন আর তার অস্তিত্ব না থাকে। এখন তবে আসি মা।"

অনুপমা যেন স্বপ্নরাজ্য হইতে নামিয়া আসিল, কহিল,—"তবে তাই হ'ক অরুণ। আশীর্ব্বাদ করি, তোর অন্তরের এই সত্যকার প্রার্থনা আগামী জন্মে যেন নিষ্ফল না হয়।"

অরুণ ধীরে ধীরে তাহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। কৌতূহলাক্রান্ত পুরনারীর মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রথম বড়বৌ বলিলেন,—"ক্রিশ্চানের দান শুভদিনে দিস নি ছোট বৌ; অকল্যাণ হবে।"

অন্য একজন কহিল,—"হারটা মন্দ দেয়নি কিন্তু।"

সে সব কথার কোন উত্তর না দিয়া অনুপমা অতি সন্তর্পণে, অতি যত্নে বুকের মধ্যে সেগুলি চাপিয়া ধরিয়া গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। বড়বৌ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন,—"ও কাপড়ে ঘরে ঢুকিস নি ছোট বৌ, চান করে আয়।"

কিন্তু তাহার ফিরিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

দৈহিক বল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

শ্রীমতী অমিয়া রায়।

কিছুদিন হইতে সংবাদপত্রে নারীহরণের সংবাদ প্রায়ই পড়িতেছি। প্রায় প্রতিদিনই খবরটি শুনিতেছি বলিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। বাঙ্গালাদেশে এ সংবাদ একেবারে নূতন নহে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও ইহা এত বেশী শোনা যায় নাই; কচিৎ দুই একটি যাহা শোনা যাইত তাহাও সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে। কিন্তু আজকাল যে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ভিতরেও ইহার অবাধ প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে তাহার কারণ কি?

অবশ্য এ কথা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, হিন্দু-সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারীগণের অপমানকে আমি অবজ্ঞার বিষয় মনে করিতেছি। আসল কথা এই যে, পাপের প্রসার সর্ব্বতোভাবে দূষণীয় এবং এই নারীহরণরূপ মহাপাপ যে ক্রমশঃ নিম্ন হইতে উচ্চ স্তরে উঠিয়া আসিতেছে, ইহাতে সমস্ত হিন্দুসমাজের ঘোর অবনতি ও দুর্দ্দিন সূচিত হইতেছে। শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ দেশবাসিগণ সমাজের যে শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে শ্রেণীর উপরেও কলঙ্ক লিপ্ত হইলে দেশের আর রহিল কি?

বাঙ্গালাদেশের নারীগণ পুরুষদের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকেন, সুতরাং এ ক্ষেত্রে পুরুষদিগের ঘোর কাপুরুষতাই কি প্রমাণিত হইতেছে না? দেশের নেতৃগণ যতখানি উদ্যম লইয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বহুবিধ দেশের কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ততখানি উদ্যম যদি এই বীভৎস পাপের প্রতিবিধানের জন্য ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আজ এতগুলি রমণীকে দস্যুহস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইত না। বাঙ্গালী মেয়ে স্বভাবতঃই কোমলা ও দুর্ব্বলা, তাহার উপরে বহুকাল হইতে অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র ও ভয়শূন্য অবরোধের মধ্যে থাকিয়া তাহারা আরও বেশীপরিমাণে ভীরু ও দুর্ব্বল স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু সাহস শক্তির প্রয়োজন, তাহার বিন্দুমাত্রও আজ তাহাদের দেহ-মনে অবশিষ্ট নাই। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে যাহাদিগকে পুরুষের বোঝাস্বরূপ হইতে হয়, তাহারা অসহায় অবস্থায় পড়িলে অনায়াসেই কুচক্রীর কবলে পড়িবে—তাহার আর বিচিত্র কি?

কেবলমাত্র এই হীন অবস্থার পরিকল্পনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে বাঙ্গালী আজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরুষেরা স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখিতেছেন, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের লোকেদের সহিত বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষে সমান স্থান অধিকার করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছেন সত্য, কিন্তু পুরুষের প্রকৃতিগত যে স্পর্দ্ধা, নারীকে রক্ষা করিবার যে শক্তি, তাহা বাঙ্গালী হিন্দু হারাইতে বসিয়াছেন। সে শক্তি তাঁহাদিগকে আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে—কাপুরুষতার অপবাদ তাঁহাদিগকে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। আর কেবল পুরুষদিগকে শক্তি-শালী হইলে চলিবেনা, পৃথিবীর অন্য সকল সভ্য জাতির মত বাঙ্গলার নারীগণকেও বহুযুগের সংস্কারবন্ধন ছিন্ন করিয়া শক্তিমতী করিয়া তুলিতে হইবে। অনেক প্রবীণ-পন্থী বলেন যে, রমণীগণ সাধ্বী হইলেই তাহাদের মনের বল বাড়ে এবং দৈহিক দুর্ব্বলতা থাকিলেও মানসিক বলের দ্বারা তাহারা শত্রুকে পরাজিত করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পশুত্বকে দেহের বল দ্বারা পরাস্ত না করিলে চলিবে না। বালকদের ন্যায় বালিকাদিগকেও বাল্যকাল হইতে দৈহিক বল বৃদ্ধির সুযোগ দিতে হইবে। অতি অল্প-কাল স্ত্রীশিক্ষার ফলেই নারীগণ কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতেছে—সেইরূপ, যদি স্কুল-কলেজে মেয়েদের জন্য ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে আশা করা যায় যে তাহাদের শারীরিক উৎকর্ষও সাধিত হইবে।

বাংলার অত্যাচারিতা নারীদের অভিশপ্ত জীবনের করুণ কাহিনী পাঠ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার মীমাংসা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিদ্বারা হইয়া উঠিবে না জানি, তবু যদি এই প্রসঙ্গে কোন যোগ্যতর ব্যক্তি ইহার প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে বাংলার নারীসমাজ তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিবে।

মার্কিণ মহিলা

শ্রী যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ. কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

মার্কিণ মহিলা বিবাহ-অবস্থা প্রাপ্ত হবার বহুপূর্ব্বে মায়ের হাত হতে মুক্তিলাভ করে, এবং তারুণ্যের প্রথম সোপান হতেই চিন্তায়, বাক্যে এবং কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লক্ষণ প্রকাশ করে। প্রায় এই সময়েই জাগতিক রহস্যময় দৃশ্যাবলী তার সুমুখে স্থাপন করা হয় এবং সে স্থির ধীর ভাবে এইগুলি পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তে শেখে। এইরূপে সমাজের ঘৃণিত বা কল্যাণকর কার্য্যসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার কর্ব্বার অবসর প্রাপ্ত হওয়ায় তার মস্ত এক উপকার এই হয় যে, সে অল্পবয়স হতেই সাহসভরে পাপপুণ্য বিচার কর্ত্তে শেখে এবং আপনার মঙ্গল আপনি বেছে নেবার শক্তি অর্জ্জন করে। কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়াবস্থায়, মার্কিণ মহিলা কখনো বালিকা সুলভ ভীরুতার বশবর্ত্তী হয় না। সে সকলকে সন্তুষ্ট কর্ত্তে চায় বটে, কিন্তু সে ভাল রকম জানে যে, সকলের মন পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। সে পাপের পথ হতে দূরে থাকতে চায় কিন্তু এও স্বীকার করে যে, সে কাজ খুবই কঠিন। এটা বেশ লক্ষ্য হয় যে, মার্কিণ মহিলা যৌবনের প্রারম্ভ হতে স্বাধীনতা লাভ কর্লেও কখনো আত্মহারা হয়ে পড়ে না, এবং সর্ব্ববিধ আমোদ-প্রমোদে রত থাকলেও, কদাপি এসবের একান্ত বশবর্ত্তী হয় না বা অসংযমনস্কতা বশতঃ আত্মরক্ষার লাগাম হাতছাড়া করে না।

মার্কিণের লোকেদের বিশ্বাস, সামাজিক আইন-কানুনের দ্বারা নর-নারীর হৃদয়নিহিত দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিসমূহ চেপে রাখা যায় না, সুতরাং লোকে মেয়েদের অষ্টবন্ধনে আবদ্ধ না করে তারা যাতে প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে পারে এই শিক্ষাই তাদের দেয়। সুতরাং পদে পদে মহিলাদের উপর সন্দেহ না করে তাদের চরিত্রের দৃঢ়তার উপর অগাধ বিশ্বাস পোষণ করে, এবং এই কারণেই নির্ব্বিচারে অবনতির যত কিছু কারণ আছে তা তাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে; একার্য্যে অনুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করে না।

মার্কিণের অধিবাসীরা একান্ত ধর্ম্মপ্রাণ হলেও একমাত্র ধর্ম্মই যে সতীত্ব রক্ষার উপায় এটা তারা বিশ্বাস করে না, সুতরাং যতদিন না নারীর মনোবলের পূর্ণবিকাশ হয় তত দিন তাদের ধর্ম্মশিক্ষা দেয় না, এবং যখন ধর্ম্মশিক্ষা দেয় তখনো তাদের বিচারবুদ্ধি বা সংযমশিক্ষা যাতে ধর্ম্মের চাপে অভিভূত না হয়ে পড়ে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখে। মার্কিণের লোকের ধারণা এই যে, সমাজের উত্থান বা পতনের সঙ্গে সঙ্গে নারীচরিত্রের উন্নতি ও অবনতি ঘটে থাকে, সুতরাং নারীর কল্যাণ যে সামাজিক কল্যাণ হতে স্বতন্ত্র এরূপ বিশ্বাস তাদের নেই।

মার্কিণদের ব্যবসায় বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় তাদের মেয়েদের ধাতুতেও এই বুদ্ধির কতকটা মিশিয়ে গেছে, সুতরাং মার্কিণ মহিলারা সংসারের শৃঙ্খলা বা মিতব্যয়িতা বজায় রাখ্‌বার জন্য স্বেচ্ছায় গার্হস্থ্য জীবনের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে। মার্কিণদেশে যে সমস্ত পুস্তক লিখিত হয়, এমন কি নাটক-নভেলাদিতেও নারীর কলঙ্কিত চরিত্র আঁকা হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্ব হতেই স্বীকার করে নেওয়া হয়, নারীর চরিত্র স্বভাবতঃ পবিত্র।

মার্কিণ মহিলাদের মধ্যে পুরুষজনোচিত গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকলেও তারা নারীধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ কর্ব্বার চেষ্টা আদৌ করে না। সেই জন্য দেখা যায়, অনেক নারীর হৃদয় পুরুষের ন্যায় দৃঢ় ও উদ্যমশীল হলেও তাদের নারীজনসুলভ হাবভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না। অন্যান্য দেশের মেয়েরা নিজেদের দুর্ব্বল, ভীরু ও চকল সাব্যিয়ে সমাজ হতে কতকগুলি অধিকার আদায় করে লয়, কিন্তু মার্কিণ মহিলা এরূপ অধিকার পছন্দ করে না। অন্যান্য দেশের মত মার্কিণরা নারীজাতির মনস্তুষ্টির জন্য সদাসর্ব্বদা রত না থাকলেও মেয়েদের

অপর কিছু করতে পারেন নি। যার কাজ তারেই সাজে, না অমিয়বাবু?" বলিতে বলিতে সে ক্ষুদ্র বালিকার মত এমন উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসিয়া উঠিল যে অমিয়কেও হাসিয়া ফেলিতে হইল।

তখনি হাসি থামাইয়া গম্ভীরভাবে সে বলিল "কপাল ভাল আমার তাই আপনার মুখে হাসি দেখলুম। আমি এসেই আপনার মুখটাকে যে রকম ভারি দেখলুম, তাতে কিছুতেই মনে হয়নি যে আপনাকে হাসাতে পারব। সত্যি—রাগ করলেন না তো আমার কথায়?"

তাহার সরলতায় প্রীত হইয়া অমিয় বলিল "মোটেই না। সত্যি আমার মনটা আজ মোটেই ভাল নয়। এখানকার কোন কারণে যে এ বিমর্ষতা জন্মাচ্ছে তা যেন ভাববেন না; এ বিমর্ষতার কারণ এ দেশ নয়, অন্য দেশের ভাবনা।"

নীরা বলিল "সে দেশটা বোধ হয় যশোর জেলার কোনও পল্লীগ্রাম, যার নাম উচ্চারণ করতেও হৃদয়টা পুলকে ভরে ওঠে, উচ্ছ্বাসটা মুখে চোখেই ফুটে বেরোয়?"

অমিয় অন্যমনস্ক ভাবে বলিল "সে কথা সত্যি, কিন্তু আমার এ বিষণ্ণতা সে দেশের বিরহে নয়, অন্য কারণে।"

নীরা বুঝিল অমিয় সে সব কথা বলিতে নারাজ; একটু থামিয়া সে বাহিরের বৃষ্টিধারার পানে চাহিয়া বলিল "এবার বৃষ্টিটা অনেক কমেছে, আসুন না মাসীমার ঘরে, মাসীমা না হলে আমাদের গল্পটা তেমন ভাবে জমে না—না?"

বাস্তবিক কুমুদিনীকে মাঝখানে রাখিয়া উভয়ে বেশ অনর্গল কথাবার্ত্তা চালাইয়া যাইত, তিনি মাঝে না থাকিলে গল্পটা কিছুতেই জমিয়া উঠে না।

অমিয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "তবে আমার ছাতাটা—"

নীরা হাসিমুখে বলিল "আমার ছাতা আছে, আপনি আসুন।"

অমিয় ছাতা লইল।

কুমুদিনী তখন ঘুমের ঔষধ একখানা বই হাতে লইয়া শয়ন করিয়াছেন মাত্র। পড়ার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক এই সবমাত্র, মিনিট পাঁচের জন্য মাত্র।

পরেশবাবু নিজের নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া সাহিত্য চর্চ্চায় সারা দিন কাটাইয়া যেন, এ গৃহের সহিত কুমুদিনীর কোনও দিন সম্পর্ক ছিল না। এবার নীরা আসিয়া পরেশবাবুর গৃহখানা দখল করিয়া লইয়াছে, পরেশবাবু তাহাকে নিজের স্থান ছাড়িয়া দিয়া নীচের বৈঠকখানায় আশ্রয় লইয়াছেন।

বারাণ্ডায় নীরা ও অমিয়ের পদ শব্দ পাইয়াই কুমুদিনী বইখানা বালিশের তলায় রাখিয়া চোখ মুদিলেন, যেন কতই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু নীরা সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার এই দুষ্টামিটা দেখিয়া ফেলিল "মাগো মা, বেশ ঘুম তো তোমার মাসীমা? আমি এইমাত্র দেখে গেলুম তুমি পানের ডিবে নিয়ে বসলে; এর মধ্যে অমনি অতগুলো পান খাওয়া হলো, বই পড়া হয়ে গেল, ঘুমও পুরো-মাত্রায় চোখ জড়িয়ে এলো। আমি এদিকে গল্প করবার জন্যে অমিয়বাবুকে ডেকে আনলুম, আর তুমি ঘুমুলে—বেশ।"

কপট নিদ্রা হইতে জাগিয়া নীরার পানে চাহিয়া কুমুদিনী উঠিয়া বসিলেন, দারুণ রাগভাব দেখাইয়া বলিলেন "সত্যি নীরা, তোর ভাব দেখলে আমার বড্ড রাগ হয়। কি রকম মেয়ে যে তুই হয়েছিস তা আমি বলতে পারিনে। এই বৃষ্টিতে ভিজে গেছিস অমিয়কে ডাকতে,—কেন বাপু, বৃষ্টিটা ধরলে গেলে কি হতো? অমিয় কি পালিয়ে যাচ্ছিল, না তুই পালিয়ে যাচ্ছিলি; সবই বিচ্ছিরি তোর বাপু, আলাতন করে আমায় মারলি তুই। পরের ছেলে—ওকেও তুই এমনি করে ভিজালি, অসুখ বিসুখ হতে পারে—তখন—"

অমিয় একটু হাসিয়া বলিল "কিছু ভিজিনি খুড়ীমা, দেখুন না, বৃষ্টি একেবারে কমে গেছে।"

বাহিরের পানে চাহিয়া কুমুদিনী বলিলেন "হ্যাঁ, কমে গেছে বই কি? এখনও বড় বড় করে জল পড়ছে দেখতে পাচ্ছি।"

নীরা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তাঁহার হাতখানা টানিয়া লইয়া নিজের মাথায় দিয়া বলিল "কই ভিজেছে দেখ দেখি? যদি ভিজতো হাত দিলেই তো জানতে পারতে। বসুন না অমিয়বাবু, চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন? আপনাদের দেশের গল্প বলুন।"

অমিয় বসিয়া বলিল "সে পল্লীগ্রামের গল্প শুনে কি করবেন ?"

নীরা মাসীমার পানে চাহিল "শোনো মাসীমা, অমিয়-বাবুর কথা শোনো একবার, বলেন পল্লীগ্রামের কথা শুনে কি হবে ? জানেন না বোধ হয়—পল্লীই সহরের জীবন, পল্লীগ্রাম সহর-দেহের প্রাণ। প্রাণ না থাকলে দেহ নিশ্চল নিথর হয়ে থাকত। আচ্ছা অমিয়বাবু, আমার মনে হয় পল্লীগ্রামে আপনার জন্ম হয়েছে বলে আপনি তারি অনুতপ্ত হন। পল্লীগ্রামের সঙ্গে সকল সম্পর্ক উঠিয়ে দিয়ে পাকা সহরবাসী হতে পারলে আপনি নিশ্চয়ই খুব সুখী হন, না ? কিন্তু সত্যি বলছি অমিয়বাবু, আমি যদি কোনও পল্লী-গ্রামে জন্মাতুম, পল্লীর বুকে মানুষ হতুম, তাতে আমি কত সুখী হতুম, তা বলতে পারিনে। আপনারা একটু লেখাপড়া শিখলেই পল্লীগ্রাম নিজেদের বাসের অযোগ্য বলে মনে করেন, এ আমি শুধু আপনাকে নয়, সকলকেই বলছি। আপনি এতে কোন রাগ করবেন না যে আমি আপনাকেই অত কথা শুনিয়ে যাচ্ছি।"

অমিয় শুধু হাসিয়া বলিল "না, না, এতো সত্যি কথাই বলছেন আপনি। তবে কথাটা কি জানেন, সবটা আগাগোড়া না জেনেই আপনি শিক্ষিতদের দোষ দিচ্ছেন এটা একটু অন্যায় হচ্ছে বই কি। আপনি চোকে না দেখে পল্লীগ্রামের সুষমাময় একটী ছবি মনে এঁকেছেন। অবশ্য পল্লীগ্রাম যে অপূর্ব্ব সুষমাময় তা আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু তার সেই সুষমার মাঝে যে নরকের বীভৎস জেগে আছে, সেটা আপনি এখনও দূর হতে দেখতে পান নি। যদি কখনও যান দেখতে পাবেন, সেখানে খাওয়ার জলের কষ্ট, দলাদলি, রেষারেষি, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা। জঙ্গলে চারিদিক ভরে গেছে, তার পরে চৈত্র বৈশাখ মাসে নদীর জল শুকিয়ে আসে, সেই জল খাওয়া—তার পর—

"থামুন—থামুন"

অধৈর্য্যভাবে নীরা বলিয়া উঠিল "এই সব জন্যে যারা শিক্ষিত হয়েছেন তাঁরা দেশে থাকতে চান না ? জিজ্ঞাসা করি, শিক্ষিতদেরও মাতৃভূমির পরে একটা কর্ত্তব্য নেই কি ?"

থতমত খাইয়া অমিয় বলিল "হ্যাঁ, তা আছে বই কি।"

"ও রকম করে বলা নয় অমিয়বাবু, থতমত খেয়ে ঠোক গিলে মাথা চুলকিয়ে ওরকম বলা নয়। দেশে জঙ্গলের কথা বলছেন, দেশে লোক নেই কি ? এমন কেউ নেই যারা অশিক্ষিত—চাষা—"

অমিয় তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না, উত্তর দিল "হ্যাঁ, তা আছে বই কি।"

"আছে ! দেশে লোক আছে, তাদের গায় কি একটুও জোর নেই ? কোদাল, কুড়াল, ঘা, এসব তারা ধরতে পারে না কি ?

অমিয় বলিল "জোর আছে বই কি।"

শান্তভাবে নীরা বলিল "আছে ? দেখুন তাদের চালাবার বোধ হয় কেউ নেই, তাদের ঠিক বুঝিয়ে দিতে কেউ নেই, তাই তাদের গায়ে জোর থাকাতেও তারা চুপচাপ রয়েছে, যেন কিছুই হয়নি এমনি তাদের ভাবটা, কিন্তু প্রতি দেহেতে তারা যে জীবনিশক্তি হারাচ্ছে এটা তাদের জ্ঞান হচ্ছে না। দেশের শিক্ষিত ছেলে যারা তাদের কি উচিত নয় এই সব মরা দেহেতে জীবনী সঞ্চার করা, তাদের উপদেশ দিয়ে কার্য্যক্ষম করে তোলা ? যে দেশে মানুষ আছে, একটী ছেলেও যে দেশে শিক্ষিত হতে পেরেছে সে দেশে এ রকম জঙ্গল হওয়া, এ রকম জলকষ্ট—এ গুলোতে প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। শিক্ষা দেশের জন্যে, দেশের জন্যে। দেশের এ জলকষ্ট দূর করার ভার নিজের হাতে না নিলে উপায় কি ? সেদিন পড়ছিলুম একখানা কাগজে, লোকে বলছে গভর্ণমেণ্ট কিছুই দেখেন না—আমরা কি করে করি। কি আশ্চর্য্য কথা এটা ভাবুন দেখি ? আমাদের জীবনমরণও আমরা এমনি করে পরের হাতে তুলে দেছি ভাবতেও কি রকম হয়ে যাই ! গভর্ণমেণ্ট যদি প্রতিবিধান না করেন আমাদের দাঁড়িয়ে মরতে হবে এমন কোনই কথা নেই। এর প্রতিবিধান আমরা নিজেরাই কি করতে পারি নে ? দেশের শিক্ষিত ছেলে যে, সে সকলকে বলে নিজে উদ্যোগী হয়ে দেশের জনসাধারণের কাছ হতে চাঁদা তুলুক, ইঁদারা কাটাক, জলকষ্ট থাকবে না, ভাল পানীয়জল পাওয়া যাবে, সংক্রামক ব্যারামও দেশ হতে দূর হয়ে যাবে। আর বলছিলেন, দলাদলি, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা—এগুলো দূর করবার চেষ্টা কি দেশের জ্ঞানপ্রাপ্ত শিক্ষিত ছেলের নয় ? এতে যে সমাজের কতটা ক্ষতি হয়, দেশের

কতটা ক্ষতি হয়, এগুলো যদি তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তা হলে দেখতে পান গ্রামের দলাদলি পরনিন্দা পরচর্চ্চা ক্রমে দূর হয়ে যাবে। শিক্ষা শিক্ষিতের যথার্থরূপে ফুটবে এইখানে, এই দেশের কাজে, অন্য কোথাও নয়, তার পাঁচশো টাকা মাইনেতেও নয়।"

নীরা চুপ করিয়া গেল, কুমুদিনীর মাথার বালিশের নিচে হইতে বইখানা টানিয়া লইয়া বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

লজ্জিত অমিয় মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল, নিজের পক্ষ টানিয়া সে যে দুইটা কথা বলিবে এমন ক্ষমতা ইহার পর তাহার আর রহিল না।

তাহার বিবর্ণ মলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া কুমুদিনী ব্যথিত হইয়া উঠিলেন, "তুই যা বলছিস তা সত্যি নীরা, কিন্তু সে জন্যে আগাগোড়া অমিয়কেই দোষী করা অন্যায়। আর পাঁচজন যা করছে, সেও তাই করে যাচ্ছে মাত্র—"

আরক্তমুখে নীরা বলিল "অন্যায়। দশজন মরছে দেখে আমাকেও যে মরতে হবে সব জেনেশুনে—এমন কোনও কথা নেই। যতক্ষণ আমার জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে—জেনেশুনে মরা কিছুতেই হবে না।"

"কি সব কথা হচ্ছে—"

বলিতে বলিতে পরেশবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন, কুমুদিনীর পানে চাহিয়া সকৌতুকে বলিলেন "এই যে, গিন্নিও উঠে বসেছেন দেখছি। চোখে ঘুম নেই যে আজ বড়, ব্যাপারখানা কি?"

কুমুদিনী মুখ ভার করিয়া বলিলেন "দেখ, দিনরাত আমার ঘুমকে ওরকম করে খুঁড়ো না বলছি, তা হলে আমিও তোমার লেখাপড়াকে খুঁড়ব।"

উৎফুল্ল মুখে পরেশবাবু বলিলেন "সচ্ছন্দে, সচ্ছন্দে; তোমার যত খুসি তুমি খোঁড়, তাতে আমার ভাল বই মন্দ হবে না। তোমার ঘুমটাকে আমি মোটে সইতে পারিনে সে তো জানোই—"

বাধা দিয়া কুমুদিনী বলিলেন "আচ্ছা থাক, শোন অমিয়, শোন নীরা, কথা শোন একবার; সত্যি শুনে আমার হাড় পর্য্যন্ত জ্বলে যায়।"

"বাসরে সাতপুরু মোটা চামড়া, তারপর মাংস ভেদ করে পৌঁছায় গিয়ে হাড়ে, সত্যি যদি আমার কথা এমনি ধারালো হয়, অদৃষ্টের সৌভাগ্য বলতে হবে। নীরা, এই কাগজখানা রইল, পড়া হয়ে গেলে আমায় ফেরৎ দিয়ো।"

পাছে কুমুদিনী ঝগড়া বাধাইয়া বসেন, এই ভয়ে কাগজখানা নীরার কাছে ফেলিয়া দিয়াই তিনি সরিয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

অলক্ষিত

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

আড়াল হ'তে চরণ ধ্বনি কার
শ্রবণ-পথে প্রবেশে বার বার!
হঠাৎ বেজে ওঠে নূপুর
বহে অঙ্গ গন্ধ মধুর
শিখী চূড়ার চমক অনিবার!
বন ফুলের মালা গলে
তড়িৎ হেন ওঠে দুলে,
পীত বসন উড়িয়া চলে কার,
নয়ন ভরে স্বপন ঘোরে
কে যায় আসে বারে বারে,
চকিত করি পরশ লেগে তার
কাঁপিয়া ওঠে রুদ্ধ হৃদি দ্বার।

চয়ন

আর্থিক উন্নতিতে নারীর কার্য্য—

নারীদের মধ্যে স্বাধীনতার অভাব পাশ্চাত্য দেশেও ছিল। সেই জন্যই নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়ই প্রথম আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষই শুধু নারীদিগকে সম্পত্তির ও অন্যান্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখে নাই। তবে পাশ্চাত্য দেশ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নারীদিগের অবস্থা উন্নত করিয়াছে, আমরা তাহার চেষ্টাই করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমরা আধুনিক জগতের ৪০।৫০ বৎসর পশ্চাতে। নারীদের শিক্ষা ও কার্য্য বিষয়ে জার্ম্মানি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, আমি সেই কথাই বলিব।

জার্ম্মানির নারীগণ প্রধানতঃ চারি বিভাগে আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। (১) গৃহস্থালী (২) শিল্প (৩) বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম (৪) সমাজ-সেবা। প্রথমতঃ, গৃহস্থালীর সকল কার্য্য প্রাতে ৭টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত শিক্ষিতা মেয়েরা নিজে করেন। একজন জার্ম্মান গৃহিণী যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন, আমাদের বেশী পাঁচ জন মহিলা তাহা পারেন না। তাঁহাদের ঘর-করা—আমি যখন তখন যাইয়া দেখিয়াছি—কোথাও একটু বে-সিলিল নয়। তাঁহাদের রান্নাঘর যেন একটী লেবরেটরী! এইসকল গৃহকর্ম্ম-অভিজ্ঞ নারীগণ শিক্ষয়িত্রীর ব্যবসা করেন। ছাত্রাবাস ও বোর্ডিংসমূহে এইসকল পাকা শিক্ষিতা উচ্চ বেতনে পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। সকল স্বাস্থ্যনিবাসে তাঁহারাই প্রধান কর্ম্মকর্ত্রী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং-স্কুল তাঁহারা পরিচালনা করেন। এসকল শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য পরিবারের মধ্যে শিখিবার উপায় নাই। তজ্জন্য স্কুলে যাইতে হয়। জার্ম্মানিতে কিণ্ডারগার্টেন, ম্যাটুরিকুলেশন করিতে হইলেও পরীক্ষায় পাশ করিয়া সার্টিফিকেট লইতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, পোষাক তৈয়ারী, টুপী তৈয়ারী ও অন্যান্য নানাবিধ কাপড়ের শিল্পে মেয়েরা অনেক উপার্জ্জন করে। সুতীর কাপড় কিনিয়া মেয়েদের কাছে দিলে তাহারা খুব সস্তায় পোষাক তৈয়ারী করিয়া দেয়। টুপী তৈয়ারী খুব শক্ত কাজ। প্যারিসের মেয়েরা এ কার্য্যে সিদ্ধহস্ত।

তৃতীয়তঃ, বিজ্ঞানবিষয়ে মেয়েরা ডাক্তারের এসিষ্ট্যাণ্ট অর্থাৎ সহকারিণী। চিকিৎসালয়ের সমস্ত কাজই মহিলাগণ করেন। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে, এক্সিরিয়ারের আফিসে, বক্তৃতার কার্য্যে, খাদ্যপরীক্ষার কার্য্যে বহুসংখ্যক মহিলা নিযুক্ত আছেন।

চতুর্থতঃ, সমাজ-সেবার নানা কার্য্যে প্রধানতঃ রোগীর শুশ্রূষায় ও বীমা-বিভাগ প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীগণ বহু প্রকার কার্য্য করিতেছেন। সেখানে রোগীদের জন্য শুশ্রূষাকারিণী-বিভাগের বিশেষ কড়া পরীক্ষা আছে। আমাদের দেশের বি, এ, অথবা বি, এস্-সি'র সমান বিদ্যা না হইলে কেহ সমাজ-সেবার এই বিভাগে প্রবেশ করিতে পারেন না। ১৯১৪ সনের পূর্ব্বে জার্ম্মানিতে এই প্রকার সমাজ-সেবায় মহিলা-বিদ্যালয় ১০টী ছিল, এখন ৪০টী হইয়াছে। দুই তিন বৎসর কাল কোনো হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য-নিবাসে হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা না করিলে এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার কোনো নারী পায় না। এই বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া সার্টিফিকেট পাইলেও ২৫ বৎসর না হইলে কোনো নারী রোগী-শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্য করিতে পারে না। যিনি যে রোগের বিষয়ে বিশেষ সার্টিফিকেট পাইয়াছেন, তিনি সেই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরই শুশ্রূষা করিবেন। সেখানে এরূপ আইন-কানুন।

[১]—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের বক্তৃতা হইতে।

শাক—

আমরা সচরাচর যে সব শাক খাই তাহার গুণাগুণ দিয়ে লিখিত হইল—

কলমী (কল্মীশাক)—

ইহার গুণ—শুক্রবৃদ্ধিকর, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর, দুগ্ধকারক, স্নিগ্ধ, শীত ও গুরু।

আমাদের দেশে প্রসূতির শুক্রবৃদ্ধি জন্য কলমীর ঝোল করিয়া তাহাকে খাইতে দেওয়া হইত, কিন্তু আজকাল তাহার পরিবর্ত্তে বিলাতী ঔষধ-লিপি দেওয়া হইয়াছে। হিষ্টিরিয়া রোগীকে ও মস্তিষ্কবিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে কলমীশাক বিশেষ উপকারক। আজকাল হিষ্টিরিয়া রোগের অভাব নাই, কিন্তু কিন্তু কলমী শাক মিলে ভাল হয়। বসন্তরোগের প্রথমেই কলমীশাকের রস পান করিতে দিলে বসন্তের গুটিগুলি শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে, সুতরাং এইরোগের বিষ কাটিয়া যায়, প্রাণসংশয় হয় না। কলমীশাকের রস পান করিলে ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া যায়। তবে যাহাদের পায়ের ফোড়া, খোস বা পাঁচড়া হইতে পুঁজ পড়িতে থাকে তাহাদের পক্ষে কলমী শাক নিষিদ্ধ; কারণ ইহাতে পুঁজ আরও বেশীরূপ হয়, শীঘ্র শুখাইতে চায় না। কবিরাজগণ বলেন, আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত কলমীশাক ভোজনে নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে; সুতরাং ঐ সময়ে কলমীশাক ভোজন না করাই বিধেয়। বাসী কলমীশাক বিশেষ অপকারক, তজ্জন্য এই শাক টাট্‌কা তুলিয়া ভোজন করাই কর্ত্তব্য। একদিন কিনিয়া ৩।৪ দিন ধরিয়া ভোজন করা আদৌ উচিত নহে। উহাদের মতে কলমীশাক প্লীহা, রক্তপিত্ত ও অর্শরোগে বিশেষ উপকারক, এবং ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ—ত্রিদোষ বিনাশ করে। ইহার ডগা ছেঁচিয়া এক ছটাক মাত্রার রস পান করিলে পারা বিষ নষ্ট হয় ও উপদংশ বিষ বিদূরিত হয়।

পোতকী (পুঁইশাক)—

ইহা শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রেচনকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, কণ্ঠের অহিতকর, পিচ্ছিল, বিষ্টম্ভনাশক, গুরুপাকী, রক্তপিত্তনিবারক, বলকর, হৃদ্য, মূত্রল, পুষ্টিকারক ও তৃপ্তিজনক। ইহা কাশোদ্দীপক; সেজন্যই আমাদের দেশে ক্ষীণ বিষয়াগণের পক্ষে পুঁইশাক ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ।

পুঁইশাকের একটি শিকড় উত্তমরূপে বাটিয়া একপোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া সমস্তটা সেবন করিলে, পরে কাঁচা কলাইয়ের ডাল ভিজাইয়া ঐ ডাল চিনি দিয়া খাইলে মূত্রকৃচ্ছ্রীনতার বিশেষ উপকার হয়। অম্লপুলরোগীর পক্ষে ইহা একেবারে নিষিদ্ধ।

পালঙ্যা (পালঙ্‌শাক)—

আর একপ্রকার পালঙ্‌শাক আছে তাহার নাম চুকা বা চুকা পালঙ্। এতদুভয়ের গুণও বিভিন্নপ্রকার। পালঙ্‌শাক বাতজনক, শীতবীর্য্য, রেচনকর, ভেদক, শুক্র বিষ্টম্ভী এবং মন্দরোগ, শ্রম, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নষ্ট করে। চুকা পালঙ্ মধুর, অতিশয় অম্লরস, বাতঘ্ন, কফ ও পিত্তকারক, হৃদ্য ও লঘুপাক। বিশেষতঃ বেগুনের সহিত পাক করিলে বিশেষ হৃদ্য হয়।

হিলমোচিকা (হিঞ্চেশাক)—

ইহা সেবনে—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত নাশ করে। বঙ্গদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে হয়, বাজিগরেরা বড়ই ভালবাসে। ইহা পুরাতন পুষ্করিণী কিম্বা জলাশয় ভূমিতে জন্মিয়া থাকে।

কিকালাচের রস, সমুদ্রফেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখিলে গাত্রের দুর্গন্ধ সব নষ্ট হয়। সূক্ষ্ম মেহচূর্ণসহ সহ কিকাশাকের রস পান করিলে বসন্তের গুটি বাহির হইয়া পড়ে। সেজন্য বসন্তরোগের প্রারম্ভে সেবনীয়। ইহা মূত্রজনক, চর্ম্মবিকার এবং nerve (স্নায়ু) পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

বাস্তুকং (বেতোশাক)—

ইহার গুণ :—বেতোশাক (শ্বেত ও রক্তবর্ণ) মধুররস, অম্লমূত্র, কটুবিপাক, অগ্নিদীপক, পাচক, হৃদ্য, লঘু, শুক্র ও বলকারক, সারক এবং প্লীহা, রক্তপিত্ত, অর্শ, কিমি ও বিষের নাশক। বৈদ্যকশাস্ত্রের মতে শাকের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাই ইহার অপর নাম শাকরাজ বা শাকশ্রেষ্ঠ।

রোচনী (পুদিনা)—

ইহা অগ্নিদীপক, মুখের জড়তা নাশ করে, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকারক এবং অরুচি নিবারক।

পুদিনা তিন প্রকার যথা, পার্ব্বতীয় ও বালুজ। ইহা বিষ ও বমন নিবারণ করে। এই পাতার আপয়ায় জ্বর ও তজ্জন্য কফ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

শিখী (সুষুনী)—

ইহা সকল প্রদেশে বকচরে বা জলাশয়ধারে উৎপন্ন হয়। ইহার চারিটী কলিকা ফল থাকে, তাই ইহাকে চতুষ্পত্রী বলে।

ইহা শীতবীর্য্য, বলপ্রদায়ক, অবিদাহী, লঘু, কষায়, মধুররস, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, বীর্য্যকর, হৃদ্যগন্ধ, রেচনজনক, রসায়ন ও বিষনাশক। বৈদ্যকগণ বলেন, ইহা শ্লেষ্মরোগ, জ্বর, শ্বাস, শ্লেষ্ম, মুখ মধু, দাহ ও বিষদোষ নাশক। ইহার পত্র ও বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

চরকের মতে—বাত-শ্বাস-রোগীকে সুষুনী শাক ভোজনার্থ দেওয়া কর্ত্তব্য। বিষদোষে ইহা বিশেষ উপকারক পথ্য। সুষুনী শাক, তিল তৈল ও লবণসহ পাক করিয়া দিবা সময়ে ভোজন করিলে উত্তমরূপ আরোগ্য হয়। ইহার বীজ ঘোলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ঘোলসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

সুশ্রুতের মতে—সুষুনী শাক ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া ভোজন করিলে রক্তপিত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

আমাদের দেশে সুষুনী শাক বিষনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং উন্মাদাদি রোগে ইহা পথ্য স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

তণ্ডুলেকঃ (নটে শাক)—

নটেশাক লঘু, শীতবীর্য্য, হৃদ্য, বলমূত্রপ্রবর্ত্তক, রুচিকর, অগ্নিদীপক। ইহা পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি, এবং বিষনাশক বলিয়া ইহার নাম বিষঘ্ন।

চণক (ছোলা শাক)—

ছোলা শাক রুচিপ্রদ, দুষ্পাচ্য, কফবাতবর্দ্ধক, অম্লরস ও বিষ্টম্ভী। অম্লরস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পিপাসা, দাহ, ভ্রম (ঘুরপোরোগ) নেত্ররোগ, জ্বর, শোথ ও কুষ্ঠরোগ জন্মে। কিন্তু শাকাদির অম্ল অল্প পরিমাণে উপকারও আছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা পাচক, রুচিজনক, লঘুলেখন (অর্থাৎ শিরস্থিত শ্লেষ্মাকে টানিয়া তুলিয়া দেয়), উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, শীতবীর্য্য ও রক্তের উপকারক। ইহা পিত্ত দমন করে এবং রক্তশোধ-নিবারক।

পটোলপত্রং (পল্‌তা)—

ইহা পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, শুক্রকর, উষ্ণবীর্য্য এবং আহার ও শিরোরোগনাশক। ভাবপ্রকাশ মতে পিত্ত বা বসন্তরোগে প্রথমই পটোল মূলের ক্বাথ পান করাইবে, এবং আরোগ্য হইলে পল্‌তার রস দিবে। পিত্তজ্বরে পল্‌তা ও যবের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া দিবে।

যাবনী (যোয়ান শাক)—

যোয়ানশাক অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকর ও কফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্তরস, অধুপিত্তবৃদ্ধিকর ও মূলরসক। যাহারা বায়ু ও কফরোগে কষ্ট পাইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে যেমন উপকারক, তেমনি যাঁহারা পিত্ত বা মূলব্যাধিতে কষ্ট পান, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ অপকারক। তবে

ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর বলিয়া হজম শক্তিকে বিশেষ সাহায্য করে, এবং ইহা সেবনে অন্ত্রকৃমিও দূর হয়। আমাদের দেশে বড় একটা ঘরোয়া-শাকের ব্যবহার নাই। কেবলমাত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

মূলপত্রকং (মূলা শাক)—

ইহার পত্র শাকরূপে ভোজন করে। মূলা রন্ধনে ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার পুষ্প ও বীজ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। মূলার নূতন পত্র পাচক, লঘু, রুচিকর ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা তৈলাদি সহ সম্যক্ পাক করা হইলে ত্রিদোষ নাশ করে। কিন্তু সিদ্ধ না করিয়া ভোজনে কফপিত্ত বৃদ্ধি করে।

চরকের মতে অর্শরোগে শুষ্ক মূলকের যূষ কিম্বা ছাগ মাংসের যূষ সহ শুষ্ক মূলকের যূষ সেবনে অর্শ আরোগ্য হয়। শোথে মূলক বিশেষ উপকারী—শুষ্ক মূলকের ক্বাথ শোথে ব্যবহার করিবে। শুষ্ক মূলকের যূষ হিক্কা নিবারণ করে। বাত বা কাসে—মূলক বিশেষ উপকারী। মূলকের ক্ষীরযুক্ত ৯ম কর্ণপূরে দিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়। মূলকের বীজ অশ্বাবর্ত্তের রূপ পেষণ করিয়া নস্যরূপে দিলে মূর্চ্ছা আরোগ্য হয়।

কলাই (কলাইশাক)—

কলাইশাক—ছেদক, লঘু, ভিক্ত ও ত্রিদোষ-নাশক। ইহা ভোজন করিলে কফ, পিত্ত, বায়ু সকল প্রকার রোগের বিশেষ উপকার হয়। তজ্জন্যই আমাদের দেশে কলাইশাক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত আছে। ইহা ক্ষুধা, মূর্চ্ছা, কফপিত্তজ্বিষি-দাহ ও রক্তপ্রকোপ-জনিত পীড়া সকল নাশ করে। বস্তি কিম্বা বায়ু দ্বারা স্ফীতীকৃত (অর্থাৎ ফুটলে) বলকে আগ্নিতে অবপাতিত করে।

পট্টশাক (নালতে)—

ইহা শ্লেষ্মপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী ও বাতপ্রকোপক। আমাদের দেশে সচরাচর নালতে শাকে শুক্তানি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাতে পিত্ত দোষ হ্রাস করে এবং অন্যান্য দ্রব্যে রুচিকর করিয়া থাকে। তজ্জন্যই অন্যান্য ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে শুক্তা ভোজন করা বিধেয় আছে।

আজকাল বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষা ও বহু গবেষণার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মাছ মাংস খাও, ডিম খাও, আণ্ডাসিদ্ধ বা ভর্জ্জিত খাও, অথবা আপেল বেদানা প্রভৃতি অতি উত্তম উত্তম উপাদেয় দ্রব্য খাও—তাহাতে দেহের পুষ্টি হইবে, অথবা রসনার তৃপ্তি সাধন হইবে বটে, কিন্তু উক্ত দ্রব্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ পরিমাণে শাক-সব্জী ভোজন করা অতি প্রয়োজনীয়। কারণ শরীর নীরোগ রাখিতে হইলে শাক-সব্জী-আহার অনিবার্য্য।

বৈদ্যগণের মতে—বায়ুপিত্ত হইয়া শিরোপীড়ায় উপশমন হইতে হইলে ঘৃতপক্ক শাক, ঝোলশাক ও কলাইশাক ব্যবহার দরকার। পুঁইশাকও বায়ু নাশ করে। অন্যদিকে পুঁইশাক ভোজনে অম্লপিত্ত বৃদ্ধি পায়, সুতরাং অম্লপিত্ত রোগীর পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ। ঝোলশাক—বায়ু, পিত্ত ও কফ ত্রিদোষ নাশ করে; সুতরাং ঝোলশাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পুঁইশাক কফ ও বায়ু বিনাশ করে। ওলকপিশাক বায়ুনাশক।

ঠিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া কবিরাজগণ পিত্ত ও কফাদি উপশমের জন্য অনেকগুলি শাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যেমন—কলমীশাক মেধা বৃদ্ধি করে; সুতরাং সর্দ্দি প্রভৃতি হইলে কলমীশাক ভোজন করিবে না। পোতকী (পুঁইশাক) মেধাকর। পালঙ্কা (পালঙ্গশাক)—মেধা বৃদ্ধি করে, কিন্তু পিত্তকারক। বিকেশাক শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত নাশ করে। পুদিনাশাক—কফ বিনাশন করে। ঘৃতভর্জ্জিত শুষ্ক শাক—রক্তপিত্ত রোগে ঘৃতে ভাজিয়া ভোজন করিবে। শালিঞ্চে—কফ ও বাতনাশক। বটে শাক—পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশ করে। ছোলা শাক—পিত্ত দমন করে; পলতা শাকও উত্তম।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমত চিকিৎসা করিয়া আমাদের বৈদ্যকগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বায়ু পিত্ত ও কফাদি দমনাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নানাপ্রকার শাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ফল প্রত্যক্ষ। সুতরাং উপহাস করিবার বিষয় নহে। সকল শাকই প্রত্যহ ব্যবহার করিবে।

—গন্ধবণিক।

চুনি পান্না—

বাক্যের আর বায়ুর যেমনি, গতির আর জ্যোতিষ তেমনি ভাষা।

—শেলি (প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি)

সুখের নাটক আসুক, তাতক্ষণ প্রহসনটাই শেষ ক'রে নাও।

—ডলটেয়ার (বিখ্যাত ফরাসী লেখক)

যে মিনিটে মন দেওয়া সোজা, তখে সব সময় ঠিক কাজ ক'রে ফেলা সোজা নয়। —ডিজরেলী (ইহুদী মন্ত্রিপ্রবর ও রাজনৈতিক)

জীবন ভাবো বা মেঘ, জীবনটা তাই ও গড়ে উঠ্‌বে।

—এমার্সন (প্রসিদ্ধ আমেরিকান প্রবন্ধ লেখক)

অন্ধের অন্ধো জানী কে? অন্ধের দর্পিনী রূপসী বালা।

—নাথী (পারসিক ভক্ত কবি)

প্রত্যেকে যদি নিজের কাছটা সাফ রাখে তবে পৃথিবী হয়ে যায় সাফ।

—রেমন্ডলেন (প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক)

ঈশ্বরের কাছে সহস্র পাপ ঘুচে যায় ক্ষমার পুণ্যে। মানুষের কাছে তেমনি সহস্র অপরাধ ঘুচে যায় বিনতায়। —ইরোক্ষো

যা চাও তা যদি না পাও, যা পাও তাই নিয়েই খুসী থাক।

—টেরেন্স)

বোকামী করেছ স্বীকার করতে লজ্জা কি? বোকামীর খরচ যদি না দিতে পার তবেই বড় লজ্জার কথা। —হোরেস (গ্রীক কবি)

যে ফুল খোঁজে সে ফুলই পাবে, যে ঘাস খোঁজে সে পাবে ঘাসই।
—ঈশপ

একাই যদি থাক, আসলে হবে না, যদি আসলে হও তবে একা থেকো না। —এমারসন (ইংরাজ কবি ও লেখক)

যার সততার লড়াই হয় তরবারিরে তিরস্কার যায়।
—সেক্সপিয়র (ইংরাজ মহাকবি)

যদি ছেড়া টাকা যদি ময়লা হয়ে যায় তবে সেখান থেকে আর চুরী যাবে না। —ফ্রাঙ্কলিন (বিখ্যাত আমেরিকান প্রবন্ধ লেখক)

বর্ত্তমান হ'ল অতীতের জীবন্ত সমষ্টি।
—কার্লাইল (ইংরাজ কবি ও লেখক)

জলদি কর, যদি বাঁচতে চাও। প্রত্যহ মনে কর নতুন জীবন।
—সেনেকা (প্রাচীন রোমীয় দার্শনিক)

দুর্ব্বল মন যেন অণুবীক্ষণ যন্ত্র, ছোট ছোট জিনিষকে বড় ক'রে দেখায়, কিন্তু বড় জিনিষ দেখতেই পায় না।
—চেষ্টার ফিল্ড (ইংরাজ লেখক)

শিল্পীর কৌশল যেই ধরে ফেলুলে, অমনি শিল্পের যাদু গেল ভেঙ্গে।
—বেকলে (ইংরাজ ঐতিহাসিক)
—বিজলী।

কুটীর শিল্প

শ্রী নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বর্ত্তমান অন্নসমস্যার যুগে মেয়েরাও সংসারের আবশ্যকীয় গৃহকার্য্যাদি সমাপনান্তে অবসর সময়ে সামান্য সামান্য কুটীর শিল্পের দ্বারা গৃহস্থের অনেক সাহায্য করিতে পারেন। ইহাতে একদিকে যেমন অর্থরক্ষা হয়, অন্যদিকে বেশ আমোদও পাওয়া যায়। নিম্নে অবসর-সময়ে করিবার উপযোগী কয়েকটি কুটীর শিল্পের বিষয় লিখিত হইল।

(ক) চরকায় সূতা কাটা :—

অবসর মত দৈনিক তিন-চার ঘণ্টা সূতা কাটিলে এক জন লোক বৎসরে প্রায় একটি সাধারণ গৃহস্থের আবশ্যক মত কাপড়ের উপযোগী সূতা কাটিতে পারেন। তুলা কিনিয়া সূতা কাটা অপেক্ষা বাড়ীতে কয়েকটি কার্পাস বৃক্ষ রোপণ করিয়া লইলে বিনামূল্যে তুলা সংগ্রহ হইতে পারে। ঐ তুলায় সূতা করিয়া অল্প কিছু মজুরী খরচ করিলে মোটামুটি ব্যবহারোপযোগী কাপড় তৈরী হইতে পারে।

(খ) তুলি সূতার কল :—

একটি সাধারণ কলের মূল্য ৩৫৲ টাকা। কলিকাতায় এই কল পাওয়া যায়। সূতা কিনিয়া অবসর মত ৩।৪ ঘণ্টা বড় বা ছোট গুলি করিলে মাসিক একটি লোক ১০।১৫৲ টাকা সহজেই আয় করিতে পারেন।

(গ) রঞ্জন শিল্প :—

যাঁহারা রঙিন বস্ত্র পরিধান করেন তাঁহাদের পক্ষে নিজেদের আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি নিজেরাই রঙ করিয়া লইলে অনেক কম খরচে হয়। সহজ গোলাপী রঙ প্রস্তুত প্রণালী এখানে লিপিবদ্ধ হইল। দুইটি মাটীর হাড়ী লইয়া একটিতে মধাই খয়ের চার তোলা এক সের জল দিয়া এবং অন্যটিতে বিলাতী সোডা ২৸০ তোলা এক সের জল দিয়া ভিজাইতে হইবে। সাত-আট ঘণ্টা পরে খয়ের মিশ্রিত জল নিচের ময়লা বাদ দিয়া অন্য পাত্রে ঢালিবেন এবং কাপড় ঐ জলে কয়েক মিনিট ভালরূপ ভিজাইয়া নিঙরাইয়া লইবেন। অতঃপর ঐরূপে সোডার জলেরও নিচেকার ময়লা বাদ দিয়া ঐ জলে কাপড় খানি পূর্ব্ববৎ কিছুক্ষণ ভিজাইয়া নিঙরাইয়া লইবেন। এইবার কাপড় ছায়ায় শুকাইয়া লইলেই সুন্দর গোলাপী রঙের বস্ত্র হইবে।

(ঘ) সাবান :—

আজকাল ধনীদরিদ্র প্রতি ঘরেই সাবানের দরকার। নিজ নিজ সংসারের আবশ্যকীয় সাবান নিজেরাই তৈরী

করিয়া লইলে সংসারের অনেক উপকার ও অর্থ রক্ষা হয়। নিম্নে দুই প্রকার সাবান-প্রস্তুত-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইল, ইহার সাহায্যে অনেকেই আবশ্যকীয় সাবান প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন।

সাবান প্রস্তুত করিতে নানাবিধ তৈল, চর্ব্বি এবং কষ্টিক সোডা আবশ্যক হয়। সাবান তৈয়ার জন্য নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদিও দরকার :—

১। সাবানের ছাঁচ—(একখানি চৌকা কাঠের সহিত সম উচ্চ চারখানি কাঠ কব্জা দ্বারা জুড়িয়া লইতে হইবে। ইহার চার কোণে চারটি হুক থাকিবে)

২। বড় কড়াই—(তৈলের সহিত সোডা মিশ্রিত জল মিশাইবার জন্য)

৩। কাঠের তাড়ু—(নাড়িবার জন্য)

৪। টিন বা মাটীর পাত্র— কষ্টিক সোডা ভিজাইবার জন্য)

৫। ষ্টিলের তার —(সাবান কাটিবার জন্য)

গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুত :—

কষ্টিক সোডা ২৮° ডিগ্রি...১ ভাগ	
জল ...	১৬ ভাগ
নারিকেল তৈল	২৫ ভাগ

একটি মাটীর বা টিনের পাত্রে জল লইয়া তাহাতে কষ্টিক সোডা মিশাইবেন (ইহা মিশাইলে গরম হয়)। যতক্ষণ না কষ্টিক সোডা গলিয়া জল ঠাণ্ডা হয় ততক্ষণ মাঝে মাঝে একখানা টিনের হাতা দ্বারা নাড়িবেন। সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হইলে একটি কড়াতে তৈল লইয়া তাহাতে উক্ত সোডা মিশ্রিত জল ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া ঢালিয়া কাঠের তাড়ু দ্বারা নাড়িয়া নাড়িয়া মিশাইতে হইবে। সম্পূর্ণ সোডার জল তৈলের সহিত মিশান হইলে দেখিবেন উহা মধুর ন্যায় গাঢ় হইয়া আসিবে। মধুর ন্যায় গাঢ় হইলে উহা ছাঁচে ঢালিবেন। ছাঁচে ঢালিবার পূর্ব্বে ছাঁচ ভাল করিয়া ধুইয়া লওয়া দরকার। অতঃপর ছাঁচের উপর একখানা পুরাতন কম্বল চাপা দিবেন। ২৪ ঘণ্টা চাপা দিয়া রাখিবার পর ছাঁচের হুক খুলিয়া আলগা করিয়া সাবান কাটিয়া লইবেন। রঙ করিতে হইলে সামান্য গোলাপী বা কমলা রঙ একটু গরম জলে গুলিয়া সোডার জল মিশাইবার পূর্ব্বে নাড়িয়া নাড়িয়া তৈলে মিশাইয়া লইবেন। সুগন্ধি করিতে হইলে অয়েল মিটোনিলা, অয়েল নিরোলী, অয়েল ক্লোভস্ প্রভৃতি সুগন্ধি তৈল, সাবান যখন মধুর ন্যায় হইবে তখন নাড়িয়া নাড়িয়া মিশাইয়া লইবেন।

কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত :—

কষ্টিক সোডা ১০—১২° ডিগ্রি...২ সের	
জল	...৩ সের
চাল মরদা ...	...৩ সের
ময়দা গুলিবার জল ...	...২ সের
নারিকেল তৈল ...	...৩ সের

প্রথমে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কষ্টিক সোডার জল করিবেন। ময়দা জলে গুলিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া তৈলের সহিত মিশাইয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সোডার জল ক্রমে ক্রমে মিশাইবেন। সাবান শক্ত হইয়া আসিলে তাড়াতাড়ি কাঠের বা লোহার হাতায় করিয়া ছাঁচে ঢালিবেন। শক্ত হইলে ছাঁচের কোণের হুক খুলিয়া আলগা করিয়া আবশ্যক সাইজ মত কাটিয়া লইবেন। এই প্রণালীতে অল্প মূল্যের অথচ বেশ ভাল কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত হইবে।

সিংহল দ্বীপ বা লঙ্কা

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

রামায়ণের বর্ণিত লঙ্কার বর্ত্তমান নাম সিংহল দ্বীপ, সুতরাং লঙ্কা নামটি স্মরণ হইবা মাত্রই সেই স্বর্ণলঙ্কা, সেই প্রবল পরাক্রান্ত রাজা দশানন, সেই রাক্ষসপুরী প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণকে সেই সকল বিষয় জানিবার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অতি অল্পই সমর্থ হইব। লঙ্কার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নিজ চক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি।

ইতিহাসে জানা যায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার সিংহবাহু রাজার পুত্র বিজয় সিংহ নিজের জাহাজে সৈন্যগণ সহ লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হইয়া সেখানকার অধিবাসী দিগকে বশীভূত করিয়া নিজের নাম অনুসারে ঐ স্থানের নাম সিংহল রাখেন। প্রাচীন ইতিহাসে বাঙ্গলার পক্ষে ইহা একটি গৌরবের বিষয় ছিল। ইহার দেড় হাজার বৎসর পরে ক্রমে পোর্টুগিজ ও দিনেমারদিগের অধীনে কয়েক শতাব্দী থাকিয়া প্রায় একশত বৎসর হইল ইহা ইংরেজের অধীন হইয়াছে। ইহা আমাদের কলিকাতা হইতে বারোশত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে জাহাজে যাওয়া যায়। বর্ত্তমানে রেল পথে যাওয়াই সুবিধা। মাদ্রাজ হইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ধনুষ্কোট বন্দর পর্য্যন্ত ট্রেনে গিয়া জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া যাইতে হয়।

সিংহল আমাদের বাঙ্গলার মতই নদীবহুলপূর্ণ দেশ। কোন কোন স্থান পাহাড় ও জঙ্গলময়। মানুষগুলি রামায়ণের বর্ণিত রাক্ষস-প্রকৃতির নয়, ঠিক আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন। গায়ের বর্ণ বাঙ্গালী অপেক্ষা ঈষৎ কৃষ্ণ বর্ণ। এখানে দুই রকমের ভাষা প্রচলিত—সিংহলী এবং তামিল। ভারতবর্ষের মাদ্রাজ ও তিনেভেলি অঞ্চল হইতে বহুলোক গিয়া সিংহলে অনেক দিন বসবাস করিয়া তাহাদিগকে তামিল ভাষা শিখাইয়াছে।

সিংহল বাসীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয়দিগের অধীনতায় বাস করিয়া অনেকে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গিয়াছে। এখানকার অধিবাসীদের পরিচ্ছদ অতি সাদাসিদা ধরণের। পুরুষেরা সকলেই লুঙ্গি পরা, গায়ে চাদর বা ঢিলে খাটো জামা। মেয়েদের পরণেও এক প্রকার লুঙ্গি, গায়ে আঁটা-সাঁটা জ্যাকেট। পুরুষদের লুঙ্গির নাম সারেঙ্গা আর মেয়েদের লুঙ্গির নাম ক্যাম্বয়। বাঙ্গলার পরিচ্ছদ অপেক্ষা সিংহলের পরিচ্ছদ অনুন্নত ধরনের হইলেও কাজ কর্ম্ম করিবার পক্ষে ইহা বাঙ্গলার পোষাক অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। এখানে আহারে জাতিভেদ একেবারেই নাই। অধিবাসীদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিন্ন অনেক মুসলমান, এবং খৃষ্টিয়ান আছে; আহারাদির স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য জ্ঞান কেহই করে না। সকলেই সকলের ছোঁয়া অন্ন জল গ্রহণ করে। ভাত ডাল রুটি খাদ্যাদি প্রায়ই বাঙ্গলার মত, তবে অত্যধিক ঝাল খায়। শুটকী মাছের প্রচলন অত্যন্ত বেশী। শুটকী চূর্ণ করিয়া এক প্রকার মসলা প্রস্তুত করিয়া খায়। রান্নায় নারিকেল তৈল গায়ে মাখিতেও নারিকেল তৈল ব্যবহার করে।

সিংহল অত্যন্ত গরম দেশ; চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ তিন মাস ভীষণ গরম পড়ে।

সিংহলের সমুদ্র তীরবর্ত্তী সমতল ভূমি গুলি নারিকেল বৃক্ষে পূর্ণ। অনেক মসলা এখানে উৎপন্ন হয়। বহু হস্তী জঙ্গলে বাস করে। নিম্ন জমিতে ধান্য এবং উচ্চ পাহাড়িয়া জমিগুলিতে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কয়েকটি পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে মূল্যবান অহরৎ প্রস্তর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্যবর্ত্তী মান্নার উপসাগর হইতে প্রচুর পরিমানে মুক্তা পাওয়া যায়। এখানে খনিতে কিছু কিছু স্বর্ণও পাওয়া যায়। রামায়ণে যে ইহাকে স্বর্ণ লঙ্কা বলা হইয়াছে—সে বোধ হয় তখনকার লঙ্কার ঐশ্বর্য্যের হিসাবে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশ যেমন ইংরেজ রাজত্বের একান্ত পক্ষপাতী ছিল, সিংহলবাসীরা ও তদ্রূপ ইংরেজ ভক্ত ছিল। বর্ত্তমানে ইহারা বড় বড় সভাসমিতি গঠন করিয়া স্বাতন্ত্র্য শক্তি বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এখানে সাধারণ কথা বার্ত্তা বলিবার মত ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন বাংলা দেশ অপেক্ষাও বেশী।

এখানকার এক শ্রেণীর বৃদ্ধেরা দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু-ধারী। দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের ন্যাপা বাউলদের মত। যুবকদের বেশ মাদ্রাজীদের মত। যদিও এই দেশটি খুব বড় নহে, তথাপি ধনশালীর সংখ্যা বাঙ্গলা অপেক্ষা বেশী। বাঙ্গলার ন্যায় বিলাসিতা সিংহলী যুবকদের মধ্যে দেখা দিয়াছে।

সিংহল দ্বীপটি বৃটিশগবর্ণমেণ্টের ক্রাউন-কলোনির অন্তর্গত একটি দ্বীপ। ইহার পরিমাণ ২৫৩৮১ বর্গমাইল। জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ মাত্র। বাঙ্গলার অনুপাতে শিক্ষিত ধনীর সংখ্যা বেশী। এখানকার টাকা আমাদের দেশের টাকার মূল্যের তুল্য, কিন্তু পয়সা অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম মূল্যের। পয়সার নাম সেণ্ট (Cent), একশত সেণ্টে এক টাকা হয়। দশ সেণ্ট, পচিশ সেণ্ট, পঞ্চাশ সেণ্ট মূল্যের রৌপ্য মুদ্রাগুলি যথাক্রমে আমাদের দুআনি সিকি আধুলির তুল্য। সেণ্ট নামক তামার পয়সাগুলির উপর দেশের প্রধান উৎপন্নের চিহ্নস্বরূপ নারিকেল বৃক্ষ অঙ্কিত আছে।

এখানকার বনে জঙ্গলে দলে দলে হাতী বিচরণ করিতে দেখা যায়। কোন কোন স্থানে হিংস্র জন্তু ও সর্পের প্রাদুর্ভাব আছে।

আমি সিংহলের অনেক পল্লী ভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধ বাস ভবন দর্শন করিয়াছি। মহিলাদের রীতি নীতি যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বাংলার সহিত তুলনা করিয়া তাহাদিগকে উন্নত বলিতে পারা যায়। ইহারা বড় স্বাবলম্বনপ্রিয়। কলম্বোতে মেয়েদের হাতের প্রস্তুত সূক্ষ্মশিল্পের বস্ত্র, লেশ প্রভৃতি দ্রব্য ইংরেজেরা অত্যন্ত আদরে কিনিয়া থাকে। মেয়েদের কেশ কৃষ্ণবর্ণ। আমি একটি মেয়ের চুল দণ্ডায়মান অবস্থায় হাটুর নিচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। সম্ভবতঃ প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ নারিকেলতৈল ব্যবহারেই সিংহলমহিলারা দীর্ঘকেশী হইয়া থাকেন।

সিংহলী রমণীরা বেশীভাগেই লেখাপড়া জানেন, নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরাও লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। অনেক বাড়ীতে দাসী বা ঝী-রা পর্য্যন্ত লেখাপড়া জানে বাঙ্গলার মত নারী অবরোধ প্রথা এখানে নাই। মেয়েরা কুটির শিল্প সম্বন্ধীয় অনেক কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম সেলাই, জরির কাজ, অনেক মহিলা জানেন। ডুযারা বলিয়া চমৎকার লতা-ফুলের সুতার কাজ করা এক প্রকার বস্ত্র মেয়েদের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। খড়ের প্রস্তুত টুপী বড় সুন্দর করিয়া থাকে।

নারিকেল তৈল বিদেশে রপ্তানি করিয়া সিংহলবাসীরা অনেকেই বহু অর্থশালী হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্যে নারীরাই বেশী সাহায্য করিয়া থাকেন। তৈল প্রস্তুত ব্যতীত নারিকেল সম্বন্ধীয় আরও অনেক কাজ আছে, তাহাও মেয়েরা করেন।

প্রতি পূর্ণিমা দিবসে বৌদ্ধ মহিলারা পানশিল বলিয়া এক প্রকার ব্রত করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ দিন পবিত্র শুভ্র বস্ত্র পরিধান করেন, এবং সমস্ত দিবস উপবাস থাকিয়া বুদ্ধের ধ্যান করিয়া থাকেন। বৌদ্ধনারী জীবিত মৎস্য মারে না, ডিম ভাজে না।

সিংহলের ইংরাজী নাম সিলোন (Ceylon), রাজধানীর নাম কলম্বো (Colombo); কলম্বো একটি উল্লেখযোগ্য সামুদ্রিক বন্দর। ইংরাজের তত্ত্বাবধানে কলম্বো বন্দরটি অতি রমণীয় রূপে গঠিত হইয়াছে। বহুদেশ বিদেশের জাহাজ কলম্বো বন্দরে আসিয়া থাকে।

কলম্বো সহরটি বিলাতের বড় বড় সহরের মত সুন্দর করিয়া গঠিত। এখানে বহু ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর সুন্দর সুসজ্জিত দোকান আছে। সহরটি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গতিবিধির জন্য ট্রামওয়ে আছে। সহরটিতে এতই বিভিন্ন দেশীয় লোকের গতিবিধি যে এখানকার বিক্রয়ব্যবসায়ীরা অনেকে ইউরোপের তিন চারিটি ভাষা এবং ভারতবর্ষের তিন চারিটি ভাষায় কথা বলিতে পারে। কলম্বো সহরে অনেক ভাল ভাল মণি মুক্তার দোকান আছে। ঐ সমস্ত জিনিস আমাদের দেশে আনিতে Custom-duty অর্থাৎ বাণিজ্য

শুল্ক দিতে হয়। আমি আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের জন্য ঐ সকল মনিকারদের কয়েকটি কারবারে সহিত যোগাযোগের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলাম।

কলম্বোর সমুদ্রতীরটি বড়ই সুন্দর, যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তেমনই আবার ইংরেজের কৃত কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের প্রভাব। ইউরোপের অনেক সৌন্দর্য্যময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরের সহিত তুলনায় ইহার সৌন্দর্য্য কম নয়। এখানকার সিনামন গার্ডেন উল্লেখ যোগ্য দর্শনীয়। সিনামন গার্ডেন এর মানে দারুচিনির উদ্যান হইলেও উদ্যানটি নানা জাতীয় বৃক্ষ পূর্ণ। জানিয়াছি এই সিনামন গার্ডেনের ভিক্টোরিয়া পার্কের মত নানা জাতীয় সুদৃশ্য বৃক্ষাদি পূর্ণ উদ্যান নাকি সমগ্র এসিয়া ভূখণ্ডে আর নাই।

দারুচিনি, বৃক্ষের ছালমাত্র। উদ্যানের দারুচিনি বৃক্ষ গুলি বহু পুরাতন হইয়া যাওয়ায় উহার ছালে বিশেষ সুগন্ধ থাকে না। আমরা যে দারুচিনি ব্যবহার করি, তথায় উহার পৃথক আবাদ আছে। গাছ পাচ ছয় ফিট দীর্ঘ হইলেই গাছগুলি হইতে ছাল বাহির করা হয়।

কলম্বো যাদুঘরে যে সকল প্রাচীনকালের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে আমাদের হিন্দু দেবতা গণেশ-মূর্ত্তি দেখিয়াছি, ইহাতে মনে হয় রামায়ণের যুগের পর হইতে সিংহলে শক্তি পূজক হিন্দুরাজা ছিল; মহারাজ অশোকের পর হইতে তৎপুত্র মহেন্দ্র কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।

কাণ্ডী সিংহলের একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। এই সহরটি সিংহলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত; ইহা পরম রমণীয় পর্ব্বত মালায় পূর্ণ। হিন্দু ও বৌদ্ধরাজত্বে ইহা সিংহলের রাজধানী ছিল। বহুবিদেশী পর্য্যটক এই স্থানটি দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। কাণ্ডীতে বুদ্ধদেবের বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে ভারতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। এই সময় বহু বুদ্ধ-ভক্ত ভারতের বাহিরে সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করেন। শ্রাবস্তীর রাজকন্যা হেমমালা বুদ্ধেরপরম ভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাঁহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইলে তিনি বুদ্ধের একটি দন্ত বীয় কবরী মধ্যে লুকাইয়া সিংহলে পলায়ন করেন। বুদ্ধের এই দন্ত কাণ্ডীর মন্দিরে স্বর্ণ পাত্রে রক্ষিত আছে; এজন্য ইহার নাম দন্তমন্দির। এই দন্ত মন্দিরটি সিংহলের স্থাপত্য বিদ্যার চমৎকার নিদর্শন। ১৯২৪ সালে লণ্ডনে বৃটিশ-এম্পায়ার একজিবিশনে বৃটিশ রাজত্বের ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ পৃথক পৃথক মণ্ডপবাটী (Pavelion) নির্ম্মিত হয়; উহাতে সিলোনের মণ্ডপ-বাটী কাণ্ডীর দন্তমন্দিরের নিদর্শন অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছিল। কলম্বো অপেক্ষা কাণ্ডীর উষ্ণতা কম বলিয়া বহু ইংরাজ এখানে বাস করেন। অনেক বিদেশী লোক এই স্থানটী দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন।

অনুরাধাপুরা নামক স্থানটি দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিংহলের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে তাহার বহু ধ্বংশাবশেষ ও উৎকৃষ্ট বৌদ্ধ মন্দিরাদির নিদর্শন রহিয়াছে।

অনেক পণ্ডিতের মতে নিউরাইলিয়া নামক পর্ব্বতময় স্থানটিতে রাবণের রাজধানী ছিল। ইহা বর্ত্তমান রাজধানী কলম্বো হইতে ১৩৫ মাইল পূর্ব্বে। স্থানটি পরম রমণীয়। বর্ত্তমানের এই স্থানটিতেই সিংহলের গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস অবস্থিত। এখানে সীতাগিরি নামে একটি পর্ব্বত আছে, তাহারই নিকটে রাবণের অশোক বন ছিল, এইখানেই জনকনন্দিনী সীতা বন্দিনী ছিলেন। সীতাগিরি পর্ব্বতের নিম্নে এখনও অশোক বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তবর্ণ পুষ্পশোভিত অশোক বৃক্ষশ্রেণী সত্যযুগের রামায়ণের বর্ণিত অশোকবনের সাক্ষ্য দিতেছে। পাঠক পাঠিকাগণকে একটি কৌতূহলের সংবাদ শুনাইব—নিকটেই একটি বিস্তীর্ণ স্থান রহিয়াছে, ঐ স্থানে বহু দূর পর্য্যন্ত কোন বৃক্ষাদি জন্মে না। কিংবদন্তী আছে যে ঐ স্থানটী হনুমান কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল। এরূপ কিংবদন্তীর মূল্য কি তাহা রামায়ণের ভক্তরাই বলিতে পারেন। সীতাগিরিতে একটী ঝরণা আছে। কথিত আছে সীতাদেবী এই জলপান করিতেন।

রামায়ণের যুগের বিশেষ নিদর্শন সিংহলদ্বীপে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে—যেখানে যেখানে বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার নিকটেই দুর্গা মন্দির রহিয়াছে। এই দুর্গামন্দিরগুলি নাকি বিভীষণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। তাহারই নিকটে পরবর্ত্তী যুগে বৌদ্ধমন্দির হইয়াছে।

ঐশ্বর্য্য-গৌরব সমন্বিত রক্ষোপুরী বিনাশের হেতুস্বরূপ বিভীষণের উপর লঙ্কাবাসীরা এখনও বীতশ্রদ্ধ।

সিংহল বা লঙ্কার বিষয় লিখিতে গিয়া যদি আমি রামায়ণ বর্ণিত রাক্ষসের কিঞ্চিৎ বর্ণন না করি তবে বিষয়টী অপূর্ণ রহিবে। সিংহলের অনেক পর্ব্বতময় জঙ্গলে এখনও এক প্রকার অসভ্য জাতি দেখা যায়,ইহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ,মস্তকের কেশ কুঞ্চিত, গঠন কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি। সম্ভবতঃ ইহারাই রামায়ণের বর্ণিত রাক্ষসবংশ। এই জাতীয় লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানের অধিকাংশ সিংহলবাসীই ভারতের নানা স্থান হইতে এখানে গিয়া বহুকাল হইতে বসবাস করিতেছে।

সিংহল বা লঙ্কা পার হইয়া ভারতবর্ষে অদূরেই সেতুবন্ধ রামেশ্বরের বিরাট মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের বিশালতা দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম। ভিতরে রামসীতা মূর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত। তীর্থ উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু যাত্রী সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। মন্দির-বাড়ীটি এতই বিশাল যে দশ সহস্র যাত্রী ইহার ভিতরে পাতিবিধি ও বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। সেতুবন্ধ হইতে আরও সমুদ্রের দিকে ধনুষ্কোটি বলিয়া যে স্থান আছে, রামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধন কালে এইখানে ধনু অস্ত্র প্রভৃতি রক্ষা করিয়াছিলেন। এইখানে ভারতবর্ষ হইতে সিংহলের মধ্যবর্ত্তী জল ভাগের দূরত্ব ত্রিশ মাইল হইবে। সেতুবন্ধের চিহ্ন স্বরূপ এই দূরত্বের মাঝে মাঝে বালির চড়া দৃষ্ট হয়।

সিংহল হইতে দেশে ফিরিবার কালে রামেশ্বর, মাদুরা শ্রীরঙ্গপত্তন ও তাঞ্জোরের প্রসিদ্ধ মন্দিরাদি, ঐ সমস্ত স্থানে দু-একদিন করিয়া থাকিয়া দর্শন করিয়া আসিয়াছিলাম।

ভারতবর্ষ হইতে সিংহলের অবস্থা অনেক বিভিন্ন ধরণের। আচার ব্যবহার রীতি-নীতিতে ও অনেক বৈষম্য লক্ষিত হয়। বিভিন্ন দেশের অবস্থাগুলি জ্ঞাত হওয়ায় যে আমাদের কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ হয় তাহা নহে—ইহাতে মনের প্রসারতাও বৃদ্ধি পায়।

ম্যাট্রিকুলেশন বৃত্তি প্রাপ্তা ছাত্রীগণের তালিকা।

[১৯২৬]

১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিম্নলিখিত মহিলাগণ দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি পাইয়াছেন।

মাসিক ২০৲ কুড়ি টাকা :—

১।	জ্যোৎস্নাকুমারী দেবী	বিদ্যাময়ী হাই স্কুল, ময়মনসিংহ।
২।	তাপসী চট্টোপাধ্যায়	ঐ

মাসিক ১৫৲ পনর টাকা :—

১।	কমলা সেনগুপ্ত	ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, কলিকাতা।
২।	কিরণ রায়	ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টীটিউসন, কলিকাতা।
৩।	অমিয়বালা দত্ত	ডাঃ খাস্তগীর হাইস্কুল, চট্টগ্রাম।
৪।	লীলা মজুমদার ...	বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা।
৫।	পদ্মিনী বেলবড়ুয়া	ডায়োসেসন্ কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা।

মাসিক ১০৲ দশ টাকা :—

১।	অমিয়া রায় ...	বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা।
২।	বিনয়বালা গুহ	ডাঃ খাস্তগীর হাইস্কুল, চট্টগ্রাম।
৩।	চারুলতা দাসগুপ্ত	ঐ
৪।	মায়া ঘোষ	বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা।
৫।	রমা দত্ত	ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টীটিউসন, কলিকাতা।
৬।	উমা বসু	ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, কলিকাতা।
৭।	শোভনা গুহ	বরিশাল নরমাল স্কুল।
৮।	উর্ম্মিলা গুহ	ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস্ হাইস্কুল, জগদীশপুর।
৯।	লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ...	ডায়োসেসন্ কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা।
১০।	উষা সেন	বরিশাল নরমাল স্কুল।

নানা কথা

প্রথম বাঙ্গালী মহিলা—

বাঙ্গালী মহিলাদিগের মধ্যে প্রথম প্রথম কিরূপে কাহারা প্রথম পদ প্রদর্শিকা হইয়া বর্ণাধিনী হইয়াছেন তাঁহাদের কয়েক জনের নাম :—

বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা—কাদম্বিনী বসু।

এম-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা—চন্দ্রমুখী বসু।

মেডিকেল কলেজের গ্রেজুয়েট—কাদম্বিনী ও স্বর্ণময়ী।

বি-এল পরীক্ষোত্তীর্ণা—রেজিনা গুহ।

ইংরাজী কবিতায় বর্ণাধিনী—তরু দত্ত।

কংগ্রেসের সভ্যা—স্বর্ণকুমারী দেবী।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতীর সভানেত্রী—স্বরজী দেবী।

কংগ্রেসের সভানেত্রী—সরোজিনী নাইডু।

এম্ এ, পি-এইচ-ডি—প্রভাবতী দাস।

ব্যায়াম চর্চ্চায় ভারতনারী—

মিস্ মাদু মহিওয়ালা নাম্নী একটি বোম্বাই বাসিনী পার্শী মেয়েদের ব্যায়াম-শিক্ষা কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বোম্বাইএ আসিয়াছেন। শুনা যায়, তিনি মেয়েদের জন্য একটি ব্যায়াম-শিক্ষাগার খুলিবেন। এই বর্ণাধিনী মহিলাটি যদি বিলাতি ইউরোপীয় ব্যায়াম শিক্ষার পরিবর্ত্তে ভারতীয় নারীদের উপযোগী ব্যায়াম শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন তবেই উহার সমাক সফল লাভের আশা করা যায়।

নারীর বীরত্ব—

সম্প্রতি জনৈক বীরাঙ্গনা এখার সম্মানিতা হইয়াছেন রেঙ্গুনের মাথিন নামে একটি বর্ণা মহিলার নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি কিছুদিন আগে একদল ডাকাতকে বাধা দিয়া পুলিসে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। বর্ণা গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে সম্মানজনক সার্টিফিকেট ও একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেওয়া হইয়াছে।

অগ্রসর হও—

ব্যবস্থাপক সভা ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনের মাত্র আর তিন মাস বিলম্ব আছে। এবার বোম্বাইএ মহিলারা এই সব ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য বেশ একটু 'উঠিয়া পড়িয়া' লাগিয়াছেন এবং সাফল্যের দিকেও অনেকটা অগ্রসর হইতেছেন। এসম্বন্ধে আমরা বাংলার নারীদের মধ্যে একটু সাড়া দেখিতে পাইলে সুখী হইব।

ঘরে বসিয়া এম-এ—

লাহোরের 'পারসা আকবর' সম্পাদকের কন্যা শ্রীমতী জয়নাব খাতুন এম-এ পরীক্ষায় পাস হইয়া পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এজন্যে আশ্চর্য্য এবং আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি এপর্য্যন্ত পর্দ্দা রক্ষা করিয়াই উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং আইভেট পড়িয়াই এম-এ পাশ করিয়াছেন। অধ্যবসায় থাকিলে সকলই সম্ভব হয়, কোন কিছু তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

বালি মহিলা সমিতি—

বালি মহিলা সমিতিতে নারিকেল ঘড়ির পা-পোষ, কার্পেটের আসন, কুশাসন, চটের থলিয়া, মোজা, ফুক, ফেল্ট, কাগজের ঠোঙ্গা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে শুনিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিলাম। উক্ত মহিলা সমিতির সম্পাদিকা, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর এবিষয় প্রচেষ্টাকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। বাংলার প্রতি পল্লীতে মুসলমানেরা এই আদর্শ গ্রহণ করুন।

শিক্ষা ও শিল্পে মোস্‌লেম নারী—

গত বৎসর খুলনা জেলার অন্তর্গত মৌলভীপুর হইতে মোসাম্মৎ রেজিয়া ও রহিম খাতুন নাম্নী দুইজন মহিলা কলিকাতায় 'গভর্ণমেণ্ট-মোহামেডান-ফিমেল-পর্দ্দা-টে চিং-ইনষ্টিটিউশনে' উচ্চশিক্ষা পড়িতে গিয়াছিলেন, এবং ঐ বৎসরের শিক্ষার ফলাফল এবার খুলনা প্রদর্শনীতে শিল্প ও অঙ্কনের জন্য তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর পদক ও সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। মোসলেম মহিলারা শিক্ষা ও শিল্পে দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করুন, ইহা আমাদের ঐকান্তিক বাসনা।

রচনা-প্রতিযোগিতা—

বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে "বঙ্গসাহিত্য-সারস্বত-মহামণ্ডল" কর্ত্তৃক গদ্যে বা পদ্যে (১) "বাঙ্গলার বাণী" এবং (২) "বাণীবন্দনা" এই দুইটী রচনা-প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গৃহীত হইবে। যোগ্যতা অনুসারে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম দুইজনকে "কাব্য বিশারদ" উপাধি দান করা হইবে, পরবর্ত্তী দুইজন দুইখানি রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইবেন। পরীক্ষার্থী লেখক ও লেখিকাগণ আগামী ১৫ই ভাদ্র তারিখের মধ্যে এক টাকা ফি: সমেত রচনাগুলি রেজেষ্টারী ডাকযোগে ১৪ নং বেণেটোলা লেন, কলিকাতায় মহামণ্ডলের সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীমতী নাইডু—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমান বিরোধানল নির্ব্বাপণার্থে অসীম উৎসাহের সহিত বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিতেছেন। সভায়-বেতারের মধ্যে হিন্দু হিন্দু-পক্ষ এবং মুসলমান মুসলমান-পক্ষ সমর্থন করায় এই বিষয় জটিল হইয়া পড়িতেছিল।

কিন্তু শ্রীযুক্তা নাইডু অত্যন্ত ভাবে হিন্দু মুসলমানের বন্ধু হইয়া সর্ব্বত্র সান্ত্বিধারি নিক্ষল করিতেছেন। ফলের বিষয় প্রত্যেক স্থানেই হিন্দু-মুসলমানের চিত্ত শ্রীযুক্তা প্রভাব সহিত অভিনন্দিত হইতেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তবাসী নেতাগণ শ্রীযুক্তা নাইডুর এই উদার নীতি অনুসরণ করিলেই মঙ্গল, নতুবা ভারতের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ব্রাহ্মণসভার উদারতা—

গত ২৪শে জুলাই কলিকাতা আলবার্ট হলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভাসমূহ সভার উদ্যোগে নানা স্থানের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে—"যদি কোন হিন্দু স্ত্রীলোককে কেহ চুরী করিয়া লইয়া যায় কিম্বা জোর করিয়া অত্যাচার করে বা সতীত্ব নাশ করে, তবে তাহাকে পরীর শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে গ্রহণ করা যাইবে। এই সকল ব্যাপারে অভিসন্ধিভাবে পরামর্শ করিলেই শুদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আমরা ব্রাহ্মণ সভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, প্রতিভাবান্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমিলনাথ সাংখ্যতীর্থ এবং বাংলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে এ বিষয়ের জন্য অশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। পল্লীর সমাজ নেতাগণের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা যেন বিপন্না ও লাঞ্ছিতা নারীকে সমাজে গ্রহণ করতঃ উক্ত সভার আদেশ পালন করেন।

বঙ্গীয় বিধবা বিবাহ সমিতি—

বঙ্গীয় বিধবা বিবাহ-সমিতি জানাইতেছেন, সমিতির চেষ্টায় গত চার মাসের মধ্যে বারটি বাঙ্গালী বিধবাকন্যার বিবাহ হিন্দুমতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বিবাহেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এবং ব্রাহ্মণগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। সমিতির সম্পাদক মহাশয় বিধবাবিবাহে সম্পত্তির বর ও কন্যার বিবরণসহ পত্র আবেদন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। অনেক পত্র আসিতেছে, ধীরে ধীরে দু-একটি বিবাহ সম্পন্ন হইতেছে। সম্পাদকের ঠিকানা—১২৩নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিধবাবিবাহে তাহাদের মধ্যে পাত্রাব প্রবেশের কার্য্য বিশেষ সফলতা লাভ করিতেছে।

উচ্চশিক্ষার বিফলতা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি উপাধিধারী একটি উচ্চ-শিক্ষিত বাঙ্গালীযুবক চাকরীর অভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে। নাম —বঙ্কিমচন্দ্র রায়। অনেক দিন পর্য্যন্ত চাকরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্যর্থ মনোরথ হওয়ায় তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল; তাই যুবক বিষপান করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গের আমরা উচ্চশিক্ষাকাঙ্ক্ষী-দিগকে একটু ভাবিয়া হইতে অনুরোধ করি। জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসরণ করুক বা কোন সন্ন্যাসীর্দ্বেষণা হউক —তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনের জন্য উচ্চশিক্ষা লাভ প্রশস্ত নহে।

সর্ব্ববাদী-সমদর্শী মহাত্মা—

আমেদাবাদে জাতীয় কলেজে মহাত্মা গান্ধী প্রতি শনিবারে ছাত্রগণকে এক ঘণ্টা করিয়া বাইবেলের খ্রীষ্ট প্রচলিত বর্ম বিষয়ের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহারই কোন মহাত্মাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিয়া ছিল। মহাত্মা প্রকৃতই মহাত্মা, তাঁহার সকল কার্য্যই আমরা অসঙ্কোচে সমর্থন করি।

যৌতুকে চরকা দান—

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বরিশালের এক জনসভায় বলিয়াছেন "হজরত মহম্মদ তাঁহার কন্যার বিবাহে যৌতুক স্বরূপ চরকা প্রদান করিয়াছিলেন।" আমাদের মনে হয়, কন্যার বিবাহে চরকা যৌতুক দান প্রাচীন কালে সমস্ত এশিয়া ভূখণ্ডেই প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে যে কন্যাকে চরকা যৌতুক দেওয়া প্রচলিত ছিল ইহা অবিসম্বাদিতভাবেই বীকার করা যাইতে পারে। আজকাল বিবাহে কন্যাকে যে সকল অনাবশ্যক জিনিষ উপঢৌকন দেওয়ার প্রথা উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা আতঙ্কিত হইতেছি। কত সত্যের দিক হইতে আমরা কত অসত্যের দিকে ধাবিত হইতেছি!

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা—

সম্প্রতি আমাদের নিকট সংবাদ আসিয়াছে, একটি বৃদ্ধ স্বামী শ্বশুরালয়ে গিয়া শত চেষ্টা করিয়াও তাহার তরুণী ভার্য্যাকে ঘরে আনিতে পারে নাই। কন্যার পিতা মাতা অতি দরিদ্র, তথাপি কন্যা শ্বশুরালয়ে যেন না! স্বামী বিরহে প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া যান। সম্প্রতি স্বামী ঘর রোগে মারা গিয়াছে। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে কন্যাকে স্বামীগৃহে আনা হইয়াছিল। তরুণীর সম্মুখেই স্বামীর মৃত্যু হইল, কিন্তু তাহার মনে কোন প্রকার বিরহের লক্ষণ দেখা গেল না। এক্ষেত্রে আমরা দোষ দিব কাহাকে?—কন্যাকে কি বৃদ্ধকে, কি সমাজকে?

আর একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ষোল বৎসর বয়স্কা যুবতী এক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক স্বামীকে খুন করিয়াছে। বিবাহে তরুণী অজ্ঞান বয়সে বীপাস্তরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছে। এ বীভৎস লীলার সমাধান কোথায়?

অসামাজিক বিবাহের কুফল—

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি. এল. রায়ের কন্যা বীণা দেবী তাঁহার স্বামী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গত ৮ই জুলাই

ওকালতি আলিপুরের প্রথম সবজজের কাছে এক বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করেন। শ্রীমতী মার্জ্জিরে আমাইয়াছেন, বিলাতে সে-আইনানুসারে তাঁহাদের বিবাহ লম্পন্ন ও রেজেষ্টারীকৃত হইয়াছিল। বহুদিন এই বিবাহ উভয়ের অভিভাবকের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল। তাহার পর প্রতিবাদী মহিলার প্রতি বিষ্ণুর আচরণ কঠোর এবং তাঁহাকে পরিত্যাগও করিয়াছেন। এই সকল কারণ দর্শাইয়া শ্রীমতী এই বিবাহ অসিদ্ধ প্রমাণ করিতে চাহেন। এবং প্রতিবাদী যাহাতে বাদিকার স্বামী বলিয়া দাবী করিতে না পারেন এজন্য চিরস্থায়ী ইঞ্জাংসনের হুকুম পাইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছে, শ্রীমতী তাহাদের অভিভাবকত্বের দাবী ছাড়িতে রাজি নহেন। জজ আর্জ্জি গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদীর প্রতি সমন জারী করিয়াছেন। দুই জনেই বাহিরে সেয়ান। সেখানে সেখানে চলুক,—আমরা রঙ্গ দেখিবার অপেক্ষায় রহিলাম।

নাককাটা—

রামলাল নামে একটি যুবক ছুরী দিয়া তাহার স্ত্রীর নাসিকা ছেদন করিয়াছিল বলিয়া শিয়ালদহের পুলিশম্যাজিষ্ট্রেট মারবাহাদুর এস, সি, সিংহের বিচারে পাঁচ মাসের জন্য সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইয়াছে। রামলাল নাকি তাহার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছিল। যুবা, যদি স্ত্রী যদি অপরাধই করিয়া থাকে তথাপিও তাহাকে সংশোধিত করিবার কি আর কোন উপায় নাই? তুমিও নাক কাটা। মানুষে তোমাকেও চিরকাল নাককাটাই বলিবে।

মরণজয়ী মাতৃস্নেহ—

গত ২৮শে জুন তিনসুকিয়া ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে, চলন্ত ট্রেন হইতে তিন বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে পড়িয়া যায়। পিতা যাত্রা তৎক্ষণাৎ কামরা হইতে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ট্রেন তিনসুকিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে বালিকার পিতা, পত্নী ও কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া সেখানে তাহাদের জীবিত দেখিতে পান। উভয়ে সামান্য আঘাত পাইয়াছিল।

বিলাতে বিলাতেরা হইয়া যাত্রা যাত্রার করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা এই প্রসঙ্গে খেলোয়াড় মহিলাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, বিলাতফেরে গাড়ী থামাইবার জন্য প্রয়োজ গাড়ীতেই যাত্রার উপরে "ব্রেকের নিশান" বলিয়া শিকল আছে। ঐ শিকল টানিবামাত্রই গাড়ী থামান হয়।

নদীয়ার আনন্দ সংবাদ—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দিরের অধিকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবকীমোহন গোস্বামী ও তাঁহার আত্মগণ অধিবে যাত্রীদিগের নিকট হইতে দর্শনী গ্রহণ বন্ধ করিয়াছেন। বহুদিন হইতে নবদ্বীপের অর্থগৃধ্নু অধিকারিগণ যাত্রীদের উপর নানা অত্যাচার করিয়া 'ভেট' নামক অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, ধর্ম্মভীরু তীর্থযাত্রীরা অতি কষ্টে ঐ 'ভেট' দিয়া আসিতেছেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা নবদ্বীপে কত নূতন ঠাকুরবাড়ী স্থাপিত হইতে দেখিয়াছি এবং [illegible]। নিকট প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। ঐ অসদুপায়-লব্ধ অর্থের অপব্যবহার এবং তজ্জনিত মন্দির-কর্ত্তাদের অধঃপতনের সংবাদও অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপায় কথা শ্রীযুক্ত দেবকী মোহন গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি দেখিতেছি। তিনি অর্থলোভ সংবরণ করিয়া যাত্রীদের মহাপ্রভু দর্শনের বিধান করিয়া দিয়াছেন। নবদ্বীপের আর আর মন্দির-কর্ত্তাদের এই আদর্শে জ্ঞানের সঞ্চার হউক—আমরা মহাপ্রভুর নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি পূজা—

২৯শে শ্রাবণ মহাত্মা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর দিন। বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে এই দিন বঙ্গবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগরের দয়া, উদারতা, স্বদেশপ্রীতি, নারীশিক্ষার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা, বিধবার প্রতি সামাজিক দণ্ডের ঔদ্ধত্য প্রভৃতি এই দিনে সমস্ত বঙ্গবাসীর সভাসমিতি করিয়া আলোচনা করিবার দিন। এই দিনে নারীজাতির প্রতি তাঁহার সহৃদয়তা অনুসরণ করিতে আমরা দেশবাসীকে অনুরোধ করি।

শিশুর পথ্য—

বর্ত্তমানে শটীভূত শিশুদের উৎকৃষ্ট পথ্য বলিয়া গণ্য। খুলনা মিশনারি প্রভৃতি জেলার বহু লোকালয় এই শটির গাছে আবর্জ্জনাময় হইয়া পড়িয়াছে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে খুলনা সহরে আন্ডারসন নামক একজন ডাক্তার তাঁহার বৈদ্য কার্পেন্টির ল্যাবোরেটরী হইতে এই পথ্যটি আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমানে রাজনার ঐ সকল অঞ্চলের খুলনা মেয়েরা ঘরে বসিয়া শটীভূত তৈরী করিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। শটির বন এখন আবাদের পরিবর্ত্তে আয়-প্রদ পথ্য বন করিতেছে।

উক্ত ডাক্তার "আর্টের বিস্কিট" নামক আর একটি উৎকৃষ্ট শিশুপথ্য প্রস্তুত করিয়া বহু প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন। আমরা পরীক্ষার্থ এক টিন কিনিয়া আনিয়া ব্যবহারে উপকারিতা অনুভব করিয়াছি। সুখের বিষয় করিয়া সর্ব্বত্র সরবরাহ করিলে বোম্বের বিস্কিটগুলিকে দূর করিতে সমর্থ হইবে। আমরা এই দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত আর্টের বিস্কিট শিশুপথ্যরূপে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই।

মাতৃশিক্ষা-সমিতি পরিচালিত মহিলা শিল্পভবনের শিক্ষয়িত্রীগণ

উপবিষ্ট—বামদিক হইতে শ্রীযুক্তা সুশীলা নন্দী, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, শ্রীযুক্তা হরিদা গুপ্ত, শ্রীযুক্তা তারিণী দেবী।

[১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

মাতৃমন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৪র্থ বর্ষ | আশ্বিন—১৩৩৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভাববার বিষয়

বাঙ্গলার নারীরা অত্যন্ত দুর্ব্বল এটা অনেক দিক দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে, তাই নারীদের শারীরিক শক্তি কিসে বৃদ্ধি পা'বে এ সম্বন্ধে দেশে চিন্তা চল্‌ছে। কেউ কেউ বলছেন, নারীদের রীতিমত ডন, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি ব্যায়াম চর্চ্চা করা দরকার। কিন্তু কথাটি অনেক অংশে ঠিক হলেও দেশের মেয়েরা এর অনুশীলনে সমর্থ হবেন কি? বাঙ্গালার পুরুষরাই বা কয়জনে রীতিমত ব্যায়াম করে থাকেন? আমাদের মনে হয় মেয়েরা বাড়ীর ভিতরে ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে সকাল বিকাল খানিকটা সময় যদি ছুটাছুটি খেলা করেন তবে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও শক্তি চর্চ্চার সুবিধা হয়; অধিকন্তু পরিবারে একটা আনন্দেরও সৃষ্টি হয়।

বাঙ্গালীর ঘরের অন্নাভাব দিন দিন গুরুতর হয়ে উঠছে। অনেক গৃহস্থ নিরুপায় হয়ে সংসারসংগ্রামে হতাশ হয়ে পড়ছেন। তারপর অবিবাহিতা কন্যা এবং বিধবারা অনেক সংসার ভারাক্রান্ত করে তুলছেন। শুধু কি অন্ন বস্ত্রের অভাব? অনেক পরিবারের বাসগৃহেরও অভাব। সঙ্কীর্ণ দু'একখানি মাত্র গৃহে অনেকে একত্রে রাত্রি যাপন যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ব্যাঘাতকর, তেমনি আবার পারিবারিক নীতিবিরুদ্ধও বটে। সকলেরই মূলে একমাত্র অর্থাভাব। এ অবস্থায় আমরা মেয়েদের অর্থকর শিল্প শিক্ষা করান অত্যাবশ্যক মনে করি।

অনেক দরিদ্র পরিবারে খুব কম বয়সের মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয়। কম বয়সে বিবাহ দেওয়া মেয়েদের অনেক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিধবা হওয়ার আশঙ্কাও বেশী, এটা সকলেই বোঝেন। বুঝেও যে ছোট মেয়েদের বিয়ে দেন এর কারণ শুধু অজ্ঞতামূলক নয়, অর্থাভাবমূলকও বটে। ছোট মেয়ে পরের ঘরে পার করে দিয়ে তাঁরা সংসারের ব্যয়ভার লাঘব করেন। এখানেও আমরা মেয়েদের অর্থকর শিল্পশিক্ষার পরামর্শ দিই।

মেয়েরা জ্ঞানবুদ্ধিতে, শিক্ষাদীক্ষায়, শক্তিসামর্থ্যে একটু খাট হয়ে থাকুক—এ অনেক পুরুষেই পছন্দ করে আসছেন। এটা কিন্তু অস্বাভাবিক মোটেই নয়। যেখানে সবলে দুর্ব্বলে একসঙ্গে বসবাস, সেখানেই এই অবস্থা। কিন্তু দুর্ব্বল সবলের খুব বেশী দৌরাত্ম্য যে চিরদিন পছন্দ করে

না, একদিন তার চৈতন্য হয়—এটাও স্বাভাবিক। বিজয়ী বিজিতকে চেপে রাখতে চেষ্টা করছে, নিজেদের সুবিধার জন্য। কিন্তু বিজিত তার সুপ্ত শক্তি দিয়ে আত্মরক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করছে না। উন্নত জাতি অবনতকে মূর্খ করে রাখতে চেষ্টা করে আসছিলেন কিন্তু অবনতরা আজ জেগে উঠছে। কারখানার ধনী মালিকরা, শ্রমিকদিগকে কোনমতে প্রাণে বাঁচিয়ে তাদের দ্বারা কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করছেন; শ্রমিকরা নিরুপায় হয়েও মাঝে মাঝে ধর্ম্মঘট করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। প্রজারা কখন কখন অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তাই বলি, মানুষকে ভেড়া গরুর মত বাধ্য করে সুখ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা, আজকালকার দিনে ব্যর্থ হয়ে যাবে। মনু বলেছেন—যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট থাকেন, সেখানে কখনই কল্যাণ নাই।

বিদুষী কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় একবার একটা মহিলাসভার সভানেত্রীর অভিভাষণে বলেছিলেন,—"আমাদের দেশের মেয়েরা প্রায় সকলেই 'অতি ভাল মানুষ': কিন্তু এই 'অতি ভাল' হওয়াটা সব সময়ে ভাল নয়।" শ্রদ্ধেয়া কবির একথা অতি নূতন, অথচ অতি সত্য। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ভারতসচিবের মন্ত্রণাদাতা হয়ে বিলাতযাত্রার সময় নারীশিক্ষাসমিতির অভ্যর্থনার উত্তরে সেদিন বলেছিলেন—"ঘরে পাঁচ খানা পিঠে তৈরী হয়েছে,গৃহিণী একখানা রেখে চারখানা কর্ত্তার পাতে দিলেন; কর্ত্তামশায় সেগুলির সৎকার করলে, বাকীখানাও এনে দিয়ে গৃহিণী আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন—হাড়ীর খবর নেওয়ার মত ক্ষুদ্র চিন্তা কর্ত্তামশায়ের মাথায় একটুও ঢুকলো না; আমরা মেয়েদের সম্বন্ধে এমনই বিবেচক!"

আজকাল ঘরে বাইরে নানা স্থানে দুর্ব্বৃত্তদের হাতে যে নারী নির্য্যাতন হচ্ছে, এ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নারীরা অতঃপর ঘরের নিভৃত কোণে লুকিয়ে থাকবেন, কি বেশী করে বাইরে গতিবিধি করবেন? আমরা বলি—লুকিয়ে যদি নিশ্চিত রক্ষা পাওয়া যেত তবে না হয় সেই মত থাকা যেতো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ঘরে থেকেও দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে নিস্তার নেই, কেবল দুর্ব্বলতাই তাতে বেড়ে উঠে মাত্র। বরং একটু বাহিরে গতি বিধির ফলে নারীদের মধ্যে একটুকু শক্তি-সামর্থ্য এসে পড়ে, আসুক; ঘরের বাহির হলেই যে নারী একেবারে অসহায়া হয়ে পড়েন, পুরুষ দেখলেই জড় সড় হয়ে পড়েন, সে ভাবটা কিঞ্চিৎ ঘুচে যাক।

দুর্ব্বৃত্তদের কু-অভিসন্ধিই যে নারী নিগ্রহের একমাত্র কারণ, তা আমাদের মনে হয় না; আর এই ইংরেজের বিচারালয়ের সাহায্যেই যে দুর্ব্বৃত্ত দমন হবে তাও আমরা আশা করি না। নারী জাতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটিই ইহার কারণ, আর তাহার সংস্কারই ইহার প্রতি বিধানের উপায়। স্যার পি, সি, রায় বলেন—"আমাদের সামাজিক দুর্নীতির কুফল অনেক সময় আমাদের হিন্দু-রমণীর সমাজ ত্যাগের কারণ।" আমাদের মনে রাখতে হবে—একটা নারী সমাজ ত্যাগ করলে শুধু সেই নারীর জাত যায় না—গোটা হিন্দু সমাজটারই জাত যায়।

"জাগো দেবি বিশ্বের গৌরব-তীর্থে,
দীন হীন নিঃস্বের অবনিত চিত্তে;
নিখিলের নন্দিতা বন্দিতা জাগো—
বাঙলার ভগিনী বাঙলার মা গো!"

প্রাচীনা স্ত্রীকবি

শ্রী শচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল, বিদ্যাবিনোদ।

অনেকের বিশ্বাস পূর্ব্বকালে বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে কবিতা রচনা করা অভ্যাস আদৌ ছিল না, তাঁহারা সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া দিতেন। এটি নিতান্ত ভুল ধারণা। বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি ও পুরাতন পুস্তক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে মহিলা কবিদের নানা প্রকারের কবিতা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সে সমস্ত কবিতা কবিত্ব, সৌন্দর্য্য ও পদলালিত্যে অন্যান্য সাময়িক কবিদের কবিতা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। অনেক বঙ্গমহিলা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতার সহিত পাণ্ডিত্যাভিমানী পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করিয়া গিয়াছেন। অনেক মহিলা কবিও যে বাঙ্গলাভাষাতে কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেক প্রাচীন পুথি হইতে সপ্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহাদের কবিতায় সত্যসত্যই মুগ্ধ হইতে হয়! আমরা তাঁহাদিগকে যতটা হীন, যতটা ক্ষুদ্র বিবেচনা করি তাঁহারা ততটা নন। তাঁহাদেরও সমাজের মধ্যে একটা স্থান, একটা অধিকার ছিল তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

নিম্নে দুই-একটি কবির ও তাঁহাদের কাব্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব।

প্রাচীনা স্ত্রীকবিদের মধ্যে বোধ হয় 'রামমণি' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনা। রামমণি শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের সমসাময়িকা ছিলেন। ইঁহার পরিচয় সাহিত্যিক মাত্রেই অবগত আছেন। ইনি অসহায় অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে বাহুড়া বেলার অন্তর্গত 'নান্নুর' গ্রামে উপস্থিত হন। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ দয়া করিয়া তাঁহাকে গ্রাম্য দেবতা 'বিশালক্ষ্মী' দেবীর মন্দির মার্জ্জনা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। সকলেই ইঁহার কার্য্যে প্রীত হন। ইনি রজক কন্যা। চণ্ডীদাস ঠাকুর রামমণিকে ভালবাসিতেন, রামমণিও এই চণ্ডীদাস ঠাকুরকে ভালবাসিতেন; ইহা রামমণি রচিত একটী পদ হইতেই পাওয়া যায়—

"তুমি সে আমার আমি সে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর
বেদে রামী কয় চণ্ডীদাস বিনা
জগৎ দেখি আঁধার।"

চণ্ডীদাসের মৃত্যুর পর রামমণি উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন।

"রামীর বচন করহ পালন
দাসীরে করহ সাথ"—বলিয়া কত আক্ষেপ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস ও রামমণির প্রেমের মধ্যে কোন কুভাব ছিল না তাহা চণ্ডীদাস রচিত পদ হইতেই পাওয়া যায়—

"তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও পিতৃ মাতৃ।"

রামমণি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অনেক পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি অতি সুন্দর ও পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে রামমণির চরিত্র প্রেমের নির্ম্মল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল।

যে সমস্ত স্ত্রীকবি বৈষ্ণব গ্রন্থ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সহচরী, দুঃখিনী, ইন্দুমুখী, গোপী, রসময়ী, ও মাধুরী বিশেষ পরিচিতা। কিন্তু ইহাদের জীবনী পাওয়া দুষ্কর।

গোপী রচিত একটি পদ হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, এ পদটি গোষ্ঠলীলা বিষয়ক—

"শুনিয়া মুরের বেণু মন্দ মন্দ চলে ধেনু
পুচ্ছ ফোল পিঠের উপরে
নাচিতে নাচিতে যায় হুপুরে পঞ্চম গায়
পাচনী ফিরায় শিশুগণে।"

কি সুন্দর পদলালিত্য—যেন সমস্ত ছন্দ নাচিতে নাচিতে যাইতেছে।

একখানি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে একটি মহিলা কবি রচিত কয়েকটি পদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেগুলি 'সুবচনী

ব্রত বিষয়ক পদ। তারিণী ব্রাহ্মণী নাম্নী জনৈক মহিলা কবি ইহার রচয়িত্রী। তাঁহার পদ হইতে কোন জীবনী পাওয়া অসম্ভব। সম্ভবতঃ তিনি চট্টগ্রামের পটীয়া থানার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডীতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আরম্ভ এইরূপ—

"বন্দমাতা সুবচনী, পুরাণে মহিমা শুনি
পতিত পাবনী পুরাতনী।
ধরি আনি কর পুটে, অধিষ্ঠান হও ঘটে,
শুন আপনার ব্রতবাণী।"

তাঁহার রচিত একটি গানও পাওয়া গিয়াছে। তাহাও ভক্তিভাব পূর্ণ ও কবিত্বপূর্ণ। গানটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"শিব দুর্গা নাম লওনা কেন মনরে আমার।
অন্তিম কালেতে তরাইবে ভবনদী পার।
দুর্গার নামটি মকরন্দ, শ্রবণে বহে আনন্দ,
নিরানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যার।
দুর্গার নামটি সুধানিধি পান কর নিরবধি
কাল ভয় কাল চিন্তা নাহিক তোমার।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে, দুর্গা নামটি না লইলে,
শমন ভবনে গেলে দোহাই দিবে কার।"

কবি দুঃখিনী রচিত নিম্নলিখিত পদটি হইতে বোধ হয় যে, মহিলা কবিদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীত বিদ্যাতে ও তাল মানেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই পদটি রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় সঙ্কলিত পুস্তক হইতে গ্রহণ করিলাম,—

সুরট মল্লার।

"শ্যাম তোমায় নাচতে হবে।
দিগেছা বিনা কেটা থোর লাগ জিগ কাঁ।
উড় তাড়া থোই বহুর বহুর বহু বহু বহু বহু বহু
থোই থোই থোই গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড়
গিড়।
তিত্তা দিমিতা তানা থোরি কাটা কাঁ।

না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুকির বড়াই।
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘুন্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল।
ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
সুচিত্রা বাজায় সপ্তসরা রাই দেখে রঙ্গ।
তুঙ্গ বিদ্যা কপিলাস তুম্বুরা রঙ্গদেবী।
ইন্দুরেখা পিনাক বাজায় মন্দিরা সুদেবী।
উল্কট তালে যদি হার বনমালী।
চূড়া বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালী।
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে রাখিব, দুখিনী শুনি হাসি।"

এই পদটি হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তৎকালে মহিলাগণ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সপ্তসরা, তুম্বুরা, পিনাক, মৃদঙ্গ, মন্দিরা প্রভৃতি যন্ত্রের সহিত ও নৃত্যকলার সহিতও পরিচিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে একটি মহিলা কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম চন্দ্রাবতী। তিনি রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতার মধ্য হইতেই তাঁহার আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অমর কবি বংশীবদনের কন্যা। তাঁহার পিতার 'পদ্ম-পুরাণ' রচনায় তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার পাশাখেলা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"কি আনন্দ হইল সই গো রস বৃন্দাবনে,
শ্যাম নাগরে খেলায় পাশা মনোমোহিনী সনে,
চন্দ্রাবতী কহে পাশা খেলায় বিনোদিনী,
পাশাতে হারিল এবার শ্যাম গুণমণি।"

তিনি কোন ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত পরিণীতা হওয়ার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন। তাঁহাদের বিবাহের কথা-বার্ত্তা একরূপ ঠিক এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ যুবক এক মুসলমানীর প্রেমে আত্মবিক্রয় করায় চন্দ্রাবতী আর বিবাহ করেন নাই। সূর্য্যব্রতের দিন ময়মনসিংহ অঞ্চলে মহিলাগণ সুর করিয়া তাঁহার রামায়ণ গান করিয়া থাকেন। তিনি এই কথা রামায়ণ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই; সীতার বনবাস পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন।

এই রামায়ণ ব্যতীত চন্দ্রাবতী মেয়েলী ব্রতের ছড়া, বিবিধ কবিতা, বাঘসার শাসন, কাজী ও বিচার, ভাকাত

কেনারামের গান, দেওয়ান বড়া প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার পদ্মপুরাণের বহু পোঁথা চন্দ্রাবলীর রচনা। তাঁহার রামায়ণ হইতে সীতার বনবাসের কয়েক ছত্র উঠাইয়া দিতেছি—

"পবন মন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী
সোণার পালঙ্ক পরে গো ফুলের বিছানা
চারিদিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযুর জল
নানাজাতি ফল আছে সুগন্ধে রসিয়া
যাহা চায় তাহাদের গো সখীরা আনিয়া।" ইত্যাদি

এই রামায়ণ কীর্ত্তিবাস রচিত রামায়ণ হইতে ছন্দ ও কবিত্বে কোন অংশে ন্যূন নহে।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত জগন্নাগ্রাম নিবাসী কবি রামগতি রায়ের কন্যা আনন্দময়ী ও তাঁহার বিদুষী পিসি গঙ্গামণি কবিত্ব সম্পদে, সমাজের মধ্যে ও পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আনন্দময়ী সংস্কৃত শাস্ত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। আনন্দময়ী যে নানাবিধ কাব্য রচনা করিয়া মাতৃভাষাকে সম্পদশালী করিয়া গিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে চেষ্টা করিব। তিনি নানাবিধ খণ্ড কাব্যও রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে সামান্য একটু বিবাহকালে রমণী-সভার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"হের চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে, পরোক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে।
কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে।
কারো হার কুর্পাস বিস্রস্ত বক্ষে।" ইত্যাদি

আনন্দময়ী রচিত বিরহিণী মনেত্রার বর্ণনা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। নিম্নে একটু তুলিয়া দিতেছি—

"যে অঙ্গে মুকুল তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে।
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বেঁধেছি আপনি
তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী।
শীত ভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সেই বুক করি করাঘাত।" ইত্যাদি

তাহার সম্পূর্ণ রচনার আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব।

গঙ্গামণি ছোট ছোট কবিতা ও বিবাহ কালীন গাহিবার উপযুক্ত ছোট ছোট গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনার নমুনা একটু দিতেছি। তাঁহার কবিতার এমন একটা প্রাণ আছে যে, পাঠকমাত্রকেই তাহা মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

"গলে দিল ধরে ধরে মুকুতার মালা।
রবির কিরণে যেন জ্বলিছে মেখলা।
কেয়ুর কঙ্কণ দিল আর বাজু বন্ধ।
দেখিয়া রূপের ছটা মনোলাভে ধন্দ।"

ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে এমন কত নারীর উজ্জ্বল চরিত্র ও কবিত্ব নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। কত জন যে বিস্মৃতির অতলগর্ভে চিরতরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন তাহাই বা কে বলিতে পারে? কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কবিত্বের অভিমান, বিদ্যার অভিমান সাংসারিক গৃহকর্ম্মগুলিকে 'দাসী'র কর্ম্ম বলিয়া হেয় জ্ঞান করিতে শিখায় নাই। যে হস্তে তাঁহারা কাব্য রচনা করিতেন সেই হস্তেই তাঁহারা আবার সম্মার্জ্জনী ধরিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

সমস্ত দৈনন্দিন গৃহ কর্ম্মের অবসানে তাঁহারা যে কাব্য, দর্শন ও শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাই আজ বাঙ্গলা সাহিত্যের উপাদান ও পাঠ করিবার জিনিষ। তাঁহাদের যশঃ প্রভায় আজো ভারতগগন উজ্জ্বল, ভারতের অতীত ইতিহাস গৌরবান্বিত।

খেয়ার শেষে

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

পরেশবাবু যখন গম্ভীর মুখে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া জানাইলেন নীরার কাকা শ্রীনাথবাবু আজ নীরাকে লইতে আসিবেন খবর দিয়াছেন, তখন কুমুদিনীর মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল।

পরেশবাবু খবরটা দিয়া বেশ চলিয়া গেলেন, কিন্তু যে তাঁহার শ্রোতৃ তাহার পক্ষে এ সংবাদ শুনিয়া নিস্তব্ধ থাকা দুঃসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আপনার মনেই বলিতে লাগিলেন "নিয়ে যাবে? কোথাকার কে তার ঠিক নেই, স্নেহমায়ার সম্পর্ক যার সম্পর্কে নেই, অমনিই এসে সে নিয়ে যাবে?"

স্বাগত কথাটা মুখে ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে দারুণ ক্রোধপূর্ণ কথাগুলো হঠাৎ কখন রোদনের সুরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না।

নীরা একখানা বই পরেশবাবুর গৃহে দিতে যাইতেছিল, মাসীমার রোদন ও ক্রোধ মিশ্রিত বিতৎস কথাগুলি কানে গিয়াছিল। সে থমকিয়া দাঁড়াইল, গৃহমধ্যে উঁকি দিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "ঘরে তো কেউই নেই, কার সঙ্গে ঝগড়া করছ তবে মাসীমা?"

কুমুদিনী হাতের পানের ডিবেটা সামনের দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সক্রোধ উক্তিতে বলিলেন "ওই তোর কাকার সঙ্গে।"

কথাটা শুনিয়া নীরার ভারি হাসি পাইল, কোথায় তাহার কাকা, আর কোথায় তাহার মাসীমা। মাসীমা যে সেই উদ্বেগহীন কথাটা, যাহা এখনও সন্দেহের আবরণে জড়িত তাহা লইয়া একাই তুমুল ঝগড়া বাধাইয়াছেন, ইহাতে জানি না কার কার।

কুমুদিনী তাহার হাসিমাখা মুখখানার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন "তুই কি ভেবে হাসছিস বল তো নীরা?"

নীরা হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে বলিল "হাসবার কারণ না থাকলে কি কেউ হাসে মাসীমা? সে কথার ভিত্তি নেই সেই কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে অনর্থক একা ঝগড়া চালাচ্ছ তুমি, এতে হাসি চাপা যায় কখনও? কোথায় রয়েছে কাকা, কোথায় রয়েছ তুমি, তোমার এখান হতে ঝগড়া করা কাকার কানে পৌঁছাবেই না।"

কুমুদিনী বলিলেন "ভিত্তি নেই কে বললে? এই মাত্র তোর মেসোমশাই বলে গেলেন আজই তোর কাকা তোকে নিতে আসবেন, তাই শুনেই তো রেগে মরছি। স্নেহের বাঁধন খসে গেল, কখনও যার সঙ্গে চেনা পরিচয় নেই, বাপের সংভাই সেই কাকা—সে কিনা হলো তোর গার্জ্জেন, আজ আইনের জোরে সে তোকে নিয়ে যাবে। আমাদের কোন দাবী দাওয়া আর থাকবে না, আমরা আর তোর কেউ নই?"

বাষ্প আসিয়া তাঁহার কণ্ঠটাকে রুদ্ধ করিয়া দিল।

নীরার সুগৌর মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সে কুমুদিনীর পানে নীরবে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে চোখ নামাইয়া ধীর কণ্ঠে বলিল "নিয়ে যাওয়া অমনি বললেই হলো কিনা মাসীমা, আমি যদি না যাই, কে কি করতে পারবে আমার?"

তাহার সে কণ্ঠস্বর কুমুদিনী চিনিতেন, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া বলিলেন "তাও কি হ'তে পারে মা? তুমি এখনো সাবালিকা হও নি, মাত্র আঠার বছর বয়েস তোমার; তোমার বাপ যাঁকে গার্জ্জেন করে গেছেন তাঁর অধীনে তোমাকে থাকতেই হবে। আমি তোমার মাসী হলেও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী, আমার কাছে থাকলে তোমার বিশাল সম্পত্তির একটী পয়সাও তুমি পাবে না, আইনের এমনি কড়া নিয়ম।"

তেমনি দৃঢ়সংযত কণ্ঠে নীরা বলিল "আমি এক

পয়সাও চাইনে। মাসী-মা, আমি এক পয়সারও প্রত্যাশা করিনে। কি হবে আমার বিশাল সম্পত্তিতে? আমার খাওয়াপরা খুব সামান্যতেই হয়ে যাবে, এই সামান্য খরচটা তুমি করতে পারবে না?"

আবেগভরে কুমুদিনী তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, তাহার সুন্দর ললাটে স্নেহ চুম্বন দিতে গিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল তাহার মাথায় ঝরিয়া পড়িল; চোখে জল মুখে হাসি, তিনি বলিলেন "দূর পাগলী, তুই চাসনে বললেই হলো? আমার কাছে থাকার জন্যে তুই তোর সকল সম্পত্তি হারাবি আমি কি তাই দেখব, তোকে কাছে আটক করে রাখব? বা রে, তেমন স্বার্থপর আমি নই। দুদিন একটু কষ্ট হবে, তারপর সবই সয়ে যাবে। মাসে মাসে আসবি বই কি, নিশ্চয়ই তারা এত হৃদয়হীন নয় যে আসতে দেবে না।"

"কে আসবে মাঝে মাঝে খুড়িমা?

নীরা সচকিতে মাসীমার আলিঙ্গন পাশ হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইয়া গোপনে চোখ মুছিয়া ফেলিল। কুমুদিনী ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন "নীরার কাকা আজ ওকে নিতে আসছেন, তাই বলছি যে—"

অমিয়ের হাসিমাখা মুখখানা মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গেল. তখনি সে-মুখ হাসি কণ্ঠে টানিয়া আনিয়া বলিল "বেশ তো, নিজের কাকার কাছে যাচ্ছেন, এ তো সুখের কথা। এইতেই বুঝি আপনি কান্নাকাটি করছেন?"

লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়া নীরা বলিল, "মিছে কথা, কান্নাকাটি করছি, আপনি দেখছেন বুঝি?"

অমিয় বলিল "হাঁ, দেখা যাচ্ছে বই কি। আপনার চোখের পাতা যে ভিজে।"

নীরা এ সত্যকে উড়াইয়া দিতে পারিল না, মিথ্যা বলিয়া তর্ক করিবার প্রবৃত্তি তাহার এখন ছিল না। সে একটুখানি নীরব থাকিয়া বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি অমিয়ের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল "আচ্ছা, এতে আপনার মত কি অমিয়বাবু?"

অমিয় বলিল "আমার মত নিয়ে তো আপনার কাজ হবে না, তবে আর আমায় জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

তাহার কথার মধ্যে যে বেদনার সুর বাজিয়া উঠিল তাহা নীরা বেশ বুঝিতে পারিল, সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমার মত কি জানেন অমিয়বাবু, আমি অনেকদিন আগে একটা দিনের জন্যে কাকাকে দেখেছিলুম। যদিও আমি তখন ছেলে মানুষ ছিলুম, তবু মানুষের যে স্বভাবজ্ঞান, তাই দিয়ে বুঝতে পেরেছিলুম আমার কাকাটী বড় সাধারণ লোক নন, তাঁর মন অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অত্যন্ত নীচ, তাঁর সেই সাপের মত দৃষ্টি আমি কোন মতেই ভুলতে পারিনি, আজ নয় দশ বছর পরেও সে দৃষ্টি আমার মনে গাঁথা আছে। তিনি আমায় তাঁর বিষ স্বরূপ ভাবতেন, যেন তাঁর যথার্থ অধিকার আমি দখল করেছি। আমি যদি না থাকতুম, সত্যিই তিনি বাবার এই সব সম্পত্তি দখল করতেন। তিনি আসুন, কারও কিছু বলতে হবে না, আমিই স্পষ্ট বলব আমি কক্ষনো তাঁর বাড়ী যাব না। আইন যদিও বলে আমায় যেতে হবে, আমি প্রাণপণে তাকে ঠেকিয়ে চলব। মানুষের ইচ্ছাশক্তি অমন আইনের অবমাননা করতে পারে তা জানবেন।"

কথাগুলা শেষ করিয়াই সে নিজের গৃহে ফিরিল, বইখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া সে ভাবিতে বসিল।

এখান হইতে চলিয়া যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এখানকার স্নেহপ্রীতির আবর্ত্তের মধ্যে সে আপনাকে একেবারে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে, মায়ার বাঁধনে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, এ বাঁধন কাটা তাহার সাধ্যাতীত।

মাসীমার স্নেহভরা হৃদয়খানার কথা ভাবিয়া তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মায়ের মৃত্যুর পর সে আর কাহারও নিকট হইতে এত স্নেহ এত ভালবাসা পায় নাই। আদর যত্ন আরও অনেকেই করিয়াছে, কিন্তু সে সবই স্বার্থ বিজড়িত; হাজার স্নেহ দেখাইলেও মনে হইত সে সবই আবিলতা মাখা, কিন্তু এ স্নেহ অনাবিল, বড় পবিত্র, এ যে দেবতার আশীষ।

তাহার পর পরেশবাবু। নিঃসন্তান বৃদ্ধ এই তরুণীটিকে সত্যই বড় ভালবাসিয়াছিলেন। নীরার আব্দারটা তাঁহার কাছেই ছিল বেশী, আর সে আব্দার পূরণ করিতে

তাঁহারও আলস্য ছিল না। পিতার কাছে নীরা যেমন থাকিত, পরেশবাবুর কাছেও তেমনি ছিল. পরেশবাবু কন্যার মতই তাহাকে দেখিতেন।

আর—আর অমিয়—?

নীরার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

সে অনেকেরই সহিতই মিশিয়াছে, এ জগতে সকলেই তাহার তোষামোদ করিয়াছে অর্থের পানে চাহিয়া। স্বার্থপর ইহাদের দেখিয়া, ইহাদের তোষামোদ বিদ্যার পারদর্শিতা দেখিয়া নীরা সত্যই বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মনে একটা দারুণ ঘৃণা ভাব আসিয়াছিল, জগতে সবাই এমনি! অমিয়কে আগে সে এড়াইয়া চলিতেই চাহিয়াছিল, কিন্তু পরে সে জানিতে পারিল অমিয় তাহাকে দেবীর ন্যায় উচ্চাসনে বসাইয়া স্তাবকের মত আরাধনা করেনা, মানুষের মতই সহজ সরল করিয়া তাহাকে ভাবিয়া লইয়াছে, এবং সেইরূপ সরল ভাবেই তাহার সহিত মিশিতেছে।

ধীরে ধীরে সে অমিয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, অমিয়ের মহত্ত্বের কাছে ধীরে ধীরে সে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল।

সমস্ত দিন সে চুপ করিয়া গৃহ মধ্যে বসিয়া রহিল। মাসীমা একবার তাহার খোঁজে আসিয়া তাহার গম্ভীর চিন্তাপূর্ণ মুখখানা দেখিয়া জানিয়াছিলেন সে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় ঠিক করিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া বিরক্ত না করিয়া কুমুদিনী আবার বাহির হইয়া গেলেন।

ভৃত্য আসিয়া বলিল "বাবু ডাকছেন আপনাকে।"

নীরা বিস্ময়ের সুরে বলিল "আমাকে?"

সে উত্তর দিল "হ্যাঁ।"

একটু ভাবিয়া নীরা জিজ্ঞাসা করিল "নীচে আর কেউ আছেন কি?

ভৃত্য বলিল "আর একটী ভদ্রলোক আছেন, আর অমিয়বাবুও এইমাত্র গেলেন সেখানে।"

নীরার মনটা অকস্মাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল, এ ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তার কাকা, তাঁহারই তো আজ আসিবার কথা আছে। সে বলিল "বল গিয়ে আমি যাচ্ছি।"

সে চলিয়া গেল, নীরা কি ভাবিল, বড় আয়নাটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, দেখিল তাহার মুখখানা অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ধীর পদে সে নীচে নামিয়া গেল।

বসিবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া সে দেখিল পরেশবাবু একটী ভদ্রলোকের সহিত গল্প করিতেছেন, অমিয় টেবিলের এক পাশে একখানা চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর ভাবে একখানা বইএর পাতা উল্টাইতেছে।

নীরাকে দেখিবামাত্র পরেশবাবু বলিলেন "এসো মা।" তাহার পরে আগন্তুকের পানে চাহিয়া বলিলেন "এইটী আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী নীরা।"

ভদ্রলোকটী চশমার মধ্য হইতে চক্ষুদুটি বিস্ফারিত করিয়া নীরার পানে চাহিলেন, তারপর বলিলেন "আমি সেই কতদিন আগে নীরাকে দেখেছি, তখন নীরা বোধ হয় আট নয় বছরের হবে। তখন দেখতে ছিল অন্য রকম, আজ যদি পরিচয় না দিতেন আমি মোটেই চিনতে পারতুম না।"

নীরা পরেশবাবুর চেয়ারখানা ধরিয়া যেন তাঁহারই উপরে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পিতার ন্যায় পরের উপর তাহার এইরূপ নির্ভরশীলতা শ্রীনাথবাবুর চক্ষুতে এড়াইয়া যাইতে পারিল না, তাঁহার সরল ভ্রূদুটী একটু কুঞ্চিত হইল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত চাপাপ্রকৃতির লোক, মনের ভাব তাঁহার মুখে কিছুতেই প্রকাশ পাইত না। চকিতে তিনি নিজের মনোভাবটা সামলাইয়া লইয়া হাসিমুখে বলিলেন "বসো মা, এই চেয়ারখানা নিয়ে আমার পাশে বসো।"

তিনি তাঁহার পাশের চেয়ারখানা সরাইয়া দিলেন। পরেশবাবু বলিলেন "বসো মা. দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে? উনি তোমার নিজের কাকা, আমাদের চেয়ে সম্পর্ক তোমার ওঁর সঙ্গে বেশী।"

নীরা চেয়ারখানা সরাইয়া আনিয়া অমিয়ের পার্শ্বে বসিল। সকলের কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া নীরা যে তাহার পার্শ্বে এমন অসঙ্কুচিত ভাবে আসিয়া বসিল, ইহাতে অমিয় নিজেই ভারি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, সে ব্যাগ্র চোখে শ্রীনাথবাবুর পানে চাহিল। তাহার মনে আশঙ্কা জাগিতেছিল অপরিচিত একটি যুবকের প...

যুবতী মাতুষ্কন্যাকে বসিতে দেখিয়া শ্রীনাথবাবু নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন।

নীরার পিতার প্রসঙ্গ লইয়া পরেশবাবু ও শ্রীনাথবাবুর কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। ভ্রাতার অন্তিম কালের কথাটা বলিতে বলিতে শ্রীনাথবাবুর ওষ্ঠ কণ্ঠ তিতিয়া উঠিল, চোখ দিয়া দু ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল। নীরার বড় হাসি আসিতেছিল, সে হাসিকে কাশিতে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়া মুখ মুছিবার ছলনায় রুমালখানা মুখে চাপা দিয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল "আহা, কি ভ্রাতৃস্নেহ!"

অমিয় মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিল।

কথাটা যদিও কাণে যায় নাই, তথাপি দুজনের হাসি শ্রীনাথবাবুর চোখ এড়াইতে পারিল না; তাঁহার ভ্রূযুগ আবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি তিনি বেশ বুঝিলেন পরেশবাবু নীরার সহিত এই যুবকের বিবাহ দিবার চেষ্টায় আছেন, ইহাতে তিনিও যে বিশেষ লাভবান হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

উদাসীনভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ছেলেটী কে?"

পরেশবাবু একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন "আমার একটী বন্ধুর ছেলে, আমার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করে।"

মুখখানায় একটু হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া শ্রীনাথবাবু বলিলেন, "আমি ভেবেছিলাম আপনার ছেলে, যাক্ বন্ধুর ছেলে আর নিজের ছেলেতে বিশেষ পার্থক্য থাকে না, বন্ধু যদি সেই রকম হয়। এখন আমি যে জন্য এসেছি —নীরাকে নিয়ে যেতে, তার সম্বন্ধে কি বলেন?"

পরেশবাবু শুষ্কমুখে বলিলেন সে বিষয়ে আমি কি বলব বলুন। আপনার চেয়ে আমরা যে ওর বেশী আপনার সে কথা তো বলতে পারিনে। বিশেষ নীরার বাপ আপনাকেই ওর বিষয়ের একজিকিউটার, ওর গার্জ্জেন করে রেখে গেছেন, আমাদের কোনও কথাই এখানে চলতে পারবে না।"

সন্তুষ্ট ভাবে শ্রীনাথবাবু বলিলেন "সে তো ঠিক কথা।" নীরার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন "তা হলে মা, প্রস্তুত হয়ে নাও। আমার মোটর এসেছে, তাতে আমার সঙ্গে চল তুমি। আমার আর্দ্দালি পরে তোমার জিনিষ পত্র নিয়ে যাবে এখন। তোমার কাকীমা, বোনেরা তোমায় দেখার জন্য খুবই ব্যগ্র হয়ে—"

বাধা দিয়া অকস্মাৎ দীপ্ত হইয়া নীরা বলিয়া উঠিল "না, আমি কোথাও যাব না।"

তথাপি নিজের রুক্ষ স্বরটা নিজেই অনুভব করিয়া কণ্ঠস্বর সংযত কোমল করিয়া বলিল "আমি মাসীমার কাছে বেশ আছি, মাসীমার কাছেই থাকব, এখান হতে কোথাও যাবার ইচ্ছে আমার নেই।"

শ্রীনাথবাবু অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। নীরা যে এমন অসঙ্কোচে তাঁহার মুখের পরে স্পষ্ট জবাব দিবে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন তিনি যাহাই কেন বলুন না নীরা তাহা মাথা পাতিয়া লইবেই।

বিরক্ত হইলেও সে ভাবটা চাপা দিয়া তিনি একটু হাসি দেখাইয়া বলিলেন "কেন তুমি যাবে না মা? এমন কোনও কারণ নেই যাতে তোমার যেতে কোনও আপত্তি হতে পারে।"

নীরা শুধু মাথা নাড়িল—"না—"

পরেশবাবু চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া শ্রীনাথবাবু তাঁহার পানে চাহিয়া একটু রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন "আপনি যে চুপ করে আছেন বড়, একটা কথাও যে বলছেন না?"

পরেশবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমি কি বলব বলুন। আপনি কি বলেন জোর করে নীরাকে যেতে বাধ্য করতে?"

শ্রীনাথবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন "আপনার নীরবতাই যে মনে আমার সন্দেহ জাগিয়ে তুলছে পরেশবাবু!"

নীরার মুখপানে চাহিয়া পরেশবাবু কোমলকণ্ঠে বলিলেন "মা, শুনছো তোমার জন্যে আমি শুদ্ধ জড়িয়ে পড়ছি।"

নীরা উঠিয়া দাঁড়াইল, "না মেসোমশাই, তা হবে না। আমার জন্যে আপনি যে জড়িয়ে পড়বেন তা হতে পারে না। কাকা, আমি যাব আপনার বাড়ীতে, কিন্তু মাপ করতে হবে এখন, আমি যাব কিছুদিন পরে—যখন আমার ইচ্ছা হবে তখন।"

শ্রীনাথবাবুর দুই চক্ষু দিয়া আগুন ছুটিয়া গেল, তিনি বেশ ঝাঁজের সুরে বলিলেন "তার কারণও আমি কিছু কিছু বুঝতে পারি নি যে, তা নয়। এমন নির্ব্বোধ আমি নই যে চোখের সামনে কারণ পড়ে থাকতে—যাক্ সে কথা, সে সব কথা আমি কিছু বলতে চাই নে, আমি বলছি কি —"

বাধা দিয়া নীরা বলিল "যখন আপনার কাছে যাব কাকা, তখন আপনি যা খুসী তাই বলবেন, এখন মাপ করতে হবে আমায়। আসুন অমিয়বাবু, এখানে এমন গম্ভীর ভাবে বসে থাকার চেয়ে চলুন আমরা ততক্ষণ সাহিত্যালোচনা করি গিয়ে।"

অমিয় নীরার পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

শ্রীনাথবাবু রুদ্ধরোষে গর্জ্জন করিয়া তাহাদের প্রস্থান-পথের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই ক্ষুদ্র একটী মেয়ে তাঁহার মত বয়োজ্যেষ্ঠ মাননীয় এক ব্যক্তিকে কি করিয়া যে এমন ভাবে ঠকাইয়া চলিয়া গেল তাহাই আশ্চর্য্য।

পরেশবাবুর পানে চাহিয়া মুহূর্ত্তে মুখের কঠোর ভাবটাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়া চিরমিষ্ট সেই ছলনাময় হাসি হাসিয়া বলিলেন "আজকালকার ছেলেমেয়ে-গুলো কাউকেই মানতে চায় না, দেখেছেন? গুরু লঘু জ্ঞান তাদের আর থাকে না কারণ তারা শিক্ষিত হয়েছে। নীরার এই কঠিন কথাগুলোতে যদিও আমার খুব কষ্ট হয়েছে তবুও মনকে প্রবোধ দিচ্ছি এটা আজকালকার স্বাভাবিক নিয়ম, নীরাও সে নিয়ম অতিক্রম করতে পারে নি। যাক—উঠি আজ তাহলে—"

ব্যস্তভাবে পরেশবাবু বলিলেন "এখনিই উঠবেন, একটু বসুন—"

শ্রীনাথবাবু উঠিতে উঠিতে বলিলেন "ও বিষয়টায় আমায় মাপ করবেন পরেশবাবু; ডিসপেপটিক রোগী, পেটে কিছু সয় না।"

বিনম্র হাসির সহিত ততোধিক বিনম্র একটা নমস্কার করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

শ্রীনাথবাবু চলিয়া গেলে পরেশবাবু বাড়ীর মধ্যে গিয়া গম্ভীর ভাবে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন "নীরা যে শ্রীনাথ-বাবুর সামনে বেশ স্পষ্ট করে তার মনের কথাগুলো বলে এল, একাজটা মোটেই ভাল হল না কিন্তু, শ্রীনাথবাবু এতে বড় বেশী রকম চটে গেছেন।"

কুমুদিনী শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

(১০)

বিদায়-সময়ে শৈলবালা উমার চরণে যখন মাথা রাখিল তখন তাহার চোখ দিয়া অনেকখানি জল গড়াইয়া পড়িল।

সে এখানে থাকিতে পারিতেছিল না, অথচ যাইতেও মোটেই ইচ্ছা ছিল না। মাতৃসমা শাশুড়ীকে যখন অনন্ত-বাবু যৎপরোনাস্তি অপমান করিতেন এবং তিনি যখন বিনা প্রতিবাদে নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া কেবল চোখের জল রুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেন তখন তাহার বুকের মধ্যে গরম রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিত। এই সদা সঙ্কুচিতা রমণীকে দেখিতে দেখিতে সে নিজেই তাহার সঙ্কুচিততা-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং সে এই অশান্তির আলয় হইতে পলাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

উমা পুত্তলিকার মতই বসিয়া রহিলেন আকাশের কোন অনন্ত প্রান্তে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, পদতলে লুণ্ঠিতা শৈলবালার পানে একবার চাহিলেন না পর্য্যন্ত।

রুদ্ধকণ্ঠে শৈলবালা বলিল "যদি না থাকতে পারি মা, দুদিন বাদে আবার তোমারই পাশে ফিরে আসব।"

উমা ভাঙ্গাসুরে বলিলেন "না বউমা আর তোমার এখানে এসে কোনও দরকার নেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি তুমি সুখী হও। ভগবান তোমার মনকে এমনি পবিত্র, নির্ম্মল করে রাখুন।"

শৈল চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল "মা, তোমায় কখনও পর বলে ভাবিনি; তুমি আমার মা নও একথা আমি কখনও মনে করতে পারি না। সেই বিয়ের সময় দশ বছর বয়সে এখানে এসেছি, আজ নয় বছর তোমার কাছে কাটিয়ে যাচ্ছি, কই মা, মনে তো তাতে আমার আনন্দ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যাব না, ফিরিয়ে নেই ভাইকে।"

উমা এবার তাহার পানে চাহিলেন, চক্ষুজল এতক্ষণ যে সামলাইয়া ছিলেন, আর পারিলেন না, দরদর ধারে তাহা ঝরিয়া পড়িল। চোখ মুছিয়া অধরে ম্লান হাসির

রেখা ফুটাইয়া বলিলেন "এখন ফিরিয়ে দেওয়া কি ভাল বউমা? আর, এখানে কি সুখের আশাতেই বা পড়ে থাকবে তুমি? এই সংসারকে যে মধুময় করত, তোমার সেই দেবতার মত স্বামী নেই; এখানে এখন কেবল গরল উগরে উঠছে, চারিদিক তাতে বলসে যাচ্ছে, এখানে থেকে সে বিষে জর জর হবে কেন মা? তোমার যখন অমন সব ভাই রয়েছে, যারা বোন বলতে বাঁচে না, তাদের কাছে যাও, কোনও অশান্তি নেই, দুশ্চিন্তার হাত হ'তে এড়াবে।"

শৈল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "না মা, দুশ্চিন্তাকে সহচারিণী করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার দুর্দ্দশার কথা ভেবে আমি কিছুতেই সুখী হতে পারব না।"

উমার নিকট বিদায় লইয়া সে ইভার সন্ধানে গেল। অনেক খুঁজিয়া ইভাকে সে একটা গৃহে চুপ করিয়া বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। আজানুলম্বিত চুলগুলি তাহার অনাবৃত সুন্দর পৃষ্ঠের উপর পড়িয়াছে, কতক প্রভাতের মৃদুল সমীরণ ভরে এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

শৈল ডাকিল "ইভা।"

ইভা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল; শৈল দেখিল তাহার আরক্ত চোখ দুটি জলভরা, শৈলকে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি চোখ দুইটা মুছিয়া ফেলিল।

ইভা যে নিজের অবস্থা বেশ বুঝিয়াছে তাহা শৈল বুঝিতে পারিয়াছিল। ইভা প্রায়ই গোপনে কাঁদে; যদিও অশ্রুজল তাহাকে ধরাইয়া দিতে সক্ষম হয় না বটে কিন্তু তাহার ক্ষীণ আঁখি এবং রক্তাভ মুখখানা বড়ই বিশ্বাসঘাতকতা করে।

শৈল তাহার নিকট সরিয়া আসিল, তাহাকে টানিয়া কোলের মধ্যে আনিয়া বলিল "কাঁদছিস কেন পাগলি, আমি চলে যাচ্ছি বলে?"

ইভা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

শৈল তাহার সিক্ত চুলগুলি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিল "আমি আবার এক মাসের মধ্যেই ফিরে আসছি। তুই বুঝি মনে ভাবছিস আমি সেখানে গিয়ে বসে থাকব, দূর পাগলী, তা কেনরে? বাপের বাড়ী এখন কি আর ভাল লাগে? তুই বাপের বাড়ী যেতে চাস কি?"

ইভা মাথা নাড়িয়া জানাইল—"না।"

শৈল বলিল "বেশ তো, ভাল কথা। এখন দেখ, আমি তোকে গোটাকতক কথা বলে যাচ্ছি, যে কয়দিন আমি না আসি সেই কয়দিন মাকে খুব যত্ন করিস। মা তোকে এখনও ভালবাসতে পারেননি, যাতে তাঁর ভালবাসা আসে তাই করবি। এখন তোকে ঘোমটা দিয়ে লুকিয়ে থাকলে আর চলবেনা, প্রকাশ হয়ে আসতে হবে, মুখের ঘোমটা খুলতে হবে, বুঝলি? কথা বলতে পারবিনে—তাতে কি, আর তো সবই বুঝতে পারিস, সবই জানিস। কেমন আমার কথা সব শুনলি তো?"

ইভা সম্মতি জানাইল, শৈল চলিয়া গেল।

অনন্তবাবু বৃহৎ উদরটি বহন করিয়া ধীর পদে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন, স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওগো, শুনছো, আমায় আজ একবার কলকাতায় যেতে হচ্ছে।"

উমা মলিন চোখ দুইটী মুক্ত হইতে নামাইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন "ভালো।"

অনন্তবাবু তাঁহার এইরকম ঔদাস্যে চটিয়া উঠিলেন, মুখখানা বিকৃতি করিয়া বলিলেন "ভালো? সব তাইতেই কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব, আসক্তি যেন কিছুতেই নেই। এ রকম ভাবের মানে কি তাতো কিছুই বুঝতে পারিনে আমি।"

একটু খানি নীরব থাকিয়া শান্তকণ্ঠে উমা বলিলেন "জানোই তো আমার স্বভাব, তবে—"

কর্কশকণ্ঠে অনন্তবাবু বলিলেন "জানি জানি, খুব জানি, এই রকম স্বভাব বলেই চিরটা কাল আমার হাড়মাস সব জ্বালিয়ে দিলে তুমি। ছেলেটাকে তোমার এই স্বভাবদোষেই তুমি একেবারে বখাটে করে ফেললে। আমার আশা ভরসা স্থল ছিল সে, ভবিষ্যৎ জমিদার সে, তুমিই তাকে এমনি করে কেড়ে নিলে, তাকে একেবারে আলাদা করে ফেললে। তাকে আমার মতই গড়ে তুলব বলে আমার ভারি ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তুমি তাকে তার দরকারের চেয়ে অনেক জিনিষ দিয়েছো, যাতে সে অভাবের জ্বালা বুঝতে পারলে না, দুই হাতে অর্থ ব্যয় করে যায়।"

উমা নতশিরে বসিয়া রহিলেন, স্বামীর কথার একটা উত্তর তিনি কোন দিনই যেন নাই, আজও দিলেন না।

তাঁহার এই নির্ব্বাকভাবে অনন্তবাবু বেশীক্ষণ নিজেকে রুদ্ররূপে প্রকাশ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইলেন না, কারণ একমুখে কতক্ষণ কথা চালানো যায়; বাধ্য হইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখে চাহিলেন। ইভা পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, উমা তাহা জানিতে পারেন নাই, আত্মচিন্তায় তিনি এতই বিভোর হইয়াছিলেন। হঠাৎ পার্শ্বে একটা সজোর নিঃশ্বাস পতনের শব্দে সচকিত হইয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন।

আজ ইভার মুখখানা তিনি ভাল করিয়া দেখিলেন। এই কয়েক মাসের মধ্যে ইভা তাঁহার মনোভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই জন্যই সে বড় একটা তাঁহার সম্মুখেই আসিত না। হঠাৎ তাঁহার সহিত যদিও তাহার দেখা হইত, তিনি মুখ ফিরাইয়া লইবার পূর্ব্বে সে এত তাড়াতাড়ি অন্তর্হিত হইয়া যাইত যে তাহার সেই ব্যস্ত ভাবটা উমাকে পর্য্যন্ত বিস্মিত করিয়া তুলিত। নিজের অবস্থা ইভা খুব ভালো রকম বুঝিয়াছিল, সে এখানে আসাতেই যে অশান্তি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানিতে পারিয়া নিজেই সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল, লোকের চক্ষু হইতে নিজেকে লুকাইয়া রাখিবার জন্যই সে গোপন স্থান খুঁজিত।

আজ উমার প্রখর দৃষ্টিপাতেও ইভা সরিয়া গেল না, চোখ নামাইল না, করুণ চোখ দুইটী তাঁহারই চোখের উপর রাখিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দৃষ্টিতে যে কতদূর দীনতা ফুটিয়া উঠিয়াছে উমা আজ তাহা বুঝিলেন, তাঁহার হৃদয় আজ এই প্রথম এই বালিকার কষ্টে ব্যথিত হইয়া উঠিল। অভাগিনী পুত্রবধূর পানে তিনি আর চাহিতে পারিলেন না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বাসিত অশ্রু কোনমতে চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে খিড়কিতে চলিয়া গেলেন।

আহা এর অপরাধ কি, এ বালিকা কি জানে? সে তো নিজেকে গোপন করিয়া আসে নাই, সকলকে জানাইয়াই তো আসিয়াছে সে মুক। তাহার আর সবই আছে, সে দেখিতে পায়, শুনিতে পায়, সুস্থ সবল দেহ তাহার, নাই কেবল কথা কহিবার শক্তি। তিনি কেন তাহার উপর এত বিরক্ত, এত ক্রুদ্ধ?

"হ্যাঁ গা অমিয়র মা, বড় বউ কি আজ চলে গেল?"

একটি প্রৌঢ়া রমণী এই কথা বলিতে বলিতে উপরে উঠিয়া আসিলেন। উমা তাড়াতাড়ি মুখে চোখে প্রশান্ততা আনিয়া বলিলেন "হাঁ, আজ সে চলে গেল।"

প্রৌঢ়া দ্বারের কাছে বসিয়া মালা জপ করিতে করিতে বলিলেন "এখন পাঠিয়ে দিলে কেন গা? তোমার কষ্ট হবে জেনে শুনেও—"

একটু হাসিয়া উমা বলিলেন "আমার আর কি কষ্ট হবে? আজ নয় দশ বছর আগে সেই বিয়ের সময় এসেছে, আর সেখানে যায় নি। এখন একবার তারাও নিয়ে যেতে চায়, তারও ঝোঁক হয়েছে যাবার জন্যে, তাই পাঠিয়ে দিলুম। আমার এ কষ্ট তো চিরকালই আছে, সকলকে কেন জড়িয়ে রাখি আমার সঙ্গে?"

সুবোধের মা বলিলেন "তোমার কপালই যে খারাপ গো, একটী মাত্র ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে এলে, সে বউটি এত সুন্দরী কিন্তু হলে হবে কি, বোবা যে, কথা বলতেই পারে না। চারিদিককার শান্তি নষ্ট হয়ে গেল একটা এই বউয়ের জন্যে। অমিয় বুঝি আর চিঠি পত্র দেয় না?"

ক্ষীণ স্বরে উমা বলিলেন "লেখে বই কি, প্রায়ই পত্র দেয়?"

সুবোধের মা বিস্ময়ের সুরে বলিলেন "প্রায়ই পত্র দেয় তবে সে ছুটিতে এল না কেন গা? পুজোর বন্ধ হয়ে গেছে আজ পাঁচ সাত দিন, আমার সুবোধ ক-বে বাড়ী এসেছে, অমিয় এল না?"

অনেক চেষ্টা করিয়াও উমা দীর্ঘনিঃশ্বাসটা রোধ করিতে পারিলেন না, সুবোধের মায়ের সম্মুখেই সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। যে কষ্টকর কল্পনাটা তাঁহার মনের মধ্যে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল, সুবোধের মায়ের এই কথাতে যেন তাহা সত্যে পরিণত হইয়া আসিল। অন্য বারে পূজার দশ বার দিন আগে অমিয় বাড়ী আসে, এবার পূজা আসিয়া পড়িয়াছে, আজ ষষ্ঠী, সে আসে নাই।

নিরানন্দ গৃহ হাহাকার করিতেছে—অমিয় নাই। বুক ফাটিয়া হাহাকার বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, সেটাকে তিনি অতি কষ্টে চাপা দিয়া রাখিতেছিলেন। মিথ্যা কল্পনা মনে আঁকিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন বোধ হয় এখনও তাহার ছুটি হয় নাই নইলে সে আসিত। দুইদিন ছুটিতে কলিকাতায় কখনও অতিবাহিত করে নাই, পল্লীকোলে মায়ের বুকে সে সেই দুইদিন ছুটির সার্থকতা করিতে ছুটিয়া আসিয়াছে। আজ এই ছয়-সাত দিন বন্ধ হইয়াছে, সে আসিল না! আজ সত্য কথা জানিতে পারিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তিনি আর একটি কথা বলিতে সক্ষম হইলেন না।

"হ্যাগা, সে আসবে কিনা কিছু লেখে নি?"

উমা মনের চাঞ্চল্য গোপন করিয়া শান্ত সুরে বলিলেন "না"।

গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের সুর টানিয়া সুবোধের মা বলিলেন "ওই গো, ঠিক কথা, আমি যা বলি তা কি মিথ্যে হয়, না হতে পারে কখনও? সে রাগই করেছে বটে, নইলে আর কিছু নেই এর মধ্যে। সে একদিন—এখানে আসার আগে সুবোধ গিয়েছিল অমিয়ের সঙ্গে দেখা করতে; যা দেখে এসেছে বোন, চুপি চুপি আমায় বললে, সে কথা আর তোমার কাছে বলতে ইচ্ছে করে না, অথচ না বললেও নয়। এখনও তোমরা সাবধান হতে পারবে, ছেলেকে ফিরাতে পারবে, এর পর থেকে বাঁশ হয়ে গেলে আর নোয়াতে পারবে না।"

কি একটা আশঙ্কায় উমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুবোধ কি দেখে এসেছে দিদি?"

সুবোধের মা একটা ছোটখাট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সে কথা বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে। শোন তবে, যা সত্যি সে দেখে এসেছে তাই বলে যাই। সেই পরেশবাবুর বাড়ীতে একটা মেয়ে আছে, তাকেই এখন বিয়ে করবার জন্যে তোমার অমিয় একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা বেদ্ধ না কি—তাই তো? তাদের বাড়ীতে না হয় রইলই সে, তা বলে তাদের মেয়েকে বিয়ে করবে এ হতে পারে কখনও? মেয়েটার বয়েস বললে বাইস তেইস হবে, দেখতে নাকি খুব ভাল—লেখাপড়াও তেমনি জানে। সব গেল বোন, তোমার ছেলে ওই মেয়েকে বিয়ে করলে তুমি নিজের জাতধর্ম খুইয়ে কিছু তাদের নিতে পারবে না, বাধ্য হয়ে তোমায় ছেলে ত্যাগ করতেই হবে। ছি, ছি, অমিয় এতটা লেখাপড়া শিখলে, ঠাকুর হতে গিয়ে হলো কিনা একটা বাঁদর? মরে যাই কোথায়!"

নির্ব্বাক উমা খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; অনেকক্ষণ পরে ধীর কণ্ঠে বলিলেন "তাই হোক দিদি, অমিয় ব্রাহ্মদের ঘরে বিয়ে করুক। আমি চাই সে সুখী হোক—যেখানে সেখানে থাক ভাল থাক, আমার এতে আপত্তি করবার মত কিছু নেই।"

হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

বিস্মিতা সুবোধের মা খানিক চুপ করিয়াই বসিয়া রহিলেন। আবার উমা ফিরিয়া আসিবেন আশা ছিল। কিন্তু উমা যখন আর ফিরিলেন না তখন অগত্যা তাঁহাকে ভগ্নমনে উঠিতে হইল। (ক্রমশঃ)

কোথা

শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ, কবিভূষণাকর।

দেখ্‌লে দেউল দেবদেবী-পীঠ
নীচের দিকেই নোয়াস্ মাথা,
চাস্‌না কভু উপর দিকে—
নীচেই কেবল দেখিস্ যা' তা'!

দেখ্‌রে চেয়ে মাথার উপর
দেখ্‌রে চেয়ে নিজের ভিতর—
বোক্ কোথা তোর দয়াল ঠাকুর?
কোথা তাহার আসন পাতা!

মহিলা-শিল্পভবন

(নারীশিক্ষা-সমিতি কর্তৃক পরিচালিত)

"নারীশিক্ষা-সমিতি" বর্ত্তমানে বাংলার একটী শ্রেষ্ঠ, আদর্শ প্রতিষ্ঠান হইলেও অনেকে ইহার বিষয় অবগত নহেন। ইহা কলিকাতার প্রধান গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অবলা বসুর তত্ত্বাবধানে অতি কর্ম্ম-কুশলতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। বাংলার বহু জেলায় এই সমিতির অন্তর্গত বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইহার কার্য্য বিশেষ ভাবে প্রসারিত হইয়াছে।

"বিদ্যাসাগর বাণীভবন" নারীশিক্ষাসমিতি কর্তৃক পরিচালিত হিন্দু বিধবাদিগের সাধারণ শিক্ষালয়। বর্ত্তমানে কলিকাতা ২৮ নং বাদুরবাগান লেনের বাটীতে অবস্থিত। এখানে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্থ হিন্দু বিধবা মহিলাদিগকে লেখাপড়া ও কিছু কিছু শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রীগণের আহার ও বাসস্থানের সমুদয় ব্যয় সমিতি বহন করেন।

'মহিলা-শিল্পভবন" অতি অল্পদিন হইল নারীশিক্ষা-সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে স্ত্রীলোকদের উপযোগী নানাপ্রকার অর্থকর শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিক্ষার্থিনীগণ প্রতিদিন নিজ নিজ গৃহ হইতে আসিয়া থাকেন। শিক্ষার জন্য কোন বেতন লওয়া হয় না।

গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে সমিতি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যাঁহারা গ্রামে থাকিবেন এবং যাঁহারা সহরে থাকিবেন তাঁহাদের জন্য পৃথক পৃথক রকমের শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার এবং ইহা বহু ব্যয় সাপেক্ষ। এই জন্য সমিতি গত বৎসর সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। অনেক লেখালেখির পর ১৯২৪ সালের নবেম্বর মাসে সরকার এই আবেদন মঞ্জুর করেন। তাহার পরেই সমিতি বিস্তৃত ভাবে শিল্প বিভাগের কার্য্য আরম্ভ করিতে যত্নবান হন। ১৯২৬ সালের জুন মাসের শেষ ভাগে সরকারী সাহায্যের যে মঞ্জুরীপত্র সমিতির হস্তগত হয় তাহাতে এককালীন দান ৪২৩৩৲ টাকা এবং বাৎসরিক সাহায্য ৫২৪০৲ টাকা সরকার হইতে মঞ্জুর হয়। সর্ত্ত থাকে যে, সমিতিকে এই উভয়বিধ দানের পরিমাণের আর অর্দ্ধাংশ অতিরিক্ত দিতে হইবে এবং অন্যূন পঞ্চাশটী অভাবগ্রস্থা ছাত্রীকে শিল্প শিক্ষা দিতে হইবে। ৬ই জুলাই সমিতির পক্ষ হইতে স্বীকার-পত্র প্রেরিত হয়।

বর্ত্তমান বাণীভবনের বাটীর নিকটেই আর একটী বাটী ভাড়া লইয়া গত জুন মাস হইতে বিশেষ ভাবে মহিলা-শিল্প-ভবনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান ছাত্রী সংখ্যা ত্রিশটী। নিম্নলিখিত বিষয় লইয়া ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং কৃতী মহিলাগণ এই শিল্পাশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন;—

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ।

শিক্ষয়িত্রীগণ—

কাপড়ের ছাট-কাট ও এমব্রয়ডারী—

শ্রীযুক্তা তরলা দত্ত (বিদ্যাসাগর বাণীভবনের সেভী-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)।

দেশীয় অলঙ্কার ও জুয়েলারী অলঙ্কার প্রস্তুত—

শ্রীযুক্তা সুশীলা নন্দী ('মাতৃ-মন্দির' ও 'ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্'এর তত্ত্বাবধায়িকা)।

পশমের কাজ—

শ্রীযুক্তা তারিণী দেবী।

সতরঞ্চি, গালিচার আসন ও রঞ্জন-শিল্প—

শ্রীমতী শান্তিময়ী দেবী ও শ্রীযুক্তা প্রভাবতী মজুমদার।

বয়ন-শিল্প—

শ্রীমতী জ্ঞানদাবালা দাশ।

বাণীভবন হইতে দুইটী ছাত্রীকে বোলপুরের শাখা স্বরূপ শ্রীনিকেতন হইতে কয়েক প্রকার শিল্প শিক্ষা দিয়া আনা হইয়াছে। ভবনের কয়েকজন ছাত্রী ভবনের

নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য শিক্ষা শেষ করিয়া ঐ সকল শিল্পের শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

বাংলার বহু পরিবার স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিল্পশিক্ষা দিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় করা প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন। বিশেষতঃ বহু স্ত্রীলোক অপরের গলগ্রহ হইয়া সংসারের দুঃখ দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। এখানে যে সকল মহিলা শিক্ষা লাভ করিবেন তাঁহারাই ভবিষ্যতে নিজ নিজ পল্লীতে গিয়া আর আর স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন।

মহিলা-শিল্পভবনের একখানি গাড়ীর একান্ত প্রয়োজন। গাড়ী না থাকায় বহু আবেদনপত্র পাওয়া সত্ত্বেও দূরবর্ত্তী স্থানের ছাত্রীগণকে আনিবার বন্দোবস্ত করা যাইতেছে না। এদেশে সৎকার্য্যে দানশীল লোকের অভাব নাই। সমিতি আশা করেন, মহিলা-শিল্পভবনের এই অভাব দূরীকরণার্থ দেশবাসী ভ্রাতা ভগিনীগণ মনোযোগী হইবেন। এতদর্থে যিনি যাহা দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইবেন—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক, বি-এ
সহকারী সম্পাদক—নারীশিক্ষাসমিতি,
১০৫ নং, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবঞ্চিতা

শ্রীমতী কল্যাণী দেবী।

ধীরপদে, পূজারিণী বেশে
অর্ঘ্যথালি হাতে ধরি, বিশ্বস্তা কিশোরী যবে
মন্দির-দুয়ারে তব দাঁড়াইল এসে;
হে দেবতা, তোমারেই দিতে উপহার,
পূজা উপচার,
—নিরমল, অনাঘ্রাত কুসুমের প্রায়,
তাহার সে কুমারী-হৃদয়—
মধুর করুণা হাস্যে বরাভয় পাণি,
আশ্বাসিলে সেবিকারে, দীন নিবেদন তার
ধন্য হবে লভি তব পুণ্য স্পর্শখানি।
বিপুল উল্লাসভরে ক্ষুব্ধ হিয়া তার,
নাচিয়া উঠিল বারেবার;
জাগ্রতে, নিদ্রায় কিম্বা তন্দ্রায়, স্বপনে,
ভাবিল না মনে,
আজি যাহা ধন্য হল, দেবতার কৃপাদৃষ্টি লভি,
তাই কোন দিন,
অনাদরে, উপেক্ষায়,
মর্ম্মভেদী যাতনায়,
চীৎকারি উঠিতে পারে, সকরুণ আর্ত্তস্বরে,
একান্তই সান্ত্বনাবিহীন।

তখন জানেনি বালা, ভাবেনিক মনে,
শান্ত শুদ্ধ দেবতাও এমন নিষ্ঠুর খেলা
খেলিবারে পারে তার সনে।

আজিও সে কিশোরীর হৃদয়ের নৈবেদ্যের থালি,
তা'র পরে অর্ঘ্যস্রবা, পুষ্পপাত্রে পুষ্প,
তেমনি ত রয়েছে সকলি;
শুধু সেই দেবতাই হৃদিহীন, নির্দ্দয়, পাষাণ,
লীলা অবসান,
অন্যত্র গিয়াছে চলি,
—নিঃশব্দ চরণ ফেলি—
পাছে রাখি বঞ্চিতার উপেক্ষিত, ব্যথিত হৃদয়,
আঘাতের ঘন ব্যথাময়।

কিন্তু সেই বালিকারে হায়,
সারাটি জীবন তার, পূজা পূজার্থিনী বেশে
কাটাইতে হবে প্রতীক্ষায়;
অর্ঘ্যভার অবহেলি,
যে দেব গিয়াছে চলি,
সেই নিষ্ঠুরের পদে, পুনরায় সমর্পিতে তার
পূজা উপহার।

বাঙ্গালীর আহার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রী চুণীলাল বসু, এম্-বি, সি-আই-ই, আই এম্ ও, এফ্-সি-এস্।

বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য্য কয়েকটী খাদ্য সামগ্রী সম্বন্ধে দুই চারিটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভাত।

বাঙ্গালী অন্নগত প্রাণ। দিবসে অন্ততঃ একবার ভাত না খাইলে আহারে তাহার তৃপ্তি হয় না। ভাত না দিলে বাঙ্গালী রোগীকে "পথ্য" দেওয়া হয় না। ভাত অগ্নিকর, রোচক এবং লঘুপাক হইলেও রুটীর ন্যায় সারবান খাদ্য নহে। রুটীর মধ্যে প্রোটীনের অংশ ভাতের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ এবং মাখন-জাতীয় সার-পদার্থ ও ভাইটামিন্ অধিক থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে ভারতবর্ষে যে সকল জাতি নিত্য "দালরুটী" ব্যবহার করে, তাহারা "দালভাত"ভোজী বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক বলশালী, সুদৃঢ়দেহ, পরিশ্রমী, সাহসী ও কষ্টসহ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাঙ্গালীর খাদ্যের প্রধান দোষ এই যে উহার মধ্যে ছানাজাতীয় সার-পদার্থের (Protein) অংশ কম এবং শর্করাজাতীয় সার-পদার্থের (Carbohydrates) পরিমাণ অধিক থাকে। ভাতের পরিবর্ত্তে আমরা যদি এক বেলা রুটী ব্যবহার করি, তাহা হইলে এই অভাব কতক পরিমাণে পূর্ণ হইয়া যায়। বিশেষতঃ ছাত্রজীবনে (যখন দেহগঠনের জন্য অধিক প্রোটীনের আবশ্যক হয়) একবেলা ভাত ও একবেলা রুটীর ব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমাদের ছাত্রাবাসসমূহে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। বাংলার অনেক জেলখানাতে কয়েদীগণের জন্য একবেলা রুটীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহাতে কয়েদীগণের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের পরিশ্রম করিবার শক্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আতপ চাউল সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা অধিকতর সারবান। যে চাউলই ব্যবহৃত হউক না কেন, উহা বেশী ছাটা (Polished) হইলে উহার ভাইটামিন্ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং উহা একরকমে অসার হইয়া পড়ে। অধিক ছাটা চাউল কিছুদিন ব্যবহার করিলে বেরিবেরি (Beri-beri) নামক রোগ উৎপন্ন হয়। চাউলের দানার উপরের আবরণে ভাইটামিন্ ও লবণ জাতীয় পদার্থ থাকে। চাউল বেশী ছাঁটিলে এই আবরণ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং উহা নিতান্ত অসার হইয়া পড়ে। মোটা আতপ-ছাটা চাউলের ব্যবহার কি স্বাস্থ্য, কি অর্থ, উভয় দিক হইতে মঙ্গলপ্রদ।

আমরা কেন গালিয়া ভাত ব্যবহার করিয়া থাকি। এই ব্যবস্থায় আমরা চাউলের মধ্যস্থিত কিয়দংশ সার ভাগ অযথা নষ্ট হইতে দিই। একে ত চাউলের মধ্যে সার ভাগ কম থাকে, তাহাতে কেন ফেলিয়া দিলে উহার সহিত প্রোটীন্ ও লবণ জাতীয় পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যক্ত হয়। আমাদের গরীব দেশে ইহা দ্বারা অযথা বহুকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা ফেনমিশ্রিত ভাত খায় অথবা কেন গালিয়া উহার সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া পৃথক্ ভাবে ব্যবহার করে। কিছুদিন অভ্যাস করিলেই চাউল সুসিদ্ধ হইবার জন্য উপযুক্ত জলের পরিমাণ সহজেই বুঝিয়া লইতে পারা যায়; তখন কেন গালিবার আবশ্যক হয় না, অথচ ভাত বেশ ঝর্‌ঝরে থাকে। বাড়ীর গৃহিণীদিগের এবিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিজেই রন্ধন করুন অথবা তাঁহাদের গৃহে পাচক পাচিকা দ্বারা রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হউক, কেন না ফেলিয়া যাহাতে পরিষ্কার ভাত প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যেন দৃষ্টি রাখেন। "ইক্‌মিক্ কুকারে" সুন্দর ঝর্‌ঝরে ভাত প্রস্তুত হয়, ইহা সকলেই জানেন; ইহাতে কেন ফেলিবার প্রয়োজন হয় না। একটু মনোযোগ দিলেই সাধারণ হাঁড়িতে ইক্‌মিক্ কুকারের মত ভাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ভাতে সার-পদার্থ কম থাকে, কিন্তু খিচুড়ি একটী খুব সারবান মুখরোচক খাদ্য। তাহার কারণ এই যে ইহার সহিত দাল ও ঘি মিশ্রিত থাকে। চাউলে যে ছানাজাতীয় ও মাখনজাতীয় সার-পদার্থের অভাব থাকে, তাহা দাল ও ঘৃত সংযোগ দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। আমরা অনেক সময়ে আলু ও অন্যান্য তরকারি মিশ্রিত করিয়া খিচুড়ি রন্ধন করি। এই ব্যবস্থার জন্য খিচুড়িকে পূর্ণখাদ্য (Complete food) বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। ভাতের পরিবর্ত্তে আমাদের গৃহে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই তিন দিন খিচুড়ি ব্যবহৃত হইলে বাঙ্গালীর খাদ্যের দোষ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। খিচুড়ির সহিত ভাতের কেন থাকিয়া যায়, ইহাও অল্প লাভের বিষয় নহে।

চাউল আমাদের দেশে যে কেবল ভাতের আকারে ব্যবহৃত হয়,তাহা নহে। আমাদের দেশের সামান্য অবস্থার লোকের মধ্যে মুড়ি, খই ও চিড়ার (কাঁচা ও ভাজা) অপর্য্যাপ্ত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ভাত অপেক্ষা লঘুপাক অথচ সারত্ব সম্বন্ধে ভাত অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ভাজা বা সিদ্ধ ছোলা বা মটরের সহিত "জল খাবারের" জন্য ইহাদিগের ব্যবহার সাতিশয় প্রশস্ত। বিশেষতঃ ইহার সহিত নূনা নারিকেল ব্যবহৃত হইলে খাদ্যের যাবতীয় সারাংশ এইরূপ ব্যবস্থিত "জল খাবার" হইতে সহজে ও অল্পব্যয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে আমাদের গৃহস্থ-ঘর মাত্রেই এইরূপ জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল। এরূপ জলখাবারের প্রধান গুণ এই যে, ইহার মধ্যে কোন ভেজাল দ্রব্য থাকিবার আশঙ্কা নাই। আজকাল আমরা জল খাবারের জন্য যে সকল বাজারের খাবার ব্যবহার করিয়া থাকি, ভেজাল দ্রব্যে ঐ সমস্ত প্রস্তুত হয় বলিয়া উহা অনেক স্থলে অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করে। "জল খাবার" সম্বন্ধে প্রাচীন প্রথা পুনঃ প্রচলিত হইলে আমাদের স্বাস্থ্য ও অর্থ, উভয় বিষয়েই উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

মাঝে মাঝে ভাতের বদলে চাউলের গুঁড়ির (সরেদা) পিষ্টকাদি ব্যবহার করিলে একঘেয়ে খাওয়ার দোষ অনেক পরিমাণে কাটিয়া যায়। নারিকেল কোরার সহিত চাউলের গুঁড়ি মিশ্রিত করিয়া বিবিধ মুখরোচক পিষ্টক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদিগের কতকগুলি লবণাক্ত, অপরগুলি চিনি বা গুড় মিশ্রিত। আজকাল আমাদের গৃহে এরূপ পিষ্টকের ব্যবহার নিতান্ত বিরল হইয়াছে।

চাউলের সহিত দুধ, চিনি ও মেওয়া ফল মিশ্রিত করিয়া "পরমান্ন" প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরমান্ন অতিশয় মুখরোচক ও সারবান খাদ্য। আমাদের গৃহে ইহার নিত্য ব্যবহারের ব্যবস্থা হইলে আমাদের খাদ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে।

বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য "দাল ভাত" হইলেও আমাদের গৃহে ভাতের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক এবং দালের ব্যবহার অত্যন্ত কম। বাঙ্গালী দালে একটু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে ভয় পায়, কিন্তু এরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই। খুব বেশী দাল খাইলে অজীর্ণ ও পেটের পীড়া হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু পরিমিত মাত্রায় দাল ভক্ষণ করিলে কোন অনিষ্টপাতের আশঙ্কা নাই।

দাল।

দাল, মাছ মাংসের ন্যায় প্রোটীন্ জাতীয় পেশী-গঠক (Muscle-forming) খাদ্য। ভাতের মধ্যে প্রোটীন্ কম থাকে বলিয়া অন্নের সহিত মাছ, মাংস, ডিম, দুধ বা দাল ভক্ষণ করিয়া উহার অভাব পূরণ করিতে হয়। কিন্তু মাছ, মাংস, দুধ বা ডিম, প্রত্যেকটী মহার্ঘ পদার্থ। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মত গরীব দেশে সাধারণ লোকের পক্ষে উহার মধ্যে কোন একটি বস্তু যথোচিত পরিমাণে আহরণ করা দুরূহ। সুতরাং যথোচিত পরিমাণ প্রোটীন্ সংগ্রহের জন্য আমাদিগকে সাধারণতঃ দালের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। মাছ মাংসের মধ্যস্থিত প্রোটীন্ দালের প্রোটীন্ অপেক্ষা সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হইলেও দীর্ঘ অভ্যাসগুণে উত্তমরূপে প্রস্তুত দাল পরিপাক করিতে আমাদিগকে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না। খাদ্য-দ্রব্যের পরিপাক অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। তবে দাল উত্তমরূপে প্রস্তুত না হইলে উহা দুষ্পাচ্য হয়। দাল এরূপ ভাবে রন্ধন করা উচিত যে রান্না-দালের মধ্যে একটী বীজও পৃথক দেখা যাইবে না; উহা সম্পূর্ণ ভাবে গলিয়া যাইবে এবং কাঁটালের রসের মত গাঢ় হইবে, রান্নাদালের মধ্যে জল ও দাল পৃথক

পৃথক স্তরে অবস্থিতি করিবে না। পুনশ্চ দালকে শুদ্ধ সাধারণ রান্না-দালের আকারে না খাইয়া বড়ি, বড়া, পিঠা, ভাজা, ঘোঁকা, বেশম, বিবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকারে নিত্য নিত্য গ্রহণ করিলে অধিক পরিমাণ দালও আমাদের ভক্ষণ করা হয় অথচ "এক ঘেয়ে" রকমের আহারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আমাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং আহারে রুচি জন্মে। দাল হইতে বিবিধ মুখরোচক খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে আমাদের দেশের প্রাচীনা গৃহিণীগণ এখনও সবিশেষ সুনিপুণা আছেন। নবীনা গৃহিণীগণ তাঁহাদিগের নিকট হইতে এই সকল প্রয়োজনীয় খাদ্য-শিল্প শিখিয়া লইতে যেন ঔদাস্য প্রকাশ না করেন এবং এই উপায়ে পরিবারের মধ্যে যাহাতে দালের ব্যবহার কিছু বাড়িয়া যায়, সে বিষয়ে যেন সম্যক্ দৃষ্টি রাখেন।

দালের গুণ এই যে, দালে মাছ মাংস অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রোটীন্ থাকে। ইহা মাছ মাংস হইতে প্রায় চতুর্গুণ সস্তা। মাছ মাংসের মধ্যে নানা জাতীয় কৃমি (Parasitic worms) ও বিষাক্ত পদার্থ (Ptomaines) অনেক সময়ে লুক্কায়িত থাকে এবং ক্রয় করিবার পর ৮।১০ ঘণ্টার অধিক উহাকে রাখিয়া খাইবার উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত মাছ মাংস প্রভৃতি দ্রব্য উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া উহাদিগের সিকি হইতে অর্দ্ধ ভাগ পর্য্যন্ত হাড়, কাঁটা, ছাল, আঁইশ, অন্ত্র প্রভৃতির আকারে পরিত্যাগ করিতে হয়। দালের মধ্যে এ সকল দোষ বা অসুবিধা কিছুই নাই। উচিত মূল্যে উহাকে ক্রয় করিয়া উহার সকল অংশেরই আমরা ধীরে সুস্থে সদ্ব্যবহার করিতে পারি। মাছ মাংসের মত দাল অরন্ধন অবস্থায় কখনই বিকৃত হইয়া যায় না; সুতরাং আমাদের মত গরীব দেশে দাল যে কত প্রয়োজনীয় ও উপকারী খাদ্য, তাহা সহজেই পাঠক-পাঠিকাগণের উপলব্ধি হইবে।

হিন্দুস্থানীরা প্রত্যহ নানা আকারে প্রায় তিন ছটাক দাল খাইয়া পরিপাক করে। দালরুটি খাইয়া তাহাদের দেহ কিরূপ বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় এবং তাহারা কতদূর সাহসী এবং পরিশ্রমী ও কষ্টসহ, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। আমাদের ধনসম্পত্তি ও পরিবারভুক্ত মহিলাদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমরা হিন্দুস্থানী দ্বারবান নিযুক্ত করিয়া থাকি। ইহা আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও সাহসহীনতার পরিচয়। আমাদের জাতীয় খাদ্যের উন্নতি সাধিত হইলে আমাদের এই কলঙ্ক ঘুচিয়া যাইবে।

দালের মধ্যে মসুর ও মুগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ প্রোটীন্ থাকে। ছোলার দালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ মাখন জাতীয় পদার্থ (Fat) আছে। অরহর দালে প্রোটীনের ভাগ অন্য সকল দাল অপেক্ষা কম, কিন্তু লাবণিক পদার্থের (Salts) অংশ অত্যন্ত অধিক। মসুর দালের প্রোটীন্ অন্য সকল দালের প্রোটীন্ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; ইহা মাছ মাংসের প্রোটীনের সহিত প্রায় সমগুণ-সম্পন্ন।

দালের পরিপাচ্যতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ খাদ্যতত্ত্ববিদ্ ইংরাজ ডাক্তার হচিন্‌সন্ নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"If properly prepared, the pulses (various forms of *dal*) are absorbed into the intestines very thoroughly. Thus the proteid of pea or lentil is all taken up except about 8 or 9 per cent when 200 grammes (about 7 ounces or 3½ *chittaks*) are given daily. The proteid of pulses, *if given in a fine division*, is capable of very good absorption, considerably better than gluten (proteid of bread) when taken in the form of white bread",

ডাক্তার হচিন্‌সনের মতে দালের মধ্যে যে প্রোটীন্ থাকে, তাহা পরিপাক করা মোটেই কঠিন নহে। তবে দাল এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে উহা সম্পূর্ণ ভাবে গলিয়া যাইবে; রান্না-দালে একটী বীজও পৃথক্ ভাবে দেখা যাইবে না। আমাদের গৃহে যাঁহাদের উপর খাদ্যের ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত আছে, তাঁহারা যেন এই প্রয়োজনীয় কথাটী কোন মতে বিস্মৃত না হন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্যে

প্রোটীনের অংশ কম থাকে। দালে কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে এই অভাব অল্প খরচে ও সহজে পূর্ণ হইয়া যায়। হচিন্‌সন্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"As a cheap and efficient method of supplementing the deficiency of Nitrogen (i.e. protein) in a purely vegetable diet, the use of pulses (*dal*) is strongly to be recommended, and it is a pity that they are not more largely taken advantage of by those to whom economy is of importance, for unquestionably pulses are amongst the cheapest of foods, and a given sum will yield more protein if invested in them than in any other way".

তাঁহার মতে অল্প খরচে দাল ভিন্ন অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য হইতে আমরা যথোচিত পরিমাণে প্রোটীন্ সংগ্রহ করিতে পারি না। এইজন্য সকল দেশেই সাধারণ অবস্থার লোকে দাল অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে অর্থ ও সামর্থ্য, উভয় দিক হইতেই তাহাদিগের লাভবান্ হইবার কথা।

আস্ত ছোলা, মুগ বা মটর দুই দিন জলে ভিজাইয়া রাখিলে উহার অঙ্কুর নির্গত হয়। এই অবস্থায় এই সকল শস্যের মধ্যে ভাইটামিন "বি" অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই অঙ্কুরিত ছোলা প্রভৃতি প্রত্যহ ভক্ষণ করিয়া বেরি-বেরি রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

ভোরের দীপ

শ্রীমতী লীলা দেবী।

নিভিল সকল তারা
পূবের আকাশ রাঙা হ'য়ে এলো
পাখীরা দিয়েছে সাড়া।

গৃহকোণে দীপ সন্ধ্যায় ম্লান
নিভিয়া কখন হবে অবসান
মনে ভেবে চায় করুণ নয়ান
যেন দীন হীন পারা ;
ভোরের শুভ্র আলোক পরশে
মরমে হ'ল সে সারা !
আপন দৈন্য করিতে গোপন
মরিয়া সে চায় রাখিতে জীবন
প্রভাহীন ক্ষীণ মলিন আনন
খর খর কাঁপে শিখা,

নির্ম্মল নব উষার আলোক
তরুলতা তৃণে শিহরে পুলক
স্রষ্টার নামে দ্যুলোক ভূলোক
গাহে জয়গান লিখা !
দীপ ভেবে বলে "কত আমি দীন
অহমিকা ভরে গর্ব্ব-বিলীন
আমার শকতি আমাতে বিলীন
সংমোহ-মদে হারা !
ফুৎকারে মোরে নিভাও ধরার
গৃহবাসী আপনারা !"

চয়ন

—ব্যায়াম চর্চ্চা—

ব্যায়াম মানুষকে সুস্থ করিয়া থাকে। ব্যায়াম কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই করা আবশ্যক। স্ত্রীলোকদিগকে ব্যায়াম করিবার কথা বলায়—অনেকের হয়ত ইহা ভাল লাগিবে না। কিন্তু জগতে সুস্থ ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে স্বাস্থ্য ও শক্তি এই দুইই লাভ করিতে হইবে। পুরুষদিগেরও যেমন স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক—স্ত্রীদিগেরও তেমন স্বাস্থ্যবতী ও শক্তিশালিনী হওয়া প্রয়োজন। ব্যায়ামের দ্বারা স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আমাদের স্ত্রীজাতি যেদিন হইতে আমাদের পুরুষদিগের মত কর্ম্মবিমুখ হইয়াছেন সেইদিন হইতেই স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের মত অকালে মৃত্যুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিয়া লইয়াছেন। স্ত্রীজাতি যদি আবার পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করেন তাহা হইলে তাঁহাদের অনেকটা ব্যায়ামের কাজ হইতে পারে। স্ত্রী-জাতিকে অবরোধপ্রথা করিয়া না রাখিয়া যদি কিছু সময় বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করান যায় তাহা হইলে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে। আমাদের স্ত্রী-জাতির স্বাস্থ্য এত খারাপ যে একটী সন্তানের জননী হইলেই তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়—ইহা সকলেই যে লক্ষ্য না করিয়াছেন তাহাও নহে। ইহার মূল কারণ আমাদের মনে হয় সন্তানের কর্ত্তব্য পালনে অন্তঃপুরবাসিনী জননীগণ বেদিন হইতে সভ্যতার আলোকে—আলস্যে আরামে—বিলাসিতার বিমোহিনী সৌন্দর্য্যে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পথ হারাইয়াছেন সেইদিন হইতে তাঁহারা নারীর স্বাভাবিক শক্তি ও সৌন্দর্য্য সমস্ত হারাইয়াছেন।

যাঁহারা ব্যায়ামচর্চ্চার বিশেষ অভিজ্ঞ তাঁহারা যদি পুরুষদিগের মত স্ত্রী-জাতির সহজে কিরূপ ব্যায়াম করিলে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য অটুট থাকে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেন তাহা হইলে স্ত্রীজাতির অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের শিশুমৃত্যু সংখ্যারও হ্রাস হইতে পারে। —সাধক।

—মেয়েদের প্রতি শিক্ষকদের ব্যবহার—

কলিকাতা সহরে কয়েকটি উচ্চইংরেজী বালিকাবিদ্যালয় আছে। স্কুলের সঙ্গে মেয়েদের থাকিবার বোর্ডিং-হাউসও আছে। মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে এই স্কুলগুলি খুব দরকারী। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে মেয়েরা যেখানকার শিক্ষকদের ব্যবহার থেকে যে সব জিনিষ শিখতে আরম্ভ করে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ হয় ত কিছু জানেন না। জানিলেও অনেক সময়ে গা করেন না। এই মেয়ে-স্কুলের মাষ্টারেরা অনেকেই মেয়েদের প্রতি অত্যন্ত অভদ্রজনোচিত ব্যবহার করেন। নিজেদের সামান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একটু অসুবিধাও সহ্য করতে পারেন না। মেয়েরা অভিভাবকদিগকে বলিতে সাহস করে না। কারণ তারা জানে, অভিভাবক যদি মাষ্টারদের কাছে বা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করেন তাহলে মেয়ের আর রক্ষে নেই। সেই মাষ্টার তাহলে তাকে যত রকমে পারবেন নাকাল করতে চেষ্টা করবেন। অভিভাবকরাও অনেকে একথা জেনেই মেয়েদের মুখে মাষ্টারদের ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগের কথা শুনেও উচ্চবাচ্য করেন না। আর অভিযোগই বা করবেন কার কাছে? যাঁরা স্কুল, বিল্ডিংস্ বা সেক্রেটারিয়েটে থাকেন তাঁরা নিজেই হয় ত মেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন। তাঁকে শাসনায় কে? সাধারণের অর্থে এই সব স্কুলগুলি চলে, কিন্তু এসব স্কুল পরিচালন সম্বন্ধে সাধারণের কোনও মতামত চলে না। এমন কি, অভিভাবকদের কথাও ঐ সকল উচ্চশিক্ষিতের শিক্ষকেরা 'খোড়াই কেয়ার' করেন। কর্ত্তৃপক্ষও জানেন, একটা মেয়ে যদি গোলমাল বেশী করে, তাকে তাড়িয়ে দিলে কোনও ক্ষতি হবে না। মফঃস্বল থেকে তার জায়গায় আরও দশজন মেয়ে পড়তে আসবে।

সকল পিতামাতাই আজকাল মেয়েদের শিক্ষার দিকে মন দিয়াছেন। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তাঁরা মেয়েদের বোর্ডিংগুলিতে মেয়েদের রেখে তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু ঘটনা যে রকম দাঁড়াচ্ছে তাতে এই সব স্কুলগুলি সম্বন্ধে প্রকাশ্য ভাবে আলোচনা না করলে স্কুল ও শিক্ষাধিনী মেয়েদের মহৎ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। যাঁরা শিক্ষয়িত্রী তাঁরা যেন মনে না করেন যে, কতগুলি ইংরেজী চাল্, অবিনয় ও যথেচ্ছাচার শিক্ষা পাবার জন্যই অভিভাবকরা তাঁদের মেয়েদের স্কুলে, বোর্ডিং-এ ভর্ত্তি করেন। তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্তই মেয়েদের মন তৈরী করবে। মেয়েরা মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে তাঁদের কাছে থাকে। তাঁদের স্নেহ মমতাই তাদের ছাত্রজীবনে একমাত্র সম্বল। স্নেহদ্বারা যে শিক্ষা দেওয়া যায়, কঠোর শাসনে সে শিক্ষা দেওয়া যায় না। যে কারণেই হোক্, এই সকল শিক্ষয়িত্রীদের অনেকেই একটু রুক্ষ স্বভাব হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত, তাঁরা কত বড় সন্তানের ও দায়িত্বের পদ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের চিত্ত যত সরল থাকবে, মেয়েদের মনও তত কোমল, সরল ও উদার হবে। —বিজলী।

—বালবৈধব্যে মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ইয়ঙ্গ ইণ্ডিয়া পত্রে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

স্যর নারায়ণ চান্দাবরকর ও তাঁহার প্রস্তাবে প্রদেশের বিবাহ সংখ্যার একটী মূল্যবান্ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ তালিকা

প্রত্যেক সংস্কারকের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক। তিনি যে ক্রমানুসারে সংস্কার হওয়া উচিত বলেন, হয়তো অনেকে সে বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইবেন না। তিনি বলেন, প্রথম সমাজসংস্কার, দ্বিতীয় অর্থনৈতিক সংস্কার, তৃতীয় ধর্ম্ম বা রাজনৈতিক সংস্কার হওয়া উচিত।

সুতরাং আবশ্যকীয় সংস্কার সকল কি ধারায় কি ভাবে হওয়া উচিত, তাহা লইয়া সার গল্পারামের সহিত বাদানুবাদ করার আবশ্যক নাই। তাঁহার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংস্কৌষধির সহিত একমত না হইলেও কেহ তাঁহার সমাজসংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে বা করিতে পারেন না। তিনি বালবিবাহ যে সংখ্যা দিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ ভীতিপ্রদ। তিনি বলেন—"বাল্য বিবাহ ও বাধ্যতামূলক বৈধব্যের সংখ্যা দেখিয়া কে না কাঁদিবে?" ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীর হিন্দু-বিধবার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিধবার সংখ্যা—	১১৮৯২
৫ হইতে ১০ বৎসর " "	৮৫০৩৭
১০ হইতে ১৫ বৎসর "	২৩৯১৪৭
	৩২৯০৭৬

পূর্ণ দুই আদমসুমারীর সংখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। ১৯২১ সালের মোট সংখ্যা পূর্ণ দুই সংখ্যায় বিভক্ত। অন্য জাতির বিধবার সংখ্যাও দেওয়া আছে। তাহাতে হিন্দু বালবিধবার প্রতি অত্যাচারের আতিশয্যই প্রমাণ পায়। আমরা ধর্ম্মের নামে গোরক্ষার জন্য চীৎকার করি—কিন্তু বালবিধবারূপিণী নরগাভী রক্ষা করিতে অস্বীকার করি। আমরা ধর্ম্মরক্ষার ছলের আশ্রয় গ্রহণ করি, কিন্তু যাহারা বিবাহের অর্থ জানে না—এমন তিনলক্ষ বিধবার বৈধব্য বলপূর্ব্বক আবরণ করি। ক্ষুদ্র বালিকাকে বিধবা হইতে বাধ্য করা সাংঘাতিক অপরাধ, যাহার জন্য আমাদিগকে প্রত্যহ কলঙ্কভোগ করিতে হইতেছে। যদি আমাদের বিবেক প্রকৃতই জাগরিত হইত, তাহা হইলে বৈধব্যের কথা দূরে থাকুক, ১৫ বৎসরের নীচে বালিকার বিবাহই হইত না এবং আমরা ঘোষণা করিতাম যে—ঐ তিনলক্ষ বালিকার ধর্ম্মানুসারে বিবাহই হয় নাই। স্বামীদের অনুমরণকারিণীর আচরণে অবলম্বিত ঘোমটাকৃত বৈধব্য—জীবনের সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে, সংসার পবিত্র করে এবং ধর্ম্ম উন্নত করে। কিন্তু ধর্ম্ম ও লোকাচার উপন্যাসিত বৈধব্য অন্ধ অনর্থক। উহা শুধু পাপ দ্বারা সংসার অপবিত্র করে এবং ধর্ম্মকে অবনত করে।

—শ্রবণগুণ—

ছেরেতা যা গাবমাড়া—

(ক) আমাশায় রোগে—বাতাসার সহিত ২।৩ ফোঁটা এই গাছের রস (লাল রসের আঠা) দিবে ২ বার করিয়া সেবন করিলে ২।৩ দিনেই সারিয়া যায়।

(খ) পাঁচড়ায়—ঐ লাল রসের আঠা পাথরের গায়ে মাখিয়া জাল করিয়া ফেলাইয়া যা বেশ করিয়া ঘষিয়া লাগাইলে অল্পদিনেই নিরাময় হয়।

(গ) দাঁত কন্‌কনানিতে—অতে লাগাইবার প্রক্রিয়া মতে ঐ সকল আঠা দাঁতের গোড়ায় লাগাইলে অতি উপকার হয়। উহার জালে দাঁতন করিয়া দাঁত মাজিলে দাঁত মুক্তার ন্যায় পরিষ্কার ও গোড়া শক্ত হয়।

শরতের শোভা

শ্রী রামেন্দু দত্ত।

আজি, জ্যোৎস্নার হাসি উঠিয়াছে ভাসি'
শুভ্র নবনী সম,
স্নিগ্ধ শোভায় প্লাবি' কিসলয়
সান্ত্র রম্যতম।
দুলিয়া দুলিয়া সুনীল ফেনিল
শুভ্র মুকুট পরিয়া সলিল—
চলিছে ছুটিয়া কুলু কুলু কুলু
সুষমায় অনুপম!

কাশের রাশিতে বাঁশের বাঁশীতে
হুঙ্কারিছে সমীরণ,
মন্দ মধুর গন্ধ বহিয়া
নন্দিছে প্রাণ মন!
বহে নিরমল নদী-জলধার
চখা আজ ডাকে চখীরে তাহার,
বালুচরে আর সখাসখীদের
মিলন মেলাটি রম্য!

শেষ কথা

(ছোট গল্প)

শ্রীমতী সুধীরা মজুমদার।

রাত্রির মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া অশোক যখন অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল "মনীষা, মণি, একবার তোমার মুখখানা দেখি!"

তখনও প্রভাত হয় নাই, কিন্তু বেশী দেরীও ছিল না। সূর্য্য যদিও তখন পূর্ব্বদিগ্বধূর মুখাবরণ উন্মোচন করে নাই, তবুও উষারাণীর রাঙ্গা ওড়নাখানার রং লইয়া সারা আকাশ জুড়িয়া একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শুকতারা তখন আকাশের ভালে সদ্য বিধবার কপালের সিন্দুর-বিন্দুর মতই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। চাঁদের আলো মুমূর্ষুর মুখের ম্লান হাসির মত মিলাইয়া যাইতেছিল।

এমন সময় আলুলায়িত কুন্তলা মনীষা স্বামীর শিয়র হইতে উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া সম্মুখে আসিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "আমায় ডেকেছ কেন গো?"

"কে, মণি আমার? এসো কাছে এসো;—আমার সময় হ'য়ে এলো,—খোকা কোথায়?"

"সে-ত' ঘুমুচ্ছে।"

"আচ্ছা থাক্। শোন—আজ পাঁচ বছর তুমি আমার গৃহে লক্ষ্মীরূপা হ'য়ে এসেছ, কিন্তু তোমাকে ত এক দিনের জন্যও সুখ দিতে পারলাম না। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত ক'রলাম। এইটাই আমার বড় দুঃখ যে, তোমার মত স্বর্গের পারিজাত হেলায় নষ্ট ক'রলাম। তোমার কাছে পেয়েছি অনেক কিন্তু আমি এমনই যে, তার পরিবর্ত্তে দিলাম দারিদ্র্যের কাঁটার মুকুট মাথায় তুলে, তুমিও হাসিমুখে তা বহন ক'রছ। বল মণি, বল আমার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়?"

"আমার দুঃখ কিসে? আমার মত সুখী কে বলতে পার? না, না, তুমি অমন কথা বলে নিজেকে কষ্ট দিও না।"—বলিয়া মনীষা অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অশোক স্নেহের সুরে ডাকিল "মণি আমার, ছিঃ অমন ক'রে কেঁদে তুমি আমায় ব্যস্ত করে তুল না। লক্ষীটী, অত কেঁদনা, আমার শরীর বড় অস্থির কর্‌ছে। যাবার আগে তোমার সঙ্গে যে অনেক কথা শেষ কর্‌তে হবে। উঠ রাণী, আর আমার কষ্ট বাড়িও না, আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে।"

"আচ্ছা, আর কাঁদব না। কিন্তু জীবন-জোড়া কান্না যে আমার সাম্‌নে আস্‌ছে।"

"লক্ষীটী, চোখের জল মোছ। আমার জন্য ত তুমি সবই কর্‌লে—আমার জন্য সকল কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছ। আমারই জন্য তোমার রূপ যৌবন বিদ্যা ব্যর্থ হ'য়ে গেল, আমার জন্য—"

"ওগো চুপ কর, আর কেন ব'লছ—"

"দেখ মণি, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, বল্‌বে বল, বল বল্‌বে ত?"

"কি কথা গো, তোমাকে কেন বল্‌ব না?"

"তবে বল্‌তে হ'বে আজ কেন বঙ্গ-জোড়া এত শিক্ষিত যুবক থাক্‌তে তুমি আমার মত লক্ষীছাড়াকে সাথী কর্‌লে—"

"ওগো, তুমি কি আমায় ব্যথা দিতে এতই ভালবাস?"

"না মনীষা, তোমার ব্যথা যে দ্বিগুণ হয়ে আমারই বুকে বাজে। কাছে এসো মণি, কাছে এসো। একবার তোমার ঐ উদার বুকে আমায় জড়িয়ে ধর মনীষা। উঃ আর পারিনা যে—বড় কষ্ট—এসো মণি—"

"বড় কষ্ট হচ্ছে, না? তোমার বুকে হাত বুলিয়ে দেব?"

"দাও, দাও মণি, বড় তপ্ত এ বুক, তোমার ঠাণ্ডা হাতে ঠাণ্ডা হয়ে যাক্ রাণী—"

"আরাম লাগ্‌ছে?"

"আঃ—বড় আরাম, বড় আরাম, বড় সুখ। হুঁ, তার পর বল মণি, বল শুনি তোমার কথা।"

"শুন্‌বেই"—

"হাঁ নিশ্চয়ই—"

"নিশ্চয়ই শুন্‌বে? আচ্ছা বল্‌ছি তবে। সে অল্প দিনের কথা নয়, তবে বেশী দিনেরও নয়। আমি সেবার আই-এ পরীক্ষা দেই, সেইবার আমার জীবন-স্রোতটা একেবারে বদ্‌লে যায়। আমি ছোট বেলা থেকেই 'সুন্দর দেখ্‌তে' এই ধারণাটা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'য়ে যায়। কাজেই ফ্যাসনেরও চূড়ান্ত ছিল। সকলে আমার ফ্যাসনের কাছে হাত জোড় করে থাক্‌ত। যদি একটু ত্রুটি হতো অম্‌নি একেবারে হুলুস্থুল ক'র্‌তাম—"

"তুমি সেই মণি এই হ'য়েছ? তোমার সে সব কোথায় গেল মনীষা? এই হতভাগার জন্য তুমি সব ত্যাগ করে যৌবনে যোগিনী সেজেছ! উঃ এযে আমি সহ্য কর্‌তে পারি না মণি! একেই বলে অদৃষ্টের দারুণ পরিহাস।"

"ওগো, না, তোমার মণির সে দিন নেই, কেন কষ্ট পাচ্ছ? থাক্, বল্‌ব না।"

"না,না,বল মণি—"বলিয়া অশোক চোখের জল মুছিল।

"আচ্ছা বল্‌ছি। তারপর পরীক্ষার পর কলেজ থেকে ফিরে দেখি ঘরের মেঝেতে একটী আট ব'ছরের ছেলে ময়লা একটা একটা বিছানায় শুয়ে কাঁপ্‌ছে আর মা তাকে বসে খাওয়াচ্ছেন। অন্যান্য দিন কলেজ থেকে ফিরে সটান নিজের ঘরে চলে যাই। সেদিন জানিনা কেন, মার খোঁজে নিচে নেমে দেখ্‌লাম তিনি ঐ ছেলেটীর বিছানার ধারে। মাকে অন্য দিন হ'লে ধমক দিয়ে উঠিয়ে দিতাম। কিন্তু, সেদিন কেন জানিনা, আমি সেখান থেকে নড়্‌তে পার্‌লাম না। শিশুর মুখের "মা" ডাকে আমার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরবাসী স্নেহধারা উৎসের মত বেরিয়ে এলো, আমি হাঁটু গেড়ে তার শিয়রে বসে আস্তে আস্তে মাথাটী কোলে তুলে নিলাম। মা আমার কাণ্ড দেখে অবাক হ'য়ে রইলেন। যে আমি কোন দিন ভুলেও ছোট ভাইবোনদের কোলে নিই না, সেই আমি এই! মা অবাক হ'য়ে রইলেন। মাকে বল্‌লাম—মা, আমি এর সেবা করি না মা? তুমি যাও। মা বহু আপত্তি কর্‌লেন। কিন্তু সে আপত্তি বন্যার জলের ফেণের মত ভেসে গেল। মা চোখের জল মুছে উঠে গেলেন। তার পর আট দিন অক্লান্ত পরিশ্রমেও তাকে রাখ্‌তে পার্‌লাম না, সে শিকল কেটে মুক্ত হ'য়ে গেল। কিন্তু সে-ই আমার জীবনধারা বদ্‌লে দিয়ে গেল। জীবনে পেলাম নূতন আনন্দ। তখন বুঝ্‌লাম জীবনের সুখ ভোগে নয়—ত্যাগে। সেই আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, যিনি দরিদ্র—কিন্তু চরিত্রবান, তিনিই আমার স্বামী। এ বিদ্যা, এ রূপ সমস্তই তাঁর পায়ে উৎসর্গ কর্‌ব। তার পর কত বিদ্বান তার বিদ্যা নিয়ে, কত ধনী তার ধন নিয়ে, কত রূপবান তার রূপ নিয়ে আমায় বিয়ে কর্‌তে এলো। আমি ধনুকভাঙ্গা পণ নিয়ে বসে থেকে শেষে তোমার দেখা পেলাম,—আমার জীবনের সমস্ত নিঃশেষে তোমার পায়ে ঢেলে দিলাম—" বলিয়া মনীষা অশোকের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অশোক বলিল "মনীষা, মণি, তুমি এত মহৎ, এত উদার? অক্লেশে তোমার সব উজার করে আমায় ঢেলে দিলে। কিন্তু, পেলে কি?—দারুণ দরিদ্রতার কশাঘাত। এত মূর্খ আমি, নিজের ক্ষণিক সুখের জন্য তোমায় জেনেশুনে নিজের হাতে সব কেড়ে নিয়ে পথে বসিয়ে যাচ্ছি। ধিক্ আমাকে! মণি, ক্ষমা কর, উঃ বড় কষ্ট,—আর ত পারি না,—বল মণি, আমি কি ক্ষমা পাবারও অযোগ্য—"

"ওগো অমন করোনা, লক্ষ্মীটী, একটু শান্ত হও।"

"মণি, বল আমায় পেয়ে তুমি সুখী?"

"নিশ্চয়,তোমায় পেয়ে আমি খুব সুখী।"

"আঃ—বড় আরাম, বড় তৃপ্ত আমি। আমার মত অভাগাকেও এত ভালবাস তুমি? মণি, আশীর্ব্বাদ করি সতী তুমি, সাধ্বী তুমি, জগতের মা-হারার মা হ'য়ো, অন্ধকে পথ দেখিও, ক্ষুধিতের মুখে অন্ন, তৃষিতের মুখে জল দিও। উঃ—আর না—ভগবান! মণি, একবার এসো, শেষবার রাণী, শেষ হ'য়ে যাক্ এ জ্বালা, ম-ণি—"

"ওগো এম্‌নি করেই চলে গেলে" বলিয়া মনীষা অশোকের পদতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

তখন সূর্য্যদেব শত অশ্বের সোণার রথে চড়িয়া দিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

বাল-চিকিৎসা

শ্রী জয়সুন্দর দত্ত।

মাতৃ-মন্দির যাঁহাদের জন্য প্রচারিত হইতেছে, তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় মধ্যে যে বিষয়টী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আমি সেই বিষয় সম্বন্ধে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাতে যদি মাতৃগণের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, তাহা হইলে আমি সুখী হইব।

ঘরসংসার করিয়া বসবাস করিতে হইলে ছেলেমেয়েদের সাধারণ অসুখ বিসুখ প্রায়ই হয় এবং তজ্জন্য সকল সময় ডাক্তার কবিরাজ ডাকা সকলের পক্ষে ও সকল অবস্থায় সম্ভবপর হয় না, কারণ ইহা বায় বাহুল্য। আমাদের পল্লিগ্রামে স্মরণাতীতকাল হইতে ছেলেমেয়েদের জন্য কতকগুলি দেশীয় ঔষধ (Country medicine) তাঁহাদের জননীগণ গুরু পরম্পরায় ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্যজনক ফল লাভ করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে ব্যয় বাহুল্য এক রকম নাই বলিলেও চলে, অথচ ঔষধগুলি সহজপ্রাপ্য, বিশুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

বর্ত্তমানে ইউরোপীয় সভ্যতার ফলে ঐ সকল চিকিৎসা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আজকাল কেহ আর গাছগাছরা ছেঁচিয়া কুটীয়া কিম্বা তাহার বল্কল, পত্র, শিকড়, ফল, ফুল জলে ভিজাইয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়াইতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা ডাক্তারী ঔষধ ঘরে আনিতে পারিলে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের পক্ষে শীতপ্রধান দেশের উগ্রবীর্য্য ঔষধ অপেক্ষা দেশী গাছ গাছরার স্নিগ্ধবীর্য্য ঔষধ যে সমধিক গুণসম্পন্ন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত লোকেরও অভাব ঘটিতেছে।

আমি দেশীয় বাল-চিকিৎসার ঔষধগুলির গুণের কথা জানিতে পারিয়া কতকগুলি পরীক্ষার্থ নিজ পরিবারে ব্যবহার করি এবং তাহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়া তন্মধ্যে কয়েকটী সাধারণে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

ছেলেমেয়ের সর্দ্দি কফ প্রায়ই হয়। বিশেষতঃ শীতকালে ও স্নানের দোষে এবং মাতার আহার বিহারের দোষে,ইহা বেশী হয়। ঐ সকল দোষে যাহাতে না হয় মাতার সেই বিষয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শীতকালে ছেলেমেয়েদের শরীরে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তাহা করিতে হয়। স্নানের জল ছেলেমেয়েদের মাথায় রোদ এক পরিমাণে ও এক সময়ে দিতে হয়। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও সাবধান থাকিতে হয়।

সর্দ্দি

১। ছেলেমেয়েদের সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় দস্তকলসের তাজা ফুল (ব্রোণ ফুল) ৫০।৬০টা ছাগ দুগ্ধে ৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা ছাকিয়া দিনে ৩।৪ বার খাওয়াইতে হইবে। মাত্রা প্রতিবার ১ তোলা। ছাগ দুগ্ধের অভাবে মাতৃদুগ্ধ দিলেও হয়, অন্য দুগ্ধ নহে।

২। বাসকের সুপক্কপত্র ৫টী পরিষ্কার করিয়া ধৌত করতঃ পাথর বা মাটীর পাত্রে টুকরা টুকরা করিয়া আধ পোয়া নির্ম্মল গরম জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ৬ ঘণ্টার পর ঐ জল মধু বা মিশ্রী দিয়া খাওয়াইতে হইবে। পরিমাণ ।০ তোলা, দিনে ৩।৪ বার। খাটী সরিষার তৈল গরম করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় বুকে পিটে ধীরে ধীরে মালিশ করিয়া দিলে সর্দ্দি আর জমাইতে পারে না, সহজে বাহির হইয়া যায়। সর্দ্দির জন্য এই দুইটী ঔষধ ভিন্ন অন্য ঔষধের বড় দরকার হয় না, তবে সর্দ্দি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিলে কবিরাজ ডাকিতে হইবে।

আমাশয়

ছেলেমেয়েদের সময় সময় আমাশয় হইতে দেখা যায়, এবং তাহা এত মারাত্মক হয়:যে জীবন সংশয় ঘটে। আমাশয় হইলে কালবিলম্ব না করিয়া নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সেবন করাইলে অতি সত্বর আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

১। কালজামের ছালের রস ।০ আনা, গাভীর দুগ্ধ (দোহনের ২।১ মিনিট মধ্যে) ।০ আনা তাড়াতাড়ি একত্র মিশাইয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করাইতে হয়। ২।৩ দিনের বেশী ব্যবহারের দরকার হয় না। ছালগুলি গাছ হইতে উঠাইবার সময় ছুরি দিয়া ছালের উপরের

মথলা চাচিয়া লইতে হয়, তৎপরে ছাল উঠাইয়া পরিষ্কৃত পাথরে ছেঁচিয়া রস লইতে হয়। প্রত্যেক বার এই পরিমাণ খাওয়াইতে ও প্রস্তুত করিতে হয়।

২। ১টা কচি বেল টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সওয়া সের জলে মাটীর পাত্রে সরা ঢাকা দিয়া মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিতে হয়। তৎপর এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া কিছু ঘোল ও পুরাতন গুড় মিশাইয়া দিনে ৩।৪ বার ২ তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে। ২।৩ দিনেই আমাশয় সারিয়া যাইবে।

যদি আমাশয়ে রক্ত পাত হয় তবে উপরের ঔষধ দুটী সেবন না করাইয়া নিম্নলিখিত ঔষধটী সেবন করাইতে হয় তাহাতে রক্তামাশয় নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া যায়।

কুর্চির ছাল (কুটজের) ২ তোলা একটু ছেঁচিয়া তিন পোয়া নির্ম্মল জলে মাটীর পাত্রে সরা ঢাকা দিয়া মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করতঃ ৵০ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে একটু পুরাতন গুড় দিয়া আধ আনা পরিমাণ দিনে ৩।৪ বার সেবন করাইলে ভয়ঙ্কর রক্তামাশয় দূর হইয়া যায়। পুরাতন গুড় পাওয়া না গেলে নূতন গুড় (আকের) ২।৩ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া নিলেও চলে।　　৺

পেটের অসুখ

ছেলেমেয়েদের সময় সময় পেটের অসুখ হয়। বাসি দুধ, অধিক মিষ্টান্ন ইত্যাদি সেবন তাহার কারণ। ঐ রকম পেটের অসুখ হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ বেশ ভাল কাজ করে।

১। ভাল যোয়ান ২ তোলা ও ৬টা হরিতকী ছেঁচিয়া তিন ছটাক নির্ম্মল জলে পাথর বা মাটীর পাত্রে ৮ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপর ছাঁকিয়া আধ তোলা পরিমাণ অল্প লবণ দিয়া খাওয়াইয়া দিলে সাধারণ পেটের অসুখ দূর হইয়া যায়।

দুগ্ধপোষ্য ছেলেমেয়েদের পেটের অসুখে মাতার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে ঔষধেও কোন কাজ করে না। মার দুধই সন্তানের পথ্য, সুতরাং তার সারাংশ যাহাতে কুপথ্য প্রস্তুত না হয় তাহা বলাই বাহুল্য। ছেলেমেয়ের সর্দ্দি হইলে মা কলা, কামলা, কবুতর, ঘোল প্রভৃতি কখনই গ্রহণ করিবেন না। আবার আমাশয় হইলে গুরুপাক দ্রব্য যথা—ছোলা বা অড়হড়ের দাল, তৈলাক্ত মৎস মাংস ইত্যাদি খাইবেন না।

বরণ

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

আমার চোখের জল যদি হয় অফুরান,
মানিয়া লইব আমি সেও দেবতার দান।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
ব্যথা যদি বাস করে,
তবু না বলিব মোর সুখ শান্তি অবসান।

নিভৃতে একেলা বসি গাহিব আশার গীতি,
প্রতি কামনার বুকে ঢালিব প্রাণের প্রীতি।
সবারে মধুর স্বরে
ডাকিব আদর ক'রে,
আমার মমতা, স্নেহ উছলিত হবে নিতি।

তোমরা করিবে নিন্দা—ভালবাসা ভুলে যাবে,
আমারে আঘাত দিয়া হৃদয়ে আনন্দ পাবে।
তাই যদি কাম্য হয়,
কর—যাহা মনে লয়,
আমার নিকটে এসে বেদনা সার্থক হবে।

সমালোচনা

প্রসূতি-পরিচর্য্যা—ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রসূতির পূর্ব্বাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া গর্ভাবস্থায় নিয়ম পালন, সু-প্রসবের বিধান, ধাত্রীর নিয়ম পালন, শিশুপালন প্রভৃতি বিষয়গুলি পর পর অতি পরিষ্কার ভাবে সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। চিত্রগুলি সহজবোধ্য, বিশেষতঃ কয়েকটি চিত্র ফটোর সাহায্যে প্রস্তুত হওয়ায় অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। গ্রন্থে প্রসূতির সম্বন্ধে খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই। প্রসবের দিন নির্ণয়, অপরিপুষ্ট শিশুর খাদ্য ও তাহাকে খাওয়াইবার নিয়ম, রোগীর রিপোর্ট লিখিবার নক্সা প্রভৃতি বিষয়গুলির বিস্তারিত তালিকা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম হয়। পরিচর্য্যা-নীতির আনুসঙ্গিক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-নীতি যথাযোগ্য সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থের মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার নিবেদনে অতি সত্য কথা লিখিয়াছেন—"ভারতীয় মহিলাগণ লজ্জাবশতঃ স্ত্রীরোগ সম্বন্ধীয় কোন কথা কাহারও নিকট, এমন কি নিজ স্বামীর নিকটও প্রকাশ করেন না। এইজন্য রোগ কঠিন আকার ধারণ না করা পর্য্যন্ত অনেকক্ষেত্রেই তাহা চিকিৎসকের গোচরে আসেনা। এই কারণে এবং কতক গুলি প্রচলিত কুসংস্কারের দোষে দেশের স্ত্রীলোকেরা নীরবে কত কষ্ট সহ্য করেন।" বামনদাসবাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষক। তাঁহার এ প্রসূতি-পরিচর্য্যা গ্রন্থখানি এ শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ স্থান পাইবার যোগ্য। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই চমৎকার, মূল্য ২৲ টাকা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং ১৩২ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

সমাজরেণু—দেশের চিন্তাশীলগণ বলিতেছেন, বর্ত্তমানে রাজনীতি অপেক্ষা সমাজনীতির চর্চ্চা দেশের পক্ষে অধিক কল্যাণকর। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান ত্রুটি দেখাইয়া কৃতিত্বের সহিত কতকগুলি তীব্র-মধুর কবিতায় গ্রন্থখানি সজ্জিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার হৃদয়বান্ পুরুষ, তাই তাঁহার এ গ্রন্থ অনেক হৃদয় স্পর্শ করিয়া সমাজসংস্কারে ব্রতী হইতে উৎসাহিত করিবে। ব্রাহ্মণাদি আভিজাত্য সম্প্রদায় ইহা পাঠে আত্মত্রুটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন এবং নিম্নশ্রেণী বলিয়া কথিত জাতিসমূহ তাঁহাদের প্রকৃত স্থান নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শ্রেণী-সম্ভূত। তাঁহার গ্রন্থ-নিহিত মহান ভাবগুলি প্রত্যেক সমাজসেবীর অবশ্য পাঠ্য। প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৹ আনা।

বাঁকুড়া জেলার বিবরণ—বাংলার অধিকাংশ জেলার ইতিহাস প্রণয়ন হইতেছে ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। যশোর-খুলনার ইতিহাস, ঢাকার ইতিহাস, নদীয়া-কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাংলার ইতিহাসের প্রচুর মূল্যবান সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। বাঁকুড়া জেলার বিবরণখানি কৃতিত্বের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দবাবু বলিয়াছেন—"এই পুস্তকে লিখিত নানা তথ্য ও সংবাদ সকলেরই জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে।" শ্রীযুক্ত রামানুজ কর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা।

মাতৃ-পূজায় মানব ধর্ম্ম—চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৌদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জটিল ধর্ম্মতত্ত্বের এবং সমাজসমস্যার তথ্য গ্রন্থখানিতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার জানাইয়াছেন, তাঁহার স্বর্গীয় মাতৃদেবীর বিষয় কিছু লিখিতে যাইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রভাবে নানা কথা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। নামের সঙ্গে গ্রন্থের বিষয়ের বিশেষ সামঞ্জস্য না থাকিলেও গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুচ্ছুদ্দি প্রণীত। ঠিকানা—টেলিগ্রাফ আফিস রোড, চট্টগ্রাম। মূল্য ১৷৹ টাকা।

সাবান প্রস্তুত শিক্ষা—আমরা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সাবান প্রস্তুত শিক্ষা পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। সাবান প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। ইহাতে প্রত্যেকেরই বহু অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। পুস্তকের পরামর্শ অনুসারে আমরা নিজে নিজে ঘরে সাবান প্রস্তুত করিয়াছি। উহা দেশী বা বিলাতী সর্ব্বোৎ-

কৃষ্ণ সাবানের তুল্য গুণ সম্পন্ন হইয়াছে। এত উৎকৃষ্ট সাবান এত সহজে ঘরে বসিয়া প্রস্তুত করা যায় ইহা আমরা পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারি নাই। নরেন্দ্রবাবু উদ্যোগী দেশকর্ম্মী পুরুষ। ইহার এই সাবান প্রস্তুত শিক্ষা পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র হইলেও প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বে ইহা প্রত্যেক গৃহে আদরণীয় হইবে। ঠিকানা খুলনা বাজার (খুলনা)।

শান্তিজল—উপন্যাস। লেখক—নারায়ণ-সাহিত্য মন্দিরের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ নং রাধামাধব গোস্বামী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা। উপন্যাস-খানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। বিমাতা হইয়াও আদর্শ-নারী মহালক্ষ্মী দেবীর সপত্নী-পুত্রের প্রতি অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ, তরুণ জমীদার দেবব্রতের প্রাণভরা মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃপ্রেম, শক্তিমান যুবক সুধাব্রতের সৎসাহস, বৃদ্ধ জমীদার জীবনচন্দ্র রায়ের উদারতা ও গুণগ্রাহিতা—গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে অঙ্কন করিয়াছেন। চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার শক্তি যে গ্রন্থকারের যথেষ্ট তাহা গ্রন্থখানি একটু মন দিয়া পড়িলেই বুঝা যায়। বিশেষ করিয়া দেবব্রতের চরিত্রে তিনি একাধারে যে কঠোর ও কোমল ভাবের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। গ্রন্থকারের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিও চমৎকার। বঙ্গবাণী-মন্দিরের এ শান্তিজল পাইয়া সকলেই পরম পরিতৃপ্ত হইবেন, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

সীতা—প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ। গ্রন্থকার সুমধুর ভাষায় সীতাদেবীর আদর্শ চরিত এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দু মহিলার পাঠের উপযোগী উপাখ্যান-গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি অল্পই আছে, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রবাবুর 'সীতা' সে অভাব অনেকাংশে পূরণ করিয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে মহিলাগণ একসঙ্গে আনন্দ ও উপদেশ দুই-ই পাইবেন। এ্যান্টীক কাগজে পরিষ্কার ছাপা, মলাট, ছবি সবই চিত্তাকর্ষক। আমরা এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

দেশবন্ধুর বজ্রবাণী—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত। মূল্য ।৹ আনা। প্রবাসী কার্য্যালয় ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। লেখক পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কতকগুলি অমূল্য বাণী ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এই গ্রন্থে সঙ্কলন করিয়াছেন। যে অমর আত্মা মহাপুরুষের শেষ নিঃশ্বাসটি পর্য্যন্ত দেশমাতৃকার কল্যাণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে তাঁহার বাণী দেশবাসীর প্রাণে প্রাণে মৃতসঞ্জীবনী ধারা সিঞ্চন করুক—ইহাই প্রার্থনা। আশা করি বাংলার তরুণসম্প্রদায় এ বজ্রবাণী সংগ্রহ করিতে ভুলিবেন না।

শ্রীশ্রীশিবপূজা-বিধি—লেখক পণ্ডিত শ্রীসারদা-চরণ শাস্ত্রী, কাব্যজ্যোতিস্তীর্থ। প্রকাশক—শ্রীনোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সারদা পুস্তকালয়, ৮৪।১ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৵৹ আনা। গ্রন্থকার সহজবোধ্য ভাষায় শিবপূজা পদ্ধতি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই শিবপূজাবিধি একখানি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ইহার সাহায্যে অল্প শিক্ষিতা পুরনারীরা সহজেই শিবপূজা করিতে পারিবেন।

রঘুনাথ—শিশু সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাহিত্যভূষণ রচিত রঘুনাথের সরল সংক্ষিপ্ত জীবনী। রঘুনাথ বাংলার গৌরব—রঘুনাথের জীবনী আদর্শ চরিত। গ্রন্থকার সুললিত ভাষায় বাংলার সেই কাণা ছেলে—ভারতের পণ্ডিতকুলের মুকুটমণি রঘুনাথ শিরোমণির জীবনী ছেলেদের উপযোগী করিয়া রচনা করিয়া তাহাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বালকগণ এ গ্রন্থ পাঠে একাধারে আনন্দ ও উপকার দুই-ই পাইবে। রঙিন কালিতে ঝরঝরে ছাপা, ছবি, কভার সবই সুন্দর। মূল্য ।৹আনা মাত্র। প্রকাশক—কুলজা সাহিত্য-মন্দির, পোঃ নর্ত্তন; ঐহট্ট। প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতার সিটি বুক সোসাইটি, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ও অন্যান্য প্রধান প্রধান দোকান।

শ্রীচৈতন্য—কুলজা সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাহিত্যভূষণ মহাশয়ের শিশুদের উপযোগী আর একখানি জীবনী-গ্রন্থ। গ্রন্থখানির ভাষা অতি সরল; ছাপা, কাগজ, ছবি, মলাট সবই চিত্তাকর্ষক। ছেলেদের জন্য পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যদেবের যত-

গুলি জীবনী বাহির হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এখানিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যায়। গ্রন্থখানির বহুলপ্রচার কামনা করি। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ও ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীটের সিটি বুক সোসাইটিতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৵০ আনা।

অদ্বৈতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমিয়কান্তি দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—কুলজা সাহিত্য-মন্দির। প্রাপ্তিস্থান—সিটি বুক সোসাইটি। মূল্য ।৵০ আনা। নদীয়া-গৌরব, জ্ঞান ও ভক্তির অবতার শ্রীমদ্বৈত প্রভুর অমিয় জীবনকাহিনী ছেলেদের উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় লেখা। রঙিন কালিতে সুন্দর করিয়া ছাপা, ছবি ও মলাটি চমৎকার। নির্ম্মল-মতি শিশুদের হাতে হাতে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক।

ঠাকুরবাণী—শ্রীহট্ট-গৌরব ভক্ত বাণীনাথের অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত শিশুদের জন্য মিষ্টি করিয়া লেখা। এই গ্রন্থ পাঠে ছেলেরা শিক্ষা ও আনন্দ দুই-ই পাইবে। লেখক শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ শিশুসাহিত্য রচনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, ছবি ও রঙিন মলাট সবই সুন্দর। মূল্য ।৵০আনা। কলিকাতার সিটি বুক সোসাইটি ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। প্রকাশক—কুলজা সাহিত্য-মন্দির, পোঃ নর্ত্তন, শ্রীহট্ট।

শিশুসাহিত্য প্রচারে কুলজা সাহিত্য-মন্দিরের এ উদ্যম ও যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহাদের রঘুনাথ, শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈতাচার্য্য, ঠাকুরবাণী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি যেমন সুনীতি পূর্ণ তেমনি আনন্দদায়ক। উপহার ও পারিতোষিক প্রভৃতিতে কাল্পনিক গল্পের বই না দিয়া এই সব মহাপুরুষ চরিতগুলি দান করিলে ছেলেরা পরম উপকৃত হইবে।

মায়ের আশা

শ্রীমতী কামিনী রায়, বি-এ।

(১)

যে সুরে মোর উঠেনি গান
অবাধ কণ্ঠে তুমি তা গাবে,
যে উচ্চ পথে পারিনি যেতে
সে পথে তুমি সহজে যাবে;
যে ফলে শুধু বাড়ায় হাত
তুমি তা পাবে, তুমি তা পাবে।

(২)

একটি ছোট বীজে যেমন
বনস্পতি জীবন পেয়ে
লক্ষ বীজে, অঙ্কুরে তার
ধরায় পারে ফেলতে ছেয়ে,
তেমনি তুমি একটা মায়ের
একটা বুকের আশা নিয়ে
লক্ষ বুকে বুনবে আশা
সাধন দিয়ে সিদ্ধি দিয়ে।

বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণের তালিকা (১৯২৬)

নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন—

অনার্স, ইংরাজী—

এড্‌না আড্ডি	(২য় বিভাগ) ...	ডায়োসেসন কলেজ
শান্তি দাস	(২য় বিভাগ) ...	"
সুধীরা রায়	(২য় বিভাগ) ...	নন-কলেজিয়েট
নীলিমা বসু	(২য় বিভাগ) ...	বেথুন কলেজ
মনীষা দত্ত	(২য় বিভাগ) ...	"
শোভনা দত্ত	(২য় বিভাগ) ...	"
লীলা দে	(২য় বিভাগ) ...	ডায়োসেসন কলেজ
স্নেহলতা মুখো	(২য় বিভাগ) ...	বেথুন কলেজ

অনার্স, সংস্কৃত—

পুষ্পময়ী বসু	(২য় বিভাগ) ...	বেথুন কলেজ

অনার্স, ফিলজফি—

শান্তা চৌধুরী	(২য় বিভাগ) ...	বেথুন কলেজ

অনার্স, গণিত—

পরিমল সেন গুপ্ত	(২য় বিভাগ) ...	বেথুন কলেজ
সুষমা পাইন	(২য় বিভাগ) ...	"

বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণা—

ঘনজ্যোৎস্না ভট্টাচার্য্য	...	বেথুন কলেজ
বাসন্তী দাশ গুপ্ত	...	"
সুখলতা দাশ গুপ্ত		"
করুণাকণা দত্ত		"
আশালতা সরকার		"
মীরা সরকার		"
নোলা ভাজুর টীলতা	...	"
কণিকা চৌধুরী	...	ডায়োসেসন কলেজ
মতিদ ভান্		"
ভরোথি কবরেট্	...	নন্-কলেজিয়েট্
সত্যবতী দুবে		"

পাস-কোর্স—

অমিয় বসু	...	নন্-কলেজিয়েট
লাবণ্যলতা চন্দ		"
হৃদয়বালা চৌধুরী		"
বীণাপাণি দাশ গুপ্ত		"
অমিয়া দত্ত		"
জ্যোতির্ম্ময়ী বসু	...	বেথুন কলেজ
সুষমা বসু		"
লিংদোহা বেট্‌সিসন		
মলিকা চৌধুরী		
নীহারবালা দাশ		
প্রতিভা দাশ গুপ্ত		
ভারতী দেবী		
সতিকা ঘোষ		
প্রভা মজুমদার		
রেণুকা দাশ গুপ্ত	...	ডায়োসেসন কলেজ
বীণা দে		"
অনোদি কেনোয়ার		"
প্রেমকুসুম মণ্ডল		"

আই-এ পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্তা ছাত্রীদের তালিকা [১৯২৬]

নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই-এ পরীক্ষায় ২০৲ টাকা হারে মাসিক বৃত্তি পাইয়াছেন—

সাধনা বসাক	বেথুন কলেজ	সুধা ঘোষ ...	ডায়োসেসন কলেজ
সুরমা মিত্র	"	ক্যাথলিন নেহাপিট...	লরেটো হাউস্
শোভনা চৌধুরী	"	ভায়োলেট্ রক্সিস্ ...	"
তিলোত্তমা দাস	"	কুকা ভীনা	"
কল্যাণী দাস	"	হাজেল ডের	"
লিলি সেন	ডায়োসেসন কলেজ	এনিডলা-ফস্ট্	"
নীতা মুখোপাধ্যায় ...	"		

নানা কথা

মহিলা-ব্যায়াম-ক্রীড়াভিনয়—

গত ৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা-ইউনিভার্সিটি-ইন্সটিটিউশন-হলে মহিলা-ব্যায়াম-সমিতির উদ্যোগে বিদ্যালয়ের মেয়েদের একটি ব্যায়াম ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা প্রদর্শিত হয়। কলিকাতার বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী বালিকা-বিদ্যালয়ের সমূহের বহু বালিকা অতি আশ্চর্য্যজনক বহুবিধ ব্যায়াম কৌশল দেখাইয়া দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। লাঠিখেলা, অসিখেলা, ছোরা চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ, বক্সিংখেলা প্রভৃতি এতই সুন্দর ভাবে খেলান হইয়াছিল যে, এই প্রথম ক্রীড়াভিনয় বালিকাদের দ্বারা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা আশা করি নাই। বাঙ্গালী বালিকা চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সের উপরের ছিল না, কিন্তু হিন্দুস্থানীদের মধ্যে ছাত্রী ব্যতীত শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে অনেক বয়স্কা মহিলা অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ সব ক্রীড়া দেখিবার সময় আমাদের দুর্গাবতী, কর্ণদেবী, কল্যাণবাই প্রভৃতি রাজপুত বীরনারীদের কথা মনে পড়িতেছিল। অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে মেয়েরা ক্রীড়ার সহিত ও অসিখেলার সহিত সঙ্গীত গাহিয়া সভাস্থ সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। মেয়েদের মধ্যে এইরূপ ব্যায়াম ক্রীড়া ও অনুষ্ঠানের প্রদর্শন বাংলায় এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। এই শ্রেণীর ব্যায়ামশিক্ষার সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের যে সন্দেহ ছিল, ইহারা সে সন্দেহ দূর করিয়াছেন। আমরা আশা করি এই মহিলা-ব্যায়াম-সমিতি বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই সকল ক্রীড়া দেখাইয়া বালিকাদের ব্যায়াম-শিক্ষার সহায়তা করিবেন।

নারীকল্যাণে নারীর দান—

স্বর্গীয় পরাণচন্দ্র দত্তের পত্নী শ্রীযুক্তা হরিমতি দত্ত বিংশ বিধবাদের শিক্ষাদানার্থ 'বিদ্যাসাগর-বাণীভবনে' পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই দান তিনি তাঁহার স্বর্গীয় স্বামী পরাণচন্দ্র দত্তের স্মৃতিরক্ষা উপলক্ষ করিয়া দিয়াছেন। এই মহিলা যখন বাণী-ভবনের আরম্ভকালে আরও দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। বাংলার নারী-প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন জাগ্রত হইতেছে, পুণ্যবতী নারীদের মনের হস্তও তেমনি মুক্ত হইতেছে দেখিয়া আমরা বড়ই আশান্বিত হইতেছি।

ঢাকায় নূতন বালিকাবিদ্যালয়—

ঢাকা সহরে আর একটি নূতন উচ্চইংরাজী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহার প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন শ্রীযুক্তা সুপ্রভাত রায়, বি-এ। শিক্ষা সম্বন্ধে সুপ্রভাত রায়ের প্রতিভা আছে। তিনি দীর্ঘকাল স্বামীর সহিত ইংলণ্ডে সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছেন। লণ্ডনের একটি উচ্চশ্রেণীর কলেজে তিনি বহুকাল শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইয়োরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষালাভের বাহ্যে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। এরূপ শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিদ্যালয় যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিবে ইহা আমরা খুবই ভরসা করি।

ধর্ম্মের উপর দেশ—

বিশ্বের প্রতিনিধি বিদুষী মহিলা জাকেরা সুলেমান সম্প্রতি ভারতে আগমন করিয়াছেন। এলাহাবাদের নীচার পত্রিকার সম্পাদকের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"যদি ভারতের মুসলমানগণ ইসলামের শিক্ষার প্রতি আর একটু মন দেন তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ধর্ম্মের মধ্যে অত্যাচারের কোন স্থান নাই। ভারতীয় মুসলমানগণ কোরাণের মর্ম্ম আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে আর কোন অশান্তি ঘটিবে না।" তিনি বলেন,—"দেশের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে ধর্ম্মের উপরে।" বিদুষী মহিলার এই উপদেশ ভারতের হিন্দু-মুসলমানাদি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রণিধানযোগ্য। এই ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা কলিকাতা প্রভৃতি ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিবেন।

শিক্ষায় অসমদর্শিতা—

বোম্বাই সরকার প্রচার করিয়াছেন যে, যে সকল বিদ্যালয় সাধারণের অর্থে পরিচালিত হয় তাহাতে যদি অনুন্নত শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগকে পড়াশুনা করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বিদ্যালয়ে সাধারণের অর্থভাণ্ডার হইতে আর সাহায্য দেওয়া হইবে না। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলি যে সকল বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন সেই সকল বিদ্যালয়ে উক্ত নিয়ম প্রচলিত করা হইতেছে। সংবাদটি সুখের বটে, তবে আমাদের দুঃখ এই—এইরূপ দেশের কল্যাণকর কাজগুলি আমাদের দেশাত্মবোধের ভিত্তির উপর না হইয়া সরকারের বাধ্যতামূলক আইনের ভিত্তির উপর হইতে চলিল! আমাদের আর উন্নতির আশা কোথায়?

সংস্কারের প্রভাব—

বিশ্বের পার্লিয়ামেণ্ট-সূত্রের সভায় একটি অধিবেশনের সময় একটি পেঁচা সেই ঘরে প্রবেশ করাতে সভ্যগণ ইহা অমঙ্গলসূচক মনে করিয়া সেদিনকার মত সভা বন্ধ রাখেন। আমাদের ভারতে এই রকম বহু বহু সংস্কার আছে। বিশেষতঃ মেয়েমহলেই সেগুলি বেশী পরিমাণে প্রতিপালিত হয়। এগুলিকে কুসংস্কার বলা যায় কি না জানি

আমরা তাহার উত্তর দিতে পারি না। তবে ইহা অসঙ্কোচে বলা যায়, যেখানে যত মনের দুর্বলতা সেখানেই তত অনুষ্ঠিতা।

ভাওয়ালের ছোটরাণী-মা—

সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন বিস্তৃতি করে এবং পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের উন্নতি করে ভাওয়ালের ছোটরাণী শ্রীযুক্তা আনন্দময়ী দেবী সমাজের গৃহনির্ম্মাণ জন্য দশ হাজার এবং স্থায়ী অর্থভাণ্ডারে ত্রিশ হাজার, মোট চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার হিন্দুবিধবা-হৃদয়ের কার্য্যও রাণীমাতার মহানুভূতি আকৃষ্ট হইয়াছে। সেখানেও তিনি আট-দশ হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে রাজোচিত দান বলিতে পারেন কিন্তু আমরা বলিব ইহা নারীর মহানুভবতা।

সঙ্গীতে কৃতিত্ব—

সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীতে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি পাইয়াছেন এবার—বোম্বাই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিসেস্ বহুরাই। পরীক্ষক মহাশয় এই মহিলার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যাবতীয় কলাবিদ্যায় নারীজাতিই যে পুরুষের চেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন ইহার আর বৈচিত্র্য কি? তবে আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ভারতের মেয়েরা এই সকল বিষয় শিক্ষালাভের খুব কমই সুযোগ পাইয়া থাকেন।

লেডি-ষ্টিফেন্‌সন্‌এর দান—

বাংলার অস্থায়ী গভর্ণরের সহধর্ম্মিণী লেডি-ষ্টিফেন্‌সন্ ঢাকা বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিতে গিয়া সেখানকার সুতা কাটা, বয়ন কার্য্য, রন্ধন এবং গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। আশ্রমের উন্নতিকল্পে তিনি দুইশত টাকা দান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি বাংলার আর আর অঞ্চলের মহিলা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিও এরূপ বদান্যতা দেখাইবেন।

যৌতুকে নূতনত্ব—

বগুড়া জেলায় একটি বিবাহে কন্যা পক্ষ হইতে কন্যাকে অন্যান্য যৌতুকের সহিত একখানি ছোরা প্রদত্ত হইয়াছে। বিবাহের পর স্থানীয় হিন্দুসভার সভাপতি মহাশয় কন্যার হস্তে ঐ ছোরা প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে উহা আজীবন ধারণ করিতে এবং আবশ্যক হইলে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন। আজকাল অনেক স্থলে বিবাহ সভায় কন্যাকে চরকাও যৌতুক রূপে দেওয়া হইতেছে। শুভ লক্ষণ বটে, তবে এই সকল জিনিষ কেবল যৌতুকের সামগ্রী না হইয়া ব্যবহারের সামগ্রী হইলেই সুখের বিষয়।

নারীর মর্য্যাদা রক্ষা—

বরিশাল জেলার অন্তর্গত গুইয়া নামক গ্রামে একজন হিন্দু ভদ্রলোকের গৃহ আক্রান্তের পিস্তল ছাড়িয়া তাড়িয়া দিতে যায়। ঐ পিস্তলের সঙ্গে একজন মুসলমান সর্দ্দার ছিল। ঐ মুসলমান যখন হিন্দুভদ্রলোকের মাথার হাত ধরিয়া করে তখন ভদ্রলোকটি অস্ত্রাঘাতে মুসলমানটিকে বিদ্ধ করেন। যথাসময়ে হিন্দুভদ্রলোকটি হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে বিচারক (জন মিঃ কার্টার) অপরাধীকে ছয় মাস কারাদণ্ড এবং পাঁচশত টাকা জরিমানা করেন। জজ সাহেব রায়ে বলিয়াছেন—"বস্তুতঃ একজন লোকও যে নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহার জন্য আমি এই লঘু দণ্ড বিধান।" মুসলমান অভীত হইলে সহরের লোকেরা চাঁদা করিয়া জরিমানার টাকা দিয়া লোকটিকে মুক্ত করিয়াছেন।

রামচন্দ্রপুর আর্য্য-আশ্রম—

ময়মনসিংহ রামচন্দ্রপুর আর্য্য আশ্রমের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আশ্রম হইতে বর্ত্তমান বর্ষে ২৫০টি বালক ও ৫০টি বালিকা বিভিন্ন বিষয়ে গুণানুসারে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

রন্ধন প্রতিযোগিতা -

ঢাকা বিভাগের উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় সমূহে বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তকের পরীক্ষা ব্যতীত রন্ধন-প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দেবার সুযোগ আছে। পরীক্ষার্থিনীগণকে যেমন কাগজে লিখিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তেমন পাক করিয়াও দেখাইতে হয়। বরিশাল বালিকাবিদ্যালয়ের তিনটি বালিকা এ বৎসর উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ট্রামে মেয়েদের সুব্যবস্থা—

কলিকাতায় ট্রামে মেয়েদের বসিবার সুবিধার জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রথম দুইখানি বেঞ্চ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার জন্য মাতৃ-মন্দিরের পক্ষ হইতে অনেক লেখালেখি করায় ট্রাম কোম্পানী এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন। আপাততঃ এসপ্লানেড হইতে কালীঘাট লাইনে এবং শ্যাম বাজার, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে মেয়েদের পৃথক বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে রেল-ষ্টীমার প্রভৃতিতে মেয়েদের গতিবিধির যে সকল অসুবিধা আছে সেই সকলের প্রতিবিধানার্থ স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিলে অনেকাংশে সফল হইতে পারেন।

নারী-যাত্রীর সুবিধা—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে অনেক স্ত্রীলোক গতিবিধি করিয়া থাকেন। অনেক সময় তাঁহাদের একাকী টিকিট

ক্রয় করিতে হয় পুরুষের সমান আনা সাড়ে তিন করিতে হইত। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, বেল কোম্পানী হাওড়া ষ্টেশনে এই সব তৃতীয় শ্রেণীর নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক টিকিট ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

আঠার ফিট দীর্ঘ লম্ফ—

লণ্ডনের ষ্ট্যাম্‌ফোর্ডব্রীজ ক্রীড়া-প্রদর্শনীতে মিস্ পাম নামক একটী যুবতী আঠার ফিট দীর্ঘ-লম্ফ (Long Jump) দিয়া দর্শক-মণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। এরূপ দীর্ঘ লম্ফ পৃথিবীতে আর কোন স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই।

বন্দীদের মাতৃ-পূজা—

মান্দালয় জেলে বাঙ্গালী রাজবন্দীগণ গত বারের মত এবারেও দুর্গা পূজা করিবার আয়োজন করিতেছেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—প্রতিমা তৈয়ারী হইতেছে। বাঙ্গালীর ছেলে, মায়ের পূজার সময় আসিলে তাহার প্রাণটা নাচিয়া উঠিবেই। সন্তানের এ মাতৃ-পূজা সার্থক হউক।

রেলে মেয়েদের কক্ষ—

কোন সংবাদপত্র প্রস্তাব করিয়াছেন,—রেলওয়ে ট্রেণের যে সকল কক্ষ নারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেগুলি একটি পৃথক বর্ণে রঞ্জিত করা হউক—যেন দূর হইতে স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের কক্ষ সহজেই চিনিয়া লইতে পারেন। রেল কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে মনোযোগ হইতে অনুরোধ করি।

সত্যাগ্রহ আশ্রমে জর্ম্মাণ মহিলা—

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আশ্রমে মিস্ মেড্ নামী জনৈকা ইংরাজ মহিলার বর্ষপ্রাপ্তা ও জলসেবার কথা আমরা মাতৃ-মন্দিরে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি জার্ম্মাণ হইতে আর একটি মহাপ্রাণ মহিলা এই আশ্রমে আসিয়া মহাত্মার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার নাম মিস্ হলকিচ। ইনি বলেন, সত্যের অনুসন্ধানে তিনি এই সুদূর দেশে আসিয়াছেন। ইনি আশ্রমে হাসপাতালের সেবা করিতে প্রস্তুত। পৃথিবীর যেখানে যত বড় শক্তিই থাকুক না কেন সত্যের কাছে আসিয়া সকলকেই মাথা নত করিতে হইবে।

নারী কয়েদী—

গত ১৯২৯ খৃঃঅব্দে ৪৪৮ জন নারী কারাগারে গিয়াছে। গত পূর্ব্ব বৎসরে সেই স্থানে ৪২৭ জন নারী কয়েদী ছিল। ১৯২৯ সালে নারী কয়েদীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। এই কয়েদীর মধ্যে হিন্দুনারী ২৫০ জন এবং মুসলমান নারী ১৩০ জন, ১জন খ্রীষ্টান, ৬৮ জন অন্য শ্রেণীর। নারী কয়েদীদের মধ্যে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে, অপরাধজনক কার্য্য করিবার ইচ্ছা ২২ বৎসর হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যেই বেশী। এই নারী কয়েদীদের মধ্যে ৯ জন লেখাপড়া জানে, এক জন পণ্ডিতা জানে। ৬৩৮ জন লেখাপড়া জানে না। শেষোক্ত কথা দুইটি হইতে বোঝা যায় যে, যে বয়সে নারীদের চরিত্রগত অপরাধে ধরিবার সম্ভাবনা, সেই বয়সের নারী এবং অশিক্ষিতা নারীদের মধ্য হইতেই অধিকাংশ বন্দী জেলে গিয়াছে।

কমলা পাঠশালা—

গত ৭ই সেপ্টেম্বর আমরা বন্ধু জেলেপাড়া লেনস্থ কমলা পাঠশালার দ্বিতীয় বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সভা দেখিতে গিয়াছিলাম। সভায় ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গীত, আবৃত্তি, অবাক-অভিনয় প্রভৃতি বড় সুন্দর হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল-অনুযায়ী বিশিষ্ট পুস্তক পারিতোষিক ব্যতীত সঙ্গীত আবৃত্তি প্রভৃতি এবং সৎ স্বভাব চরিত্রের জন্য কয়েকটি বালিকাকে রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইয়াছিল। বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দুমিতা রায়ের চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত—

কষ্টিক সোডা (৭০—৭৫° ডিগ্রী শক্তি বিশিষ্ট)		/২ সের
জল		/৩ সের
ভাল মহুয়া		/১০ আড়াই সের
মহুয়া গুলিবার জল		/২ সের
নারিকেল তৈল	...	/৩ সের

একটি মাটির বা টিনের পাত্রে জল লইয়া তাহাতে কষ্টিক সোডা মিশাইবেন। যতক্ষণ না কষ্টিক সোডা গলিয়া জল ঠাণ্ডা হয় ততক্ষণ মাঝে মাঝে একখানা টিনের হাতা দ্বারা নাড়িবেন। মহুয়া অপর একটি পাত্রে জলে উত্তমরূপে গুলিয়া তৈলের সহিত মিশাইবেন। এইবার ঐ সোডা মিশ্রিত জল অল্প অল্প করিয়া মহুয়া মিশ্রিত তৈলের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবেন। সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত এই মিশ্রিটই সাবান। মিশ্রিত সাবান একটু ঘন হইয়া আসিলে ইচ্ছামত সাইজের ছাঁচে ঢালিবেন। কয়েক ঘণ্টা ছাঁচে রাখিবার পর ঠাণ্ডা হইলেই উৎকৃষ্ট কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত হইবে।

গত ভাদ্র সংখ্যা মাতৃ-মন্দিরে আমরা উপরোক্ত বিষয়টি প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং মহুয়ার পরিবর্ত্তে আধ সেরের স্থলে আধপোয়া তিল তেল ছাপা হইয়াছিল। পাঠক পাঠিকাগণ ভ্রান্ত সংখ্যা সংশোধন করিয়া লিখিয়া রাখিবেন। কষ্টিক সোডা কলিকাতা বনফিল্ড্ লেনে ষটচন্দ্র পাল প্রভৃতি কেমিষ্টদের দোকানে পাওয়া যায়। সাবান প্রস্তুত সম্বন্ধে আর আর বিষয়ের জন্য ডাক টিকিটসহ খুলনা বাজারে ৺মহেন্দ্রনাথ বসুর নিকট পত্র লিখিলে উত্তর পাওয়া যাইবে।

প্রকাশক—ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্
৩৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৪র্থ বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৩৩ | ৮ম সংখ্যা

দেবী আমার

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

প্রভাতে সদ্য-গোময়-প্রলেপনী হস্তে গৃহাঙ্গন নিকণে নিযুক্তা তোমার কর্ম্মিষ্ঠা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার দিবসের প্রথম শ্রদ্ধা তোমাকে অর্পণ করি।

আবার দিবসান্তে যখন তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়া তুমি তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করতঃ ভূমিষ্ঠ প্রণাম কর, তখন আমার মন তোমার নিষ্ঠা-ভক্তির প্রতি মস্তক অবনত করে।

যখন পট্টাম্বর-পরিহিতা হইয়া পূজার মণ্ডপে তুমি নৈবেদ্য সজ্জিত করিতে থাক, তখন তোমার পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন আমার অন্তরের কলুষ নাশ করে।

দেবদ্বিজে তোমার অচলা ভক্তির বিরুদ্ধে আমার ন্যায় অবিশ্বাসীদের বৃথা কূটতর্ক একেবারেই ব্যর্থ হইয়া উড়িয়া যায়।

চন্দ্রে সূর্য্যে আকাশে বাতাসে, পর্ব্বত সাগর নদী বৃক্ষে, নর পশু পক্ষীতে তুমি নারায়ণ দর্শন করিয়া থাক—তোমার দেবতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান; জ্ঞানাভিমানী পুরুষ আমি কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইব?

পূজাপার্ব্বণ ব্রতাদিতে সারাদিন নিরম্ব উপবাসী তোমার মুখখানিতে কি এক পবিত্র জ্যোতিই না ফুটিয়া উঠে। এক বিন্দু ক্লান্তির চিহ্ন নাই—যেন সে অন্তরনিহিত শক্তি অসীম, অপরিমেয়।

গৃহে গুরুদেব আসিলে তোমার সেবা-ভক্তির গুণে গুরুরূপী মানুষটির মধ্যে সত্যই তুমি নারায়ণকে আনয়ন করিয়া থাক।

তীর্থক্ষেত্রে তোমার নিষ্ঠা ভক্তি, একাগ্রতা, কষ্টসহিষ্ণুতা দর্শন করিয়া আমি তোমার ভগবদ্ভক্তির ইয়ত্তা নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পড়ি।

ধন্য সুবচনীর পূজায় তুমি যখন সহযোগিনীদের লইয়া আনন্দ কর, বালকবালিকাদের প্রতি স্নেহাশীষ বর্ষণ কর,

তখন তোমাকে আনন্দময়ীরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আমি মুগ্ধ হই।

মঙ্গলের দিনে তুমি যখন ধান-দুর্ব্বা-বিল্বপত্র যোগে আশীর্ব্বাদের ডালা হস্তে আমার অবনত মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর, আমার শত কল্যাণ কামনা কর তখন তোমার ঐ সাক্ষাৎ দেবী মূর্ত্তির প্রতি আপনা হইতেই আমার মস্তক অবনত হয়।

বিবাহাদি শুভকর্ম্মের উৎসব ক্ষেত্রে তোমার প্রাণের আনন্দ শতমুখী প্রস্ফুটিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত আনন্দের সৃষ্টি করে। তোমার উলুধ্বনি, তোমার মাঙ্গলিক নৃত্যগীত, তোমার হাতের বরণ-ডালা উৎসব ক্ষেত্রে স্বর্গীয় সুষমা ফুটাইয়া তোলে।

রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণ লব্ধ তোমার নীতি জ্ঞান-ধারা পাইয়া শিশুকাল হইতেই তোমার সন্তানগণ দেশে ধর্ম্মধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

'প্রেমের রাজ্য তোমাদেরই অন্তরে—সে সুরধুনীর মত পবিত্র, আকাশের মত নির্ম্মল, নন্দনের মত মনোহর। কামনা-রাজ্যের পুরুষ আমরা তাহা ভোগ করিতে গিয়া গন্ধায়োতে ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাই।

তোমার সতত-যত্ন-কৃত গৃহস্থালী আমার কুটিরখানিকে লক্ষ্মী-শ্রী পূর্ণ করিয়া রাখে।

তুমি যখন তোমার কল্যাণ-হস্তের সযত্ন-প্রস্তুত অন্ন-পাত্র লইয়া আমাকে পরিবেশন কর, তখন তোমার ঐ মূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া থাকি।

শিশু ক্রোড়ে স্তন্যদাত্রী মূর্ত্তির মধ্যে তোমার জগৎ-পালিনী মূর্ত্তি দর্শন করি।

তুমি যখন ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া দাও, তখন তোমাকে করুণাময়ী দেবীর মত দেখিতে পাই।

আসন্ন বিপন্ন রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তুমি যখন তাহার সেবা কর, বিপত্তারণ শ্রীমধুসূদনের নাম স্মরণ করতঃ কাতরে প্রার্থনা করিতে থাক, তখন রোগী রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া যায়, হতাশ জীবনে আশ্বাস পায়।

শোকে তোমার বুক-ভাঙ্গা অশ্রু দেখিয়াছি—কোন্ পার্থিব সম্পদ তাহার একটি বিন্দুর তুল্য?

তোমার লজ্জা নম্রতা বিনয়, তোমার ভক্তি স্নেহ ভালবাসা, তোমার পবিত্রতা শুচিতা সরলতা, তোমার নিঃস্বার্থ পরসেবা—এ সকলই এক একটি স্বর্গের ফুল।

বাল্যে তোমার চঞ্চলা মূর্ত্তি, কৈশোরে তোমার সলজ্জা মূর্ত্তি, যৌবনে মধুর মূর্ত্তি, প্রৌঢ়ে প্রশান্ত জননীমূর্ত্তি, বার্দ্ধক্যে ভক্তিমতী মূর্ত্তি—এ সকলই আমার স্বর্গের সৃষ্টি করিয়া তোলে।

হে জননী ভগিনী সহধর্ম্মিণীরূপা দেবী, হে শ্রী-ঐশ্বর্য্যের লক্ষ্মী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সরস্বতী, সর্ব্ব কার্য্যের সর্ব্ব কল্যাণের শক্তি—শিবাণী, আমি তোমাকে বন্দনা করি।

বাঙ্গালীর আহার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু, এম্-বি, সি-আই-ই, আই-এস-ও, এফ্-সি-এস্।

চাউল অপেক্ষা গমের মধ্যে প্রোটীন্, মাখন-জাতীয় পদার্থ এবং ভাইটামিন্ অধিক পরিমাণে থাকে, এজন্য রুটী বা পাউরুটী ভাত অপেক্ষা অনেক অধিকতর পুষ্টিকর। গমের মধ্যে চূণ ঘটিত লবণও চাউল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকে। বেরিবেরি রোগে রক্তের মধ্যে চূণ ঘটিত লবণের অভাব হয়, এইজন্য এই রোগে ভাত অপেক্ষা রুটী উৎকৃষ্ট পথ্য। যাঁতাভাঙ্গা আটার মধ্যে ভাইটামিন্ পূর্ণ মাত্রায় অবস্থিতি করে, এজন্য ইহা ময়দা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুষ্পাচ্য হইলেও ইহার ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। শুভ্র ধবধবে সাদা ময়দার মধ্যে ভাইটামিন্ মোটেই থাকে না, সুতরাং ইহা হইতে প্রস্তুত রুটী, পাউরুটী বা লুচি সৌখিন খাদ্য হইলেও উহা অসার বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। আটা অপেক্ষা ময়দার মধ্যে প্রোটীনের অংশ অনেক কম থাকে। বাঙ্গালী (বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায়) যদি একবেলা ভাত ও একবেলা যাঁতাভাঙ্গা আটার রুটী ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে, তাহার শরীর দৃঢ় ও সবল হইবে, তাহার আলস্য-প্রবণতা ঘুচিয়া কর্ম্মপটুতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহার সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়িয়া যাইবে। লুচি, রুটী অপেক্ষা সারবান খাদ্য হইলেও অধিক ঘৃত থাকে বলিয়া উহা রুটী অপেক্ষা গুরুপাক।

রুটী, লুচি ও পাউরুটী।

সুজী গম হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা একটী সহজ পরিপাচ্য উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। দুধ-সুজী একটী বিশেষ বলকারক খাদ্য। বালক বালিকাদিগের জন্য প্রত্যহ ইহা ব্যবহার হওয়া উচিত। সুজীর সহিত ঘৃত, চিনি ও মেওয়া ফল মিশ্রিত করিয়া মোহনভোগ প্রস্তুত হয়। ইহা সারবান মুখরোচক খাদ্য, তবে কিঞ্চিৎ গুরুপাক। লুচি ও মোহনভোগ "ফল খাবার" রূপে সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে ঘৃত ও চিনির পরিমাণ বেশী থাকে বলিয়া ইহার নিত্য ব্যবহারে দেহ স্থূল হইবার সম্ভাবনা।

পাউরুটী, রুটী বা লুচি অপেক্ষা লঘুপাক। ময়দার পাউরুটী অপেক্ষা, আটার পাউরুটীর (Brown bread) ব্যবহার প্রশস্ত। খুব সাদা পাউরুটীর মধ্যে ভাইটামিন্ থাকে না, পাউরুটীর শ্বেতসার (Starch) সুসিদ্ধ হইয়া যায়। হাতে গড়া রুটীর মধ্যে কতক পরিমাণ শ্বেতসার কাঁচা অবস্থায় থাকিয়া যায়, এইজন্য পাউরুটী হাতে গড়া রুটী অপেক্ষা সুপাচ্য। রুটী খুব পাতলা করিয়া গড়িয়া আগুনে অধিকক্ষণ সেঁকিলে উহা পাউরুটীর ন্যায় সুপাচ্য হয়। টাট্‌কা পাউরুটী অপেক্ষা বাসি পাউরুটী সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

আমাদের ছাত্রাবাসে ছাত্রদিগের জন্য একবেলা যাঁতাভাঙ্গা আটার রুটীর ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে আমাদের যুবক ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের সবিশেষ উন্নতি হইবে।

যবের ছাতু ভাত অপেক্ষা অধিকতর সারবান খাদ্য। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহার বিস্তৃত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। জনার বা মকাই আমাদের দেশে (বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে) প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং সামান্য অবস্থার লোকে উহাকে কাঁচা অবস্থায়, আগুনে পোড়াইয়া এবং উহার ময়দার রুটী প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে। গম অপেক্ষা জনারের মধ্যে প্রোটীন্ ও মাখন জাতীয় সার-পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে; তবে গম অপেক্ষা ইহা কিঞ্চিৎ দুষ্পাচ্য।

আমাদের দেশে অনেক গৃহে ওটমীলের ব্যবহার প্রচলন হইয়াছে। ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট সারবান খাদ্য। দুধ ও ওট্‌মীল্ চিনির সহিত একত্রে সিদ্ধ করিয়া পোরিজ্

(Porridge) প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় বলকারক খাদ্য এবং ইহার নিত্য ব্যবহারে কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর হয়।

মিষ্টান্ন।

বাঙ্গালী বড়ই মিষ্টান্ন ভক্ত। অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী দুই বেলা খাদ্যের সহিত এবং জলখাবারের আকারে নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। সামান্য অবস্থার লোকের, ভাতের সঙ্গে গুড় না থাকিলে আহার সম্পন্ন হয় না। গুড়, চিনি প্রভৃতি পদার্থ তাপ ও শক্তি প্রদায়ক খাদ্য। এই জাতীয় পদার্থ আমাদের দৈনিক খাদ্যে পরিমিত পরিমাণে থাকা আবশ্যক। অত্যধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। চিনির মধ্যে ভাইটামিন্ মোটেই নাই; গুড় ও মাতগুড়ের মধ্যে ভাইটামিন্ অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করে। অধিক মিষ্টান্ন ব্যবহার করিলে দাঁত নষ্ট হইয়া যায় এবং কালে বহুমূত্র রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। মিষ্টান্নের মধ্যে ভাল সন্দেশ সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর ও নির্দ্দোষ খাদ্য। ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন মাত্রেই গুরুপাক; অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে দেহ স্থূল হইয়া পড়ে। রসগোল্লা সারবান খাদ্য, তবে ইহার মধ্যে মিষ্টের ভাগ অধিক থাকে বলিয়া অনেকে ইহা পছন্দ করেন না। পূর্ব্বে এদেশে নারিকেল সন্দেশের অধিকতর প্রচলন ছিল। ইহা একটি পুষ্টিকর নির্দ্দোষ খাদ্য।

তরিতরকারি।

তরিতরকারি শাকসব্জি বাঙ্গালীর খাদ্যের একটা প্রধান উপকরণ। গরীব বাঙ্গালী যথেষ্ট পরিমাণ ভাত ও শাকসব্জি খাইয়া উদর পূরণ করে। তরিতরকারি শাকসব্জির মধ্যে সাধারণতঃ প্রোটীন্ ও মাখন জাতীয় সার-পদার্থের যথোচিত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে লবণজাতীয় ও অম্লজাতীয় পদার্থ এবং "সি" (C) জাতীয় ভাইটামিন্ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ইহারা রক্তের স্বাভাবিক ক্ষারত্ব (Alkalinity) রক্ষা করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার সহায় হয় এবং দেহকে বিবিধ উৎকট রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি প্রদান করে। টাট্‌কা তরিতরকারি বা ফলমূল কিছু দিন ব্যবহার না করিলে রক্ত দুষ্ট হয় এবং স্কর্ভি (Scurvy) নামক উৎকট ব্যাধি উৎপন্ন হয়। কলের জাহাজ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে দূরগামী জাহাজের নাবিকগণকে বহুদিন ব্যাপিয়া সমুদ্রে অবস্থিতি করিতে হইত, সুতরাং জাহাজের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ টাট্‌কা তরিতরকারি ফলমূলের অভাব ঘটিত। ইহার ফলে নাবিকগণ প্রায়ই স্কর্ভি রোগে আক্রান্ত হইত এবং অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তাহাদের খাদ্যে "সি" জাতীয় ভাইটামিনের অভাব হইত বলিয়া এরূপ বিপদ ঘটিত। এক্ষণে নাবিকগণের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কদাচ লক্ষিত হয়। ভারতবাসীগণ যথেষ্ট পরিমাণে টাটকা তরিতরকারি ব্যবহার করে বলিয়া এই রোগ তাহাদের মধ্যে বিরল। এই জন্য খাদ্যহিসাবে টাটকা তরিতরকারি শাকসব্জির মূল্য অত্যন্ত অধিক। অনেকে মনে করেন যে "শাকপাতাড়ের" মধ্যে কোন সার পদার্থ নাই, উহা গোজাতির খাদ্য; ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস। যথেষ্ট পরিমাণে শাকসব্জি না খাইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। বিশেষতঃ শাকসব্জি কিছু বেশী পরিমাণে খাইলে কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) দূরীভূত হয়।

তরিতরকারির মধ্যে আলু সর্ব্বদেশে আদৃত ও সর্ব্বজন প্রিয়। ইহার মধ্যে ২০ ভাগ শ্বেতসার (Starch থাকে। আলুর শ্বেতসার সহজ পরিপাচ্য। আলুর মধ্যে প্রোটীনের অংশ কম হইলেও ঐ প্রোটীন্ সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। আলুর মধ্যে অবস্থিত লবণজাতীয় পদার্থ রক্তের ক্ষারত্ব (Alkalinity) রক্ষায় সবিশেষ সহায়তা করে। আলু, ভাত ও রুটী অপেক্ষা সহজে ও শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। আলুর মধ্যে দেহবৃদ্ধি-সহায়ক ভাইটামিন্ থাকে, সুতরাং বালকবালিকাদিগের পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কেবল রুটী, আলু ও শাকসব্জি খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থদেহে থাকিয়া সকল প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারা যায়।

খোসা ছাড়াইয়া আলু সিদ্ধ করা উচিত নহে, কারণ ইহাতে আলুর সার পদার্থ কতক পরিমাণে নষ্ট হয়। আলু সিদ্ধ করিয়া খোসা ছাড়াইয়া লওয়া উচিত। পোড়া আলু সিদ্ধ আলু অপেক্ষা সহজ পরিপাচ্য। আলু ভাজা কিঞ্চিৎ গুরুপাক।

যুবা বয়সে অন্ততঃ ১ পোয়া আলু প্রত্যহ ভক্ষণ করা উচিত।

পটল কচি অবস্থায় সহজ পরিপাচ্য, এইজন্য ইহা সাধারণের খাদ্য ব্যতীত রোগীর পথ্যরূপেও বাংলা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে প্রোটীনের অংশ নিতান্ত কম নহে এবং ভাইটামিন্‌ও অবস্থিতি করে। পটল ভাজিলে কিছু গুরুপাক হয়।

বেগুণের মধ্যে জলের অংশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অন্যান্য সার-পদার্থ নিতান্ত কম। লবণজাতীয় পদার্থও বেগুণের মধ্যে বেশী পরিমাণে থাকে না। ইহা উৎকৃষ্ট তরকারির মধ্যে গণ্য নহে।

কাঁচা কলার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ শ্বেতসার আছে। ইহা সহজপাচ্য ও ধারক এবং রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া ইহার ময়দা (Meal) রুটী প্রস্তুত করিবার জন্য কোন কোন দেশে ব্যবহৃত হয়।

ডাল মানকচু একটী উত্তম তরকারি। ইহা সহজ পাচ্য এজন্য ইহা রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। মানকচুর পালো কবিরাজেরা "মানমণ্ডের" আকারে ঔষধ ও পথ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বিটের (Beet) মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি থাকে, এই জন্য ইহা একটী সারবান খাদ্য। আমাদের দেশে যেমন আক হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, ইয়ুরোপ ও অন্যান্য স্থানে বীট চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বরবটী, শিম ও কলাইসুঁটী প্রভৃতি সুঁটীজাতীয় তরকারির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটীন থাকে, সুতরাং এগুলি খুব সারবান্ খাদ্য। কলাইসুঁটি ও বরবটী কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করিলে ভাইটামিন্ সংগ্রহ করিবার সুবিধা হয়। সাহেবেরা অনেক শাকসব্জি কাঁচা অবস্থায় সালাড (Salad) ব্যবহার করেন। মূলা, বিলাতীবেগুণ, (Tomato) বরবটী, কলাইসুঁটী, পুদিনা প্রভৃতি কতকগুলি তরকারি কাঁচা অবস্থায় গ্রহণ করিলে আমাদের খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব হয় না।

ভাইটামিন সম্বন্ধে বিলাতী বেগুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তরকারি। রন্ধন করিলে ইহার মধ্যস্থিত ভাইটামিনের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কাঁচা অবস্থায় ইহাকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া অল্প লেবুর রস, লবণ, চিনি ও রাইসরিষার গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলে সুন্দর চাটনি প্রস্তুত হয় এবং প্রত্যহ ইহার ব্যবহার প্রশস্ত। শীতকালে বিলাতীবেগুণ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। তখন ইহা সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া রাখিলে বারমাস ইহা ব্যবহার করিতে পারা যায়। চিনির সহিত ইহার মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া বালকবালিকাগণকে খাইতে দিলে তন্মধ্যস্থ ভাইটামিন্ উহাদিগের শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি সংসাধন করে।

লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, ঢেঁড়স, চিচিঙ্গা, ডুমুর প্রভৃতি বিবিধ তরকারি আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি। তরকারির সাধারণ গুণ ইহাদের সকলগুলিরই মধ্যে থাকিতে দেখা যায়। পল্‌তা, উচ্ছে, করলা, নিমপাতা প্রভৃতি তিক্ত তরকারি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহারা ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসরণের সহায়তা করে এবং তদ্বারা খাদ্য পরিপাকের সুবিধা হয়। ইহাদিগের মধ্যে কোন না কোনটীর নিত্য ব্যবহার প্রশস্ত।

পিয়াজ হিন্দুর নিকট আদৃত না হইলেও একটী উৎকৃষ্ট তরকারি। ইহার মধ্যে ভাইটামিন্ ও লৌহঘটিত লবণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। রক্তহীনতা রোগে ইহার ব্যবহারে উপকার দর্শে। সাদা পিয়াজ লাল পিয়াজ অপেক্ষা অধিকতর গুণশালী বলিয়া পরিচিত। ছোট পিয়াজের ব্যবহারই প্রশস্ত।

কাঁটালের বীজের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটীন্ আছে, এজন্য ইহা একটী অতি সারবান তরকারি। গ্রীষ্মকালে ইহা সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিলে বারমাস ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। অল্প পরিমাণ রসুনের ব্যবহারে বাতরোগে উপকার দর্শে; ইহার দুর্গন্ধ ইহার ব্যবহারের অন্তরায়।

শাকজাতীয় তরকারির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন্ ও লবণ জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে। ভাইটামিন্ সম্বন্ধে পালমশাক (Spinach) সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। বাঁধাকপিতেও যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন্ আছে, তবে ইহার মধ্যে গন্ধক ঘটিত লবণ থাকে বলিয়া ইহা অধিক

পরিমাণে ভক্ষণ করিলে পেট গরম হয়। মূলকপি একটী উৎকৃষ্ট তরকারি; ইহার মধ্যে লবণ জাতীয় পদার্থ ও ভাইটামিনের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেবেরা সিলারি (Celery), লেটুস্ (Lettuce) প্রভৃতি শাকজাতীয় পদার্থ প্রত্যহ কাঁচা অবস্থায় সালাড্‌রূপে ব্যবহার করেন বলিয়া তাঁহাদের খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব হয় না। যে সকল তরকারি কাঁচা খাইতে বিষ হয় না, কতক পরিমাণে সেই সকল তরকারি কাঁচা অবস্থায় আমাদের প্রত্যহ ভক্ষণ করা উচিত। যে কোন শাকের তরকারি প্রত্যহ গ্রহণ করিলে ভাইটামিন্ সংগ্রহ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। "শাক পাতাড়" অবহেলার সামগ্রী নহে, ইহা আমরা যেন কখন বিস্মৃত না হই।

তেঁতুল, আমচুর, জলপাই, কুল, আমড়া, চালতা প্রভৃতি অম্লজাতীয় পদার্থ আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। পরিপাকের সময়ে ইহাদিগের মধ্যস্থিত অম্লজাতীয় পদার্থ, ক্ষার লবণে পরিণত হইয়া রক্তের স্বাভাবিক ক্ষারত্ব রক্ষা করে। যথাপরিমাণে ইহাদিগের কোন না কোনটীর নিত্য ব্যবহার প্রশস্ত।

ফল।

প্রত্যহ টাট্‌কা ফল ভক্ষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। টাট্‌কা ফলের মধ্যে "সি" জাতীয় ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে। ইহা ব্যতীত লবণজাতীয় সার-পদার্থ ও অম্লজাতীয় দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে ফলের মধ্যে থাকে বলিয়া ফল, রক্তের স্বাভাবিক ক্ষার ধর্ম্ম রক্ষায় সহায়তা করে। ফলের প্রধান গুণ এই যে ইহা পরিপাক করিতে পরিপাক-যন্ত্রের বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না। ফলের মধ্যে সার-পদার্থ সমূহ এরূপ অবস্থায় থাকে যে ভক্ষণ করিবার পর কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ব্যতীত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহের পোষণ কার্য্যে সহায়তা করে। ফল ভক্ষণ করিলে অন্ত্রের মধ্যে পচন (Putrefaction) কতক পরিমাণে নিবারিত হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। ফল ভক্ষণ দ্বারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, উভয়েরই শান্তি হয়। পরিশ্রমের পর ফলের রস খাইলে চা, কফি প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য অপেক্ষা অতি সহজে ও শীঘ্র ক্লান্তি দূর হয়।

ফলের মধ্যে বাদাম জাতীয় ফল (Nuts) অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। বাদামের মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগ প্রোটীন ও ৩২ ভাগ মাখনজাতীয় পদার্থ থাকে। যাঁহারা নিরামিষভোজী তাঁহাদের প্রত্যহ কোন না কোন জাতীয় বাদাম ব্যবহার করা উচিত। বাদামের মধ্যে যে প্রোটীন থাকে, তাহা মাছ মাংসের প্রোটীনের ন্যায় সহজ পরিপাচ্য। আমাদের দেশের পালোয়ানেরা যথেষ্ট পরিমাণে বাদাম ভক্ষণ করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই মাছমাংস একেবারেই স্পর্শ করে না। চীনাবাদাম একটী সস্তা অথচ অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। বাঙ্গালীর গৃহে চীনা বাদাম বিস্তৃত ভাবে ব্যবহৃত হইলে বাঙ্গালীর খাদ্যের প্রধান দোষ কাটিয়া যাইবে। চীনাবাদামের মধ্যে শত করা ২৪ ভাগ প্রোটীন্ এবং ৪৪ ভাগ মাখন জাতীয় পদার্থ আছে; এত অধিক মাখন-জাতীয় পদার্থ আছে বলিয়া "পেটরোগের" লোকের পক্ষে ইহা সুপাচ্য নহে। তবে চীনাবাদামের পরিমিত পরিমাণ ব্যবহার সকলের পক্ষেই উপকারী। চিনিতে পাক করিয়া ইহা বালকদিগকে প্রত্যহ খাইতে দেওয়া উচিত।

আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জাতীয় ফল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। যে কোন প্রকারের ফল প্রত্যহ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আম, জাম, কাঁটাল, আনারস, পেঁপে, আতা, পিয়ারা তরমুজ, তাল, বেল, কলা, শসা, নারিকেল, বাতাবি লেবু, কুল, কমলা লেবু, ডালিম, খরমুজা প্রভৃতি ফল এদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আঙ্গুর, আপেল, পীচ, বেদানা প্রভৃতি ফল যথেষ্ট পরিমাণে অন্যদেশ হইতে আমদানি হয়। এতদ্ব্যতীত বাদাম, আকরোট, পেস্তা, কিস্‌মিস্, মনাক্কা খেজুর প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্টিকর শুষ্কফল ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত হইতে বঙ্গদেশে বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসা হয়। এই শেষোক্ত ফল সমূহ অবস্থাপন্ন লোকেই ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে সমর্থ হন। সামান্য অর্থ ব্যয় করিলে কলা, শসা, বেল, লেবু, আম, কাঁটাল প্রভৃতি দেশজাত ফল প্রত্যহ ব্যবহার করিবার কাহারো বিশেষ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যহ কোন না কোন প্রকার ফল আমাদের খাদ্যের সহিত ব্যবহার করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

চা বা কফিকে খাদ্য বলা যায় না, তবে ইহারা উত্তেজক পানীয়রূপে এক্ষণে বাংলার অনেক পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে ইহারা শরীর পোষণ বা স্বাস্থ্যরক্ষার কোনরূপ সহায়তা করে না, সাময়িক উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করে। পরিমিত মাত্রায় চা বা কাফি ব্যবহার করিলে কোনরূপ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। কিন্তু ইহাদিগের অপরিমিত ব্যবহারে অজীর্ণ, শিরঃপীড়া, হৃদ্‌স্পন্দন, অনিদ্রা ও বিবিধ বায়ুরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। কোকো, চা বা কফি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত মৃদু উত্তেজক এবং ইহার মধ্যে প্রোটীন্ ও চর্ব্বি (Fat) থাকে বলিয়া ইহা খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হয়, কিন্তু যে মাত্রায় ইহা আমরা ব্যবহার করি, তাহার মধ্যে খাদ্যগুণ অতি অল্পই থাকে। চা কফি প্রভৃতি পানীয় কিছুদিন ব্যবহার করিলে পর ইহাদিগকে পরিত্যাগ করা দুষ্কর হইয়া উঠে।

৪। কফি, কোকো।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর খাদ্যে যে সকল দোষ লক্ষিত হয়, এবং যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে উহাদিগের সংশোধন হইতে পারে, মাতৃ-মন্দিরের কয়েক সংখ্যায় তাহার কয়েকটী ইঙ্গিতমাত্র জানাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।　　সমাপ্ত।

শিশুমঙ্গল

শ্রীমতী সুরবালা বিশ্বাস।

উদ্বোধনের শঙ্খ বেজে দিচ্ছে আজি হৃদয় নাড়া,
মঙ্গল কে করবে বল শিশুর প্রতি মাতা ছাড়া?
অভাগিনী বঙ্গনারী
নয়নে শোক-অশ্রুবারি,
দুঃখে তাহার মর্ম্ম ফাটে, বক্ষে বহে রক্তধারা,
শূন্য কোলে নয়নজলে হায় জননী কেঁদে সারা।

ছুটে এস বঙ্গদেশের ভাবী মাতা ভগ্নী যারা,
কত ব্যথার শিশু তোদের, তোদের রক্তমাংসে গড়া,
অনাদরে অবহেলে
অসময়ে যায় যে চলে,
তারাই যে গো 'মণি' 'মানিক' অন্ধকারে ধ্রুবতারা,
বুঝলে কি তা বঙ্গবাসী হত কি আজ শিশুহারা?
যার উদরে ধারণ করি জনম মোদের সফল হয়,
যার জনমে বস্ত্র দু-কূল আর কিবা তার পরিচয়,
নবাগত অতিথিরে
বিদায় করি দুদিন পরে,—
যোগে যাগে বাঁচলে পরে বংশে রবে বংশধারা,
নতুবা মার হৃদয়-শ্মশান কেঁদে হবে পাগলপারা।

মায়ের কোলে খেলবে শিশু স্বর্গপুরী নয় কি ধরা?
শিশুর গানে মায়ের প্রাণে উঠবে বেজে সপ্তস্বরা।
এই বঙ্গে শত শত
জন্মি শিশু মরছে কত,
খোঁজে কি তা বঙ্গবাসী কোন্ অভাবে এমন ধারা?
দৈন্য দুঃখে অনশনে বঙ্গ হল শ্মশান পারা।
আয় মা ভেঙ্গে শিশুর ডাকে সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর কারা,
মা বিনে কে বুঝবে ব্যথা বঙ্গ-শিশুর কপাল পোড়া!
শুচিতার ঐ গর্ব্ব নাশি
মায়ের মুখে ফুটুক হাসি,
মঙ্গলেতে এই শিশুদের সুখী কে আর মায়ের বাড়া,
শিশুর লাগি উঠ জাগি বঙ্গ-শিশুর মাতা যারা।

খেয়ার শেষে

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১২)

আহারান্তে দুই বন্ধুতে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। পরেশবাবু কখনও ধূমপান করিতেন না কিন্তু অনন্তবাবু ছিলেন তামাকের একটী প্রিয়তম ভক্ত। তিনি কথা বলিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কেবল যে সময়টা তামাক খাইতেন সেই সময়টার কথা বলা বন্ধ থাকিত। এখানে আসিয়াও তাহার সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয় নাই। ভদ্রলোক কেহ আসিলে তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য হুঁকা অথবা গড়গড়া কলিকা থাকা চাই-ই, শুধু এইজন্যই এই জিনিষগুলি এ সংসারে আসিতে হইয়াছিল এবং কোন একটা গৃহের এককোণে পড়িয়া ছিল। অনন্তবাবুর আগমনে লছমন গড়গড়া ধুইয়া মাজিয়া জল ভরিয়া তামাক সাজিয়া আনিয়াছিল। তামাক সাজিতে সাজিতে সে বেচারী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিল এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছিল যেন অনন্তবাবু শীঘ্রই এ বাড়ী ত্যাগ করেন।

একখানা ইজিচেয়ারে চৌদ্দ পোয়া হইয়া পড়িয়া অনন্তবাবু একটা হাই তুলিয়া গোটা দুই আড়ামোড়া দিয়া বলিলেন "এ সব আজগুবি জিনিষ ব্যবহার করো কেন হে? চেয়ারে কখনও ভদ্রলোক বসতে পারে? তারা যতটা আরাম পাবে মাটীতে একটা মাদুর পেতে বসে শুয়ে, চেয়ারে বসে কখনই সে রকম আরাম পাবে না। এই যে চেয়ারখানা দেছ আমায়, আমি কি এতে বসতে পারি? সোজা বাপু একখানা খাট কি তক্তাপোষ দেবে, ভদ্রলোকের ছেলে তাতে গড়াব, দশবার হাত পা ছেড়ে আড়ামোড়া দেব, তা নয়।"

পরেশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "তা আর কি করব বল? আগে এ ঘর সাবেক ধরণেই সাজানো ছিল দেখেছ তো? দেখতে পেলুম আমার বন্ধুদের অনেকেরই লেজ বেরিয়েছে, তাঁরা উচ্চাসন ভিন্ন বসতে চান না। অনেকে এ ঘরে এসে বসবার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে দুটো চারটে কথা বলেই চলে যান। এইসব দেখে সে সব উঠিয়ে ফেলে চেয়ার টেবল আনলুম, ব্যস্, আর কারও না কথাটী শুনতে হবে না। আমি ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি কারণ কেউ আর একটী কথা বলতে পারে না।"

অনন্তবাবু আবার একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া একটা হাই তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে গোটাকতক তুড়ি দিলেন, তাহার পরে গড়গড়ার নলটী মুখে দিয়া বারকতক টানিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন "এঃ, ধোঁয়া যে মোটেই বেরুচ্ছেনা, এতে আগুন দেয়নি বুঝি? বেটা ভুলে মরেছে।"

পরেশবাবু কলিকার পানে চাহিয়া বলিলেন "আগুন দিয়েছিল কিন্তু নিভে গেছে দেখছি।"

তিনি লছমনকে ডাকিয়া কলিকায় আগুন দিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। সে মনে মনে অনন্তবাবুকে অভিশাপ দিতে দিতে আবার কলিকা ধরাইয়া আনিয়া দিয়া গেল।

অনন্তবাবু ঘন ঘন তামাক টানিয়া ধূমে গৃহখানা পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরেশবাবু ডিবা হইতে একটা পান লইয়া বাকি গুলা সব অনন্তবাবুকে ধরিয়া দিলেন।

অনন্তবাবু বলিলেন "একটা নিলে যে?"

পরেশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "আমি দুটি-দুবেলা পান খাই, তার বেশী আর খাইনে।"

বিকট হাসিয়া তাহার উত্তরে অনন্তবাবু কি বলিতে

যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় বাহির হইতে কাহার উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল "মেসোমশাই—"

অনন্তবাবুর হাসি থামিয়া গেল, তিনি বেশ বুঝিলেন এ সেই মেয়েটী ভিন্ন আর কেহ নয়।

পরেশবাবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে উত্তর দিলেন "কি নীরা?"

নীরা বাহির হইতে বলিল "একটা কথা শুনে যান।"

পরেশবাবু বাহিরে আসিলেন, তাহার বিষণ্ণ উদ্বেগ ব্যাকুল মুখখানার পানে চাহিয়া তেমনি উদ্বিগ্নস্বরে বলিলেন "কি মা, ব্যাপারখানা কি?"

নীরা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া রুমালে মুখ ঢাকিল।

"এ কি মা তুমি কাঁদছো?"

নীরা তখনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কম্পকণ্ঠ যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বলিল "এই দেখুন কাকা আমায় পত্র দেছেন।" সে পত্রখানা পরেশবাবুর সামনে ধরিল; পরেশবাবু বলিলেন "তুমিই পড়না মা, আমি শুনি।"

"তা আমি বলতে পারব না আপনাকে। কাকা আমায় যে ঘৃণিত পত্রখানা লিখেছেন, এ পর্য্যন্ত আর কোনও কাকা তার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে এ রকম পত্র লিখতে পারে নি। তিনি যে আমারই কাকা এই ভেবে ঘৃণায় আমার আত্মহত্যা করে মরতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি পত্রখানা পড়ুন মেসোমশাই, তারপর এর সম্বন্ধে যা হয় বিবেচনা করুন, আমি কোনও কথা বলতে চাইনে, বলতে পারবও না।"

সে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। অগত্যা পরেশবাবু পত্রখানা তুলিয়া লইলেন। বাস্তবিকই পত্রখানা বড় শ্রুতিকটু কথা বহন করিয়া আনিয়াছে, যাহা নীরা তাঁহার সম্মুখে বলিতে পারে না।

কুমুদিনী চুপ করিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুখখানা বড় ভার; পরেশবাবুর পদশব্দ পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন।

বিছানাটার উপর বসিয়া পরেশবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন "পত্রখানা শুনেছ বোধহয়?"

"শুনেছি।"

পরেশবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কি ছোট লোক দেখেছ একবার? আমার মনে হয় আমার জীবনে এমন লোকের সঙ্গে মেলামেশা খুবই কম হয়েছে। অমিয় আমার ছেলে, নীরা আমার মেয়ে, আমি এদের ঠিক তেমনি চোখেই দেখি, কোনদিন এদের বিয়ে দেবার কল্পনা পর্য্যন্ত আমার মাথায় আসেনি, আর সে কিনা বলছে আমি ফাঁকি দিয়ে অমিয়ের সঙ্গে নীরার বিয়ে দেবার চেষ্টায় আছি। সে কিনা বলছে আমার এতে বিলক্ষণ লাভ আছে, আমি এতে প্রচুর লাভবান হব; দেখ দেখি লোকটা কি ভয়ানক। আমরা যা কখনও ভাবিনি সে তা অনায়াসে ভেবে নিয়েছে, সেটা মুখ ফুটে প্রকাশ পর্য্যন্ত করেছে। সে ভয় দেখাচ্ছে এখনও নীরা যদি তার বাড়ীতে না যায় সে বাধ্য হয়ে কোর্টে যাবে, সে স্পষ্ট জানাবে নীরা এখনও নাবালিকা, আমি তার অভিভাবকের মত না নিয়েই তাকে পাত্রস্থা করতে যাচ্ছি।"

কুমুদিনী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কিন্তু নীরা তো বলতে পারবে—"

পরেশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "নীরার কথা গ্রাহ্য করবে কে? সত্যই নীরা নাবালিকা, এখনও সাবালিকা হতে ওর দু বছর বাকি। আর এই পত্রে শ্রীনাথবাবু আরও একটা কথা জোর করে বলেছেন, নীরার বাপ ব্রাহ্মধর্ম্মে রীতিমত দীক্ষিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ তিনি যথেষ্ট দিতে পারবেন। এখন নীরাকে আমি ভুলিয়ে অমিয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে যাচ্ছি, অমিয় হিন্দু, এখনও তার পূর্ব্ব স্ত্রী বিদ্যমান রয়েছে, মনে করনা তুমি—শ্রীনাথবাবু সব প্রমাণ না সাজিয়ে কাজে নেমেছেন। সব রকমে তিনি আমায় জড়িয়ে ফেলেছেন, আমার যশ মান সব নষ্ট করছেন। তুমি একবার নীরাকে ডাক, আমি সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলি; বুদ্ধিমতী সে, নিশ্চয়ই আমার বিপদের গুরুত্বটা সে অনুভব করবে।"

কুমুদিনী নীরাকে ডাকিলেন, নীরা আসিল।

পরেশবাবু বলিলেন "বসো মা। ব্যাপার তো সবই বুঝলুম, এখন কি করা উচিৎ তাই আমি ভেবে ঠিক করতে পারছিনে।"

নীরা একটা নিঃশ্বাস গোপনে ফেলিয়া বলিল "আমি

যাব মেসোমশাই, আমার জন্যে আপনি, মাসীমা সবাই যে জড়িয়ে পড়ছেন তা আমি কোন মতেই সহ্য করতে পারব না। আমি না বুঝতে পেরে যাইনি, ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা জানতুম না। এখন বুঝতে পেরেছি বলেই যেতে চাচ্ছি। আমি এখনই একখানা পত্র লিখে দেই দিয়ে, তাঁরা কেউ আমায় নিয়ে চলুন। মিছিমিছি এ সব অপবাদ আমি সইতে পারব না।"

কথা কয়টী শেষ করিয়া মাসীমার পানে একবার কটাক্ষপাত করিয়া সে বাহির হইয়া গেল। পরেশবাবু আর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধে বসিয়া থাকিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন অনন্তবাবুর গাঢ় নিদ্রা আসিয়াছে, নাসিকাগর্জ্জনে সারা গৃহখানি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গড়গড়ার নলটা দৃঢ়বদ্ধ ভাবে বুকের উপর পড়িয়া আছে, মুখবিবর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত; দুই পাশ দিয়া পানের লাল রস গড়াইয়া পড়িতেছে অনেক গুলি মাছি সেখানে উড়িতেছে, বসিতেছে।

পরেশবাবু নিজের আসন খানায় বসিয়া পড়িলেন, পকেট হইতে পত্রখানা টেবিলে বিস্তৃত করিয়া দিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন।

হঠাৎ অনন্তবাবুর নাসিকাগর্জ্জন বন্ধ হইয়া গেল, পরেশবাবু দেখিলেন তিনি আড়ামোড়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে গেলেন; তাকাইয়া দেখিলেন পরেশবাবু তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন। অপ্রস্তুতভাবে তিনি উঠিয়া বসিলেন, হাত বাড়াইয়া টেবিলের উপর হইতে গামছা খানা লইয়া মুখটা মুছিয়া বলিলেন "বড় ঘুমটা এসে পড়েছিল যা হোক। তুমি কখন ঘরে এলে?"

পরেশবাবু পত্রখানা পকেটে ফেলিয়া বলিলেন "এই মাত্র আসছি। তুমি ঘুমাওনা কেন; আমার ঘরিও ঘুম নেই, তবু কেউ ঘুমুচ্ছে দেখে আমি বিরক্ত হইনে।"

অনন্তবাবু কলিকাটাতে হাত দিয়া একবার জোরে হাক দিলেন "ওরে ও চাকরটা, আর এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা তো বাবা।" তাহার পর পরেশবাবুর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ডাকছিল না তোমায়?"

পরেশবাবু বলিলেন "ওঃ, সে আমার শালির মেয়ে। সে আমার এখানেই আছে বোধ হয় জানোনা তুমি?"

অনন্তবাবু বলিলেন "হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখেছি বটে সে মেয়েটীকে আজ সকালবেলা অমিয়ের ঘরে। বেশ মেয়েটী —বিয়ে হয়েছে?

পরেশবাবু বলিলেন "এখনও বিয়ে হয়নি। বয়েস এই বছর আঠার হবে, বিয়ের সময় উত্তরায়নি। আর ওর যত বয়সই হোকনা, ওর বিয়ের জন্যে ভাবতে হবে না কাউকে। ওর বাপ যা রেখে গেছে ওর জন্যে, সে একটা রাজ-সম্পত্তি। চল্লিশপঞ্চাশ হাজার টাকা, খান-দুই বাড়ী, এমন লোকই নেই যে বিয়ে করতে চাইবে না।"

অনন্তবাবু বিস্ময়ে এতখানি হাঁ করিলেন যে তাঁহাকে দেখিলে হাসি সামলান দায় হইয়া উঠে।

পরেশবাবুর তখন হাসিবার সময় নাই, তেমনি গম্ভীর মুখেই তিনি বলিলেন "রূপকথার রাজকন্যা যাকে বলে নীরা হচ্ছে তাই। যেমন সুন্দরী, তেমনি শিক্ষিতা, আবার এতগুলি টাকা; এটি বড় মুখের কথা? যে বিয়ে করবে সে যে একেবারেই বড়লোক হয়ে যাবে।"

একটু থামিয়া অনন্তবাবু বলিলেন "হিঁদুর ঘরে এতবড় মেয়ে কে নেবে?"

পরেশবাবু বলিলেন "যদি পায় তবে দেখবে বড় বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও এই লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রীকে গ্রহণ করবার জন্যে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু সে আশা করা ভুল, কেননা নীরার কাকা ব্রাহ্ম, নীরাকেও তাঁরা ব্রাহ্ম বলছেন, তিনি যখন নীরার অভিভাবক তখন জানা কথা যে তার কোনও ব্রাহ্মঘরেই বিয়ে হবে।"

অনন্তবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর আবার একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া দুইটা হাই তুলিয়া দশটা তুড়ি দিয়া বলিলেন "হরি বোল, হরি বোল; ওসব খিষ্টেনি মত হে, খিষ্টেনি আচার ব্যবহার আমাদের হিঁদু ঘরে সাজে না। ওরে, তোমার চাকরটা তো আর এক কলকে তামাক দিয়ে গেল না? আমি আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে উঠে পড়ি, একবার বহুবাজারে বেহানের বাড়ী যেতে হবে, বিশেষ দরকার, দেরী করবার যো নেই।"

পরেশবাবু বারকতক লছমনকে ডাকিয়া তাহার সাড়া না পাইয়া বাহিরে গেলেন; দেখিলেন সে বেয়ারা ঠেস

দিয়া দিব্য আরামে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিজেই কলিকাটী লইয়া তামাক সাজিবার মতলবে পা বাড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে দাসী আসিয়া কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে গেল। পরেশবাবু ফিরিয়া আসিতেই অনন্ত-বাবু ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কই হে?"

পরেশবাবু বলিলেন "তামাক সেজে আনছে। চাকরটা ঘুমিয়ে পড়েছে, কি তাই তামাক সাজতে গেল।"

অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়া অনন্তবাবু বলিলেন "তোমার বাড়ীর ঝি-চাকরগুলো যেন এক একটী নবাব; মনিবের সঙ্গে যে কি রকম ভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তারা মোটেই শেখেনি, যাও যদি আমার বাড়ী, দেখতে পাও ঝি চাকর সেখানে কেমন জব্দ থাকে। একটা টুঁশব্দ করবার ক্ষমতা আছে কারও!"

পরেশবাবু একটু হাসিলেন মাত্র, তিনি অনন্তবাবুর শাসন খুব ভাল করিয়াই জানিতেন।

(১৩)

বৈকাল বেলা অমিয় কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র দরজার উপর নীরাকে দেখিতে পাইল। নীরা মৃদু হাসিয়া বলিল "জানেন অমিয়বাবু, আমি কাকার বাসায় যাচ্ছি যে।"

অমিয়ের মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, মুখখানা ফিরাইয়া লইয়া সে একটা ঢোক গিলিয়া বলিল "সত্যি-সত্যিই যাবেন নাকি? আজই বোধ হয় নয়?"

"না, আজ নয়; সম্ভব কাল বিকেলে কি পরশু বিকেলে কাকার বাসায় যেতে হবে। বইগুলো রেখে একটু ঠাণ্ডা হয়ে কাকিমার কাছে সব কথা শুনুন গিয়ে।"

সে চলিয়া গেল। অমিয় খাতা দুখানা টেবিলে ফেলিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া বাড়ীমধ্যে গেল।

কুমুদিনী বিমর্ষমুখে পাচককে রন্ধনের বিষয় বলিয়া দিতেছিলেন। অমিয়কে বসাইয়া তাহাকে জলখাবার আনিয়া দিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন "নীরা তো চলছে অমিয়। কয়মাস আগে যেমন তুমি একলা ছিলে, তেমনি একাই থাকতে হবে।"

তাঁহার কথাটা ভার হইয়া উঠিল।

অমিয় অন্যমনস্ক ভাবে বলিল "হঠাৎ চলে যাবেন যে।"

মেয়েদের বুকের মধ্যে যে কথা চাপা থাকে না একথা যথার্থ সত্য। যত গোপনীয় কথাই হোক না তাঁহারা তাহা কোনও ক্রমে প্রকাশ করিয়া ফেলিবেনই। কুমুদিনী অনেক চেষ্টা করিয়াও কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, শ্রীনাথবাবুর পত্রের কথা আগাগোড়া বিবৃত করিয়া ফেলিলেন।

তাহার জন্যই নীরা একমাত্র স্নেহাশ্রয় মাসীমার স্নেহময় কোল ছাড়িয়া সেই দুঃসহ নির্ব্বাসিত জীবন ভোগ করিতে যাইতেছে ইহা শুনিয়া অমিয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহাদের ন্যায় যুবক যুবতীর এরূপ আলাপে, কথাবার্ত্তায় লোকে তো দোষ ভাবিবেই, এটা তো শ্রীনাথ-বাবুর অন্যায় সন্দেহ নহে। স্নেহের খাতিরে কুমুদিনী ও পরেশবাবু কোন কথাই মনে আনিবেন না, কিন্তু এ যে যথার্থ সত্য কথা। তাঁহারা তাহাকে অবাধে মিশিবার অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু সে কেন শেষ ফলটা ভাবিয়া দেখিল না, তাহা হইলে তো আজ নীরাকে মাসীমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইত না। নীরা তাহার জন্য এ গৃহ ত্যাগ করিবে, তাহার চেয়ে সে কেন একেবারে সরিয়া যাক না।

অমিয় জল খাইয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে অনন্তবাবু বসিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়াই একটু রাগত সুরে বলিলেন "আমি তোমায় বলে দিয়েছিলুম না ঠিক বেলা দুটোর সময় বাড়ী চলে আসতে?"

অমিয় উত্তর দিল "আজ অনেক পড়া ছিল, ছুটি পাই নি।"

সে যে পিতার সাধু সঙ্কল্পটা উল্টাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই বেলা তিনটায় কলেজের ছুটি হইলেও এই দেড়ঘণ্টাকাল চুপ করিয়া লাইব্রেরী-রুমে বসিয়াছিল তাহা কিছুতেই বলিতে পারিল না।

অনন্তবাবু বলিলেন "তোমার মত হয়েছে কি সেখানে যাবার?"

অমিয় বলিল "চলুন, আমার আর অমত নেই।"

প্রসন্ন হাসিতে অনন্তবাবুর মুখখানা ভরিয়া উঠিল, তিনি ছড়িটা হাতে লইয়া চটিজুতা জোড়াটা পায়ে দিতে দিতে বলিলেন "তা, মত না হবেই বা কেন? এতে

তোমারই ভাল, আমার আর কি? নিজের ভালমন্দ বিবেচনা করতে হয় নিজেকেই, পরে কি কেউ কারও জন্যে ভাবে?"

অমিয় সে দীর্ঘ লেকচারে কান না দিয়া বলিল "হেঁটে যেতে পারবেন কি অতদূর?"

অনন্তবাবু উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন "ওঃ, তা খুব পারব। তোমরা দু-দিন সহরে থেকে বাবুগিরিটাই শিখেছ, দুপা হাঁটতে গেলে হাঁফিয়ে পড়, পয়সা খরচ করতেই জানো। ভগবান তোমাদের ওজনের ডবল ওজন আমায় দিয়েছেন, তবু যে তোমাদের মত মিথ্যে বাবু হই নি এর জন্যে সত্যি আমি তাঁর কৃতজ্ঞ হয়ে আছি তাঁর কাছে। যা নিজেরা পারব তার জন্যে অনর্থক কতকগুলো পয়সা খরচ করতে আমি চাই নে।"

তিনি আগে আগে চলিলেন, অমিয়ও সুবোধ বালকের মত তাঁহার পিছনে পিছনে চলিল। মাঝে মাঝে তিনি পিছন ফিরিয়া দেখিতেছিলেন অমিয় আসিতেছে কিনা। পিতার মনোভাব বুঝিয়া সে মনে মনে হাসিল।

বহুবাজারে —নং বাড়ীতে পিতা পুত্র সহ উঠিলেন, বাড়ীর মধ্যে খবর গেল জামাতা আসিয়াছে।

অমিয়কে লইয়া অনন্তবাবু বাড়ীমধ্যে গেলেন। অমিয় এখানে থাকিয়া পড়িবে শুনিয়া ইভার মা ভারি খুসী হইয়া উঠিলেন।

পরদিনই অমিয় এই বাড়ীতে আসিবে বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া অনন্তবাবু পুত্র সহ উঠিলেন।

অমিয় এ পর্য্যন্ত একটাও কথা বলে নাই। সন্দিগ্ধনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া অনন্তবাবু বলিলেন "তোমার মুখে যে কথা নেই একটা, ব্যাপারখানা কি? হেন কি একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেছে, ভয়ানক বড় একটা তোমার পা বিয়ে বয়ে গেছে, এমনিই বিমর্ষ, অন্ধকার হয়ে গেছে তোমার মুখখানা। তোমার মনের ভাবটা কি স্পষ্ট করে এখনও তো বুঝলুম না।"

পিতার অজ্ঞাতে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অমিয় বলিল "মনের ভাব আর কি; আমি এখানেই থাকব, কলেজে থাকব না।"

যাওয়ার সময় অনন্তবাবু ভারি স্ফূর্তিতে পথে চলিয়া ছিলেন কিন্তু আসার সময় খানিকদূর হাঁটিয়াই হাঁফাইয়া উঠিলেন, অমিয় দেখিল তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে; সে বলিল "একখানা গাড়ী করব বাবা?"

অনন্তবাবু বলিলেন "দরকার কি, বরং এখানে একটু বসা যাক, বলিয়া তিনি পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন পয়সা টাকাগুলি ঠিক আছে কিনা।"

অমিয় দেখিল তিনি একটী পয়সা ব্যয় করিতেও একান্ত নারাজ, সে বলিল "আমি আর হাঁটতে পারছিনে, পা বড় ব্যথা করছে।"

তখন পথে লাইটগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার আলোকে পুত্রের ম্লান মুখখানার পানে চাহিয়া অনন্তবাবু ভাবিলেন অতিরিক্ত হাঁটিয়াই তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আহা, সে কখনও হাঁটে না, কষ্ট তো হইবেই। তিনি দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন "তবে না হয় ডাক একখানা গাড়ীকে; তোমার যখন এতই কষ্ট হচ্ছে তখন না হয় একখানা গাড়ীই করা যাক।"

পাশ দিয়া একখানা গাড়ী চলিয়া যাইতেছিল, অমিয় গাড়ীখানাকে ডাকিয়া পিতাকে লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। তাহার জন্য অনন্তবাবুকে অনেক সময় এইরূপ করিয়া অনেক পয়সাই অপব্যয় করিতে হইত।

পরেশবাবুর বাড়ীতে আসিয়া অনন্তবাবু বাহিরের ঘরে চলিয়া গেলেন, অমিয় খানিকক্ষণ পথে বেড়াইতে লাগিল।

পরদিন তাড়াতাড়ি করিয়া আহার করিয়া লইয়া অনন্তবাবু পুত্রকে অনেক উপদেশ দিয়া দেশাভিমুখে রওনা হইলেন।

আগের দিন হইতে অমিয়ও কাহারও সহিত কথা বলে নাই, আজও চুপচাপ আহার সারিয়া লইয়া চুপচাপ গৃহে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল "মা ডাকছেন।"

অমিয় বিরক্তভাবে উঠিয়া পড়িল।

আজ বৈকালের চায়ের টেবিলে পরেশবাবুও ছিলেন। সে গিয়া তাঁহার পার্শ্বে একখানা চেয়ার টানিয়া লইল। আজ সদা প্রফুল্লমুখী নীরার মুখখানা বড় বিমর্ষ, তাহার এই মলিন ভাবটা অমিয়ের মনকে অজ্ঞাত আঘাত করিল।

পরেশবাবু তাড়াতাড়ি চা খাইয়া নামিয়া গেলেন। কুমুদিনী অমিয়ের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল তোমার বাপের সঙ্গে কোথায় গেছলে অমিয়?"

অমিয় মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল "বহুবাজারে গেছলুম।"

কুমুদিনী বলিলেন "বহুবাজারে? বিশেষ দরকার ছিল বুঝি?"

অমিয় একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বাবা সেখানে আমার থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে এলেন, কাল সকালে আমায় এখান হতে চলে যেতে হবে।"

কথাটা এমন অস্বাভাবিক ভাবে কুমুদিনীর কানে আসিয়া বাজিল যে তিনি বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে চাহিলেন। নীরা বলিয়া উঠিল "আপনিও চলে যাবেন, তা হলে এঁরা থাকবেন কি করে? না অমিয়বাবু, আপনার যাওয়া কোন মতেই হতে পারে না।"

অমিয়ের মনের মধ্যে কবিত্বপূর্ণ কথা অনেকগুলি জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে সব কথা কোনক্রমে প্রকাশ করা যায় না, মনের কথা মনেই রাখিয়া সে একটু উদাসীন ভাবে বলিল "আপনি তো থাকবেন।"

নীরা বিস্মিতভাবে বলিল "আমি থাকব? আপনি কি জানেন না আমায় আজকালই চলে যেতে হবে।"

অমিয় বলিল "তা আমি জানি বলেই যেতে চাচ্ছি। আমার জন্যে আপনি যে অপরাধের বোঝা মাথায় নেবেন, আমার জন্যে আপনাকে যে আপনার এই স্নেহাশ্রয় ছাড়তে হবে এ আমি দেখতে পারব না। অনেক ভেবে ঠিক করেছি আমার এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল।"

নীরা একটুখানি নীরবে রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল "না আপনি কিছুতেই যেতে পাবেন না অমিয়বাবু, আপনার যাওয়া হবে না।"

অমিয় কুমুদিনীর পানে চাহিয়া বলিল "বলুন কাকিমা, এ অবস্থায় আমার যাওয়া উচিৎ কিনা; শুধু আমার জন্যেই ইনি সরে যাচ্ছেন, আমি যদি চলে যাই তাহলে হয় তো যেতে হবে না এঁকে।"

কুমুদিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "না অমিয়, তোমার যাওয়া কোন মতেই হতে পারে না।"

অমিয় বলিল "আপনিও এ কথা বলছেন কাকিমা? ভেবে দেখুন এতে আপনাদের সবারই ভাল হবে। শুধু আমার জন্যেই যে আপনাদের এমন লাঞ্ছনা সইতে হচ্ছে এর জন্যে আমি যে কতদূর লজ্জিত হয়ে উঠছি তা আর কি বলব। আপনাদের কাছে আমার মুখ দেখাবার মুখ আর নেই। আমি বলছি হয়তো আমি চলে গেলে শ্রীনাথবাবু নীরাকে নিয়ে যাবার জন্যে এতটা ব্যগ্র হয়ে উঠবেন না, নীরা এখানেই থাকতেই পাবেন। আমি নীরার চেয়েও আপনাদের স্নেহের পাত্র নই, আমায় রেখে আপনাদের যে কতটা ক্ষতি সইতে হচ্ছে সেটা ভেবে দেখেছেন কি?"

ধীরস্বরে কুমুদিনী বলিলেন "ভেবে দেখেছি বাবা। তোমায় আজ ছয় বছর নিয়ত কাছে পেয়েছি, এর আগেও ছোটবেলা হতে তোমায় দেখেছি, খাইয়েছি, নিজের ছেলের চেয়ে কোনও অংশে তুমি আমাদের কম নও। আমি যে এত সহজে শুধু লোকের কথায় তোমায় ছেড়ে দেব তা তুমি মনে ভেব না। কিন্তু একটা কথা আছে বাবা, তোমার কাকা আমায় অন্ততঃ একশবার বলেছেন একথা যেন অমিয় না শুনতে পায়, তখন রাগের ঝোঁকে কথাটা সামলাতে না পেরে তোমায় বলে ফেলেছি। এখন তুমি আমারই কথা শুনে চলে যাচ্ছো একথা শুনলে তোমার কাকা আমায় কি বলবেন বল দেখি? আমায় কি তিনি অবিশ্বাসিনী বলে ঘৃণা করবেন না? তোমার কাকিমাকে এই মস্ত বড় কলঙ্কের হাত হতে বাঁচানো আজ তোমারই কাজ বাবা, দুনিয়ার আর কেউই আমায় বাঁচাতে পারবে না। মনে ভেবে দেখ আমার কথাগুলো; তারপরে যা হয় বল, কর।"

অমিয় একটুখানি চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর নীরার পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল "আমাদের এক বাড়ীতে যে থাকা হবে না এ ঠিক সত্যি কথা। আমিই যাই বা আপনিই যান, একজনকে ঠিক যেতে হবেই। কিন্তু আমি এই ভেবে বড় কষ্ট পাচ্ছি, কেবল আমার জন্যেই আপনাকে এই স্নেহের কোল হারাতে হল।"

নীরা-হসিল "আমিও ভারি সুখী হচ্ছি যে, আমি নিজে সরে গিয়ে আপনার আসন ঠিক রাখতে পারলুম।"

তাহার কথাগুলা বেশ সরল, স্বাভাবিক কিন্তু তাহার সুরে বেদনার অস্পষ্ট যে সুরটা বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল তাহা অমিয়ের বক্ষেও বাজিতে লাগিল। নীরা তাহার জন্ত কতখানি দিয়া গেল, কিন্তু সে তো কই তাহার জন্ত এতটুকু ত্যাগও করিতে পারিল না, এই বেদনাটাই তাহাকে মর্ম্মঘাতী যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

নারী

শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[১]

ভূতলে অতুল সৃষ্টি ধাতার, তোমার সৃষ্টি নারী,
তব অকূল স্নিগ্ধ ছায়ায় আমি হই সংসারী।
তুমি মা জননী, প্রেয়সী আমার, তুমি জীবনের আলো,
তোমার স্নেহ ও প্রীতির পরশ সকল হইতে ভালো।

[২]

তোমার মহিমা চির অজ্ঞাত, বিধাতার আছো ভুল
তোমারে বুঝিতে পারিল না কভু তুমি যে কিসের মূল।
বহুরূপে তব বহুরূপ দেখি শান্ত করুণ মূর্ত্তি;
রক্ত লিপ্ত অঙ্গে তোমার রণোন্মাদের স্ফূর্ত্তি!

[৩]

তুমি যে জননী, প্রেয়সী, ভগিনী, তুমি যে সচীব, সখী,
ধন, সম্পদ, জীবন আমার, তোমারে ভরসা রাখি।
সুখে দুখে তুমি সোহাগী, দরদী, তোমার অশ্রু জল
বিপুলা ধরার বুকে বাজে তাও দুলে উঠে টলমল!

[৪]

জীবন হইতে শ্রেষ্ঠ তোমার সতীর গরিমাখানি,
অপমানে তার স্বামীরেও তুমি দেখাও খড়্গপাণি।
শান্ত স্নিগ্ধ নয়নে তোমার আগ্নেয়গিরি জ্বলে,
মহাদেবী তুমি, দৈত্য দানব পিষিত চরণ তলে।

[৫]

তুমি শুধু নারী? শক্তিরূপিনী দুর্ব্বলে দাও বল,
অমৃত দাও বরষিয়া তুমি পরশিয়া অকূল।
স্নেহময়ী তুমি অন্নপূর্ণা, তোমার প্রসাদ পুণ্য
বসুধা মিটায় সুধা আপনার সকল অভাব দৈন্য।

[৬]

পুত্রের লাগি হেসে দাও তুমি বুকের রক্ত চিরে,
অকূল দিয়ে বেঁধেছ নয়ন অন্ধ বঁধুর তরে।
দুর্গম বনে স্বামীর সনে সহেছ কতই দুখ,
রাজনন্দিনী ভিখারী স্বামীরে লভিয়া বরেছ সুখ!

[৭]

মার মন্দিরে বাজেনি এখনো শঙ্খনাদের রব,
জাগেনি বসুধা রহিয়াছে তার ঘুমায়ে এখনো সব,
আসিবে সেদিন জাগিয়া উঠিবে শক্তিরূপিনী নারী,
কুসুম-কোমল চরণে পিষিয়া মরিবে অত্যাচারী।

মুসলমান বীরাঙ্গনা

শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক।

মাতৃ-মন্দিরের পাঠিকাগণ অনেক হিন্দুরমণীর, বিশেষতঃ রাজপুত-নারীর বীরত্বকাহিনী শুনিয়াছেন। আজ তাঁহাদিগকে একজন অলোকসামান্যা মুসলমান বীরাঙ্গনার কথা শুনাইব।

জগদ্বিখ্যাত মোগলসম্রাট আকবরের পররাজ্যলোলুপতা দুইজন তেজস্বিনী রমণীকে খ্যাতি দান করিয়াছে। একজন হিন্দু—গড়মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতী; অপরজন মুসলমান—আমেদনগরের চাঁদসুলতানা। এই চাঁদ-সুলতানারই অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী আজ বলিতেছি।

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে দাক্ষিণাত্যের আমেদনগরের রাজা ছিলেন হুসেন নিজাম শাহ। তাঁহার একটি কন্যা ছিল—পরম রূপলাবণ্যময়ী, অশেষ গুণের আধার। এই কন্যার যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার রূপের খ্যাতি ও গুণের সৌরভ ভারতময় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এই অনুপম রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেক মুসলমান রাজাই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিজাপুররাজ আলি আদিল শাহের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল; নিরুপমা চাঁদ পত্নীরূপে তাঁহার প্রাসাদ আলোকিত করিলেন।

চাঁদের চন্দ্রলাঞ্ছিত কান্তি তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্য্যকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। বিবাহের পর তিনি পতিভক্তির অপূর্ব্ব রমণীয়তায় আরও মাধুর্য্যময়ী হইয়া উঠিলেন; আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল কি করিয়া তাঁহার প্রিয়তমকে প্রীতিদান করিবেন। পরস্পরের প্রগাঢ় ভালবাসায় স্বামী-স্ত্রীতে কিছুকাল কঠোর সংসার ভুলিয়া ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট-দেবতার বুঝি তাহা সহ্য হইল না; তাঁহাদের সুখের সংসারে শীঘ্রই তাঁহার অযোঘ বজ্র পড়িয়া সমস্ত মাধুর্য্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে নিতান্ত অকালে আদিল শাহের মৃত্যু হইল।

জীবনের ধ্যানধারণার একমাত্র অবলম্বন হারাইয়া চাঁদের হৃদয়ে যে দুর্ব্বিসহ দুঃখ উপস্থিত হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু চাঁদ সামান্যা নারী নহেন; তিনি অন্তরের আগুন অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া স্বামীর পরিত্যক্ত রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। নিজেদের সন্তান না থাকায় স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র নবমবর্ষীয় শিশু ইব্রাহিমকে রাজা করিয়া চাঁদ নিজে তাঁহার প্রতিনিধি ও অভিভাবিকারূপে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

তাঁহার অধীনে কিছুদিন রাজকার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত চলিল। এদিকে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা আধিপত্য লইয়া ধীরে ধীরে পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন—ক্রমে গৃহবিবাদে সমস্ত শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের রাজগণ মিলিত হইয়া বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। চাঁদ তাঁহার সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া সর্দ্দারগণকে সম্মিলিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দীপনায় মিলন সাধিত হইল। মহীয়সী চাঁদের তেজে উদ্দীপিত সম্মিলিত সর্দ্দারগণের নিকট পরাজিত হইয়া শত্রু বিজাপুর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

কিন্তু ভাঙ্গন যাহার অন্তরদেশ ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে, কিসে আর তাহার রক্ষা হইতে পারে? কিছুদিন মধ্যেই চাঁদ-রচিত মিলনসৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িল—আবার বিজাপুরে গৃহবিবাদ জ্বলিয়া উঠিল। ইব্রাহিম তখন আর নাবালক নহেন; তিনি রাজকার্য্য নিজে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; চাঁদের উপদেশে বড় একটা কাণ দেন্ না। দেখিয়া শুনিয়া বিরক্ত হইয়া চাঁদবিবি বিজাপুর ত্যাগ করিয়া পিতৃরাজ্য আমেদনগরে চলিয়া গেলেন।

শান্তিসুখ বিধাতা যাঁহার কপালে লিখেন নাই, স্থান পরিবর্ত্তনে তাঁহার অশান্তি দূর হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমেদনগরে এ সময়ে চাঁদের ভ্রাতা মুর্ত্তজা রাজা ছিলেন।

কিছুদিন মধ্যেই রাজ্যলোভী পুত্র মীরণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। দু'দিন না যাইতেই আবার জনৈক সর্দারের হস্তে মীরণ নিহত হইলেন; রাজ্য অরাজক হইল। চাঁদবিবির আর একজন ভ্রাতা ছিলেন—বুহাণ। সুযোগ বুঝিয়া তিনি মোগল সৈন্যের সাহায্যে আমেদনগর অধিকার করিয়া লইলেন। বুর্হাণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম রাজা হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ বাধিল; যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। আবার অরাজকতা!

পিতৃরাজ্যের এই দুর্দিনে চাঁদ সুলতানা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি ইব্রাহিমের শিশুপুত্র বাহাদুরকে রাজা করিয়া বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিতে সকল করিলেন। কিন্তু রাজ্যের প্রধানগণের অনেকে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন এবং ফলে দলের সৃষ্টি হইল।

চাঁদবিবির বিরুদ্ধপক্ষ আকবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আকবরও এই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি পুত্র মুরাদকে বহু সৈন্যের সহিত আমেদনগর অধিকার করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

রাজ্যের এই বিপদের সময়, সুলতানা চাঁদ সর্দারগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য মিলিত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে বিপুল দুর্জ্জেয় মোগলবাহিনী লইয়া মুরাদ আমেদনগর অবরোধ করিলেন; ভয়ে সেনাপতিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। একে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ, তাহাতে অপরাজেয় মোগলের ভয়—বড় বড় সেনাপতিগণ মুরাদের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইলেন না। এদিকে দুর্গ অধিকৃত হয় হয়। বীরাঙ্গনা চাঁদ ক্রোধে ক্ষোভে অস্থির হইয়া স্বয়ং উন্মুক্ত অসিহস্তে মহিষমর্দ্দিনী দেবী ভগবতীর ন্যায় দুর্গের ভগ্নস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল; মোগলের অগ্রগতি বাধা পাইল। লাবণ্যময়ী কোমলকায়া নারীর এই অসীম তেজ, অপূর্ব্ব সাহস দেখিয়া সর্দারগণ লজ্জিত হইলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলে আসিয়া যুদ্ধে যোগদান করিলেন। মুরাদ আমেদনগর অধিকার করিতে পারিলেন না; চাঁদের বিক্রমে তাঁহার সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইল। নিরুপায় হইয়া মুরাদ সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধিমতী চাঁদ ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। মুরাদ বেরার প্রদেশ পাইয়া আমেদনগর ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু শান্তি চাঁদের ভাগ্যে নাই। মিলন স্থায়ী হইল না। দুষ্টবুদ্ধি সর্দারগণের নিমন্ত্রণে আবার বিপুল মোগলবাহিনী আমেদনগর আক্রমণ করিল। চাঁদ পুনরায় সেনাপতিগণকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল - কাপুরুষ স্বদেশদ্রোহী সেনাপতিগণকে কিছুতেই মোগলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলা গেল না। নিরুপায় হইয়া চাঁদবিবি স্থির করিলেন, সম্ভব হইলে সম্মানজনক সর্ত্তে সন্ধি করিয়া নিজেদের মান সম্ভ্রমের সহিত রাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। তাঁহার পক্ষীয় কেহ কেহ তাঁহার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, ইহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। হামিদ খাঁ নামক জনৈক লোক সৈন্যগণের মধ্যে এই কথা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্ব্বর সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া হামিদ খাঁর সহিত বলপূর্ব্বক চাঁদবিবির গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল; শরীরিণী তেজস্বিতা অকালে নির্ভিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমেদনগরের স্বাধীনতাসূর্য্যও চিরতরে ডুবিল।

বিষুবিয়স-প্রান্তে *

শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী।

৩রা জুন (১৯২৪) সকাল ৭টায় ইটালীদেশের নেপলস্ (Naples) বন্দরে আমাদের জাহাজ ভিড়িল। যাত্রীরা সব পূর্ব্ব হইতেই সহর দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। ৮টার সময় প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া আমরা প্রায় ২০০ যাত্রী সহর দেখিবার জন্য জাহাজ হইতে অবতরণ করিলাম। যাত্রীদের অনেকের সহিত ছোট ছেলেমেয়ে ছিল, তাহারা খুবই স্ফূর্ত্তির সহিত নামিতে লাগিল। যাত্রীদের কেহ সহর, কেহ নেপলসের মিউজিয়ম, কেহ বিষুবিয়স আগ্নেয়-গিরির উপরিভাগ, কেহ বা ভূগর্ভোত্থিত পম্পী (Pompie) সহর দেখিতে মনস্থ করিয়াছিল।

নেপলস্ সহরটি সমুদ্রের কিনারা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উচ্চ হইয়া পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত অবস্থিত। খুব উচ্চ স্থানের তিন-চার তলা বাড়ীগুলি সমুদ্রতীর হইতে ছোট ছোট তাসের ঘরের মত দেখা যাইতেছিল। নেপলসের এই পোতাশ্রয় (Harbor)টির তিনদিকে ক্রমোচ্চ বিস্তীর্ণ পাহাড়ের গায়ে সহরের সৌধশ্রেণী, আর দক্ষিণদিকে ধূ ধূ সমুদ্র। পূর্ব্বদিকে বিষুবিয়স আগ্নেয়-গিরির শীর্ষদেশ হইতে অনর্গল শ্বেত ও ধূসর বর্ণের ধূমরাশি নির্গত হইয়া মেঘের মত চলিয়া যাইতেছে। শুনিলাম, কোন কোন সময় বিষুবিয়সের শিখরদেশ বিদ্ধা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা বাহির হইয়া পর্ব্বতোপরিস্থিত নীলাকাশ অগ্নি-বর্ণ করিয়া তোলে। এই বিরাট আগ্নেয়গিরিই একদিন বহু ধনজনপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী পম্পী (Pompie) সহরটিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল—সহস্র সহস্র নরনারীর জীবন, মূল্যবান রত্নরাজি এবং বহু পরিশ্রম-কৃত ইটালীর অমর কীর্ত্তিসমূহ লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল।

আমরা তিনজন বাংলাদেশের যাত্রী ইংলণ্ড যাইতেছি। তিন জনই হিন্দু। অপর দুইজন—ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, কলিকাতা; হরেন্দ্রনাথ দাস, ঢাকা; আমরা তিনজনেই পম্পী দেখিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের আরও আট-নয় জন ভারতীয় যাত্রী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বড়সাহেব-ছোটসাহেব, কাজেই পম্পী সহর দেখিবার জন্য তাঁহারা জাহাজ ভিড়িবার দুই-এক দিন পূর্ব্ব হইতেই টমাস কুক (Thomas Cook) কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে Wireless যোগে বন্দোবস্ত করিয়া-ছিলেন। টমাস কুক উপযুক্ত অর্থ লইয়া মোটর গাড়ী, গাইড (পাণ্ডা), মধ্যাহ্ন-ভোজন ও চা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন*। ধীরেনবাবু ও হরেনবাবু এই কোম্পানীর তত্ত্বে পম্পী দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু আমি অমত প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের বুঝাইয়া দিলাম যে, কোন নূতন স্থান দেখিতে হইলে নিজের তত্ত্বে দেখা-শুনাই ভাল, তাহাতে আনন্দও প্রচুর হয় এবং নিজেদের অভিজ্ঞতাও অনেক বাড়িয়া যায়। —ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজেদের তত্ত্বেই সহর দেখা হইবে স্থির করিয়া জাহাজ হইতে নামিলাম। কলম্বো হইতে ৫৯৯০ মাইল আসিয়া এই ইউরোপখণ্ডে প্রথম পদার্পণ করিলাম।

জাহাজ-ঘাটেই কয়েকটি টাকা পয়সা বদল লইবার আফিস (Exchange Office) আছে। দেশ হইতে যে নোট ও টাকা লইয়া গিয়াছিলাম, কলম্বোয় জাহাজে উঠিবার সময় সেগুলি বদল করিয়া ইংলণ্ডদেশের পাউণ্ড, শিলিং, পেনী লইয়াছিলাম। ইটালীদেশে ইটালীয় মুদ্রার আবশ্যকে এখান হইতে ১০ শিলিংএর বদল লইলাম। হিসাবমত ১০ শিলিংএ ইটালীয় মুদ্রা ৬০ লেরা (Lira) স্থলে ৫৫ লেরা পাইলাম। ৫ লেরা তাহারা লাভ করিল। এক একটি লেরা আমাদের দেশের আধুলীর মত নিকেলে প্রস্তুত। ৫ লেরার নোটগুলি প্রায় এক টাকার নোটের মত। তিনজনেই কিছু কিছু ইংলিশমুদ্রার পরিবর্ত্তে ইটালীয় মুদ্রা লইয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। ক্ষণকালের মধ্যেই কয়েকটি গাইড জুটিল। প্রত্যেকেই বলিতে লাগিল—"আমি খুব কম ব্যয়ে আপনাদিগকে ভাল করিয়া সব

* Orient লাইনের জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রাপথে বিষুবিয়স ও পম্পী দর্শন বৃত্তান্ত।

দেখাইয়া-শোনাইয়া আনিব।" ইহাতে বেশ একটু গোলমাল হইয়া উঠিতেছিল, তখনই একজন সশস্ত্র ইটালীয় পুলিস আমাদের নিকট আসিয়া করজোড়ে ভদ্রভাবে ইংরাজীভাষায় বলিল—"আপনারা অনুগ্রহ করিয়া এখানে গোলমাল করিবেন না, রাস্তায় গিয়া আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা বলুন।" আমাদের পূর্ব্ব হইতেই ঠিক ছিল যে, আপাততঃ কোন গাইডের সাহায্য লইব না; কারণ আমি অগ্রজ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী মহাশয়ের মুখে এই সকল দেশের অনেক বিবরণ ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম।

পথে কয়েকটি ভদ্রলোকের নিকট পল্লী যাইবার পথ এবং আমাদের আবশ্যকীয় অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলাম। ইটালীর শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কেহ কেহ সামান্য ইংরেজী জানে, তাই কোনমতে জানিয়া শুনিয়া লওয়া চলে। শুনিলাম পল্লী যাইবার ট্রেণ ধরিবার ষ্টেশন প্রায় এক মাইল দূরে। জাহাজ হইতে নামিবার সময় সিঁড়ির সম্মুখে খুব বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখিয়া আসিয়াছি "ষ্টীমারকে বৈকাল ৬টার মধ্যে জাহাজে ফিরিয়া আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে, অন্যথায় জাহাজ ফেল করিলে কোম্পানী দায়ী নহে।" কাজেই সময় আমাদের খুব সংক্ষেপ। অল্প সময়ে ষ্টেশনে পৌঁছিবার জন্য একখানা ফিটন গাড়ী ১০ লেরা ভাড়ায় ঠিক করিলাম। এখানকার গাড়োয়ানেরা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পোষাকপরিচ্ছদও তাহাদের বেশ ফিটফাট্।

বেলা দশটার সময় ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এগারটার সময় ট্রেণ ছাড়িবে। এই এক ঘণ্টা সময় বৃথা বসিয়া না থাকিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ দেখিতে বাহির হইলাম। ষ্টেশনের নিকটেই ইটালীদেশ সম্বন্ধীয় অনেক ছবি ও নানা বিষয়ের রাশি রাশি পুস্তক কিনিতে পাওয়া যায়। আমরা কয়েকখানি পুস্তক লইলাম। রাস্তায় কর্ম্মশীল লোকজন জলবায়ুর সঙ্গে-পদক্ষেপে যাতায়াত করিতেছে। অনেকে আমাদের কৃষ্ণবর্ণ চেহারার পানে বেশ একটু স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিল। রাস্তার দুইধারে আমাদের কলিকাতার মতই বড় বড় বাড়ী—কতক পাথরের, কতক বা ইটের। পাহাড়ের উপর সহর, কাজেই রাস্তাগুলি পাথরের। কলিকাতার মত সোজা রাস্তা নয়। দোকানগুলি বেশ সুন্দর সাজান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এদেশের লোকের গায়ের রং ফর্সা, কিঞ্চিৎ লালাভ। চুল, ভ্রূ, চোখের তারা সাহেবদের মত ধূসর বর্ণের নহে, অনেকটা আমাদের বাঙ্গালীর মত কাল। মেয়েরা এখানকার রাস্তাঘাটে অবাধে গতিবিধি করে। তিন-চারটি করিয়া মেয়ে চামড়ার ব্যাগের ভিতর পুস্তকাদি লইয়া গলায় ঐ ব্যাগ ঝুলাইয়া দ্রুতপদে বিদ্যালয়ে যাইতেছে দেখিলাম। অন্যান্য কর্ম্মশীলা মেয়েরাও বেশ সঙ্গের গতিতে আপন আপন কাজে যাতায়াত করিতেছে। মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ মোটেই এলোমেলো নয়, বেশ আঁটসাঁট। আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও স্বাধীন দেশ দেখি নাই; স্বাধীন দেশের বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুক্ত প্রাণের পরিচয় কখন পাই নাই; শিশুকাল হইতে তাহারা যে কিরূপ স্বাধীন চিন্তার ভিতর দিয়া বড় হইতে থাকে তাহাও কখন অনুভব করি নাই। তাই এই ইটালীবাসীদের কাজকর্ম্ম, গতিবিধি সবই আমার কাছে বড় নূতন রকমেরই লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একঘণ্টা কাটিয়া গেল। যথাসময়ে ষ্টেশনে গিয়া প্রতিজনে ৮ লেরা ১০ সেণ্ট দিয়া এক একখানি যাতায়াতের টিকিট কিনিলাম; ২০।২২ ফিট নিম্নগামী সিঁড়ি দিয়া প্লাটফরমে পৌঁছিতেই ট্রেণ আসিল। আমরা ট্রেণে চাপিলাম। ট্রেণ পল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল। তখন বেশ একটু গরম বোধ হইতেছিল, ইউরোপ শীতের দেশ হইলেও শীতের তুলনায় ইটালীটাই একটু গরম। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, তাই মাঝে মাঝে বাতাস আসিয়া বড় আরাম দিতেছিল। এদেশের গাড়ীগুলি যদিও আমাদের দেশের Broad Gauge এর গাড়ীর অপেক্ষা একটু ছোট, তবু আমাদের দেশের মত চাপাচাপি করিয়া বসিতে হয় না, এবং তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ীগুলি আমাদের দেশের তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ী অপেক্ষা অনেক ভাল। ট্রেণ ছাড়িবার ৩।৪ মিনিট পরেই প্রত্যেক কামরায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং অল্প পরেই গাড়ীখানি একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গের (Tunnel) মধ্যে প্রবেশ করিয়া একমিনিট কাল চলিয়া পুনরায় মুক্ত জায়গায় বাহির হইল। একটি পাহাড়ের তলদেশ কাটিয়া সুড়ঙ্গ করিয়া রেলপথটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। খানিক দূর

যাইবার পর একটি বক্রস্থানে গিয়া গাড়ীখানি খুব বাঁকিয়া চলিতে লাগিল। এখানি বৈদ্যুতিক-ট্রেণ। কলিকাতার ট্রামলাইনের মত উপরে বৈদ্যুতিক তারের সহিত গাড়ীর সংযোগ আছে, নিচের লাইন ঠিক ট্রেণের লাইনেরই মত।

গাড়ীতে বসিয়া পথের দুই ধারের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমাগত ঝিউল-ঝিউল অষ্ট্রালিকাশ্রেণী—সব গুলিই সুন্দর সুন্দর ফুলভরা লতাপাতা ও গাছ দিয়া সাজান। প্রাচীর, গৃহ সবই পাথরে তৈয়ারী। কিছুদূর গিয়া পথের দুইধারে সতেজ শাক-সব্জির ক্ষেত বাগান শ্রেণী; এই সব ক্ষেত ও বাগানে এক তুঁত গাছ ব্যতীত আর কোন গাছই চিনিলাম না। মেয়েরা আঁটসাঁট পোষাক পরিয়া এই সব ক্ষেত ও বাগানে কাজ করিতেছে। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে তাহাদের ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে, কেহ কেহ বা ধবধবে সাদা বিছানায় ঘুমাইতেছে। কাজকর্ম্ম করিতে মেয়েদেরই বেশী দেখিলাম, পুরুষ ততি কোন স্থানে দৃষ্ট হইল। পাহাড়ী পথ—ট্রেণ খুব আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ফাঁকে কখন সমুদ্র, কখন নেপলস্ সহর, কখনও সুদূর বিদূবিবর শূন্য দেখা যাইতে লাগিল। যখন পাহাড়ের গা দিয়া ট্রেণ চলিতেছিল তখন পাহাড়ের গভীর নিম্নদেশ দেখিয়া প্রাণে একটা আতঙ্ক জন্মিতেছিল —যদি ট্রেণখানা গড়াইয়া পড়ে! এই দেখি বিদূবিবর বামদিকে, পরক্ষণেই দেখা গেল ডানদিকে। এইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে একঘণ্টা পঁচিশ মিনিটে আমরা পম্পী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। নেপলস্ হইতে পম্পী ১৫ মাইল। পাহাড়িয়া উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা পথ বলিয়া এই ১৫ মাইল পথ আসিতেই এত সময় কাটিয়া গেল।

পম্পী ষ্টেশনটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বহু যাত্রী এই ষ্টেশনে নামিল, অধিকাংশই আমাদেরই সহযাত্রী। একজন গাইড আমাদের সঙ্গ ধরিল, লোকটি বড় সাদাসিদে, আমাদের অল্প সময় মধ্যে অনেক দেখিয়া লইতে হইবে, তাই তাঁহাকে লইয়া একখানা ফিটিন গাড়ীতে উঠিলাম।

প্রথমে একটি নবনির্ম্মিত সহরের প্রশস্ত পথ দিয়া খানিক গিয়া একটি গির্জ্জার নিকট আমাদের গাড়ী থামিল। বাহির হইতে গির্জ্জাটীর বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না—একটি প্রকাণ্ড সাদাসিধে বাড়ী বা একটি বিরাট বাড়ীর ডাকনার মত দেখা গেল। দরজায় দুইজন বন্দুক-ধারী পাহারাওয়ালা। ভিতরে প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা এখন আমার নিকট স্বপ্নের মতই বোধ হয়। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ভাস্কর্য্য, চিত্র ও স্থপতিবিদ্যায় ইটালীই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, এখন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আমরা নয়ন মন চরিতার্থ করিলাম। গির্জ্জাটি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে—কিন্তু দেখিয়া মনে হয় যেন সদ্য প্রস্তুত। নিখুঁত শ্বেত পাথরে নানাবিধ মনোরম কারুকার্য্য ও মূর্ত্তি খোদিত করিয়া গির্জ্জাটি প্রস্তুত হইয়াছে। প্রস্তর-প্রাচীরের উজ্জ্বল আভায় ভিতরটি ঝক্‌মক্ করিতেছিল।

আমরা চারিদিক দেখিয়া ভিতরের দিকে একটু অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম প্রায় ৪০।৫০ জন নরনারী মাথা নীচু করিয়া নীরবে প্রার্থনা করিতেছেন। ভিতরে প্রবেশ করিবার অবাধ আদেশ আছে। ভিতরে গিয়া সম্মুখে বেদীর উপর নানাবিধ সজ্জিত মূর্ত্তির মধ্যস্থলে মাতৃক্রোড়ে শিশু যীশুমূর্ত্তি—পশ্চাৎ দিয়া যেন আলোক-ছটা বাহির হইতেছে। মূর্ত্তিটি অনেকগুলি মণিমাণিক্য দ্বারা সজ্জিত। ঐ সকল মণিমাণিক্যের মূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। আমি যদিও একজন জুয়েলার, তথাপি ঐ সকল রত্নরাজির মূল্য নিজ অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিতে সমর্থ হই নাই, গাইড আমাদিগকে বুঝাইয়া দিল। রূপার ছুরানীর মত বড় বড় মুক্তার একগাছা মালা ব্যতীত বিশেষ কিছুই চিনিলাম না। মুগ্ধনেত্রে খানিকক্ষণ দেখিয়া আমরা অন্য একটি ঘরে প্রবেশ করিলাম। এ ঘরের মধ্যস্থলেও একটি যীশু মূর্ত্তি আছে, ৩।৪জন নরনারী হাতজোড় করিয়া সজল-নয়নে উপাসনায় নিযুক্ত দেখিলাম।

অতঃপর আমরা আর একটি প্রকাণ্ড ঘরে প্রবেশ করিলাম। তাহার মধ্যস্থলেও শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত একটি যীশুমূর্ত্তি ক্রুশে বিদ্ধ, রক্ত পড়িতেছে। আমি কোন দিনই যীশুখৃষ্টের ভক্ত নহি, তথাপি এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া কেন যে আমার চোখে জল জল করিয়াছিল তাহা জানি না। ধবধবে সাদা পোষাক-পরা একজন পাদ্রী স্ত্রীলোক স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া কতকগুলি ফুল লইয়া যীশুর

দেবপূজার ন্যায় শুদ্ধাশ্রুকরণে এক একটি করিয়া ফুল খৃষ্টের পদতলে প্রদান করিতেছিলেন। আমরা অবাক হইয়া তাঁহার পূজা দেখিলাম। ফুল প্রদান শেষ করিয়া তিনি হিন্দুদেরই মত ভক্তিভরে একটি প্রণাম করিলেন। আমিও কেন যেন মনে মনে খৃষ্টের চরণোদ্দেশে অন্তরের প্রণতি জ্ঞাপন করিলাম।

এর পর আমরা অপর একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সে ঘরটির মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রাশি রাশি পুস্তক, কতক বিক্রয়ের জন্য, কতক বা বিতরণের জন্য সজ্জিত রহিয়াছে। এই ঘরে গিয়া আমাদের নাম ধাম লিখিয়া দিতে হইল। একজন মৃদুভাষী, ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধ কয়েকখানি ধর্ম্মপুস্তক, নিজেদের খৃষ্টমূর্ত্তি, সুন্দর তিনখানি লকেট এবং খৃষ্টের কতকগুলি ছোট ছোট ছবি আমাদিগকে দিবার জন্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি রোমান ক্যাথলিক?" আমরা বলিলাম "না, আমরা ভারতীয় হিন্দু।" উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ একটু বিস্ময়ভাবে মাটীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আমাদের গাইড (পাণ্ডা) আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনারা ধর্ম্মমন্দিরকে বিশ্বাস করেন?" আমরা বলিলাম "বিশ্বাস করি।" কথাটি শুনিবামাত্র বৃদ্ধ খুব আনন্দে খুসি হইলেন এবং আমাদিগকে বই, লকেট, ও ছবি দিয়া অত্যন্ত বিনয় সহকারে বিদায় করিলেন।

সমস্ত সংক্ষেপ বলিয়া এখানেই আমাদের গির্জ্জা দর্শন শেষ করিতে হইল। অতঃপর আমরা পুনরায় সেই গাড়ীতেই পম্পী অভিমুখে রওনা হইলাম। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম ষোড়শোপচারে বিশ্বকর্ম্মা ঠাকুরের পূজা করি আমরা কিন্তু ঠাকুরের কৃপা ভোগ করছে এই সব দেশের লোকে। অল্পক্ষণের ভিতরই পম্পী সহরের সান্নিহিত দ্বারে (Marine Gate) উপস্থিত হইলাম। সহরে প্রবেশ করিবার জন্য আমাদের ছয় লেয়া (বারআনা) দিয়া টিকিট করিতে হইল।

বহুকাল পূর্ব্বে এই পম্পী সহর একটি সুবৃহৎ নগর ছিল, তখনকার আমলে ইউরোপে যতগুলি প্রধান স্থান ছিল তন্মধ্যে এই পম্পী একটী বৃহৎ ও পুরাতন নগর। বন্দরটীর একদিকে সমুদ্র ও অপরদিকে ১০।১২ মাইল দূরে বিখ্যাত বিশ্ববিশ্রুত পর্ব্বত। ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-জন, শিল্প, সৌন্দর্য্য, বিদ্যালয়, শিক্ষালয় প্রভৃতির গৌরবে এবং নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদে এদেশ সর্ব্বদা ভরপুর থাকিত। তখন কেহ ভাবিতেও পারে নাই যে, এই সুবৃহৎ সহরটী একদিন ধনে প্রাণে সর্ব্বসমেত ধ্বংস হইয়া যাইবে, চিহ্নটী পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইবে।

খৃষ্টের মৃত্যুর ৭৯ বৎসর পরে, অকস্মাৎ বিশ্ববিশ্রুত-শিখর হইতে ভীষণ ভাবে ধূম, অগ্নি, নানাবিধ গলিত ধাতু নির্গত হওয়ায় অতি অল্প সময় মধ্যে ঐ পর্ব্বতের পাশের বহু দূর ব্যাপী স্থান এরূপ ভাবে চাপা পড়ে যে, বড় বড় অট্টালিকা ও বৃক্ষাদি প্রভৃতির চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে ঐ স্থান চাপা পড়িয়াছিল যে বহু স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা জীবজন্তু এক সঙ্গে প্রোথিত হইয়া যায়। পরে ঐ সকল স্থান ক্রমে ক্রমে বৃক্ষাদি-পূর্ণ স্বাভাবিক স্থানের মত হইয়া যায়।

পম্পী ধ্বংস হইবার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যায়, ক্রমে ঐ সহরের অবস্থান প্রভৃতির বিষয় লোকে বিস্মৃত হইতে থাকে এবং ক্রমে একেবারে ভুলিয়া যায়। এইরূপে ১৬ শত বৎসর পরে বারবণের রাজা ৩য় চার্লস্ প্রাচীন তত্ত্ববিদ্‌গণের সাহায্যে এবং উৎসাহে সেই বিস্তীর্ণ স্থান সমূহ হইতে সন্ধান করিয়া পম্পী নগরটীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে খনন কার্য্য আরম্ভ করেন এবং অনেক নীচে প্রাচীন সহর পম্পীর নিদর্শন দেখিতে পান। তারপর বহু বর্ষ ধরিয়া বহু লোক বহু অর্থ ব্যয়ে সহরটী খুড়িয়া বাহির করায় প্রায় ৪ হাজার বৎসর আগেকার কীর্ত্তিসমূহ বর্ত্তমানে মানবগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পূর্ব্বে রোমানদের সহর নির্ম্মাণ কার্য্য কিরূপ ছিল তাহা এই সহরটি দেখিলে অনেকটা অনুমান করা যায়।

এই ভূগর্ভোত্থিত সহরে প্রবেশ করিয়া যাহা যাহা দেখিলাম নিম্নে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। মেরিনো গেট নামক সহরের প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াই প্রথমে নজরে পড়ে—

(১) মিউজিয়ম। এই মিউজিয়মে সেই পূর্ব্বস্থলের পম্পী সহরের গৃহ-ব্যবহার্য্য জিনিস, পোষাক পরিচ্ছদ, ও ধ্বংসীভূত মানবের কঙ্কালরাশি অতি যত্নে সাজান আছে।

(২) Amphi theatre। কুড়িহাজার দর্শক বসিবার উপযুক্ত করিয়া গোলাকারে প্রস্তুত। এই স্থানে পূর্ব্বে বন্য-সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুদের সহিত এ দেশের শক্তিমান অস্ত্র ক্রীড়কদের যুদ্ধ দেখান হইত।

(৩) School of the Gladiators অস্ত্র বিদ্যালয় ও সৈন্যাগার। এটি একটি বিরাট অট্টালিকা। ইহার অভ্যন্তরে প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র এবং নরকঙ্কাল সঞ্চিত রহিয়াছে।

(৪) টেম্পল অফ্ ফরচুন (Temple of Fortune) মারকাস্ টুলিয়াস্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পর্ব্বের সময় এখানে খুব আমোদ প্রমোদ হইত।

(৫) টেম্পল অফ্ ভেনাস (Temple of Venus)। এই মন্দিরটি ঈশ্বরের প্রেরিত দূত ভেনাসের নামে উৎসর্গীকৃত। বর্ত্তমানে অনেকগুলি ভদ্রঘরের যুবক এখানে নানাবিধ ব্যায়াম চর্চ্চা করে।

(৬) টেম্পল অফ্ জুপিটার (Temple of Jupiter)। রোমানদিগের অতি প্রাচীন মন্দির। এইখানে জুপিটার মিনার্ভা ও জুলিয়াস্—এই তিনজন স্বর্গীয় দেবতার প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল।

(৭) ব্যাসিলিকা (Basilica)। প্রাচীন মনোরম মন্দির।

(৮) ট্র্যাজিক থিয়েটার। (Tragic Theatre)। পাঁচ হাজার লোক বসিবার উপযুক্ত স্থান সমেত একটি থিয়েটার বাড়ী। গ্রীষ্মকালে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি দ্বারা বাড়ীটিকে ঠাণ্ডা করিয়া দর্শকদের আরামের ব্যবস্থা করা হইত।

(৯) হাউস অফ্ দি ভেয়ার্স। সুন্দর সুন্দর চিত্র, ব্রোঞ্জের ও শ্বেত প্রস্তরের মূল্যবান মূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত। এই বাড়ীটী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। দেখিলে বিগত যুগের পল্লীর অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করা যায়।

ধ্বংসীকৃত অট্টালিকাগুলির অধিকাংশই প্রস্তরে প্রস্তুত। অধিকাংশ বাড়ীর ছাদই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাস্তাগুলিও প্রস্তর নির্ম্মিত বেশী প্রশস্ত নহে। ফুটপাথগুলি কলিকাতার ফুটপাথের অপেক্ষা অনেক উঁচু। রাস্তার দুইধারে জল রাখিবার পাথরের ট্যাঙ্ক এবং স্নানের জন্য সরকারী স্নানাগার। অনেক স্থানে ঔষধের দোকান, মদের দোকান এবং মদ তৈয়ারী করা ভাটীগুলির চিহ্ন রহিয়াছে। সহরের সর্ব্বস্থান হইতেই ইবিসুবিয়স্-শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল।

অপরাহ্ণ ৩।০ টার সময় দেখাশুনা শেষ করিয়া পাওার প্রাপ্য দিয়া ট্রেণ ধরিবার জন্য আবার ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। ষ্টেশনের পথে একজন লোক পম্পীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ গলিত ধাতু (Lova) সংলগ্ন একখণ্ড লৌহ আমাদের নিকট বিক্রয় করিল, আমরা সামান্য মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিলাম। অল্পকাল পরেই আমরা ট্রেণ ধরিয়া পুনরায় নেপলস্ অভিমুখে রওনা হইলাম। নেপলসে পৌঁছিয়া আমাদের ইচ্ছা হইল হাঁটিয়া একটু সহরটি দেখিয়া যাইব। একটি বড় রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। পথে এক বৃদ্ধার দোকান হইতে একটি মনিব্যাগ ও একটি লোহার তালা কিনিলাম। রাস্তার দুধারে খাবারের দোকান প্রচুর। 'ম্যাকরণি' (ময়দায় প্রস্তুত) ইটালীর একটি প্রধান খাদ্য। ফলমূলও এখানে যথেষ্ট মিলে। অনেক হোটেলের সাইনবোর্ড রাস্তার ফুটপাথের উপরে ঝোলান, তাহার পিছনে একটি ঘণ্টা ঠং ঠং করিয়া বাজিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। নেপলস্ সহরে বিদেশী লোক দেখিলে অসৎ আমোদপ্রমোদের জন্য প্রলুব্ধ করিবার অনেক লোক আছে। আমাদিগকেও একবার এরূপ কয়েকটি লোকের পাল্লায় পড়িতে হইয়াছিল; তাদের সে চেষ্টা অবশ্য বিফল হইয়াছিল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে আমরা অনেকদূর গিয়া পড়িয়াছিলাম, জাহাজ ঘাটের রাস্তা কোন্ দিকে ঠিক করিতে না পারায় একজন পুলিশকে ঘাটের পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পুলিশটি আমাদের আকার-ইঙ্গিতেই বুঝিয়াছিল যে আমরা পথহারা হইয়াছি। যথেষ্ট সম্মান ও ভদ্রতার সহিত সে আমাদের গন্তব্য পথ বেশ করিয়া বোঝাইয়া দিল। আমরা তাহার কথামত ঠিকঠাক জাহাজে উপনীত হইলাম। ক্ষুধায় প্রাণ আহি আহি করিতেছিল, সুখের বিষয় জাহাজে পৌঁছিবার অল্প পরেই চা খাওয়ার ঘণ্টা বাজিল। চা এর সঙ্গে জলযোগটি বেশ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া উপরতলের ডেকের উপর একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া যাত্রীদের সহিত গল্প জুড়িয়া দিলাম। আবার আমাদের বিশাল জাহাজখানি সমুদ্রবক্ষে গা ভাসাইয়া দিল। দুই দিন পরে আমরা ফ্রান্সে। সামরিক সজ্জাসম্ভার পরিপূর্ণ টুলন বন্দরে পৌঁছিব।

নারীর অভিশাপ

[কাহিনী]

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ, কবিগুণাকর।

সে ছিল সতীলক্ষ্মী, আর আমি ছিলুম নষ্ট পাষণ্ড। সে আমার হাতে প'ড়ে কত দুঃখই না সয়ে গেছে—তার জীবনটাকে আমি একেবারে ব্যর্থ করে দিয়েছি। আগে যদি জানতুম তার অতৃপ্তির, তার অশান্তির, তার ব্যর্থ জীবনের মর্ম্মন্তুদ প্রত্যেক দীর্ঘশ্বাস—প্রত্যেক হাহাকার—প্রতি ফোঁটা চোখের জল শেষে বজ্র হ'য়ে আমার বুকখানাকে ভেঙে চুড়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে তা'হলে আমি সাবধান হ'য়ে যেতুম।

আজ কত কথাই না মনে পড়ে। তখন আমার হিতৈষী বন্ধুরা প্রায়ই বলতেন "দেখ্ ভাই, তুই আজ যাকে দূর ছাই করচিস্ একদিন তারই জন্যে তোকে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াতে হবে।" তখন তাঁদের কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। এখন দেখচি, তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। তখন কি আমার রূপ ছিল? তখন আমার পূর্ণ যৌবন, রূপ ছিল—সে রূপ বড় সামান্য ছিল না, নারীর চোখে একটা কেমন মোহ এনে দিত, এখনকার মত 'বৃষকাঠ' ছিলুম না। আর পিতার যথেষ্ট অর্থ ছিল, তার উপর প্রাণে বেশ একটু কবিত্বও ছিল—এই কবিত্বই আমার 'কাল' হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং সদাসর্ব্বদাই কি এক গোলাপী নেশায় বিভোর থাকতুম—ধরাকে সরা জ্ঞান করতুম—পাপ পুণ্যের দিকে তাকাতুম না। রূপ রূপ ক'রে পাগল হয়েছিলুম। গুণের কষ্টিপাথরে তা' যাচাই ক'রে দেখবার অবসর পেতুম না, দেখবার তেমন ইচ্ছাও হতো না। যেখানে রূপ দেখতুম, সেখানেই ছুটে গিয়ে হাজির হতুম—কোন বাধা বিঘ্ন মানতুম না। কেবল রূপের পিছনে ছুটে বেড়িয়েছি—অভাগীর পানে ভুলেও তাকাইনি।

রীতিমত-নয় প'ড়ে অগ্নিদেবের সাক্ষাতে—সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে যাকে ধর্ম্মপত্নী ব'লে একদিন স্বীকার ক'রে নিয়েছিলুম, হায় আমি পাষণ্ড—কিনা তাকে বিনা কারণে নাকের চোখের জলে ভাসিয়ে—তার সমস্ত আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য ক'রে—তার সমস্ত উদ্ভিন্ন যৌবন কুসুমের উপর ঘৃণারূপ তীব্র হলাহলের উত্তাপ বারিরাশি ঢেলে দিয়ে—তার হৃদয়ের মাধুর্য্যকোরকগুলিকে একে একে পদদলিত ক'রে পংকীয়া রূপের বেদীমূলে তরুকে তরুকে প্রেমের পুষ্পার্ঘ্য উপহার দিয়েছি!—সেই আমার যে সারা জীবন দারুণ মনোকষ্ট ও অশান্তিতে কেটে যাবে তার আর বিচিত্রতা কি? এখন কেমন জব্দ হয়েছি! এখন সে কেমন ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে! এখন আমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত দুর্ব্বহ হয়ে পড়েছে! পাপের ত একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে! হিন্দু রমণী যে দেবীর অংশ—সেই দেবীর উপর আমি অথবা অত্যাচার করেছি, মঙ্গলঘট পদাঘাতে চূর্ণ করেছি। আমি দুষ্মন্ত না ত দুষ্মন্ত কে? একবার ভাবি, আমারই বা দোষ কি! তার অদৃষ্টে ঐ লেখা ছিল, আর আমার অদৃষ্টেও দুঃখু আছে। সুতরাং "অদৃষ্ট লিখন, না হয় খণ্ডন"। এই রকমের তর্কে বিতর্কে সময়ে সময়ে মনকে সান্ত্বনা খাওয়াতে যাই বটে, কিন্তু গলাধঃকরণ করতে পারিনে। শাস্ত্র যেটে যা জান্তে পেরেছি, আর ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ যা উপদেশ দেন তাতে ক'রে মনে হয়না ত' আমি একেবারে নির্দ্দোষ। তা' যাই হ'ক না কেন—আমি যে আর টিকতে পারচি নে। আমি যে আজ পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি—কই আজ আমার সে রূপের নেশা কোথা? কেউ ত কিছুতে আমাকে শান্তি দিতে পারচে না!

অভাগী যে আজ কেবল একা চ'লে গিয়ে আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেছে, আমাকে এমন ক'রে গেছে—তা' নয়, সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে নিয়ে গেছে—যাকে রেখে অভাগীকে হারাবার পর আমি সব ভুলেছিলুম, যাকে

দেখে আমার সমস্ত অশান্তি সমস্ত ব্যর্থতাকে মনের মধ্যে আদৌ ঠাঁই দিতুম না, যাকে দেখে আমার ভাঙা হৃদয়টাকে একরকমে জোড়াতাড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছিলুম—অভাগী তাকে পর্য্যন্ত আমার কাছে থাকতে দিলে না। আমি আজ যেন কেবলই শুনতে পাচ্চি—অভাগী আমাকে লক্ষ্য করে বলচে "এখন কেমন! আমাকে যেমন ফুগিয়েছিলে এখন তেমন ভোগ।" পাখী যেন সেই শব্দ চারধারে ছড়িয়ে দিচ্চে। বাতাসে যেন সে শব্দ ভেসে বেড়াচ্চে। গভীর রাতে যখন সারাজগত ঘুমে অচেতন—যখন আমি একা আঙিনার এক কোণে পড়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকি, আর মাঝে মাঝে আকাশের পানে তাকাই তখন যেন দেখি—সেই হতভাগী নক্ষত্রাবলীর মাঝখান থেকে আমাকে বিদ্রূপ করতে থাকে, আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে তার প্রিয় বস্তুটীকে বলে—যাকে 'অর্ব্বনাশী' কিছুদিন হলো নিজের কোলে টেনে নিয়েচে, "দেখ মা আজ ওর কি দশা হয়েচে।"

না, না, ভুল, ভুল! আমারি মনের ভুল। আমার যে আজ মাথার ঠিক নেই। আমি যে আজ আস্ত পাগল! আমি যে আজ বিকৃত মস্তিষ্ক। সে কখনই অমন করতে পারে না। সে ত তেমন ছিল না। আমি তাকে হাজার দুঃখু কষ্ট দিয়েচি—তবু সে আমা ছাড়া জানত না। সে এখন যেখানেই থাকুনা কেন, স্বর্গেই থাকুক, কিম্বা সাতটা জগতের যে কোন জায়গাতেই থাকুক—সে যে আমার কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দেবে তা' আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

আর যদি তাই করিস্ ওরে হতভাগী, ওরে সর্ব্বনাশী, আমাকে পর্য্যন্ত টেনে নে—আমি এত জ্বালা আর সহ্য করতে পারচি নে! তারপর তোর কাছে গেলে আমাকে যত পারিস্ শাস্তি দিস্—সে শাস্তি আমার সুখের হবে। আমি কিছুটি বল্‌ব না, কেননা আমি যে তোদের দেখতে পাব।

দিন নেই, রাত নেই, সকাল বিকেল সন্ধ্যে নেই—আমি আমার হারাণ ধনটীকে লক্ষ্য করে—আমার এগার বছরের মা-হারা মেয়েটীর উদ্দেশে—তোর প্রিয় বস্তুটীর উদ্দেশে কেবল এক গানেই গাইচি—

"সত্যি কি মা মর্‌লে পরে তোদের সঙ্গে মিলন হবে?
সেই আশাতেই বেঁচে আছি—আমায় ভুলে নিবি কবে?
হারায়েছি সুখ সোয়াস্তি নিবে গেছে মনের আলো
তোরা যখন গেছিস্ চলে' কে আর আমায় বাস্‌বে ভাল?
দীনহীন ভিখারীর চেয়েও কাঙাল আমি এ জগতে,
দেহের সনে প্রাণের মিলটা আছে বজায় কোন মতে!
আজকে কেবল হচ্চে মনে— জোর করে' তা'ছিঁড় করে'
তোদের কাছে যাই মা চলে'—নে মা আমার হাতটী ধরে!"

গোলাপ

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

গোলাপ ওগো গোলাপ
অরুণ তোমার কপোলেতে
কার বেদনার প্রলাপ?

জাগলে যখন প্রভাতে
শুভ্র অমল শোভাতে,
কুঞ্জ দ্বারে কিশোর রবি
অতর্কিতে মিল কি?

পলক তরে হিয়ার পরে
অধরেতে দিল কি?
এঁকে প্রাণের বন্ধনা
তীব্র আশার মন্ত্রণা
কুণ্ঠা কাতর প্রার্থনার?
পাগল করা বিলাপে
রক্তে রাঙ্গা করে দিল
অমল মন কলাপে!

রাসলীলা

শ্রীমতী সুশীলা নন্দী।

ব্রজের গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রাণের দেবতা বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছেন। তাঁহারা গৃহকর্ম্মে রত রহিয়াছেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন, মন প্রাণ সমস্তই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।

একদিন হেমন্তের প্রভাতে ব্রজকুমারীগণ মিলিত হইয়া কাত্যায়নীর ব্রত করিতেছিলেন। তাঁহারা কালিন্দীর কূলে গিয়া নিভৃত কদম্ব বৃক্ষমূলে বসিয়া মৃত্তিকা দ্বারা ধীরে ধীরে দেবী প্রতিমা গড়িলেন। ধূপ দীপ গন্ধমাল্যাদি সহ মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ বারবার দেবী প্রতিমাকে নমস্কার করিলেন। দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করিলেন—হে দেবী, নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের পতি করিয়া দাও।

কুমারীগণ প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে যমুনা স্নানে যাইতেন। তাঁহারা প্রতিদিনের ন্যায় আজিও তাঁহাদের পরিধানের বসন যমুনাতীরে কদম্ব মূলে রাখিয়া স্নান করিতে নামিলেন। নিঃশঙ্ক মনে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে অবগাহন করিতেছেন, আনন্দে নানাপ্রকার জলক্রীড়া করিতেছেন।

বাঞ্ছাপূর্ণকারী প্রেমময় ঠাকুর বালক-কৃষ্ণ বাল্যসখাগণসহ প্রভাতে ধেনুচারণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি গোপ বালাগণের আকুল প্রার্থনা অন্তরে অনুভব করিলেন। তখন সখা গণকে ডাকিয়া বলিলেন—এস ভাই একটা খেলা করিব। তাঁহারা যমুনা তীরে আসিয়া উপাসনারতা কুমারীগণের পশ্চাৎ হইতে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে বসনগুলি চুরি করিয়া লইয়া কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। পরে কুমারীগণকে পরিহাস করিয়া বলিলেন—হে বালিকাগণ, এই দেখ তোমাদের বসন; স্নান সমাপনান্তে আসিয়া পরিধান কর। তাঁহারা লজ্জাচকিতনেত্রে বৃক্ষোপরে তাঁহাদের আরাধনার ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তাঁহারা প্রিয়দর্শন জনিত অন্তরের আনন্দ গোপন করিয়া লজ্জাহারী শ্রীকৃষ্ণকে বসন ফিরাইয়া দিবার জন্য বিনয় সহকারে নিবেদন জানাইলেন। সুচতুর ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁহাদিগকে অসম্ভব রকমের লজ্জার বিপদে ফেলিয়া,—তাঁহাদের মন পরীক্ষা করিবেন।

কুমারীগণ নিরুপায় হইয়া জল মধ্যেই রহিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুনরায় নিবেদন জানাইলেন—হে জীবরূপী ব্রহ্ম, সকল কার্য্যই তোমাতে সম্ভব হয়, তুমি আমাদের লজ্জা নিবারণ কর। আমাদের এই অসাবধানতাপ্রসূত অপরাধের ক্ষমা কর। আমরা মন প্রাণ তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছি, এখন হে ইচ্ছাময় তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

কৃষ্ণ তখন তাঁহাদের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বসন লইতে ডাকিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আগমন করিয়া বসন পরিধান করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের সান্নিধ্য ত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন, সজল নয়নে আবার প্রার্থনা জানাইলেন—ঠাকুর তোমার শ্রীপাদপদ্ম লাভই আমাদের একান্ত বাসনা—আমরা আর কিছু চাই না, আমাদের বাসনা পূর্ণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন—তোমাদের কাত্যায়নী ব্রত সিদ্ধ হইয়াছে—তোমরা আমাকেই পতিরূপে পাইবে। আমি তোমাদেরই হইলাম। আগামী রজনীতে আমি তোমাদের লইয়া আনন্দবিহার করিব। আমাদের রাসলীলা হইবে। ব্রজবালাগণ হর্ষোৎফুল্ল মনে গৃহে গমন করিলেন।

(২)

মনোহর শরৎযামিনী; নির্ম্মল চন্দ্রকিরণে ভুবন মুগ্ধ। প্রেমময় ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসব মানসে যমুনা পুলিনে আসিয়াছেন। কুসুম বেষ্টিত কানন মধ্যে তিনি তাঁহার ভুবনমোহন বাঁশরী লইয়া সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

সে সঙ্গীত ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রবণে অমৃতবর্ষণ করিল। তাঁহারা আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কেহবা কৃষ্ণ দর্শন আশায় বেশবিন্যাস করিতেছিলেন। কৃষ্ণের মধুময় প্রেমের সঙ্গীত তাহাদের প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল। তাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ প্রেমমধু পান পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। স্বজনের নিষেধবাক্য তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারিল না। তাঁহারা শ্রীভগবান প্রাপ্তির আশায় অকর্ম্ম কুকর্ম্ম কোন কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া পাগল হইয়া কাননের দিকে ছুটিলেন।

কুমারীগণ কাননমধ্যে বংশীবাদননিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে পাইয়া মনে মনে হর্ষোৎফুল্ল হইলেন বটে কিন্তু চতুরতাপূর্ব্বক তাঁহাদের মনের অবস্থা বুঝিবার জন্য আবার ছল আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—হে ভাগ্যবতীগণ, তোমাদের আগমনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি, কিন্তু বল দেখি—তোমরা কিজন্য স্বজন পরিত্যাগ করিয়া নিশীথ কালে এই কাননমধ্যে উপস্থিত হইয়াছ? ইহা ত তোমাদের ন্যায় কুলকন্যাগণের উচিত হয় নাই। তোমরা যদি কাননের শোভা নিরীক্ষণ করিতে আসিয়া থাক, তবে তাহা ত তোমাদের সফল হইয়াছে, এখন আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাও। আর যদি প্রেমবশে আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আসিয়া থাক তবে তাহাও প্রকাশ করিয়া বল। যাহারা সংসারে থাকিয়া পতিপুত্রের সেবা করে তাহারা আনন্দে বাস করিয়া থাকে, আর যাহারা আমা হইতে দূরে থাকিয়া আমার ধ্যান কীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত থাকে তাহারাও আনন্দলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা আমার সেবায় দেহ মন সমর্পণ করে, তাহারা কখনও সুখী হইতে পারে না। তাই বলি তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।

প্রিয়তম মাধবের মুখে এইমত নিষ্ঠুর বাণী শ্রবণ করিয়া গোপাঙ্গনাগণ মনের দুঃখে মরমে মরমে মরিয়া গেলেন। তাঁহারা অধোবদনে নীরবে দাঁড়াইয়া পদনখে মৃত্তিকা খুঁটিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অশ্রুধারা নেত্রকজ্জল বিধৌত করিয়া বক্ষের কুঙ্কুম রাশিতে মিশিয়া একাকার হইল; নেত্রবারি মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—হে দয়াময় কমললোচন, এমন নিদারুণ কথা কহিয়া কেন আমাদিগকে ব্যথিত করিতেছ? আমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মের পূজা ভিন্ন আর কিছুই আশা করি না। তুমি আমাদিগকে পতি পুত্রের সেবা করিতে বলিতেছ—আমরা জানি তাহাই নারীর ধর্ম্ম। কিন্তু হে গুরো, তোমারই মুখে শুনিয়াছি তুমিই সকলের পতি-পুত্র, তুমিই ঈশ্বর, তোমার সেবাই সকলের সেবা। তুমিই জীবের নিত্যাশ্রিত পরমবান্ধব। তুমি ছাড়া আবার আমাদের পতি পুত্র কে? আমরা এতদিন গৃহকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি, এখন তুমিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছ; আর তো আমাদের গৃহে যাইবার উপায় নাই। তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। আমরা যখন তোমার সেবায় মন দিয়াছি তখন কখনই এ মন আর অন্য কোন সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিব না। লক্ষ্মীসহ তুলসীদেবী তোমার বক্ষে অবস্থান করিয়াও তোমার পাদপদ্মের প্রার্থী। তোমার অধরের বাক্যসুধা, তোমার সুমধুর হাস্য, তোমার প্রেমের কটাক্ষপাত আমাদের হৃদয়ে আনন্দ দান করে; তোমার ভুজদণ্ডে আমাদের ভয় দূর হয়। তোমার বেণুর সঙ্গীতে আমাদের ধৈর্য্য খসিয়া যায়—আমরা আর সংসারের নীতিপথে টিকিয়া থাকিতে পারি না। তোমার রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া ধেনু বৎস বিহঙ্গ মৃগগণ পুলকপ্রাপ্ত হয়। হে সর্ব্বদুঃখহারী হরি, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া গ্রহণ কর, আমাদের মনপ্রাণ সুশীতল কর; আমরা তোমার শ্রীচরণের দাসী।

(৩)

গোপাঙ্গনাগণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন যোগেশ্বর আত্মারাম শ্রীহরি লীলার ছলে তাঁহাদিগের মনোদুঃখ দূর করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি সুমধুর হাস্য করতঃ তাঁহাদের প্রাণের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। তখন, ব্রজাঙ্গনাগণ প্রেমভরে তারকা বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। তিনি সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন, গোপবালাগণও তাঁহাকে কত গান শুনাইলেন। তাঁহারা বৈজয়ন্তি মালা তাঁহাদের প্রাণেশ্বরের গলদেশে পরাইয়া দিলেন। তখন চন্দ্রকিরণশোভিত যমুনা পুলিন

আনন্দময় হইয়া উঠিল। শ্রীহরি বাহু প্রসারণ করিয়া প্রিয়াগণকে আলিঙ্গন করিলেন। কখন তাঁহাদের করে কর মিলাইয়া, কখন তাঁহাদের অলককুণ্ডল ধারণ করিয়া কত নৃত্য করিলেন কত রঙ্গ পরিহাস করিলেন। তাঁহারা আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

ব্রজবালাগণের এ আনন্দ তাঁহাদের ভাগ্যে বেশীক্ষণ টিকিল না—কামনৃত্ত শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে করিতে তাঁহারা মত্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের অভিমান উপস্থিত হইল—ভাবিতে লাগিলেন জগতে তাঁহারাই কেবল নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্তর্যামী শ্রীভগবান তাহা অন্তরে অনুভব করিলেন এবং তাঁহাদের অহঙ্কারের বিনাশার্থে অন্তর্হিত হইলেন।

যূথপতিহারা করিণীর মত ব্যস্ত হইয়া ব্রজবালাগণ কৃষ্ণ অদর্শনে বিষাদিত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা উন্মত্ত কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমাধবের প্রেমালাপ, তাঁহার সুমধুর হাস্য, সুচতুর চাহনি, তাঁহার যত প্রকার বিলাসবিভ্রম, অঙ্গনাগণের চিত্ত হরণ করিয়াছিল; তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তন্ময় হইয়া তাঁহারা কৃষ্ণের ভাব ধারণ করিলেন। আপনাদিগকেই কৃষ্ণময় জ্ঞান করিয়া প্রেমগান আরম্ভ করিলেন। পরক্ষণেই আবার নিজদের ভ্রম উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণান্বেষণে ছুটিলেন। তাঁহারা কাননের বৃক্ষরাজিকে একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—তোমরা কি কেহ আমাদের প্রাণকৃষ্ণকে দেখিয়াছ? হে হরিপ্রিয়া তুলসী, আমাদের হরি তো তোমারই, তিনি তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, তুমি কি তাঁহার সন্ধান জান? হে অশোক, হে কুরুবক, হে চম্পক, হে নাগকেশর, তোমরা কি কেহ তাঁহাকে যাইতে দেখিয়াছ? হে যূথি মল্লিকা মালতী আমাদের প্রাণেশ্বর তোমাদিগকে ভালবাসিয়া থাকেন, তিনি কি যাইবার সময় তোমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যান নাই?

এইরূপে কাননের চারিদিকে যমুনাতীরে তাঁহাদের প্রাণের ঠাকুরকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বনের কুরঙ্গিনীগণকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কোথায়ও বনলতিকাগণকে পুলকিতা দেখিয়া তাহাদের গাত্রে শ্রীনাথের নখচিহ্ন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তার পর বহু চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া তাঁহারা কৃষ্ণের বিরহ যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য পুনরায় কৃষ্ণলীলায় মগ্ন হইলেন।

তাঁহাদের একজনে কৃষ্ণ রূপ ধারণ করিলেন, আর আর সখিগণ কৃষ্ণের বাল্যসখাগণের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া নানাপ্রকার বালাক্রীড়ায় মগ্ন হইলেন। কেহ কৃষ্ণের বংশীধ্বনির এমন অনুকরণ করিলেন যে, তাহাতে ধেনুগণ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভ্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ তাঁহার মৃণালভুজখানি দ্বারা অন্য এক তরুণীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া নিজকে কৃষ্ণ কল্পনা করিয়া সখীর মুখচুম্বনে রত হইলেন। কেহ বা পীত পাত্রাবরণখানি অঙ্গুলি সংযোগে ঊর্দ্ধে দোলায়মান করতঃ গোবর্দ্ধন গিরি ধারণের অভিনয় দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। কেহ অন্য গোপিকার পদদ্বয় নিজ ভুজপাশে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া 'উদ্বলে বাঁধিলাম' বলিয়া তাহার ভীতি সঞ্চার করিয়া তুলিলেন।

(৪)

কৃষ্ণপ্রাণগতা গোপাঙ্গনাগণ নানা ভাবে ক্রীড়া করতঃ বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ কানন-পথমধ্যে কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন—উহাতে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের নিশ্চয়তা উপলব্ধি করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন হায় হায় আমরা নিশ্চয়ই তাঁহার সেবায় ত্রুটি করিয়াছি নৈলে তিনি আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন কেন? পদচিহ্ন ধরিয়া কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা কৃষ্ণ পদচিহ্নের সঙ্গে নারী পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। বলিতে লাগিলেন এ আবার কোন ভাগ্যবতী কৃষ্ণসহ বিচরণ করিয়াছেন? তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন নিশ্চয়ই ঐ ভাগ্যবতী আমাদের অপেক্ষা কৃষ্ণকে অধিক ভালবাসিয়াছে। গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়ার পদচিহ্নের উপর পড়িয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন—ভাবিতে লাগিলেন, এই ধূলিস্নানে যদি আমাদের কৃষ্ণাপরাধ কাটিয়া যায়।

গোপাঙ্গনাগণ পুনরায় পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন,নারী পদচিহ্ন রহিয়াছে কিন্তু তৎসহ

কৃষ্ণ পদচিহ্ন নাই। তাঁহারা বুঝিলেন কুশাঙ্কুরে প্রাণেশ্বরের চরণকমল বিদ্ধ হইবার আশঙ্কায় তাঁহার সখী নিশ্চয়ই এখানে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই এক তরুণী বলিলেন—সহচরীগণ, এই দেখ প্রাণসখার গভীর পদচিহ্ন দেখ; প্রেমানন্দ শ্রীনন্দনন্দন এইখানে প্রিয়াভারে ভারাক্রান্ত হইয়া গমন করিয়াছেন—আহা সে আবার কোন ভাগ্যবতী, যে আমাদের প্রিয়তমের স্কন্ধে উঠিয়া এই পথে গমন করিয়াছে। আবার এই দেখ এইখানে কৃষ্ণ প্রিয়ার চিত্ত বিনোদনার্থে কুসুম চয়ন করিয়াছেন। এই যে ঘন ঘন অসম্বদ্ধ পদচিহ্ন, এই যে চরণ নখাগ্রের গভীর চিহ্ন, এখানে পদনখাগ্রে নির্ভর করিয়া উচ্চ ডালে কুসুম সংগ্রহ করিয়াছেন। এই যে ছিন্ন কুসুমপত্র পড়িয়া রহিয়াছে—এইখানে বসিবার চিহ্ন রহিয়াছে, এই যে ছিন্ন পুষ্পগুচ্ছ দেখা যাইতেছে, এই স্থানে বসিয়া আমাদের প্রাণেশ্বর তাঁহার প্রিয়ার কবরী পুষ্পসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। হায় সখী আমরা ভাগ্যহীনা। প্রিয়ার সঙ্গে তিনি কত রঙ্গই যে করিয়াছেন!

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সখিগণকে পরিত্যাগ করিয়া যে সুন্দরীর সঙ্গে গমন করিয়াছেন, সে নারী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে! আমিই রমণী-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; নতুবা কৃষ্ণ সকলকে ছাড়িয়া আমার প্রতি এত অনুরক্ত হইলেন কেন। সুন্দরী মদগর্ব্ব ভরে মাধবকে ডাকিয়া কহিল—দেখ কৃষ্ণ, আমার যাহা খুসী তাহাই করিব, যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইব—তুমি আমাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহার মনের অহঙ্কার বুঝিয়া স্কন্ধ পাতিয়া দিলেন। সুন্দরী কৃষ্ণের স্কন্ধে উঠিতে উদ্যত হইলেন—অমনি তিনি আবার অন্তর্ধান হইলেন।

সখীগণ কৃষ্ণান্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া দেখেন সেই সুন্দরী একাকী বনমধ্যে বসিয়া "হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিতেছে। "হায় কেন আমি মদগর্ব্বে মত্ত হইয়া মাধবের প্রতি এহেন আচরণ করিলাম" বলিয়া বিলাপ করিতেছে। সখীগণ তাহার দুঃখে সমদুঃখ প্রকাশ করিলেন; সকলে মিলিয়া আবার কৃষ্ণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তার পর চন্দ্র অস্তগামী হইলে তাঁহারা ঘোর অন্ধকারে পতিত হইলেন। আর অন্বেষণ করা হইল না।

(৫)

তখন তাঁহারা কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় যমুনা পুলিনে গিয়া সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণগুণ গান আরম্ভ করিলেন। ব্রজবালাগণের বিরহ সঙ্গীতে যমুনাপুলিন বাধিত হইয়া উঠিল। সখীগণ সঙ্গীত সমাপনান্তে কৃষ্ণের আগমন জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের নিবেদন জানাইলেন—সে নিবেদন অন্তর্যামী ঠাকুরের প্রাণ স্পর্শ করিল।

লীলাময় ঠাকুর আবার আসিলেন—মদনমোহন রূপ, কটিতে পীত বসন, গলে বনমালা, সহাস্য বদন। গোপিকাগণ যেন মৃত দেহে পুনঃ প্রাণ পাইলেন। তাঁহারা কেহ গিয়া ব্রজেন্দ্র নন্দনের শ্রীচরণযুগল দুগ্ধ-সভায় বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। কেহ অনিমেষ নয়নে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া রহিলেন। কেহ তাঁহার অঙ্গে চন্দন চর্চ্চিত করিয়া দাগাইয়া দিলেন। এইরূপ নানা ভাবে তাঁহারা কৃষ্ণবিরহের গভীর জ্বালা মিটাইতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণকে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

তখন শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করতঃ সাধ্বী নিষ্পাপহৃদয় গোপিকাদেবীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিলেন। আজ কৃষ্ণদর্শনে গোপিকাগণের প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। গোপিকাগণকে আনন্দ দান করিবার জন্য ব্রজেন্দ্র নন্দন ত্রিভুবনের যত শোভা সকলই নিজঅঙ্গে ধারণ করিলেন। গোপাঙ্গনাগণ তখন কেহ কৃষ্ণের হস্ত, কেহ পদ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ভাব ভঙ্গি, হাস্যরসাদি সহকারে তাঁহারা কৃষ্ণ প্রেমানন্দ রসে মগ্ন হইলেন।

ঠাকুর কহিলেন—হে অবলাগণ! তোমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম জাতিকুল ছাড়িয়া আমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছ। গৃহ মায়া—সে কঠিন শৃঙ্খল, তাহা ছিন্ন করিয়া আসিয়াছ; তোমাদের এই ঐকান্তিক সেবাপরায়ণতায় আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছি। আমি যে মাঝে মাঝে লুকাইয়াছি—সে কেবল তোমাদের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ মানসে। এতদিনকার আমি অন্তরালে থাকিয়া তোমাদের ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া তোমাদের

প্রতি পূর্ণ প্রীত হইয়াছি। দেবতার আশু পাইলেও আমি তো মানুষের এরূপ কখনও শোধ দিতে সমর্থ হইব না। হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদের কোন উপকার করিতে আমার সাধ্য নাই, তথাপি তোমাদের নিকট আমি ঋণমুক্ত হইতে চাই—তোমাদের স্বার্থশূন্য সুশীলতাই আমার একমাত্র সম্বল।

(৬)

অবলা সরলা সতী সাধ্বী ব্রজবালাগণ যমুনা পুলিনে শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন। তাঁহারা পূর্ণের বিরহজ্বালা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা পূর্ণকাম হইয়া প্রেমের মালা গলায় পরিলেন। করে করে ধরাধরি করিয়া তাঁহারা শ্রীহরিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। সেই নক্ষত্র মাঝে আজ বৃন্দাবনচন্দ্র গোবিন্দ প্রেমানন্দ মনে ব্রজসুন্দরীগণসহ রাসলীলায় মগ্ন হইয়াছেন। যোগেশ্বর ভগবান গোপীগণের প্রাণ মুগ্ধ করণ মানসে শত শত রূপ ধারণ করিলেন। প্রতি গোপাঙ্গনার উভয় পার্শ্বেই কৃষ্ণ। প্রতি কৃষ্ণের উভয় পার্শ্বেই গোপাঙ্গনা দণ্ডায়মানা। তাঁহারা চক্রাকারে পরিবেষ্টিত হইয়া গলা ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতি সখীই মনে করিতেছেন আমিই কৃষ্ণমধ্যবর্ত্তিনী। তাঁহারা যোগমায়ার প্রভাবে ভাবিতে লাগিলেন, প্রাণসখ ব্রজেন্দ্র নন্দন আমারই পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন।

রাস আরম্ভ হইল। প্রিয় সঙ্গে প্রিয়ার নৃত্যের তালে তালে তাঁহাদের বলয় নূপুর কিঙ্কিণির অবিরাম ধ্বনীতে ত্রিভুবন পুলকিত হইয়া উঠিল। তাঁহাদের কৃষ্ণনাম গান শ্রবণ মানসে নভোমণ্ডলে দেবদেবীগণ সমাগত হইলেন। অন্তরীক্ষে দুন্দুভি বাজিল; স্বর্গ হইতে অবিরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রেমানন্দময় ভগবান রাসেশ্বর রাসেশ্বরী-গণসহ পরমানন্দে লীলায় মগ্ন হইলেন।

শ্রীভগবানের এই রাসলীলার বিরাম নাই, ইহা সমভাবেই চলিতেছে। পরমাত্মারূপ পুরুষের সঙ্গে জীবাত্মারূপ প্রকৃতির মধুর মিলনই শ্রীভগবানের রাসলীলা। শুদ্ধ সাত্ত্বিকা ভক্তিমতী গোপাঙ্গনাগণ অনন্যমনা হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করতঃ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া রাসের উদ্ভব করিয়াছিলেন। নিরবধি ভগবানের সহিত ভক্তের এই রাসলীলা চলিতেছে। মায়ামুগ্ধ জীবের ভাগ্যে সে রসাস্বাদন অসম্ভব। তাঁহার প্রিয় ভক্তগণই সে রসের অধিকারী।

শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের উপদেশ

শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র (নাগ-দুহিতা)

একদিন নাগ মহাশয়ের নিকটে বসিয়া আছি, তিনি বলিতে লাগিলেন—ভগবান দয়াবান, তাঁহাকে যে যে ভাবে ডাকে, তিনি তাহাকে সে ভাবে দেখা দেন। একটি মেয়ে শিশুকালে একটি শিলা পাইয়াছিল। সে তাঁহাকে পূজা করিত এবং তাঁহাকে শিলা পিলা বলিত। সে শিলা পিলাকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করিত এবং অন্যস্থানে যাইয়া মনে করিলে, শিলা পিলা তথায় যাইয়া তাহাকে দেখা দিতেন। মেয়েটির বয়স হইল। পিতা তাহার বিবাহ দিলেন। শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সময় পিতা মনে করিলেন, শিলা পিলা নিয়া কি করা যায়। মেয়েটি শিলা পিলা সঙ্গে নিয়া গেল। পথে নৌকায় শিলা পিলা দেখিতে পাইয়া শ্বশুর তাহা জলে ফেলিয়া দিলেন। মেয়েটি নৌকায় বসিয়া মনে মনে শিলা পিলাকে ডাকিতে লাগিল। শিলা পিলা আসিয়া দেখা দিলেন। বাড়ী যাইয়া সে এক নির্জ্জন স্থানে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। স্বামী তাহা জানিতে পারিয়া শিলা পিলাকে জলে ফেলিয়া দিল। মেয়েটি আবার ডাকিল, শিলা পিলা আবার আসিয়া দেখা দিলেন। সে আবার নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। কয়েকদিন এই ভাবে গেলে পর স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নির্জ্জনে বসিয়া কি কর? মেয়েটি উত্তর দিল, আমি শিলা পিলার পূজা করি। স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শিলা পিলা কোথায়? মেয়েটি বলিল, আমি তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আসিয়া আমাকে দেখা দেন। স্বামী বলিল, দেখাও দেখি তোমার শিলা

শিলা কেমন? মেয়েটি তাহা স্বামীকে দেখাইলে স্বামী বিশ্বাস করিল মেয়েটি দেবত এবং শিলা শিলা নারায়ণ। সে যখন তাকে শিলা শিলা আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বামী বলিল, আমি তোমাকে পূজার ঘর করিয়া দিব, তুমি সে ঘরে বসিয়া শিলা শিলার পূজা করিবে। পূজার স্থান ঠিক করিয়া দিয়া পিতাকে সমস্ত কথা বলিল। আর কোন গোলমাল হইল না। মেয়েটি শিলা শিলার পূজা করিয়া মুক্ত হইয়া গেল।

নাগ মহাশয় বলিতেন,—ভগবান সকল স্থানে আছেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া ভগবানকে ডাকিলে, তিনি সকল স্থানে দেখা দেন। মনে প্রাণে না ডাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। মন বিষয় ছাড়িয়া শুদ্ধ না হইলে, তাঁহার ছবি হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না। একটি সাধ্বী মেয়ে ছিল। তাহার স্বামী অতিশয় ধনী। স্বামী কেবল ভোগবাসনায় রত ছিল, নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে লাগিল। এই ভাবে দিন চলিয়া যাইতেছে। মেয়েটির মনে বড় আঘাত লাগিল। সে ভাবিল, স্বামী বিষয়ে একবারে আসক্ত হইয়া বিষয় ভোগেই দিনাতিপাত করিতেছে; কত শত অত্যাচার, কত শত পাপে লিপ্ত হইতেছে, কিছুতেই তাহার বিষয়ের নেশা কাটে না, একবারও ভগবানের কথা মনে করে না। অবশেষে স্বামীকে বলিল, তুমি কখন কি ভাব তোমার কি দুর্গতি হইবে? তুমি একবারও ভগবানকে মনে কর না, বিষয় ভোগ বাসনাতেই মত্ত আছ। এ জীবন কত দিনের? অনন্তকালের তুলনায় ইহা চক্ষের পলক ফেলিতে যে সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা কম। ইহা জানিয়াও কি তোমার বৃথা সময় নাশ করিতে ইচ্ছা হয়? যে সংসারে তুমি মত্ত আছ, যে বিষয় ভোগ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করিতেছ, তাহা তুমি কতদিন নিজ বশে রাখিতে পারিবে? যখন তোমার শরীর অবশ হইয়া আসিবে, যখন তোমার ইন্দ্রিয় সকল আর বিষয় সুখ ভোগ করিতে পারিবে না, তখন তোমার কি অবস্থা হইবে? তখন তোমাকে এই আঘাত মধুর হলাহলপূর্ণ মায়াময় সংসার হইতে সরিয়া যাইতে হইবে। কে তোমার সঙ্গী হইবে? ভোগ বাসনা পূর্ণ মন ত? এখন এই সমস্ত ছাড়িয়া যাও। যথেষ্ট সংসার ভোগ হইয়াছে। ভগবানের রাতুল চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ কর। যে মন তোমাকে পঞ্চভূতের ফাঁদে ফেলিয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লইয়া যাইতেছে, তাহাকে তুমি তাঁহারই চরণে উৎসর্গ কর। কাতর প্রাণে তাঁহার নিকটে নিজ কর্মফলের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি নিজগুণে দয়া করিয়া তোমার একূল ওকূল রক্ষা করিবেন। তিনি বড় দয়ালু। দুর্বল মানব আকুল প্রাণে তাঁহার নিকট আশ্রয় চাহিলে, তিনি তাহাকে আশ্রয় দেন। পথভ্রান্ত জীব মনোরম দয়াসুখ-পূর্ণ অনন্তকালস্থায়ী পথ ভুলিয়া আপাতঃ মধুর, সদা বিপদ সঙ্কুল, পিচ্ছিল, শোক-তাপসমাকীর্ণ, পূতিগন্ধময়, অন্ধকারে ঢাকা পথে চলিতে চলিতে যখন শ্রান্ত ক্লান্ত বিহ্বল হইয়া দুই হাত তুলিয়া বলে—প্রভু, দীন দয়াল, পতিত বন্ধো, আমায় ধর। তখন তিনি সমস্ত ভুলিয়া যাইয়া, সযতনে আদর করিয়া বলেন, সন্তান, এস, আমি তোমারই জন্য পথ আগুলিয়া বসিয়া আছি। বল দেখি এমন দয়াল, এমন আপন জন কি আর আছে? এই আপন ভুলিয়া, যাহা তোমার কিছু নয়, যাহা তোমাকে চিরকালস্থায়ী আনন্দের বাজার হইতে দূরে নিয়া যায়, চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়া যাহা সত্য, বিস্বাদশূন্য তাহা দেখিতে দেয় না, তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছ। স্বামী তাহার কথা শুনিয়া কোন কথা বলিল না। মেয়েটিও সহজে ছাড়িবার পাত্রী ছিল না। সে যখনই স্বামীকে দেখিত, তখনই বলিত, তুমি কি করিতেছ? ঘরে আসিয়া স্বামী একই কথা শুনিতে লাগিল। অনেক দিন এই সব কথা শুনিয়া স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিল। তাহার কতকালের নেশা একদিন ছুটিল। সে বলিল, সত্যই ত স্ত্রী যাহা বলিতেছে, তাহার একবর্ণও ভুল নয়। আমি এই সংসারে মত্ত আছি, একদিনও ভাবি না, ইহার পর কি হইবে। এ জীবন শেষ হইলে, এ বিষয় সম্পত্তি কোথায় থাকিবে আর আমি কোথায় থাকিব। যাহা পাইলে আর ছাড়াছাড়ি নাই, তাহাতে মত্ত থাকা নিশ্চয়ই ভাল। তৎপর স্বামী স্থির করিল, সে বিষয় ছাড়িয়া দিয়া ভগবানে মন দিবে এবং স্ত্রীকে বলিল, সে সংসার ছাড়িয়া ভগবানকে ডাকিবার জন্য বনে যাইবে। স্বামী বনে চলিয়া গেল। কতকদিন পরে স্বামী বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, সে

ভাল হইয়াছে কি না। মেয়েটি বলিল, এখনও হয় নাই। স্বামী ভাবিল, সে সমস্ত ছাড়িল, তবুও ভাল হইতে পারে নাই। সঙ্গে বিছানা ছিল তাহা ত্যাগ করিয়া আবার বনে গেল। বহুদিন পরে আবার বাড়ীতে আসিল এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, সে এখন ভাল হইয়াছে কি না। স্ত্রী একই উত্তর দিল। স্বামী এবার অন্য সমস্ত জিনিষ ত্যাগ করিয়া একখানা ধুতি পরিয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা রাখিয়া বনে চলিয়া গেল। অনেক কাল পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া ভাল হইয়াছে কি না, তাহা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল। মেয়েটি কিছু বলিল না। স্বামী বলিল, দেখ প্রথমে সকল কাজ ছাড়িয়া বনে গেলাম। সঙ্গে বিছানা ছিল, পরে তাহা ছাড়িলাম। অবশেষে বসন ব্যতীত আর সকল বস্তু ত্যাগ করিলাম। তাহাতেও তুমি বলিলে, আমার কিছুই হয় নাই। এখন আমার সঙ্গে একটি রুদ্রাক্ষের মালা আর একখানা কাপড় আছে। আমি ইহাও ছাড়িলাম। সাধ্বী বলিল, তুমি ভগবানের জন্য কিছুই ছাড় নাই। তুমি বিষয় ছাড়িয়া বনে গেলে, তোমার মনে যে ভোগ বাসনা ছিল, তাহা এখনও আছে। শরীরের উপরের কাপড় ত্যাগ করিলে কি হইবে? রুদ্রাক্ষের মালা কি পরিধেয় কাপড় মন ধরিয়া রাখে নাই। যেমন বিষয় ও বস্ত্রাদি ছাড়িয়াছ, সেইরূপ মনের বাসনা সকল ত্যাগ কর, তবে ভগবানে মন যাইবে মনে বাসনা থাকিতে বনে গেলে কিছু হয় না। মনের বাসনা ত্যাগ হইলে বাড়ীতে বসিয়াই ভগবান লাভ হয়। তুমি বাসনা ছাড়। সমস্ত ছাড়া হইবে। সাধ্বীর কথায় স্বামী প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিল। নাগ মহাশয় বলিতেন সাধ্বী মেয়ে হইতেই কুল রক্ষা হয়। (ক্রমশঃ)

দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য

ডাঃ শ্রীআশুতোষ দত্ত গুপ্ত।

১। বাংলাদেশে এই অন্নসমস্যার যুগে শটির পালো প্রস্তুত জীবিকানির্ব্বাহের একটি বিশেষ পন্থা। ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় প্রচুর শটি গাছ জন্মে। এখন পর্য্যন্ত ইহা বিনামূল্যেই সংগ্রহ করা যায়। শটির পালো প্রস্তুত-প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল—ইহা শীতের প্রারম্ভে গৃহস্থের মেয়েরা প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

প্রথমে শটির মূল তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইতে হইবে। তৎপরে উহা 'ঢেঁকিতে' বা টিন-চাদরের 'খাদরীতে' কুটিয়া ছ্যাকড়া ছাকিবার জন্য জল মিশাইতে হইবে। উক্ত ছ্যাকড়া পৃথক করণান্তর জলীয় শটি ১২ ঘণ্টা অর্থাৎ সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত স্থিরভাবে রাখিয়া থিতাইয়া লইতে হইবে। এইরূপে প্রতিদিন থিতাইতে থিতাইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পাত্রের তলদেশে বহু শুভ্র পদার্থ জমিয়া গিয়াছে। উহাই শটির 'পালো বা "শটিকুড"। যত অধিক বার শটি থিতাইয়া ধৌত করা হইবে ততই উহার বর্ণের উজ্জ্বলতা ও মিষ্টত্ব বর্দ্ধিত হইবে। ধূলিহীন উচ্চ স্থানে রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে উত্তম জিনিস প্রস্তুত হইবে এবং উহা সুপথ্য ও খাদ্য হিসাবে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবে। প্রস্তুতের তারতম্যে মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধিতে ১০৲—২০৲ টাকা মণ হয়।

২। কৃষিবিজ্ঞান গ্রন্থের কথিত ও মহীশূর প্রচলিত যন্ত্রের চাষ প্রণালীতে চীনে বাদাম (গ্রাউণ্ড নট্) চাষ করিয়া উহার তৈল প্রস্তুতও একটি উত্তম কৃষি ব্যবসা। কোচিনের 'কোকনট্' ও চীনের 'গ্রাউণ্ডনট্' তৈল এদেশে হাজার হাজার মন আমদানী ও ব্যবহৃত হয়। উক্ত তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতার 'বাঙ্গারলরী', 'জোনেক' প্রভৃতি কোম্পানী অনেক ছোট ছোট কল তৈয়ারী করিয়াছেন। এই অন্ন সমস্যার দিনে বাঙ্গালী একবার এবিষয়ে লক্ষ্য করিবে কি?

৩। সুন্দর বন অঞ্চলের মউয়ালী ও তদ্রূপ গোলাদারগণের নিকট হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করাও একটি সুন্দর ব্যবসা। মধু বিক্রয়ে লাভ প্রচুর অথচ সংগ্রহ করাও সহজ।

এইরূপ শটি প্রস্তুত, তৈল প্রস্তুত, মধু বিক্রয় প্রভৃতি ব্যবসায় অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য দেশের গোলাদার ও হিতাকাঙ্ক্ষীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কলিকাতার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ বাংলার বাণিজ্যোন্নতির জন্য ঐ সব দ্রব্য সাদরে ন্যায্য দামে গ্রহণ করেন। বাংলার ব্যবসায়ীগণ এবিষয়ে চেষ্টা করিয়া নিজেদের উন্নতি ও স্বদেশের হিতসাধন করুন।

নানা কথা

মহিলা ব্যারিষ্টার—

কুমারী মাঁ কাওয়াসি নাম্নী রেঙ্গুনবাসিনী একটি মহিলা লণ্ডন হইতে ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি রেঙ্গুন হাইকোর্ট তাঁহাকে ব্যারিষ্টারী করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। মাঁ কাওয়া মি রেঙ্গুন কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেডিকেল অফিসার ডাক্তার ইউ, টান বো মহাশয়ের কন্যা। ইনি ব্রহ্মদেশের সর্ব্ব প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার। কিছুকাল পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে আর একটি মহিলা ব্যারিষ্টারী পাস করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা মহিলাদের উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কম নহে, কিন্তু কার্য্যকরী ক্ষেত্রে আমরা তাঁহার আরও অধিকতর পরিণতি দেখিতে আশা করি।

স্ত্রী-শিক্ষার উচ্চ আদর্শ—

কুমারী কে, এস, উমারেদ্ নাম্নী কলিকাতার ডায়োসেসন কলেজ হইতে বি-এ পাস করিবার পর কোন কলেজে ভর্ত্তি না হইয়াই প্রাইভেট ভাবে এম-এ ও প্রাথমিক আইন পরীক্ষার পুস্তিকার সহিত ই হইয়া নিজের পরিচালিত 'রাধাপুর মহিলা' পত্রিকার সম্পাদকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁরে ছোট ভগিনী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, বি-এল এবং কনিষ্ঠা ভগিনী বি-এ, বি-টি। অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ এই যে, তিন ভগিনীই পর্দ্দা প্রথা ত্যাগ করিয়া চলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক উচ্চ আদর্শ আমরা এই পরিবার হইতে গ্রহণ করিতে পারি।

জাপানে নারীশক্তি—

বর্ত্তমান জাপানে পুরুষ-শিল্পীদের চেয়ে নারী-শিল্পীদের সংখ্যা অনেক অধিক। সেখানে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নারী-শিল্পীদের সংখ্যা ছিল ৮,৫৩,৭০৫ আর পুরুষ-শিল্পীদের সংখ্যা ছিল ৮,২৩,৩১৫ জন। ব্যবসায়ে শতকরা ৮০ জনের অধিক নারী নিযুক্তা আছে। জাপানে নারীদের মধ্যে শতকরা ২৮ জন ব্যবসায়ে নিযুক্ত। এত বড় নারীশক্তি পাইলে বাঙ্গালাদেশ আজ কতখানি উন্নত হইতে পারিত—প্রত্যেক বাঙ্গালীর চিন্তা করিবার বিষয়। আমাদের বিশ্বাস, নারীর শ্রম সাহায্য পাইলে বাঙ্গালার একটি পরিবারেরও অন্নবস্ত্রের অভাব থাকিত না।

শিশুরক্ষা—

বাঙ্গালায় যত শিশু জন্মে তাহার এক-তৃতীয়াংশ একবৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই মরিয়া যায়। ইহার মধ্যে অধিকাংশই আঁতুড় ঘরে মারা পড়ে। প্রসূতিদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক, অনেক পরিবারেই তত্তখানি যত্ন লওয়া হয় না। বিশেষতঃ তাঁহাদের আহার্য্য যে কত এবং পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক সে বিষয় একটুও মনোযোগ না দিয়া সাধারণের আহার্য্য-দ্রব্যই তাঁহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে যে সন্তান অপুষ্ট হইবে এবং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? তারপর আঁতুড়ঘরের নিয়মাদির দোষেও অনেক শিশু মারা যায়। এই শীতকাল পড়িয়াছে, আঁতুড়ঘরের কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে আমরা পরামর্শ দিই—(১) উহা ঠিক হইতে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে প্রবেশ করে না ত? (২) মেঝে সেঁত-সেঁতে বা ঠাণ্ডা নয় ত? (৩) সূতে ন-ঢুকে আক্রমের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট গরম কাপড় ব্যবহৃত হইতেছে ত? (৪) শিশুকে ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ান হয় না ত?

নাটক-নভেল—

সহযোগী "প্রচার" লিখিতেছেন,—বাঙ্গালার নভেল-নাটকগুলি যেন বিষমিশ্রিত মধু! বাঙ্গালাদেশের অবোধ যুবক যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া এমন কি বালক-বালিকাগণ পর্য্যন্ত কুরুচিপূর্ণ নভেল-নাটক পাঠে আত্মহারা হইয়া পড়িতেছে। নভেল-নাটকের মধ্যে যে একটু আধটু শিক্ষা আছে, তাহা পাপ-চরিত্রের উজ্জ্বল বর্ণনার বিষে বিষাক্ত হইয়াছে, তাহা অতল দেখিয়া বুঝিতে পারে না।

তুরস্কের বিবাহ-আইন—

বর্ষ তুর্কীরা আইন করিয়াছেন যে, তুরস্কে বর কনেকে সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডাক্তারের দ্বারায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে হইবে। বর কনে বিবাহের উপযুক্ত স্বাস্থ্যবান বিবেচিত হইলে ডাক্তার তাহাদের হাতেমুলে চিঠির ছাপের মত সরকারী ছাপ মারেন এবং একখানা সার্টিফিকেট দেন। বর কনে ঐ ছাপ দেখাইয়া অনুষ্ঠানের পুরোহিত জোগাড় করে। বিবাহ হইয়া গেলে ঐ সার্টিফিকেট বর, কনে, পুরোহিত ও অন্যূন সাক্ষীর নাম সই করিয়া তাহা সরকারী দপ্তরে পুরোহিতকে পাঠাইতে হয়।

বিধবা বিবাহ—

ভারতে হিন্দু বিধবা বিবাহের রীতি ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের অতি রক্ষণশীল ব্যক্তিরাও ইহাতে আপত্তি করেন না। সমাজের শক্তিবৃদ্ধি ও পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত ইহা যে প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা অনেকে এখন বুঝিতে পারিয়াছেন। গত জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই নয় মাসের মধ্যে সমস্ত ভারতে ২, ১০০টি

হিন্দু বিধবা বিবাহ হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ৪২১, ক্ষত্রিয় ২৮৫, বৈশ্য ৩১১, শূদ্র ১০২, কায়স্থ ৭৩, ব্রাহ্মণেতর ৮০২, সিখ ১৪৮, বিবিধ সম্প্রদায় ৩০২। পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বিধবা বিবাহ হইয়াছে। তথায় ১৩১৩, যুক্তপ্রদেশে ৪৮৯, বিহারে ৮৪, বঙ্গদেশে ৯৯, হিন্দীতে ৭১, বিহার ও উড়িষ্যায় ৪১, মধ্য-ভারতে ৮, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও আসাম প্রদেশে ৩।

বহুমূল্য অলঙ্কারের পরিণাম—

কুতুবিয়ের মহারাণী বোম্বাইএর এক জহরীর দোকানে সেডলক্ষ টাকা মূল্যের একখানি মুক্তার হার বিক্রয় করিতে দেন। তাহারপর পরদিন দোকানদার ঐ হার বিক্রয় করিয়া বা ফেরত দেওয়ায় মহারাণী ১৯২৩সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি হারের মূল্য বা হার ফেরৎ দিবার জন্য তাগাদা দিতে থাকেন। ইহাতেও ঐ হার বিক্রয় বা ফেরত না দেওয়ায় মহারাণী ঐ দোকানদারের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিয়াছেন। গত ১৯শে জুন তারিখে পুলিস আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে লইয়া যায়। আসামী জামিন প্রার্থনা করিয়া একলক্ষ টাকা জামিন ও দুইজন টাকার দোকানদার দর্শাইলে মুক্তি পায়। ১৯শে বার হাজার টাকা মূল্যের একটি মুক্তার মালা লইয়া ৪জন পার্শি ভদ্রলোক দোকানে আসিয়া পরীক্ষা করিবার পর টাকাও দেন না, মালও ফেরত দেন না। পরে পুলিসে খবর দেওয়ায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিসের অনুসন্ধানে ৮টি মুক্তার মধ্যে ৬টি দোকানে পাওয়া গিয়াছে। অপরগুলির সন্ধান চলিতেছে। মূল্যবান অলঙ্কার লইয়া এরূপ কত অঘটনই না ঘটিয়া থাকে।

নারী-সমাজে আলস্য—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, অধিকাংশ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা আজকাল অবসরসময়ে জীবনযাপন করেন, তাঁহারা কিছুই করেন না। তিনি তাঁহাদের নারীশিক্ষাকে আবার পূর্ব্বেকার ন্যায় চরকা অবলম্বন করিতে বলেন। তিনি বলেন, ইহাতে অবসরকালে তাঁহারা আনন্দও উপভোগ করিতে পারিবেন, সেই সঙ্গে সংসারের দুই পয়সা আয়ও বাড়িবে।

মায়ের প্রাণ—

সম্প্রতি ঐরাবতের অন্তর্গত ব্রহ্মদেশের বিকটনদী একটি নৌকায় এক হৃদয়-দ্রাবক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একখানি নৌকায় ১৭ জন আরোহী ছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। কড় ঠাঁৎ নৌকাখানি ডুবিয়া যায়, আরোহীদের মধ্যে মাত্র ৭ জন রক্ষা পাইয়াছে। একটী স্ত্রীলোক তাহার শিশুকন্যাকে বক্ষে ধরিয়া বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন কোন উপায় দেখিতে পাইল না, তখন সেই কন্যাটীকে বিকটনদী কুক্ষিগামীর উদরে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং তরঙ্গ জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। শিশুটী রক্ষা পাইয়াছে। আহা! মাতৃ-স্নেহ-সিন্ধু—কত গভীর

বিজয়া দশমী—

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর "বিজয়া" বিষয়টি কি? এ উপলক্ষে আমরা লিখিতেছিই বা কবি কেন? এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই চিন্তা করি নাই। পুরাণের দুইটি সংযুক্ত নিম্নলিখিত বিষয়টি অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত বোধ হয়—রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিতে অসমর্থ হইয়া রাবণের গৃহ হইতে দশভুজাকে আনয়ন করতঃ তাঁহার পূজা করেন ও তাহার ফলস্বরূপ রাবণবধে সমর্থ হন। রাবণবধের দিনই বিজয়া নামে আখ্যাত। রাবণবধের পর রামচন্দ্রের কপি-বাহিনী জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়াছিল। সেই বিজয়োৎসবের অনুকরণই বঙ্গে বিজয়া নামে প্রচলিত।

শ্বেতাঙ্গিনীর ছাত্রী নির্য্যাতন

মিসেস ব্রডাওয়েল ইংলণ্ডের ৪৮ নং মিডল রোডস্থিত বোর্ডিং হাউসের কর্ত্রী। ইনি উক্ত বোর্ডিং হাউসে অবস্থিতা ৭বছরের ছাত্রী—মার্গারেট, কিড়া, ডেরিক, টেটা, মোরাইউকে (ইহারা যথাক্রমে ১০, ১০, ৮, ৪ এবং ৩॥০ বৎসর বয়স্কা) তাহাদের খাদ্যের সঙ্গে ফাইকলরূপে চাবুকাদিকে উপেক্ষা ও প্রহার করায় ইংলিস পুলিসের কোর্ট ইন্সপেক্টর আর্থার বন্ধ নিয়োজিত পুলিস সার্জ্জেণ্ট মিলস ইহার বিরুদ্ধে সমন বাহির হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯২ খৃঃ অব্দের ২ আইনের ৩০ ধারা মতে আসামীকে অভিযুক্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে সমন বাহির হইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

বিদেশী দ্রব্যের আমদানী—

বিগত এক বৎসরে আমাদের বাণিজ্যবিবরণে নিম্নলিখিত মূল্যের দ্রব্যগুলি বিদেশ হইতে আসিয়াছে—

কাপড় ও সুতার দ্রব্য	২৭,০৫,৩৬,৪৮৩৲
চোষা চিনি	৩,৫১,৪৪,১৪৭৲
বস্ত্র সিলিট	৮৫,৪৭,৯৮৯৲
কাচের দ্রব্য	৮,৩৭,৯০০৲
আমদানি, সিমার সিমারেট	১৫,১৬,৩০৩৲
নকল রেশম	৩১,৪০,৭১৮৲
দেশলাই	৫,৩ ,৩২২৲
খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম	১৮,২০,৪৪৮৲
মেয়ের কাপড় বুনিবার উপকরণ	৩৩,৮৪,৭১১৲
	৩১,০৫,৪৮,৯৩০৲

বিলাস-সম্ভার কিঞ্চিৎ পরিমাণ করিলে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিলেই এতগুলি টাকা বিদেশীর হাতে যাইয়া দেশের দৈন্যতার বৃদ্ধি করে।

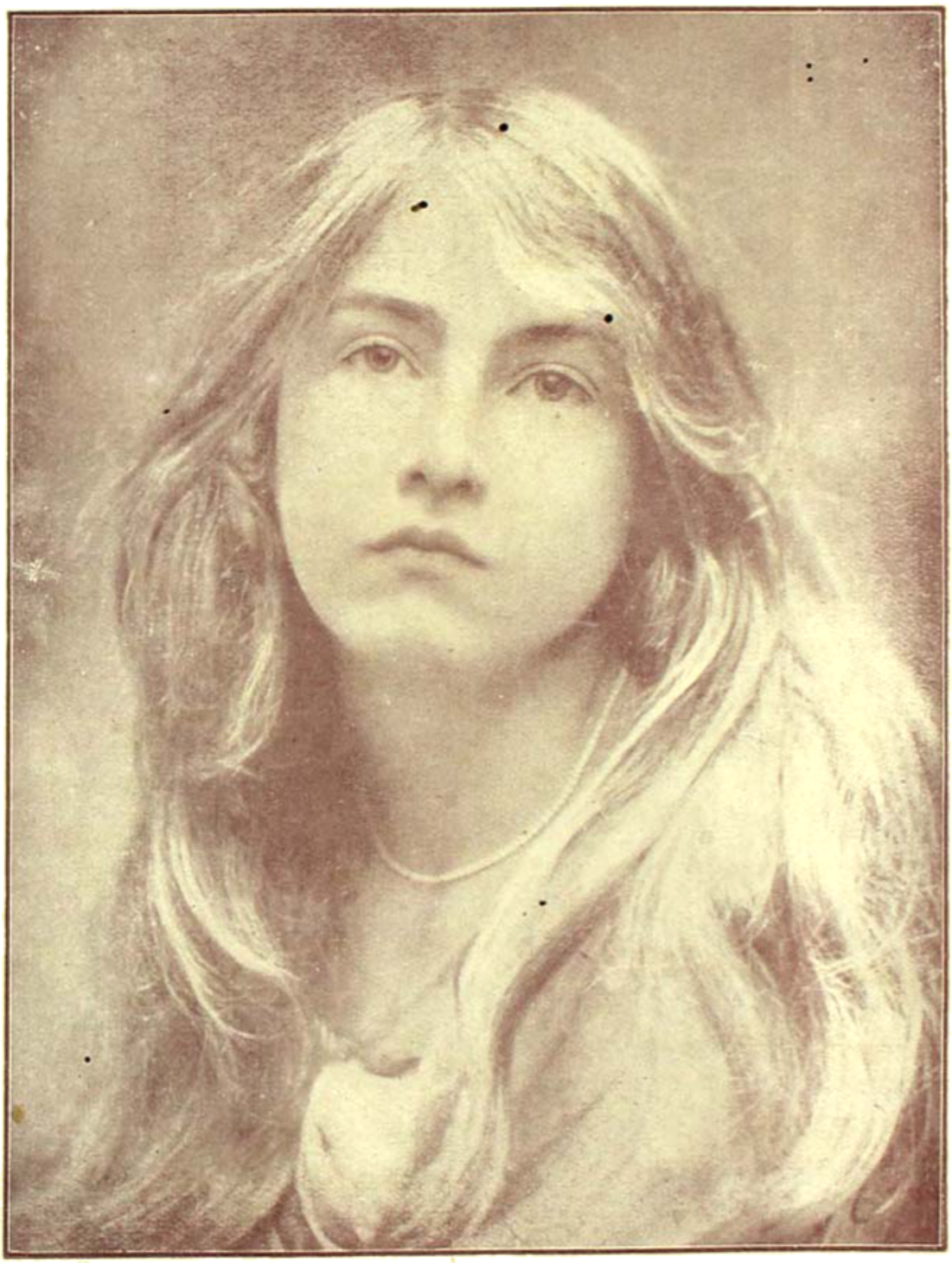

তন্ময়

Popular Press—Simla St. Cal.

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৪র্থ বর্ষ | মাঘ—১৩৩৩ | ১০ম সংখ্যা

বাণী-স্তুতি

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নমস্তে বাণি—বীণাপাণি!
নমো ইন্দু-কুন্দ নিভ
ধবল বরণী।

ঝঙ্কৃত ধৃত বীণা—মঞ্জুল সুর,
বেদ নিনাদিত প্রণব-মুখর,
সপ্তলোকাতীত,
বিশ্ব বিকাশিত,
উদ্ভাসিতাসিত-
সুন্দর ধরণী।
নমস্তে বাণি—বীণাপাণি!

সূর্য্য শতঃশত প্রস্ফুট অবিরত,
অনন্ত ব্যোম-তমু উজ্জ্বল আলোকিত,
ধ্বান্ত অন্তর্হিত,
ধীর্জ্যোতি-মণ্ডিত,
পুলক প্রকাশিত
রাগ-রাগিণী।
নমস্তে বাণি—বীণাপাণি!

তন্ত্রী উপর ধীর অঙ্গুলি চালনে,
কঙ্কণ শিঞ্জিত মিলিত সে বাদনে,
ছন্দ গঠিত নব,
মধু-রব-বৈভব,
নূপুর-নিনাদ-গীতি
গুঞ্জন গামিনী।
নমস্তে বাণি—বীণাপাণি!

নমোনমঃ দেবি! বিদ্যাবিধায়িনী,
বিজ্ঞান-জ্ঞান দান কর জ্ঞানদায়িনী,
প্রণতি চরণে তব,
তব পূজা-উৎসব
সিদ্ধ হউক, দাও
এ আশিস্-বাণী।
নমস্তে বাণি—বীণাপাণি!

নারীর শক্তিচর্চ্চা।

শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আজকাল নারীজাগরণের দিনে নারীকে সকলপ্রকারে জাগিতে হইবে, ইহাই হইতেছে এ যুগের কথা। নারী যেমন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সামাজিক আচারে এবং আসনে স্থান বিশেষে উচ্চ হইয়া পড়িতেছেন, তেমনি শারীরিক শক্তিচর্চ্চাতেও নারীকে বর্ত্তমানের উপযোগী দক্ষতা দেখাইতে হইবে।

নারীর শারীরিক শক্তিচর্চ্চার সম্বন্ধে অনেক বিষয় ভাবিবার আছে। আজকাল দেশে দেশে যে নারী-নির্য্যাতনের, নারী-অপহরণের বিবরণ শুনা যাইতেছে, আমরা দেখিতে পাই নারীর শক্তিহীনতা ও সাহসের অভাব তাহার জন্য অনেকটা দায়ী। জানিনা বিধাতা নারীকে ইচ্ছা করিয়াই পুরুষের অপেক্ষা দুর্ব্বল করিয়া সৃজন করিয়াছেন কি না। তবে ইহাও সত্য, নারী যদি পুরুষের মত সকল বিষয়েই সবল হইতেন,তাঁহার প্রাণ যদি পুরুষের মত কঠিন হইত, তাহা হইলে বিশ্বজগতে এইরূপ সুশৃঙ্খলা সম্ভব হইত না। এই সবল ও দুর্ব্বলের মধ্যে আধিপত্যের অদৃশ্য প্রভাবের ভিতর দিয়া যে মিলনের সেতু ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, তাহাই দৃঢ় এবং মধুর। পুরুষ বাস্তব জগতের সহস্র শ্রেষ্ঠত্ব সাধন করিবেন, নারী অন্তরের গূঢ় প্রদেশে করুণা ধারার সৃষ্টি করিয়া তুলিবেন,—সেই স্রোত অপ্রতিহত থাকিয়া অন্তঃসারের উষর বক্ষ সিক্ত করিয়া সকল অসার্থকতা দূর করিয়া দিবে। পরস্পরের দেয় জিনিষের পূর্ণ আদান-প্রদানই মিলন-মন্ত্রের জনক। নারী যদি পুরুষকে পরাজিত করিবার জন্য সকল প্রকারে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন, তাহা হইলে মিলনের গ্রন্থি শিথিল হইয়া যাইবে—স্বৈরত্বের দাবী অধিকার ছাড়িয়া গেলে কখনও ক্ষেয় হয় না ইহা ঠিকই।

তাই বলিয়া কি নারী নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন? ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নারী নিজের মধ্যে পারিপার্শ্বিক বিষয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যতদূর সাধ্য শারীরিক উন্নতি সাধন করিবেন। পুরুষ জাতিকে পরাজিত করিব বলিয়া নয়—নিজেকে তুলিয়া ধরিব, এই মন্ত্র লইয়া নারী তাঁহার কার্য্যে ব্রতী হইবেন। ন্যায্য প্রচলিত অধিকারে পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব সাধন করিয়া বিনয়ের শুভ্র মুকুট ধারণ করিয়া নারীকে গড়িয়া উঠিতে হইবে।

নারীর শ্রেষ্ঠ চিন্তার মধ্যে এই কথাটাকে প্রথম স্থান দেওয়া উচিত যে, নারী মাতা—তাঁহাকে সন্তান গড়িয়া তুলিতে হইবে। মাতৃজাতির মধ্যে এই শক্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। মানসিক ও শারীরিক শক্তির মধ্যে এই শক্তিই যেন তাঁহাদের সমস্তটুকু ঘিরিয়া থাকে। নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা পাইতে হইবে—সৎগ্রন্থ পড়িয়া, সৎচিন্তা করিয়া আদর্শস্থানীয়া হইতে হইবে।

কিন্তু এই শক্তিসাধনার মধ্যে শারীরিক শক্তি থাকা কতখানি প্রয়োজন, সেই কথাই আলোচনা করিব। সাংসারিক জীবনে নারীর যে অনেক শারীরিক শক্তির ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমরা জানি। অবশ্য দরিদ্র গৃহস্থ জীবনেই বেশী শক্তির ব্যবহার হয়। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অম্লানবদনে পরিশ্রম করিয়া, তাহার উপর সকলের আবদার-ফরমাস শুনিয়া, পুত্র কন্যা শাসন পালন করিয়া নারীগণ যে শক্তির ও ধৈর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব।

সাধারণ হিন্দু-গৃহে রমণীগণ যে প্রকার পরিশ্রম করেন, তাহা সময়ে সময়ে তাঁহাদের পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। ইহার ফলেও অনেক সময় তাঁহারা দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়েন। কিন্তু যে সকল গৃহে পরিমিত শক্তি ব্যয়ের অবসরে বধূগণ পুস্তকাদি পাঠ করিতে পান, বিশ্রাম করিতে পান, সেখানে তাঁহারা দুর্ব্বল না হইয়া বেশ সহিষ্ণু ও প্রফুল্ল থাকেন। গৃহস্থ জীবনে এই কথাও অবশ্য মনে করা উচিত যে, নারীর পরিশ্রম করিবার একটা সীমা আছে—জীবন যাপনের জন্য তাঁহার অন্যান্য জিনিষেরও প্রয়োজন। তবে দিবারাত্রি বিনা কাজে যাঁহারা বসিয়া থাকেন তাঁহাদের শারীরিক শক্তির চর্চ্চা করা খুবই দরকার। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকার শরীর গঠনের জন্য যে ব্যায়াম বিশেষ দরকার এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিবে কেন?

বালিকাই ভবিষ্যতে মা হইবেন। তাঁহাকেই জাতির জীবনে শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। সাধারণ গৃহস্থ-সংসারে নারী যেরূপ পরিশ্রম করেন, তাহার উপর আর কিছুই প্রয়োজন না হইতে পারে। তবে অবকাশকালে শক্তি-চর্চ্চার আলোচনা করা, ছেলে মেয়েদের লইয়া মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ ইত্যাদি খুবই দরকার। ভারতবর্ষে নারীকে অবশ্য বহু দায়ীত্ব লইয়াই কার্য্য করিতে হয়, তাহার উপর ব্যায়াম চর্চ্চা করিবার সময় এবং ক্ষমতা অনেকের থাকে না। কিন্তু যাঁহারা অলস খেলাধূলা, উপন্যাস পাঠ এবং খোস গল্প করিয়া সময় কাটান, যাঁহাদের শরীর রোগজীর্ণ, কণ্ঠ ও শক্তিশালী হইতে হইলে তাঁহাদের শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা করা উচিত। ভারতবর্ষের নারী একদিন সত্যই শক্তিরূপা ছিলেন—একথা ভুলিলে চলিবে না।

নারী শক্তিমতী হইলে, পুরুষের অত্যাচার হইতে তিনি নিজকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন,—নারী-নির্য্যাতনও কমিয়া যাইবে; ইহা আজ কাল অনেক জায়গায় প্রমাণিত হইতেছে। তবে শুধু শারীরিক শক্তিতে ইহা নিবারিত হইবে না, যথেষ্ট সাহস এবং দলবদ্ধ হইবার একটু শক্তিও চাই। আর চাই মনের বল। যেসকল ক্ষেত্রে নারী অপহৃত হইয়াছেন, সেখানে দুর্ব্বৃত্তের সংখ্যা অধিক। কখনও একটী দুর্ব্বৃত্ত আসিয়া অপহরণ করে না—দলবদ্ধ হইয়া আসে। এই দলবদ্ধ দুর্ব্বৃত্তের সম্মুখে একাকী দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করা অতিশয় সাহস ও শক্তির পরিচয়। নারীর যথেষ্ট শক্তি থাকিলেও, অস্ত্রধারী অধিক সংখ্যক দুর্ব্বৃত্তের সম্মুখীন হইয়া তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু সাহস থাকিলে এবং মনের বল থাকিলে লোকজন সংগ্রহ করিতে, সাধ্যমত শক্তিতে দুর্ব্বৃত্তদের আঘাতে জর্জ্জরিত করিতে তিনি নিশ্চয়ই পারিবেন।

একটা জিনিষ সাধারণ হিন্দু গৃহস্থ ঘরে প্রায়ই দেখা যায় না, তাহা বয়স্কগণের মুক্ত বায়ু সেবন। ব্যায়াম বাদ দিলেও মুক্ত বায়ু উপভোগ করা স্বাস্থ্যের একটী অপরিহার্য্য উপকরণ। যাহাতে অন্তঃপুরচারিণীগণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া মুক্তবায়ু সেবন করিতে পারেন তাহা অবশ্য দেখা প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে নারীকে শক্তিমতী ও তৎসঙ্গে বিপুলা সাহসিনী হইতে হইবে। সাহস থাকিলে বিপদে ধৈর্য্যহারা হইতে হয় না। বিপদে আপদে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইতে হইলে, অগ্রে সাহস থাকা দরকার! শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সাহস হয় বটে, কিন্তু তাহা মুখ্যতঃ মানসিক বলের উপরেই নির্ভর করে। মানসিক বল লাভ করিতে হইলেও শারীরিক শক্তিচর্চ্চার অবশ্যই দরকার। বাংলার স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে এ বিষয়ে অবহিত হউন, ঘরে ঘরে আত্মরক্ষণশীলা শক্তিমতী নারী জন্মগ্রহণ করুন।

পল্লীপ্রীতি

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

তোমার রূপসী, গরবী-নগরী তুমি উপভোগ কর;
আমার ক্ষুদ্র তুচ্ছ পল্লী আমার নিকটে বড়!
এর খোলা মাঠ, ধূলিময় বাট, সন্ধ্যার ঘুমরাশি,
আরতি-ঘণ্টা, ধেনুর হাম্বা, ভালবাসি, ভালবাসি!
তোমার নগর ভীড়ে কোলাহলে হলাহল ধরি' আছে,
কেবল পীড়ন, আঁটন, বাঁধন, প্রাণ কেমনে বাঁচে?
সে যেন সদাই কণ্ঠ টিপিয়া জীবন লইতে চাহে;
আমার পল্লী মধুর লীলায় জীবন-গীতিকা গাহে!
তোমার নগর আমোদ বিলায়; আমার পল্লী, হাসি—
"মদন-গোপাল" মন্দিরই মোর গঙ্গা, প্রয়াগ, কাশী!
স্বর্গ আমার ইহারই কানন-মধুর-গন্ধ মাঝে,
নন্দন-বন-পারিজাত সম মায়ের মুখটি রাজে!
চরণ-সরোজে সকল তীর্থ—জনম, মরণ সবি;
তুমি লও ধন-ধন্যা-নগরী, পল্লী মাগিছে কবি।

খেয়ার শেষে

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(১৫)

পরদিন বেলা ঠিক আটটার সময়ে কেটী ও সুধীর মোটর লইয়া উপস্থিত হইল।

নীরা আশা করে নাই এত সকালেই তাহাকে যাইতে হইবে, তাই একটু বিমর্ষভাবে বলিল "এখনি ?"

কেটী বলিয়া উঠিল "কাল বলে দিলেন যে।"

সুধীর অগ্রসর হইয়া বলিল "থাক, তোকে আর অত বকতে হবে না কেটী, কাকিমা কি বলে গেছেন আমার সময়ে ?"

নীরা একটু হাসিয়া বলিল "নাঃ, আপনারা দেখছি এ বেচারাকে মুখ খুলে কথাও বলতে দেন না। সব রকমে অভ্যাস শাসন করতে গেলে ছেলে মেয়েদের মনের যে স্বাভাবিক স্ফূর্তি সেটা একেবারে মাটী হয়ে যায়, তারা আর কিছুতেই নিজেদের জড়তা ছাড়িয়ে সরল স্বাভাবিক হতে পারে না।"

নীরা সুধীরের আরক্ত মুখখানার পানে চাহিয়া বলিল "আপনি খেয়ে যাবেন কিন্তু, মাসীমা চা তৈরি করেছেন। আমায় বললেন আপনাকে বসাতে। ততক্ষণে আমি আমার বাকি কয়টা জিনিষ আছে গুছিয়ে নেই।"

কিন্তু গুছাইল সে যে কত তাহা ভগবানই জানেন। কুমুদিনী আগেই তাহার জিনিষপত্র সব ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, এখন নিজের দেওয়া কতকগুলি জিনিস নূতন একটা বাক্সে বন্ধ করিয়া চাবিটা নীরার হাতে দিলেন।

নীরা এতক্ষণ নূতন বাক্সটার পানে চাহে নাই, এখন সেদিকে চাহিয়া বিস্মিতস্বরে বলিয়া উঠিল "একি মাসীমা ?"

মাসীমা হৃদয়ের ব্যথা গোপন করিয়া মুখে হাসি দেখাইয়া বলিলেন "কয়েকখানি কাপড় জামা—"

নীরা বলিল "আমি যে দেখব একবার মাসীমা—"

ব্যস্তভাবে কুমুদিনী বলিলেন "আর তো তোমার যাবার দেরী নেই মা, বরং কাল ওখানে দেখো। আজ থাক মা, এমন করে সাজিয়ে দিয়েছি, সব আমার অগোছালো হয়ে যাবে।"

তাঁহার মুখ দেখিয়াই নীরা তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিল। তিনি চা দিতে নীচে যাইবা মাত্র সে বাক্সটা খুলিয়া ফেলিল। কাপড়গুলির উপর কারুকার্য্য খচিত একটী বাক্স ছিল; সেইটা খুলিতেই সে দেখিল হীরক খচিত বহুমূল্য একছড়া নেকলেস, এটী কুমুদিনীর।

কুমুদিনী আসিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল "তোমার এ হার আমাকে কেন দিচ্ছ মাসীমা ? আমিও কি এমনি মেয়ে তোমার, তোমার গায়ের গহনা নেব ?"

রুদ্ধ কণ্ঠে কুমুদিনী বলিলেন "ফিরিয়ে দিসনে নীরা, ফিরিয়ে দিসনে। এ তোর মাসীমার স্নেহের দান রে, যখনই এই হার ছড়াটী গলায় দিতে যাবি তখনই তোর মাসীমার কথা বিশেষ করেই মনে হবে। এ তোর মাসীমার পবিত্র স্নেহাশীষ, ফিরাসনে নীরা, ফিরাসনে।"

নীরার চোখ ভরিয়া জল আসিতেছিল, স্নেহের সে দান সে আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না, তাহার হৃদয় এ দানের কাছে অবনত হইয়া পড়িল। নেকলেসটী গলায় পরিয়া সে বলিল "তবে এ আমার গলাতেই থাক মাসীমা, বাক্সে রেখে কোন ফল নেই। তোমার দেওয়া জিনিষ যা তা আমার কাছে অমূল্য।"

সুধীর খানিকক্ষণ অমিয়ের সহিত গল্প করিয়া বাহিরে পরেশবাবুর কাছে দাঁড়াইয়াছিল। কেটী আসিয়া বলিল "চলুন দিদি, আমাদের বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

নীরা প্রস্তুত হইয়া লইল, লছমন বাক্স লইয়া চলিয়া গেল। মাসীমাকে প্রণাম করিয়া কেটীর হাত ধরিয়া চোখ

মুছিতে মুছিতে নীরা অগ্রসর হইল। অমিয় নিজের গৃহে তখন নিবিষ্টচিত্তে একখানা কি বই পড়িতেছিল, নীরা প্রবেশ করিল জানিয়াও সে চোখ তুলিল না। নীরা তাহার মলিন মুখখানার পানে চাহিতে তাহার বুকটা অসহ্য বেদনায় ফাটিয়া যাইতে চাহিতেছিল।

বাস্তবিকই বিধাতার অলক্ষ্য অভিশাপ তাহাদের উভয়ের মাথার উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের একত্র থাকা কখনও হইবে না, তাহাদের পৃথক হইতেই হইবে। নীরার হৃদয় অমিয়ের পানে আকৃষ্ট হইয়াছে, সত্যই সে অমিয়কে ভালবাসিয়াছে; স্পষ্ট জানা গিয়াছে অমিয়ও তাহাকে ভালবাসিয়াছে—কিন্তু তাহাদের মিলন ভগবানের অভিপ্রেত নয়।

কেটী বলিল "আবার দাঁড়ালেন যে?"

নীরা চকিতে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল "না, চল, যাই।"

সে কেন এ গৃহে প্রবেশ করিল, কি শক্তি তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিল? এখন এমনি ভাবে একটু দাঁড়াইয়া ফিরিতে গেলেও উপহাসের অট্টহাসি বোধ হয় দিঙমণ্ডল ঝঙ্কারিত করিয়া তুলিবে। এমন ভাবে কাঙ্গালের মত বিদায়ের একটী বাণী উচ্চারণ করিতেও যেন অপমান বোধ হয়।

অমিয় চোখ না তুলিয়াই বেশ সহজ সুরে বলিল "এখনই যাচ্ছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি।"

নীরার আর কথা বাহির হইতেছিল না। ছোট এই একটী কথা উচ্চারণ করিতে গিয়া তাহার সুরটা বিকৃত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল, চোখের জলও খানিকটা উপছাইয়া পড়িয়া গেল।

বড় ধরা পড়িয়া গেল সে, অমিয় বিস্মিত ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার মুখখানাও বিকৃত হইয়া উঠিল। নীরা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল।

কেটী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল তাহার আরক্ত গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। খানিকক্ষণ দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া চিত্তবেগ প্রশমিত করিয়া সে চোক মুখ মুছিয়া দেখিল কেটী আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া আছে। সে তাহার কটিদেশ জড়াইয়া কাছে আসিয়া বলিল "অমন করে তাকিয়ে আছ যে কেটী?"

কেটী জিজ্ঞাসা করিল "হঠাৎ এমন করে কাঁদলেন যে?"

নীরা মলিন হাসিয়া বলিল "এতদিন রয়েছি, যাওয়ার বেলায় একটু কষ্ট হয় বই কি ভাই। তুমি তো কখনও মা বাপের কাছ ছেড়ে কোথাও যাওনি, কেমন করে জানবে ছেড়ে যাওয়ার কি ব্যথা।"

মোটরে উঠিয়া নীরা একেবারেই মুখ বন্ধ করিয়া দিল, সুধীর কেটীর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল।

(১৬)

দিনের পর দিন, মাসের পরে মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল। অমিয় পিতাকে পত্র দেওয়া একেবারেই প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। অনন্তবাবু তাহাকে কয়েকখানি পত্র দিলেন, উত্তর না পাইয়া পরেশবাবুকে পত্র দিলেন, তাহাতে লিখিলেন, তিনি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন অমিয় যেন বহরাজারে যায়, কেন সে বহরাজারে যায় নাই? সে কি পিতার একটী আদেশও পালন করিতে চায় না? যদি তাহাই হয় তবে অগত্যা অনন্তবাবু তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া দিবেন। অমন অবাধ্য ছেলে থাকিয়াও যে ফল না থাকিয়াও সেই ফল। সে যে বিবাহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহার উপায় কি হইবে?

ইহার উত্তর যেদিন আসিল সেদিন উমা সকাল হইতে ছিট হওয়ায় পড়িয়া ছিলেন। ইলা রন্ধন করিতেছিল, মাঝে মাঝে অবকাশ পাইয়া উমার কাছে আসিয়া চোখের জল মুছিতেছিল।

সে জানিয়াছিল এই শান্তিপূর্ণ সংসার-গগনে সে অমঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি একটী ধূমকেতুর মতই ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্যই এখানে জাগিয়া উঠিয়াছে এই বুকফাটা হাহাকার। হায়, এমন অদৃষ্ট লইয়াও সে জগতে আসিয়াছে? সে কি করিয়া ইহার প্রতিকার করিবে, প্রতিকারের পথই বা কোথায়?

নিজের যাতনায় অস্থির হইয়া সে দিনরাত ছটফট করিত। তাহার ভাষা চিররুদ্ধ, তাহার বড় বড় চোখ দুটিতে যে ভাষা ফুটিয়া উঠে তাহা কি তাহার হৃদয়ের বেদনাটা প্রকাশ করিতে পারে? সে লেখাপড়া জানে না

যে তাহার মনের একটী কথা সে কাগজে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে। ওগো দেবতা, মানুষকে যেমন সব দিয়াছ, হাত পা নাক চোখ কান, বেদনার সুখের অনুভূতি, সবই তো তাহাকেও দিয়াছ, ভাষাটী কেন দাও নাই প্রভু? এই একটীর জন্যই তাহার সব থাকিয়াও যে কিছু নাই, সে যে একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। মানুষ করিয়া পাঠাইয়া তাহাকে সার্থকতা দিলে কই নাথ?

খুকের হৃদয়ের নির্ব্বাক বেদনা বাহির হইয়া উপনীত হইত সেই ভগবানের চরণোপান্তে। ভগবান, তাহাকে গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, সে আর এই বেদনা বুকে চাপিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায় না।

রন্ধনগৃহে একটা তরকারী উনানে চাপাইয়া দিয়া আসিয়া সে উমার পার্শ্বে বসিল। উমার সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল, মুখ দিয়া সাদা ফেনা উঠিতেছে। ইভা একদৃষ্টে সেই মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার দুটি গণ্ড ভাসাইয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল।

বাহিরে খড়মের খট্ খট্ শব্দ হইতেছিল, ইভা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল। অনন্তবাবু একখানা পত্র হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তবাবু পত্নীর মলিন মুখখানার পানে খানিক চাহিয়া রহিলেন.একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "মরেছে নাকি? আঃ ভগবান, মরণ যদি হয়, তা হলে এই অবস্থাতেই যেন হয়, আমি তোমার কাছে তাই প্রার্থনা করি। বেঁচে ছেলের অবহেলা সওয়া—সে যে মরণাধিক যন্ত্রণা; না না, তার চেয়ে মরে যাক্, সে হাজার গুণে ভালো।"

নত হইয়া স্ত্রীর গাত্রে হাত দিলেন, আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ইভার পানে চাহিয়া বলিলেন "মরেনি না বউমা? তোমার ইচ্ছে কি এ বেঁচে ওঠে? বল মা, তোমার কি ইচ্ছে বল আমাকে।"

ইভার দুই চোখ দিয়া আবার অশ্রুধারা ছুটিল, ওগো, ভগবান যে বাক্যহীনা করিয়াছেন তাহাকে, কেমন করিয়া সে বলিবে নিজের প্রাণ দিয়াও সে উমাকে বাঁচাইতে চায়?

কিন্তু মুখে যে কথা বলিতে সে অক্ষম হইল তাহার চক্ষুজল সে কথা প্রকাশ করিয়া দিল। অনন্তবাবু একবার হাতের পত্রখানা পড়িলেন, তাহার পর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "তুমি কিছু জানো না তাই মা ওর বাঁচার প্রার্থনা কর। যদি জানতে সব তাহলে কখনই ওর বাঁচার কথা বলতে না। জলে ধোয়া যুঁই ফুল আমার, আমার বড় হতভাগা কপাল মা, তোমায় এনে একটী দিনের তরেও শান্তি দিতে পারলুম না।"

কঠিন হৃদয় তাঁহার একেবারেই গুঁড়াইয়া গিয়াছিল তাই এই জীবনে জানে তাঁহার চোখে এই প্রথম জল ভাসিল। উমা যদি আজ অনন্তবাবুর এ পরিবর্ত্তন দেখিতেন তাহা হইলে যে কতদূর বিস্মিত হইতেন বলিতে পারিনা।

অনন্তবাবু উমার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন, দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া তিনি খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর দুই হাতে উমাকে নাড়া দিতে লাগিলেন "ওগো, যদি ঘুমিয়ে থাক জাগো। আর ঘুমিয়ো না উমা, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ। আমি একা এ যন্ত্রণা যে সইতে পারছিনে উমা, একা মাথায় এ ভার আর রাখতে পারছিনে, আমার ঘাড় ফেটে যাচ্ছে যে। এসো অর্দ্ধাঙ্গিনী, এর অর্দ্ধেক ভার যে তোমাকেও বইতে হবে এই যে বিধাতার নিয়ম। ওঠো, জাগো উমা—একবার তাকাও, একবার জাগার সাড়া দাও, আমি আমার বুকের ব্যথাটা একবার তোমায় বলে ফেলে লাঘব করে নেই।"

উমা তেমনি অবস্থাতেই পড়িয়া রহিলেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অনন্তবাবু উঠিলেন, ইভার পানে তাকাইয়া বলিলেন "তোমার একা বড় কষ্ট হচ্ছে মা, চেহারা বড় খারাপ হয়ে গেছে। দু বেলা রাঁধছো বুঝি তুমিই?"

পিছন হইতে দাসী বলিল "উনি বই আর কে রাঁধবেন?"

অনন্তবাবু বিস্ময়ে বলিলেন "একা মা এত রাঁধছো তুমি? লোক তো বড় কম খাচ্ছে না সংসারে। আমি মোক্ষদাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম, সে আসে নি বুঝি?"

দাসী বলিল "কই এলো বাবু? দেখুন না—বউমার হাতখানা কি করে পুড়েছে।"

ইভা হাত কিছুতেই বাহির করিবে না, দাসী অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু সে হাত লুকাইয়া রাখিল। শান্ত কণ্ঠে অনন্তবাবু বলিলেন "দেখি মা, হাত বার কর ত।"

তাঁহার আদেশ ইভা লঙ্ঘন করিতে পারিল না, অত্যন্ত মলিন মুখে অগত্যা তাহাকে হাত বাহির করিতে হইল। দীর্ঘ দণ্ড স্থানটীর পানে চাহিয়া অনন্তবাবু শিহরিয়া উঠিলেন, চোখ তুলিয়া ইভার মুখের উপর রাখিলেন, সে দৃষ্টিপাতে সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিয়া ইভা মুখ নত করিল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনন্তবাবু ধীরপদে বাহির হইয়া গেলেন। অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সামান্য কয়েকহাজার টাকার লোভে পড়িয়া তিনি একি সর্ব্বনাশ করিলেন? এ কোন একটী নির্দ্দোষী বালিকাকে কোথা হইতে ছিঁড়িয়া আনিলেন? ইহার জীবনটাকে একেবারে দুঃসহনীয় করিয়া তুলিলেন যে তিনিই।

একটী মাত্র পুত্র তাঁহার, জগতে যাহার অধিক স্নেহের পাত্র তাঁহার আর নাই, তাহাকে গৃহত্যাগ করাইল তাঁহার দারুণ অর্থলিপ্সা। সেবার সে মুখেই বলিয়াছে, স্পষ্ট তাঁহার দোষ দেখাইয়া দিয়াছে, আজিকার পত্রেও সে স্পষ্ট তাই লিখিয়াছে। স্পষ্ট জানাইয়াছে সে ব্রাহ্মই হইবে, এমন স্বার্থপর পিতার পুত্র হইতে চাহে না। সে পিতার বিশাল সম্পত্তিরও এক পয়সা চাহে না।

থাক সে অধঃপাতে যাক। অনন্তবাবু এবার হইতে মনে করিবেন তাঁহার পুত্র নাই, সে মরিয়া গিয়াছে। সন্তান সে—কি করিয়া সে সন্তান পদবাচ্য হইতে পারে? সে কেবল পিতামাতাকে জ্বালাইল, তাঁহাদের শান্তি দিতে পারিল না। যে ধর্ম্মত্যাগ করিয়া যাইতেছে তাহাকে সন্তান বলা যায় না।

আর কিসের মায়ায় তিনি ভুলিয়া আছেন— কাহার জন্য তিনি প্রজার বুকের রক্ত অর্থ নানা কৌশলে, বলে, ছলে এরূপ ভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজের সিন্দুক ভর্ত্তি করিতেছেন? ওই মূক বালিকাটিকে কেন তিনি জানিয়া শুনিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাকেই বা এত কষ্ট দিতেছেন কেন? কাহার জন্য আর সঞ্চয় করা, না, আর না, যাহা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা তিনি ব্যয় করিয়া যাইবেন; যে প্রজাদের উৎপীড়ন করিয়া অর্থ শোষণ করিয়াছেন, সেই অর্থ তাহাদেরই জন্য ব্যয় করিবেন, তাহাদেরই উপকার করিবেন?

বাহিরের ঘরে তামাক খাইতে খাইতে তিনি গভীর চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গেলেন। হৃদয়ে বড় বেদনা পাইয়াছিলেন তাই আজ পরের বেদনা অনুভব করিতে পারিলেন।

দেওয়ান রামসদয় মিত্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; অনন্তবাবু নিজের চিন্তাতেই ডুবিয়া গিয়াছেন, দেওয়ানের আগমন সংবাদ জানিতেও পারেন নাই। তাঁহাকে আজ এই প্রথম এরূপ নিবিষ্ট চিন্তায় মগ্ন থাকিতে দেখিয়া রামসদয় মিত্র যথার্থই বিস্মিত হইয়া গেলেন।

কথায় বলে দেবতার যোগ্য বাহনই হইয়া থাকে। দুর্গার বাহন সিংহ, শিবের বাহন ষাঁড়, সরস্বতীর বাহন হংস, এইরূপ অনন্তবাবুর বাহন ছিলেন রামসদয় বাবু। লোকটির মুখ ছিল হাসিতে ভরা, গায়ের রং ছিল নিকষ কালো; বিধাতা তাঁহাকে আড়ের দিকে কমাইয়া লম্বার দিকেই বেশীরকম টানিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহাকে গোল আলুর সঙ্গে তুলনা দিত, কারণ গোল আলুর মত তিনি সকল সম্প্রদায়ে—ভাল অথবা মন্দ, সকলের সহিতই মিশিতেন।

রামসদয় বাবু নিচের কম্বলখানার উপর বসিয়া চৌকির তলা হইতে দপ্তর বাঁধা কতকগুলা কাগজপত্র বাহির করিলেন। বাছিয়া বাছিয়া তাহার মধ্য হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া অনন্তবাবুর সামনে রাখিয়া বলিলেন "দেখুন একবার এই কাগজ খানা—,"

সুপ্তোত্থিতের মত চাহিয়া অনন্তবাবু বিস্মিতস্বরে বলিলেন "কাগজ? কিসের কাগজ দেখব?"

রামসদয় বাবু বলিলেন "মোকদ্দমার কাগজ, কাল এর দিন আছে।"

অনন্তবাবু গড়গড়ার নল ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন "বটে বটে, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। যাও তো দেওয়ান, খুজ সেখকে ডাকতে কাউকে একবার পাঠাও, এখনি দরকার তাকে। আর আমার মুসলমান পাড়ার প্রজাগুলোকেও ডাকতে হুকুম দাও, ওদের সবাইকে আমার দরকার।"

রামসদয় বাবু কারণটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়াও হুকুম তামিল করিতে চলিয়া গেলেন।

প্রজারা সকলেই এই দুর্দান্ত জমীদারের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়াছিল বড় কম নয়। প্রথম তাহারাও দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু ন্যায় বিচার এ সংসারে দরিদ্রের অদৃষ্টে ছুটে না, বিধাতার অভিশাপে তাহারা ধরণীর বোঝা হইয়া আসে, ধনীর পায়ের তলায় বুক পাতিয়া দেয়, সকল অত্যাচারই শেষটায় নীরবে সহিয়া যায়; মনকে প্রবোধ দেয়—পরে অবশ্যই এর ফলভোগ করিতে হইবে। জানি না স্বর্গ নরক কিছু আছে কিনা, জানি না পরজন্ম আছে কিনা এবং ইহার যথাযথ ন্যায় বিচার সংসারের গণ্ডী ছাড়াইয়া গেলেও পাওয়া যায় কিনা। পরে যাহাই থাক—সংসার লইয়াই আমাদের জীবনের প্রতিক্ষণকার সম্পর্ক, সংসারের এই বৈষম্য তাই বড় ব্যথা দেয়।

এই সব উৎপীড়িতদের মধ্যে একা খুজ সেখ ছিল সাহসী, সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনন্তবাবু তাহাকে অনেক করিয়াও দমন করিতে পারেন নাই, এবার গরুচুরীর মামলায় তাহাকে ফেলিয়া তিনি জব্দ করিতে চান।

অনেক প্রজা আধঘণ্টার মধ্যেই আসিয়া পড়িল। তাহাদের চোখের কোণে ভয়, দৃষ্টি বড় চঞ্চল, মুখগুলি শুষ্ক। আজ আবার কেন তাহাদের ডাকিয়া আনিয়াছেন তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল না। অনন্তবাবু কখনই বিনাকারণে কাহাকেও ডাকেন না, নিতান্ত দরকার যখন পড়ে তখনই ডাকেন। ইহাদের মধ্যে খুজ সেখও ছিল। সে প্রথমটায় প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদারের কাছে আসিতে কিছুতেই রাজি হয় নাই,তাহার পর কি ভাবিয়া আসিয়াছে তাহা সেই জানে।

অনন্তবাবু কতকগুলি কাগজপত্র হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন; প্রথমেই তিনি খুজ সেখকে ডাকিলেন।

আড়ালে জমীদারের মাথাটা একচড়ে দেহচ্যুত করিবার অনেক কল্পনা করিলেও সম্মুখে জমীদারকে সশরীরে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া খুজ সেখের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। আত্মীয়দের পানে চাহিতে চাহিতে সে কম্পিত হৃদয়ে অনন্তবাবুর সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

অনন্তবাবু একবার তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "কাল তোমার মোকর্দ্দমার দিন, শুনছি তোমার অবস্থা এই মোকর্দ্দমা চালাতে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, কেমন করে তুমি মোকর্দ্দমা চালাবে? তোমার জমী বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে না, এ খরচ করবে কি করে?"

খুজ সেখ মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার ভাই দামু সেখ অগ্রসর হইয়া একটা লম্বা সেলাম ঠুকিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল "কিছু নেই হুজুর; ওর সব গেছে। কাল ওকে জেলে যেতে হবে নিশ্চয়ই, সে জানা কথা।"

অনন্তবাবু একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর নিজের হাত হইতে কয়েকখানা কাগজ তাহার হাতে দিয়া বলিলেন "তোমার জমী তোমায় আজ সব ফিরিয়ে দেওয়া হলো। তোমার যে ক্ষতিটা হয়েছে তা পূরণ করতে তোমার দুই বছরের খাজনা আমি রেহাই দিলুম। মোকর্দ্দমা কাল আমি সব মিটিয়ে দেব, এখন যাও তুমি।"

খুজসেখ একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কিসে যে কি ঘটিয়া গেল তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না। এই দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না।

অন্য সব প্রজার যাহা যাহা অনন্তবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সব ফিরাইয়া দিলেন এবং সকলের এক বৎসরের খাজনা রেহাই দিলেন। তাহাদের চোখ ফাটিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, তাহাদের মুখে অস্ফুট একটা গুঞ্জন ধ্বনি ভাসিয়া উঠিল। সেদিকে আর না চাহিয়া, তাহাদের কথা না শুনিয়া অনন্তবাবু গৃহমধ্যে চলিয়া গেলেন।

দেওয়ানকে আদেশ দিলেন যত টাকা বেতনেই হোক একটী পাচক বা পাচিকার বন্দোবস্ত যেন আজকালের মধ্যেই করিয়া ফেলা হয়।

সেদিন যে প্রভাতটী আসিয়াছিল তাহাকে তিনি বড় সুন্দর, বড় রমণীয় করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার কাজের দ্বারা। সে প্রভাতে তিনি যে আলো দেখিলেন সে আলো তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। (ক্রমশঃ)

নারীশিক্ষার ধারা

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

মাতৃ-মন্দিরের ভিতর দিয়া আমরা বাংলার নারীশিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনার যে সুযোগ পাইয়াছি, তাহার ফলে বুঝিয়াছি, আমাদের দেশে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে—বলিতে কি বাংলায় এ সম্বন্ধে কোন সু-ধারাই গঠিত হয় নাই। বোধ হয় সমগ্র ভারতেই নারীশিক্ষা সম্বন্ধে এই একই দশা।

অত্যন্ত সুখের বিষয় সমগ্র ভারতের নারী প্রতিনিধি মিলিত হইয়া বোম্বাইএর নিকটবর্ত্তী পুনা সহরে নারী শিক্ষার ধারা নির্ণয়ার্থে একটি মহতী সভা গঠন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষা বলিলে স্কুল কলেজের শিক্ষা বুঝায়। এই স্কুল কলেজের শিক্ষা এদেশে পুরুষ যে ভাবে পাইয়া আসিতেছেন, নারী তাহার শতাংশের একাংশও পান নাই। এই বর্ত্তমানের শিক্ষা পুরুষের পক্ষে কত দূর উপযোগী হইয়াছে সে সম্বন্ধেও যখন সন্দেহ রহিয়াছে তখন নারীদের পক্ষে যে অধিকতর সন্দেহের বিষয়, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনদ্বারা অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই শিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইবে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অভাবের ভিতর দিয়া। কিন্তু বর্ত্তমানের প্রচলিত শিক্ষা তো আমাদের দেশের অভাবের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠে নাই—এ শিক্ষার অধিকাংশ মালমসলা বিলাতের আমদানী। পল্লীর ছোট ছোট বালিকা-বিদ্যালয়গুলি এক প্রকার আবশ্যকতার ভিতর দিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সহরের স্কুল কলেজের শিক্ষা মেয়েরা দখল করিতেছেন একটা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া। এইজন্য বলিতে বাধ্য হইতেছি, ইহার আবশ্যকানুযায়ী অনেক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

পল্লীগ্রামে অভিভাবকগণ কন্যাকে বিদ্যালয়ে দিতেছেন কি কি কারণে? কন্যা চিঠি পত্র লিখিতে পড়িতে পারিবে, রামায়ণ মহাভারতাদি পড়িতে পারিবে, খরচের পয়সা কড়ির হিসাবাদি লিখিয়া রাখিতে পারিবে, ইত্যাদি। এটুকু তাঁদের বর্ত্তমানের নিম্ন প্রাথমিকের বিদ্যাতেই যথেষ্ট হইল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার উপরের চিন্তা হইতেছে—মেয়ে সুবুদ্ধিসম্পন্না হইবে, গার্হস্থ্য নীতি শিখিবে, সেবা শুশ্রূষা, সদাচার, পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি শিখিবে। এই পর্য্যন্ত যে শিক্ষা ইহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সভ্যতা ধারার কোন বিরোধ নাই। কিন্তু তার পর যখন—ইংরেজী ভাষা, গণিত, ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতি আরম্ভ করে তখন আর দেশের ধারার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না। তখন ইহা কেবল বিভিন্নমুখী মানসিক বিকাশের কিঞ্চিৎ সহায়তা করে মাত্র।

পল্লীগ্রামে বারো তেরো বৎসর বয়সে অথবা তাহার পূর্ব্বেই বালিকাদের বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের পর স্বামী-গৃহে তো বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা একেবারেই নাই, পিতৃগৃহে থাকিয়াও তখন বিদ্যালয়ে গমন বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় পল্লীর বালিকাদের বিবাহ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স অতিক্রম করিয়া দিতে পারিলেই পিতৃগৃহে থাকিয়া তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার কিঞ্চিৎ সুযোগ হইতে পারে। যদি মেয়েদের একটু শিক্ষা দিতে দেশের সাধারণের ইচ্ছা থাকে, তবে এই চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া বিবাহ দেওয়া খুব কঠিন নয়।

এই চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স কাল পর্য্যন্তই আমরা এদেশে বালিকাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার নির্দ্ধারিত কাল করিয়া লইতে পরামর্শ দিই। এই সময় মধ্যে বালিকারা বাংলা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অথবা আবশ্যক বোধ করিলে তাহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইংরেজী শিক্ষা করিতে পারেন। অবশ্য গণিত ইতিহাস ভূগোলের কিছু কিছু বাদ দিয়া শরীর পালন, রন্ধন এবং অর্থকরী শিল্পাদির সম্বন্ধে শিক্ষা কার্য্য কিছু বেশী করিয়া দিতে হইবে।

বালিকাদের বিদ্যালয়টি বর্ত্তমানের প্রচলিত মত সঙ্কীর্ণ একখানি গৃহমাত্র হইলে চলিবে না। বাড়ীর ভিতরে প্রচুর জমি থাকা চাই। উহাতে গৃহস্থোপযোগী কৃষি ও শিল্পের কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা থাকিবে। আমাদের দেশে পল্লীর মেয়েরা প্রত্যেকেই বাড়ীর ধারে বা আশেপাশে লাউ, কুমড়া, শশা, আলু, কচু, শিম, বেগুন, লঙ্কা এবং নানা প্রকার শাকসব্জি নিজ হাতে বুনিয়া থাকেন, এবং তাহাতে সংসারের আহার্য্যের প্রচুর সহায়তা হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে যদিও পল্লীর মেয়েরা অনেক জানেন, তথাপি উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে যে এ সকল শিক্ষাপ্রণালী আরও অধিকতর কার্য্যকরী হইবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বালিকারা পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে এই সকল শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন। পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট মান পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার নিয়ম চলিবে না, বয়স পঞ্চদশে পড়িতেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার নিয়ম হওয়া ভাল।

এর পর বিবাহকাল। এই বিবাহের পর বালিকাদের জীবন যারা একেবারে বদলাইয়া যায়। বিবাহের পর মেয়েদের হাতে এলোমেলো উপন্যাস প্রভৃতি না দিয়া একটা ধারা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে তাঁহারা বধূ-জীবনে গৃহে বসিয়াই নানাপ্রকারের আবশ্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষতঃ স্বামীকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

পরিবারস্থ মহিলাগণ ইচ্ছা করিলে দিবসের আহার বেলা বারোটার মধ্যে শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া তিন চারি ঘণ্টা নানা প্রকার গ্রন্থালোচনা করিয়া জ্ঞানোন্নতি করিতে পারেন; চরকা প্রভৃতি চালাইয়া শিল্প কার্য্য করিতে পারেন। আবার এইরূপ রাত্রিতে আহারের পর সকলে মিলিয়া দু-এক ঘণ্টা শাস্ত্র পাঠ প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিতে পারেন।

এর পর আমরা অধিক বয়স্কা মেয়েদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। বর্ত্তমানে ইঁহাদের কেহ উচ্চ বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা পাইতেছেন, কেহ শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, কেহবা চিকিৎসা-বিদ্যা ধাত্রী-বিদ্যা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেছেন। এই সকল গুলি সম্বন্ধেই এই একই অভিযোগ যে, এ সকল দেশের পক্ষে আবশ্যক হইলেও এমনই বিদেশী ছাঁচে ঢালাই করা যে দেশের পক্ষে ইহা খুব কমই উপকারে আসিতেছে। এই সকল বিষয় বিশেষ ভাবে দেশীয় অনুকূলে করা উচিত।

অতঃপর আমরা মহিলাদের কার্য্যকরী শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। ইহাই আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক অথচ ইহার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা দেশে চলিতেছে না। সহরে যে দু-একটা আশ্রম বা সমিতি গঠিত হইয়া মহিলাদের অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইতেছে সেগুলি দেশের আবশ্যকতার তুলনায় নিতান্তই কম, এবং তাহাও এমনই ক্ষীণ অবস্থায় চলিতেছে যে কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে তাহাদের কতদিন অতিক্রম হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই; কেবল পরীক্ষা চলিতেছে মাত্র। বাংলায় নারীদের মধ্যে অর্থকরী শিল্প-বিদ্যায় পারদর্শিনী শিক্ষয়িত্রীর একান্তই অভাব, এজন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি দেশের প্রাচীন রীতি রক্ষা করিতে গিয়া আশ্রমে পুরুষ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদানে কাজ থাকেন, তবে শিক্ষার্থিনীদের শিল্প-শিক্ষার সম্যক ব্যাঘাত ঘটিবে।

ঐ সকল নারী প্রতিষ্ঠান সহরের উপপ্রান্তে খুব বড় স্থান লইয়া আরম্ভ করা আবশ্যক। বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে কয়েকটি নারী প্রতিষ্ঠানের সংবাদ জানা যায় তাহাতে উহার কর্ত্তৃপক্ষগণ চেষ্টার কোন ত্রুটি করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না, তবে নারীশিল্পের কোন ধারাই দেশে গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া তাঁহারা কোন একটি আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

শিল্পের ধারা হইবে দেশের আবশ্যকতার দিক দিয়া। এজন্য বিলাস-শিল্পকে একেবারে অনাবশ্যক বোধে বর্জ্জন করিতে হইবে। উহাতে আপাততঃ কিছু অর্থোপার্জ্জন দেখা গেলেও উহা বর্জ্জনীয়। শিক্ষার্থিনী-দিগকে খুবই অল্প খরচে চলিতে হইবে। সাদাসিদা পোষাকে চলিতে হইবে। বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে বাস্তবিকই একটা দোষ আসিয়া পড়িয়াছে যে ইঁহারা আবশ্যকের অতিরিক্ত ভাবে বেশভূষায় ব্যয় করিয়া থাকেন, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। হিন্দুস্থানী মহিলাগণ সাধারণতঃ অনেকেই পোষাক-পরিচ্ছদে ব্যয়

বাহুল্য করেন না, এমন কি অর্থসম্পন্ন গৃহস্থের মেয়েরাও অত্যন্ত সাধাসিধা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। নারী-শিল্পের আয়ের দ্বারাই নারী-শিল্পালয়গুলি গড়িয়া উঠিতে পারে মনে হয়, কিন্তু দেখা যাইতেছে অনেক সরকারী অর্থ ব্যয় করিয়াও এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভালভাবে চালান যাইতেছে না! প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণকে এবিষয়ে আরও অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। শিক্ষিত কর্ম্মকুশল শিল্পীদিগের হস্তে ইহার অনেক কর্ম্মভার অর্পণ করিতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই অর্থকরী নারী-শিল্পের প্রতি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দিতে হইবে। জগতের সর্ব্বত্রই সুসভ্য জাতির মধ্যে নারী-শিল্পের দ্বারা দেশের প্রকৃত অর্থ সাহায্য হইতেছে। আমরা এ বিষয়ে তাচ্ছিল্য করিলে অন্যান্য শক্তিশালী জাতির তুলনায় অর্থবলে হীন হইয়া থাকিব, ইহা সত্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, স্ত্রী-জাতির নিকট হইতে দেশের কল্যাণের পক্ষে আমরা অনেক আশা করিতে পারি; আর ইহা নির্ভর করিতেছে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধীয় নূতন ধারা গঠনের উপর।

শ্বাশুড়ী

শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

[১]

আয় মা বউ মা!
ঘরের লক্ষ্মী ঘরের আলোক
আয় রে নব খোকুনা!
কেন এ সঙ্কোচ অবোধ বালিকে
চলিতে পা চলে না,
মা'র কোল ছেড়ে এসেছিস তাই?—
আমিও যে তোর মা!

[২]

আমারো হৃদয়ে তোরি তরে বাছা
মাতৃ স্নেহ ভরা আছে,
তুই হয়ে চির স্নেহের পুতলী
রহিবি আমারি কাছে!

[৩]

নিদাঘের খরা বরষার ঝরা
পাছে লাগে কম গায়,
বুকের ভিতরে রাখিব লুকিয়ে,
হাসি মুখে আয়! আয়!

[৪]

কত দেবতার পায়ে মাথা লুটি—
পেয়েছি যে পুত্র ধন,
তারি হাত ধরি এলে তুমি হেথা,
পুলকে পূরিল মন;—

[৫]

তুচ্ছ মনে গণি, হীরা মতি মণি,
মুখে কিবা বলা যায়,
লক্ষ্মী হয়ে এসো রাণী হয়ে বোসো
মা হয়ে, মা! ঘরে আয়!

[৬]

কেন হেন ভয় অবোধ বালিকে
সঙ্কোচ-নত-আননা?—
এই তোর ঘর, আজি যে মা আমি,
তোমারে করিনু "মা"।

কাঁকের পাগলখানার ব্যবস্থা

জনৈক আর্য্যনারী।

প্রায় ৯।১০ বৎসর হইতে চলিল রাঁচিতে আসিয়াছি। প্রথম যখন আসি, শুনিয়াছিলাম কাঁকে নামক রাঁচির একটি স্থানে পাগলদিগের নিমিত্ত একটি বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেকে ঐ স্থান দেখিতেও যান।

কোন সময় একবার ঐ কাঁকের পথ দিয়া অন্যত্র যাইবার সময় প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে দেখিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম উন্মাদগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের জন্য রাঁচি উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারিত হওয়ায় ভারতের সকল উন্মাদদিগকে এখানেই রাখা হইবে, সেইজন্যই এই আয়োজন হইতেছে।

গত ডিসেম্বর মাসে মহারাণী সুনীতি দেবী—আমাদের পরম পূজনীয়া রাণীদিদির ইচ্ছা ও আহ্বানে কয়েকটী বন্ধু সমভিব্যাহারে আমরা কাঁকের এই বৃহৎ পাগলখানা দেখিতে গিয়াছিলাম।

যাঁহার হস্তে এই পাগলখানার ভারতীয় বিভাগের ভার অর্পিত আছে তিনি Motor পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা তথায় পৌঁছিবামাত্র তিনি স্ত্রী-বিভাগে আমাদিগকে লইয়া গেলেন এবং সেখানকার সর্ব্বপ্রধান পরিচারিকা অর্থাৎ সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারিকার হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্রমে ক্রমে দুইটী বাড়ীর প্রশস্ত গৃহ সকল দেখিতে লাগিলাম। এক তলায় এবং দ্বিতলে মিলাইয়া প্রতি বাড়ীতে প্রায় শতাধিক করিয়া উন্মাদগ্রস্থ রোগিণী বাস করিতেছে। অধিকাংশ স্ত্রীদিগকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। শুনিলাম সময়ে সময়ে উন্মাদনা সমুপস্থিত হয়। কাহাকে কাহাকেও ঘোরতর যন্ত্রণার অবস্থায় দেখা গেল এবং তাহারা লোহার গরাদে দেওয়া ঘরে বন্ধ রহিয়াছে। হিংস্র জন্তুদিগকে যেরূপ বৃত করিয়া বন্ধ রাখা হয়, এবং মানুষে দেখিতে যায়—এরা সেইভাবে আবদ্ধ। আমাদের মত মানুষের সেই ভয়ানক দুঃখের অবস্থা দেখিয়া বড়ই যন্ত্রণা বোধ হইতেছিল।

বন্দোবস্তগুলিও বড় ভাল দেখিলাম। লোহার খাট ও বিছানা প্রতিজনের পৃথক স্থাপিত। এসব পরিষ্কার করা ও প্রতিদিন রৌদ্রে দেওয়া হয়। ইচ্ছা ক্রমে যে যাহা করিতে পারে তাহাকে সেইরূপ কাজ, সেলাই ইত্যাদি কাজ করিতে দেখা গেল। অনেক গুলি গৃহকর্ম্মও, যাহারা সুস্থ আছে তাহারা করিতেছে।

এই ভারতীয় স্ত্রী-বিভাগে একজন প্রধান কর্ত্রী রহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটী সহকারী শিক্ষিতা নার্স ও ৮০।৯০ জন এদেশীয় নারী কার্য্য করিতেছেন। প্রতি নিয়মিত সময়ে ১৮ জন করিয়া পরিচারিকা এই কার্য্যে উপস্থিত থাকেন, এবং তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে অহর্নিশি বিশ্রাম এবং কার্য্য করেন। সমস্ত রাত্রির মধ্যেও এই পরিচারিকাগণ পর্য্যায়ক্রমে পাহারা দিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত একটী লেডি ডাক্তার আছেন। সন্নিকটেই তাঁহার আবাস স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাতে ৮টার সময় আসেন ও ১২টা পর্য্যন্ত থাকেন, পুনরায় অপরাহ্নে আসিয়া দেখাশুনা ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি করেন। প্রয়োজন হইলে গভীর রাত্রিতে বা অন্য সময়ও তাঁহাকে পাগলখানায় উপস্থিত থাকিতে হয়।

যাহা কিছু হিসাবপত্র, বাজার, ভাণ্ডার তৎসমুদয় পুরুষ বিভাগের ম্যানেজার, কর্ম্মচারী ইত্যাদি দিগেরই হস্তে অর্পিত আছে। সেখান হইতে সব জিনিষ আসে এবং মহিলা-বিভাগে পৃথক রন্ধন ইত্যাদি হইয়া থাকে।

রন্ধনগৃহটী প্রশস্ত, ধৌত ও পরিষ্কৃত দেখা গেল। বড় বড় উচ্চ উনানগুলিতে বৃহৎ নূতন ধরণের লোহা পিতল ইত্যাদির ডেক কড়াতে করিয়া রন্ধন হইতেছিল। ভাত প্রস্তুত হইলে টিনের পেটরার মত পাত্রে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। পাত্রের উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করা আছে। শনিবার ও মঙ্গলবারে নিরামিষ খাবার দেওয়া হয় ও সপ্তাহের অন্য বারগুলিতে মৎস্য মাংসাদি দেওয়া হয়। শুনিলাম হত্যাকারিনী স্ত্রী যাহারা এখন সুস্থ আছে সেই সকল নারী রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত আছে। প্রাতে ও দুইটা বেলার সময় চা রুটী বিস্কুট প্রভৃতি দেওয়া হয়।

বেলা ১০টার সময় ও বিকাল ৪টার সময় ভাত ডাল তরকারি দেওয়া হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয়। প্রতিদিন ভাতের সঙ্গে ঘি দেওয়া হয়। খাইবার নিয়ম অতি সুন্দর। তাহারা যখন বাড়ীতে ছিল অনেকের এ প্রকার আহার জুটিত কিনা সন্দেহ। ভোজন-গৃহটী প্রশস্ত এবং অন্য স্থান হইতে স্বতন্ত্র; সেখানে সবাই বসিয়া আহার করে। অনেকে পরিবেশন করিয়া পরে যায়।

একটী গির্জ্জা ঘর আছে, সেখানে প্রতিদিন প্রার্থনা ও উপাসনা গান হয়। যাহারা হিন্দু, মুসলমান বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, অনেক সময় তাহারা ইচ্ছাক্রমে এখানে আসিতে চায়। তাহাদিগকে আসিতে দেওয়া হয়। গীত বাদ্য আনন্দ উৎসব করিবার জন্যও একটী ঘর আছে। সেখানে গ্রামোফোনে গান শুনান হয়। বেহালা অর্গান ছোট ছোট হারমোনিয়ম্ সবই আছে। যাহার যাহা অভিরুচি বাজাইতে বা গাহিতে পারে। ইহাদিগকে বাহিরে বেড়াইতে লইয়া যাইবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। বেড়াইবার জন্য এখানে বড় বড় Motor Bus আছে, এই Motor Busএ করিয়া উন্মাদদিগকে অনেক দূরে দূরে নানা স্থানে ঘুরাইয়া দেখাইয়া শুনাইয়া লইয়া আনা হয়।

এই পাগলখানার জন্য সরকার পক্ষ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। ভারতবর্ষের উন্মাদগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের জন্য রাঁচির ন্যায় উপযুক্ত স্থানে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন হওয়ায় জন-সাধারণের অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

শুনিয়াছি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে পরিবারের মধ্যে যদি কেহ প্রকৃতি হারাইয়া উন্মাদগ্রস্থ হইত তাহাকে অনেক দুর্গতি ভোগ করিতে হইত, কেহই উপযুক্তরূপ সেবা অথবা যত্ন পাইত না। একদিন যিনি গৃহের সকলকে ভালবাসিয়াছেন, খাওয়াইয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে রোগ-কবলে পড়িয়া সেই সকল প্রিয়জনদিগের হস্তে বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে হইত। কত শত পরিবারে এইরূপ দেখা গিয়াছে। গরীব দুঃখী কপর্দ্দকশূন্য ব্যক্তিগণ, মস্তক রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত যাহাদিগের নাই—সেরূপ দুঃখী উন্মাদ ব্যক্তিদিগের আর যদি এই আরামপ্রদ আবাস পাইবার সুযোগ না হইত তবে তাহারা পথে প্রান্তরে পড়িয়া কত যন্ত্রণা পাইত তাহা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

যে সকল উদার পুরুষ ও মহিয়সী নারী ইহাদিগের সেবার জন্য নিযুক্ত আছেন নিশ্চয়ই তাঁহারা জনসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। সকলে কি এই ভীষণ বিপজ্জনক কাজে আপনাকে নিয়োগ করিতে পারেন? অনেকে পারেন না। কিন্তু যত ইহারা—এই মানবহিতৈষণার কাজে খাটিতেছেন। যদি বলেন স্বর্গলোভে তাঁহারা ইহা করেন। কিন্তু অর্থ লইয়াও অনেকে এই ভীতিজনক কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন না, চাহেনও না। সত্য ই ইহাদিগের হৃদয়ে দরিদ্র কাঙ্গালের প্রতি দরদ ভাব আছে, সেজন্য দেখিলাম সমবেদনা সহকারে এই উন্মাদগ্রস্থ ব্যক্তিগুলিকে লালনপালন করিতেছেন।

বাণী-আবাহন

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফুটিল মলয়, টুটিল হিমানী, কাননে ফুটিল ফুল;
কোকিল-কাকলী-কূজিত-কুঞ্জে গুঞ্জে মধুপকুল।
প্রকৃতিরাণীর বিরস বদন পুলক-উৎসময়,
হরষে মগন বিশ্ব-ভুবন ঘোষিছে তোমার জয়!
নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে আগমনী-গান গেয়ে,
সোণার বরণী পরাণ-হরণী কে চ'লেছে ওই ধেয়ে!
ঢালিছে তপন নবীন কিরণ, উতলা উষাও ধায়,
ছুটেছে আনিতে মেঘের তরীতে শ্বেত-বরণী মায়।—
ধ্যান-নিমগন যুগল-নয়ন, দুঃখ দহনকারিণী,
বিশ্ব-ভুবন-বন্ধন-ধন, জ্ঞান-কমল-ধারিণী।
কর্ণে দুলিছে স্বর্ণ কীরিট, অমল ধবল-বেশে,
মধুর-করুণা-হাস্য বিতরি দাঁড়াল দুয়ারে এসে।
রাতুল-চরণে ঢালিয়া দিলাম কানন-কুসুম-রাজি,
চিত্ত দেউলে 'পঞ্চপ্রদীপ' জ্বালিয়া রাখিনু আজি।
নন্দন-ভরা পারিজাতরাজি, শুভ্র অপরাজিতা,
রেখেছি সাজা'য়ে হৃদয়োৎপলে—এস কল্যাণী-মাতা!

কালোর রূপ

শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী, বাণী-বিনোদ।

তোমরা তাকে যত কুৎসিৎই বল, আমার চোখে সে ছিল অপরূপা। রংটা যদিও তার বড় বেশীরকমেই কালো ছিল, তবুও তার সেই কালো চামড়ার আবরণে ঢাকা হৃদয়টার মাঝে যে মহত্বের জ্যোতি ঠিক্‌রে পড়ত—তার তুলনা হয় না। তার প্রাণটা যেমন ছিল উদার, অন্তরটা ছিল তেমনি করুণ, আর হৃদয়টা ছিল তেমনি মহৎ। তার এই অন্তরের উচ্চতাই তাকে বাইরের রূপাকর্ষণের বহু থেকে অপরূপের আসন দিয়েছিল। তার অন্তরের সৌন্দর্য্য আমাকে এত মুগ্ধ করেছিল যে, আমার এই চির গর্ব্বিত শিরটাও তার পায়ে নুয়ে পড়েছিল। তাকে যে কেমন করে আপনার করে নিতে পারি, সেইটেই হয়েছিল আমার সেদিনকার একমাত্র ভাবনা।

উত্তপ্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে গ্রীষ্মের দারুণ প্রতাপকে অগ্রাহ্য করে সেদিন সে যাচ্ছিল - মাথায় একটা বোঝা—তাতে কতকগুলো তরী-তরকারী, কয়েকটা ঔষধ; আর সব চেয়ে একটা জিনিষ আমার চোখ্‌কে ধাঁধিয়ে দিলে, সেটা হচ্ছে তার চোখের দৃঢ়তাব্যঞ্জক তীব্রোজ্জ্বল দৃষ্টি। খানিক দূর যেয়ে একটা গাছতলায় সে বস্‌লে—আমিও বস্‌লাম। জিজ্ঞাসা করলাম— "তুমি কোথায় যাবে?"

সে বল্লে "বাবু—ঐ যে ঐ গাঁটা দেখ্‌ছো, আর বোধ হয় ক্রোশখ'নেক হবে—ঐখানে একটা মা-বাপ মরা ছেলের ভারি ব্যামো হয়েছে তার কেউ কোথাও নেই। সেদিন ঐ পথ দিয়ে আস্‌ছিলাম, দেখলাম ছেলেটা ছট্ ফট্ কচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম—সাতদিন তার জ্বর হয়েছে কেউ নেই, সুতরাং একটু ওষুধ পথ্যও পাইনি। তাই বাবু ছেলেটার জন্যে ওষুধ আন্‌তে গিয়েছিলাম। তরকারী বেচে খাই—তাই এগুলোও মাথায় করে নিয়ে গিয়েছিলাম—যদি বিক্রি হয়। কিন্তু পারলাম না বাবু, ছেলেটার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করতে লাগলো তাই ফিরে এলাম। আহা, তার যে কেউ নেই বাবু!" তার উজ্জ্বল চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস আর কয়েক ফোঁটা অশ্রু টপ্ টপ্ করে বেরিয়ে পড়ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমার ঘর কোথায়?"

সে বল্লে "আর বাবু পোড়া কপাল আমার, এখন ত আর সময় নেই, ছেলেটা আমার জন্যে আকুলি বিকুলি কচ্ছে। আজ নয় বাবু—আর একদিন বল্‌ব।"

আমি বল্লাম—"তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি করে?"

সে একটু হেসে বল্লে—"ওঃ বাবু, তোমায় আমি অনেকবার দেখেছি, তোমার নামও শুনেছি। ঐ ত—ঐ গাঁয়ে তোমার ঘর? ছেলেটা ভাল হোক্, একদিন তাকে সঙ্গে নিয়েই যাব।" এই বলেই সে উঠে গেল।

• • • • •

তারপর প্রায় তিন মাস কেটে গেছে—সে কথা কিছুই আমার মনে ছিল না। হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্সটা নিয়ে একটা রোগীকে ঔষধ দিয়ে ফিরছি—এমন সময় কে যেন ডাক্‌লে "বাবু!" পেছনে চেয়ে দেখি সেই মেয়েটি—সঙ্গে তার একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর ছেলে।

সে বল্লে—"বাবু, সেদিন সব কথা বল্‌বার সময় পাইনি। আজ সময় করে সব কথা বল্‌তে এলাম। এত লোক দেখেছি—কত লোক আমাকে কত কথা জিজ্ঞেস করেছে, কাকেও বল্‌তে ইচ্ছা হয়নি, কিন্তু তোমায় বল্‌ব—"

এই বলে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে নিয়ে আমার বাড়ীতে এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম—"তোমাদের খাওয়া হয়েছে?"

সে বল্লে—"হাঁ বাবু, আমরা খেয়েই এসেছি।"

তাকে বস্‌তে দিয়ে—আমি নাওয়া-খাওয়া সেরে নিলাম। পিসীমা ও বীণা আগেই খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছিলো—কারণ তারা জান্‌ত যে আমার আসার কিছু ঠিক নেই।

খাওয়া সেরে আমরা সবাই বস্‌লাম আর মেয়েটি তার নিজের কথা বলে যেতে লাগলো। সে বল্লে—

"বাবু, আমরা জাতে হলাম ঘুগে, মা-বাপের একটি মাত্র মেয়ে ছিলাম আমি—আদর আব্দারের সীমা ছিল না। ছোট বেলা থেকে আমার কেমন একটা স্বভাব ছিল—'ফরসা ফরসি' না হলে আমি থাকতে পারতাম না। ঘর দোর সব পরিষ্কার করে রাখা এইটেকে সবাই বলত আমার একটা মহাব্যাধি। যাক্, পাছে আমার মনে কষ্ট হয়, সেইজন্যে মা বাবা সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই রাখতেন। আমাদের বাড়ীতে ঢুকলে কেউ বলতে পারতো না এটা একটা ছোটলোকের বাড়ী। ন বছর বয়সের সময় আমার বিয়ে হলো—এগার বছরে শ্বশুর বাড়ী গেলাম। শ্বশুর বাড়ীতে যেয়ে আমার প্রাণ আঁৎকে উঠলো। বাস্‌রে কি নোংরা! যাই হোক্, তাতেই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতে হলো। নিজে যতটা পারতাম ঘর দোর সাফ রাখতে চেষ্টা করতাম, কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখতাম—কিন্তু আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ বলতেন—'এটা তোমার ভাল লক্ষণ নয়, ছোট জাতের মেয়ের আবার অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা কেন? কালো মেয়ের আবার ভালো কাপড় পরা কেন?' ইত্যাদি।

"ওসব কথায় আমি কান দিতাম না—আমার কাজ নিয়েই আমি ব্যস্ত থাকতাম। আমার স্বামী ছিলেন বড় ভাল মানুষ। সারাদিন খেটে খুটে যা আনতেন—তাতেই আমাদের দিন কাটত। ঘুগেপাড়ার সবাই তাঁকে ভালবাসত। সবার দুঃখে-বিপদে, অসুখে-বিসুখে সব সময় তিনি যেয়ে দাঁড়াতেন। কতদিন যে আমরা উপোস্ দিয়ে কাটিয়েছি বাবু—তা আর কি বলব। তাতেও কিন্তু আমার বড় সুখ ছিল। ঐ সুখের দুঃখ যে কি আরামের তা ভগবান জানেন। দু বছর পরে শাশুড়ী মারা গেলেন। আমরা দুটিতে ঐরকম ভাবেই দিন কাটাতে লাগলাম। আমাদের গরীবের ঘর হলেও মনের মত ঘর দোর করলাম—মনের মত সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঘর সংসার গোছ করে নিলাম। আমার স্বামী বলতেন 'চাপা, উপোস্ দিয়েও উপোসীকে খাবার দিও, মরতে মরতেও যে মরতে চলেছে তার সেবা কোরো, ভগবান তাহলে খুব খুশী হবেন।' জান বাবু—আজ সেই কথাগুলিই আমার বেদবাক্য। গরীব ছোট জাতের মেয়ে আমরা, অত শত বুঝি না, কিন্তু কি বলব বাবু ঐ কথা কটির তেজ আমার বুকটা যেন ভরে আছে।

"সে বছর গ্রামে কলেরা ঢুকলো। ঘরে ঘরে কান্না—কে কাকে চুপ করায়—লোক নেই। আমরা দুজনে ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে দুয়োরে দুয়োরে ঘুরতে লাগলাম। আমাদের ঘুগে পাড়া প্রায় শেষ হয়ে গেল। বামুনরা কেউ এদিকে ঘেঁসলেন না। সেই রোগে আমার স্বামীও আমায় একলা ফেলে চলে গেলেন। তখনও কলেরার ওষুধ আমার কাছে ছিল। চোখের জল মুছে তাই দিতে লাগলাম। যখন গ্রামের রোগ সেরে গেল, দেখলাম—কারও স্বামী নেই, কারো ছেলে নেই, কারও বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই—সেদিন বুঝলাম আমি কত বড় মন্দভাগিনী।" বলতে বলতে তার দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। চোখের জল মুছতে মুছতে সে বলে—"বাবু কেমন করে যে তাঁর সৎকার হয়েছিল সে কথাও মনে নেই। স্বামীর শেষ উপদেশ 'পরের সেবা কোরো চাপা'—এই নিয়েই পড়ে আছি। আমরা লেখাপড়া জানি নে, শাস্ত্র টাস্ত্র বুঝি নে—আমরা জানি আমাদের সম্বন্ধ জন্ম জন্মের। আমি আবার তাঁকে পাব—তিনি কি আমায় ছেড়ে থাকতে পারেন?

"তারপর আর ঘরদোর ভাল লাগল না। জাতিরাও জালপেতে সব টেনে টুনে নিলে। আমিও আমার এই ঝাঁকাটা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। এখন হাট থেকে তরকারী কিনে আনি আর গাঁয়ে গাঁয়ে ফেরি করে বেচি। যা পাই তাতে পেট চলে যায়, দুপয়সা থাকেও। তাতে করে যা হয়, কারও অসুখ বিসুখ করলে সাগুটা মিছরিটা কিনে দি। আমার স্বামীর কথা যে আমার বেদবাক্য বাবু!" তার চোখ দিয়ে পুনরায় জল গড়িয়ে পড়ল।

মেয়েটির কথা শুনে শ্রদ্ধায় আমার অন্তর ভরে গেল, পিসিমা বলে উঠলেন—"পরজন্মে তোর ভালই হবে চাপা, তোর জন্ম সার্থক।"

খানিক পরে সে বললে "এই সেই ছেলেটি বাবু—এর কেউ নেই। জাত নাপিত—একে রাখবে বাবু?"

আমি বললাম "বেশ ত, থাকুক না—"

চাঁপা ছেলেটিকে বললে—"নিধিরাম, বাবুকে, মাকে প্রণাম কর। ভাল হয়ে থেকো—"

আমি বললাম "তুমিও থাকনা চাঁপা, পিসীমার কাছে থাকবে—বীণা রয়েছে, তোমার কোন কষ্টই হবে না।"

সে বললে—"না বাবু, তা হবে না। যতক্ষণ হাত পা রয়েছে খেটে খাই। আমার স্বামী বসে খাওয়া পছন্দ করতেন না। যখন চল্‌বে না তখন তোমার বাড়ী আস্‌ব।"

আমি বললাম—"তবে তাই এসো চাঁপা, তোমার এই অভাগা ছেলের বাড়ীতে আসতে দ্বিধা করো না। এ তোমার নিজের ঘর বলেই মনে কোরো।"

"তবে আসি বাবু" বলেই সে উঠল। আমি বললাম—"মাঝে মাঝে এসো।" সে বললে—"তা আবার আসব না বাবু? এযে আমার বাপের বাড়ী।"

চাঁপা চলে গেল—কি তার দৃষ্টি, কি তার স্বামী-ভক্তি—কি তার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা! আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম। মনে হল সকলেই যদি এমনি কাজ্জো হত—তা হলে? তা হলে বোধ হয় পৃথিবীই স্বর্গ হয়ে যেত।

এর পর সে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসত। তার পানে তাকিয়ে থাকতাম—আর শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে পড়ত। তাকে ঘরে রাখতে পারিনি। বোধ হয় কেও কখন পারবেও না। তা যদি পারতাম তা হলে আমার ঐ কালো মায়ের রূপে আমার অন্তর বাহির আলো হয়ে যেত। সবাই তাকে দেখত—তরকারী বেচা চাঁপা ঘুচে, বাইরের চোখে সবাই তাকে দেখতো—একটা করুণাকার মাগী আসু বেচে বেড়াচ্ছে; কিন্তু আমি তাকে দেখতাম আমার কল্যাণময়ী কালো মা ঘরে ঘরে অমৃতের ধারা দিয়ে বেড়াচ্ছেন আর সবাইকে বলে যাচ্ছেন "তোরা মানুষ হ, মরতে মরতেও দীন-দুঃখীর সেবা কর।"

হিমাদ্রি

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

হিমাদ্রির বক্ষ ভরি সমুদ্র কল্লোল,
শত শত উৎসধারে উঠিছে ধ্বনিয়া,
উত্তাল তরঙ্গ মালা বিস্তৃত হিল্লোল,
স্তম্ভিত পর্ব্বতরাজি বিস্ময় মানিয়া!
বাহিরে বন্ধুর দেহ কঠিন পাষাণ,
শিথিল মাটীর বুকে রয়েছে চাপিয়া,
দোদুল দুর্ব্বল তৃণ শৈবাল সমান,
সভয়ে বহিছে ফুল কাঁপিয়া কাঁপিয়া!
ধূসর নীলাভ গাত্রে ভেসে চলে মেঘ
কেন সম সুকুমার, গগন মন্থর,
তরঙ্গের চঞ্চলতা অশান্ত আবেগ
স্তব্ধ সব, জীবনের নব যুগান্তর!
ছিলে পারাবার, দৃষ্টি নাহি শেষ তল,
বিশাল মূরতি আজ ভূধর অটল!

শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের উপদেশ

শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র—(নাগ-দুহিতা)

আমি একদিন নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবান কখন জীবের উপর দয়া করেন? তিনি ত কর্ম-অনুসারে জীবকে ফল দিয়া থাকেন। নাগমহাশয় মৃদু মন্দ হাসিয়া বলিলেন, ভগবান দয়াবান। যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল ভোগ করে, ইহা সত্য। কিন্তু ভগবান যাহাকে দয়া করেন, তাহার কর্ম ভাল হয়, ভাল কর্ম হেতু সে মুক্তিলাভ করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ কর্ম করিলে ভগবান সুখী হন? নাগমহাশয় বলিলেন, ভগবানকে মনে করিলেই তিনি সুখী হন। আমি বলিলাম, পূজা করা, উপবাস করা, ইহা ত বাহিরের কাজ, ইহাতে কি তিনি সুখী হন? নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা, ভগবানের উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়, ভগবান তাহাতেই সুখী হন। একটি লোক এক নির্জন স্থানে শিবপূজা করিত। এক দিন সে শিবপূজা করিতে যাইয়া দেখিতে পাইল, তাহার পূজার স্থানে একটী চিল বসিয়া রহিয়াছে। সে তাড়া করিলে চিলটি পাখা নাড়িয়া উড়িয়া গেল। চিলের পাখার দ্বারা আন্দোলিত বাতাসে সেই স্থানটী খুব পরিষ্কৃত হইল। লোকটী সেই স্থানে বসিয়া শিবপূজা করিল। স্থান পরিষ্কৃত দেখিয়া মহাদেব সুখী হইয়া বর দিলেন, যে আমার পূজার স্থান পরিষ্কার করিয়াছে, তাহার আমাতে অচলা ভক্তি হউক। চিলটীর দেহ পতন হইল। সে এক রাজার মেয়ে হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। সে ছোট সময় হইতেই শিবপূজা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার শিবে ভক্তি দেখিয়া, তাহার পিতামাতা ভাবিতে লাগিলেন, উহার যেমন শিবভক্তি, যদি শিব দয়া করিয়া একটী শিবভক্ত স্বামী উহাকে দেন, তবেই ভাল হয়। ভগবান ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। কালক্রমে সে মেয়ের একটী শিবভক্ত রাজার সঙ্গে বিবাহ হইল। যখন সে স্বামীর সঙ্গে তাহার বাড়ীতে চলিয়া আসিবে, তাহার পিতা ছোট সময় যে সব পুষ্পপাত্রে পুষ্প রাখিয়া সে শিব পূজা করিত, তাহা তাহার সহিত দিলেন। মেয়েটী স্বামীর বাটীতে যাইয়া, ছোট সময় যে ভাবে শিব পূজা করিত, সেই সমস্ত কথা প্রাণ খুলিয়া স্বামীকে বলিল। তাহা শুনিয়া স্বামী অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। স্ত্রীর শিবপূজার সমস্ত যোগাড় করিয়া দিল। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে এক স্থানে বসিয়া শিবপূজা আরম্ভ করিল। শিবই তাহাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হইল। উভয়ে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া শিবের আরাধনা করিয়া অন্তে শিবলোকে চলিয়া গেল। শিব তাহাদিগকে তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দিলেন।

নাগমহাশয় অনেক সময় বলিতেন, ভগবান দয়াবান, তিনি সকলেরই আপন। আমি নাগমহাশয়কে বলিলাম, পুরুষ স্বাধীন। সে যে ভাবে ইচ্ছা ভগবান লাভের জন্য সাধনা করিতে পারে। পরাধীন জাতির ততটা সুবিধা হয় না। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা, ভগবানের নিকট মেয়ে পুরুষ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। ভগবান সকলেরই সমান। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অমঙ্গল হয় না। কৃষ্ণ যখন অবতার হইয়া আসিয়াছিলেন, ব্রজের রাখালগণ তাঁহাকে সখা বলিত, প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভালবাসিত। ভক্ত-বৎসল ভগবান সর্ব্বদা ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে স্থানে লইয়া যাইত, তিনি তাহাদের সঙ্গে তথায় যাইতেন। রাখালগণ ঘোর বনে যাইত, কৃষ্ণকেও আব্দার করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইত। বনে লইয়া ছাড়িয়া দিয়া সকলে মিলিয়া খেলা করিত, ফল পাড়িয়া কৃষ্ণকে খাওয়াইয়া পরে নিজেরা খাইত। কিন্তু প্রথমে নিজের মুখে দিয়া দেখিত, উহা সুমিষ্ট কি না। মিষ্ট হইলে ফল কৃষ্ণকে দিত, টক হইলে তাহা কখনও তাঁহাকে দিত না। রাখালগণ কৃষ্ণ লইয়া যেদিন যে বনে যাইতে ইচ্ছা করিত, সেইদিন তথায় যাইত।

বৃন্দাবনের নিকটে মুনিদের এক আশ্রম ছিল। মুনিরা জানিতেন, নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়া নন্দের ঘরে লীলা

করিতেছেন। তাঁহাদের পত্নীরাও সেই কথা জানিতেন। একদিন মুনি-পত্নীরা শুনিতে পাইলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের তপোবনের নিকট রাখালগণের সহিত গো-চারণ করিতে নিত্য আসিতেছেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, তাঁহাদের স্বামীদের বলিয়া একদিন কৃষ্ণ দর্শনে যাইবেন; মুনিগণ সকল দিন ভগবানের ধ্যান করিয়া সায়ংকালে আশ্রমে আসিতেন। মুনি-পত্নীরা নিয়মমত স্ব স্ব স্বামীকে আহারাদি করাইয়া, অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিতে লাগিলেন—আমরা শুনিতে পাই যে, গোলকের পতি লীলা করিতে বৃন্দাবনে নন্দের ঘরে আসিয়াছেন, তিনি নিত্য আমাদের তপোবনের নিকট রাখালদের সহিত গোচারণ করিতে আসেন। আমাদের বড় ইচ্ছা হয় একবার তাঁহাকে দেখি। আপনারা একবার বলিলে আমরা যাইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করি। তাঁহাদের বিনীত বচনে মুগ্ধ হইয়া সকল মুনিই নিজ নিজ পত্নীকে কৃষ্ণ দর্শনে যাইতে অনুমতি দিলেন। কেবল এক মুনির কি দুর্বুদ্ধি হইল, তিনি তাঁহার পত্নীকে কিছুতেই যাইতে দিলেন না। অন্যান্য মুনি-পত্নিগণ স্ব স্ব স্বামীর আদেশে কৃষ্ণের জন্য সুমিষ্ট ফল-মূলাদি সঙ্গে লইয়া, তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। যাঁহাকে স্বামী যাইতে বারণ করিলেন, তিনি ঘরের দ্বার অর্গল বন্ধ করিয়া, কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং মনে মনে কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ, দয়াময়, আমার মত পাতকিনী কি তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারে? নারায়ণ, তুমি আমার বাড়ীর কাছে আসিয়া খেলা করিতেছ, বনের পশুপক্ষী তোমাকে দেখিয়া নয়ন জুড়াইতেছে, আর আমার পাপ চক্ষু তোমার রূপ দেখিতে পাইল না! ভগবন্, আমি মহা অপরাধী, তোমার দর্শনজনিত সুখ লাভ হইল না। হা কৃষ্ণ, আমি তোমার জন্য সুমিষ্ট ফল রাখিয়াছি, বড় আশা ছিল, নিজ হাতে তোমার চাঁদমুখে তুলিয়া দিব। তোমাকে দেখিতে না পাওয়ায় সকল আশা বিফল হইল। বিপদভঞ্জন, পতিতপাবন, মধুসূদন, এসে আমাকে দেখা দাও। নারায়ণ, তোমার ফল তুমি লও। এই বলিয়া মুনি-পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে নিরুপায় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। অমনি কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া, তাঁহার প্রাণ কৃষ্ণে মিলিয়া গেল। ঘরে শূন্য দেহটি পড়িয়া রহিল।

নাগমহাশয় বলিতেন, মা, ভগবান হৃদয়ের ধন। তাঁহাকে হৃদয়ে খুঁজিতে হয়। কাতর প্রাণে যেখানে বসিয়া ভগবানকে ডাকা যায়, তিনি সেইখানেই আসিয়া দেখা দেন।

আরতি

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

তোমার সুন্দর মুখে সুমধুর হাসি
জীবন-উৎসবে মোর মুখরিত বাঁশী।
তোমার মধুর কণ্ঠ শ্রবণে আমার
নিয়ত ঢালিয়া দেয় সুধা অনরার।
স্বজনের ব্যবহারে যবে ব্যথা পাই,
তখন তোমার স্নেহে হৃদয় জুড়াই।

শত অভিঘাতে প্রভু আমি অবিচল,
সে শুধু পাইয়া তব প্রীতি অবিরল।
জীবন-আকাশে মম ধ্রুবতারা তুমি,
তোমার অভাবে ধরা শূন্য মরুভূমি।
সন্ধ্যায় আঁধার তুমি তুমিই প্রভাত,
স্মরণে মরতে তুমি জীবনের নাথ।

"প্রজাপতি-বরলব্ধ" তুমি চির-প্রিয়,
জীবন দেবতা তুমি হৃদয়-অমিয়।

বাঙ্গলার ব্রত

শ্রীপ্রমথকুমার ভট্টাচার্য্য, বি-এ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিজকে রাখিয়া, যখনই আমি, আমার নিজের কথা ভাবি,—তখনই আমার উত্তম অবয়বে ক্রম-পরিবর্ত্তন আমার সজাগ চক্ষুর সুস্পষ্টদৃষ্টিতে পতিত হয়, আর ভাবনায় ও তাহার বিশ্লেষণের কোন পথ না দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মৌনভাবে থাকি। আমার কেবলই মনে হয়—"স্বকর্ম্মে নিরতঃ শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ"—নিজের ধর্ম্মে ভিতরে থাকিয়া নিজের বিকাশ করিতে পথে বিষাদ-লাঞ্ছনা মঙ্গলময়—কিন্তু পরধর্ম্ম ঐহিক বা আত্মীয় জীবনের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। স্ব স্ব ধর্ম্মই তাহাদের মধ্যে পার্থক্যের অঙ্কন রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। জীবের ধর্ম্ম বৈশিষ্ট্যের উপরই স্ব স্ব শ্রেণীর যথাযথত্ব উৎকর্ষ নির্ভর করে।

দেশ-কাল, মানুষকর্ম্মের পন্থা নির্ণায়ক। সেই পথ-ভ্রান্তি কিংবা উৎকর্ষই নির্ণয় করের ক্রমক-ফলক। এবং সেই অন্তঃসারশূন্য-ভ্রান্তই মানবের বিশেষত্বের সর্ব্বনাশকারী। অনুভূতি সহকারে ক্রম-উন্নতির চিন্তার সুষম-পথে যাবনাকাঙ্ক্ষাই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব;—তাহাই মানবকে বিশ্বের শ্রীবৃদ্ধিমের গৌরব দান করে।

বিশ্বকর্ম্মের মহান্ নেতা শ্রীকৃষ্ণ পতিত ধনঞ্জয়কে মানব্যের ক্রম-বিকাশ পথিক বাণীর পুনরাবৃত্তি তাঁহাকে সকল সময়ই সমান আনন্দ দান করে বলিয়া উপযুক্ত সময়ের মীমাংসা-বিধানে তাহার পুনরুল্লেখ করিতে সাহস-পূর্ণ আত্মবাহুল্য করিতেছি—"অজ্ঞানতা দূর করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান দিতে এবং হৃদয়ে সহজ-পথে ভগবানের প্রেম আসাতে, বিশ্বকর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম।"

আমাদের জীবন-যাপন একটা দীর্ঘকালের বিরহ বিশেষ। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সুখদুঃখ ও পাপপুণ্যের এক অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে। এই অনাদিম আত্ম মনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই কিছু কিছু অগ্রসর না না হইলে এবং জীবনের কর্ম্মফলাপ শান্তির দিকে চালিত না করিলে—মৃত্যুকালেই অসদ্গতি ভিন্ন আর কোন গতি সম্ভব নহে। আমাদের জীবনধর্ম্মের প্রতি মনোনিবেশ করিলে স্বতঃই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেব ধর্ম্মের প্রাণ অন্ত একটী মহৎ কোন পদার্থ;—আমাদের কর্ম্ম ও চিন্তা সেইদিকেই আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া দেয়—মনকে আকর্ষণ করিয়া আনে। যাহারা সেই দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লয় তাহাদের সাধারণ জীবন ভিন্ন আর কিছু থাকিতে পারে না।

আমাদের বর্ত্তমান অবোগতির প্রকৃত কারণই—স্বধর্ম্মের উপেক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল আহার, নিদ্রা, বাগ্‌বিতণ্ডা এবং জীবের হত কলহ-বিবাদ—সেই সাধনারই ফল। তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ভিন্ন উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। অনেকেই বলেন—বহুতায় সাধারণ ভাষায় ধর্ম্মের ব্যাখ্যান করিয়া নিজে বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ান। অনেকে আছেন—সপ্তাহে, মাসান্তে অথবা বৎসরান্তে চক্ষু কিংবা নিজ-পড়া লালিত্যে ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করেন। অনেকের এক একদল থাকে—তাহারা অর্থবাদ কাহাকেও গুরুত্বসূচক কতকগুলি শব্দ উপাধি দ্বারে আবৃত করিয়া, অনুমানের অন্ধকার গৃহে গৌরিক বৃদ্ধা করে। গৃহিতে বসিয়া অপর সিদ্ধান্ত অনেকের মূলধর্ম্ম। কতকগুলি যোগান মন্দিরের পূজকবিশেষ আচার্য্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহজনে। মহৎ বৈশিষ্ট্য জীবনের গতিবিধির উপর নির্ভর করে। যদি নৈতিক জীবন সুপরিচালিত না হয়—তবে সহসা কোথাও হইতে যশ লাভ করিয়া কিংবা ক্রয় করিয়া পাওয়া অসম্ভব। যাহারা নৈতিক জীবনের কর্ম্ম ও চিন্তাকে উপেক্ষা করিয়া চলে, তাহারা সেই উপেক্ষার স্রোতে এক একস্থানে নীত হয়—যেখানে তাহার কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি হইয়া যায়।

সুতরাং প্রথমক্রমে আমার বাঙ্গলা বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া আমাকে সর্ব্বপ্রথমই বলিতে হয়—নারীব্রতের বিশেষ সার্থকতা আছে। পুরুষ ঘরে বাহিরে পাঁচ রকম দেখিয়া শুনিয়া—পাঁচরকম বিষয়ের ভিতরে তাহার নিজের কিছু করিয়া লয়—পুরুষের কোথাও স্থায়ী জীবনের তেমন ঘরো নাই।

কেবল পড়িতে পারিলেই প্রকৃত শিক্ষিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। নিজের ভিতরে পরের বিষয়কে নিজের বিবেচনায় রাখিয়া সারভাগ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে জ্ঞানের উৎকর্ষ হইয়াছে বলা যায় না। বিদেশী ভাষায় বক্তিমতা হইলেই শিক্ষিতা হয় না। যদি ধর্ম্মতঃ উন্নত হন—তবে স্বদেশী ভাষায়ই তাহার ভাব পরিণতি লাভ করা যায়; অথবা তাহাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলিতে হয়। পরিবারের ভিতরে নৈতিক জীবনের উন্নতিই সমূহ-উন্নতির মূলীভূত কারণ বলিয়া পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি।

সুতরাং নারীব্রতের সার্থকতা যে খানে—এবং তাহাই যে একমাত্র পথ তাহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। গৃহস্থালী কাজ দেহ ও মন রক্ষারই বাস্তব কর্ম্ম ও সহায়। প্রতি মাসে নানাভাবে নানা নামে নানা দেবতার পূজা অর্চ্চনা—মনঃসংযোগ ও একাগ্রতা লাভেরই অনুকূল। প্রতি মুহূর্ত্তই ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত হয়—তাহার সম্যক উপলব্ধির জন্যই, সর্ব্বকাজের ভিতরে মাঝে মাঝে ব্রতের পূজা কিংবা উপবাসাদি নিয়মের

সাহায্যে সংযম ও ব্রত উপবাসাদি দেহ-মনঃশোধনের সহজ বিধি। তাহাতে সকল দিক্ দিয়া উৎকর্ষলাভের যেমন সুবিধা হয়—তেমন সুবিধা আর কোনও দিক্ দিয়া হয় না। বর্ষীয়ান্ ও বর্ষীয়সীর ন্যায় কনীয়ান্ ও কনীয়সী, সকলেই সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়—এবং তাঁহাদের অনুকরণে নিজ নিজ দেহ-মনকেও সংশুদ্ধ ও সংগঠিত করিতে সকলেরই প্রাণে একটা তীব্র পিপাসা আসে। উৎকর্ষলাভের ঐ পিপাসা—ধর্ম-কর্ম্ম ব্যতিরেকে শান্ত হয় না। যদি কথাবার্ত্তায় ও কাজকর্ম্মে জীবনাতিপাত হইয়া যায়—তবে জীবনের শেষে হিসাব করিতে কিছুই পাওয়া যাইবে না।

সহধর্ম্মিণী স্ত্রীর সহায়তা ও ব্রতই, বিরত পুরুষকে সৎপথে ও কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত করে। আধুনিক শিক্ষিত ও শিক্ষিতা অনেকেই, এসবে নিন্দা করিতে দ্বিধা বোধ করেন না—তাহার কারণ, তাঁহারা নিজেদের ঘর হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। নিজ নিজ ঘরের ভিতর খুঁজিয়া দেখিলে হয়ত অবোধ না হইয়া পারিবেন—তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় না। নীরস সাধনার প্রাণটীকে জাগরিত রাখিতে সাময়িক ব্রত চর্চ্চা সর্ব্বথা সমীচীন। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ভিন্ন শিক্ষার ধারা মন হইতে উঠিয়া যায়।

সংসার-তাপদগ্ধ পীড়িত ও ক্লিষ্টাপে তাপিত মনকে সংস্থ করিতে কেন্দ্রীভূত ব্রতশিক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। পুরুষকারের মূলের ভাষা—মূলের ভাব—অন্তঃপ্রকৃতির স্বাধীনতা—তাহার ভবিষ্যতের পূর্ণজীবন—সবই মাতার চরিত্রের প্রতিবিম্ব হয়। সুতরাং যে সংযম, দম, শম, বিনয় ইত্যাদি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক—তাহা মাতার নিকট হইতেই লাভ করিতে হইবে। অতএব দেবভক্তি, সত্যাশ্রিতা, মাতা জীবনের অঙ্গে উৎসব-আকারে সন্তানদের সুবিধা মত না করিলে—তাহারা জড়তা হইতে জড়তায়ই পরিণত হইবে এবং অধিকন্তু বিদ্রোহিতাময় হইবারই সম্ভাবনা।

মাঘমণ্ডল ব্রত

হিন্দুর দৈনন্দিন কার্য্য হইতে সকল জীবনের কার্য্যাবলীই বিজ্ঞানপ্রসূত। সমস্ত দিন গুলি, একজন হিন্দুকে তাহার পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়। তাহাতে অযুক্তি অনিয়ম কিংবা স্বার্থের পূতিগন্ধময় আবিলতা নাই। অনিয়ম ও অনাচার যে হিন্দুর ধর্ম্মচ্যুতি ঘটায় নাই, বিলাসিতা যাহাকে কলি-কলুষে মলিন করিতে পারে নাই, যাহার মন বনের পশুর মত নয়, ভাষা যাহাকে ক্ষু-পিপাসায় কদ্ধশ্বাস করিতে ভীতা হয়—তাহার জীবন সত্যই, সত্যের ঘরে বিজ্ঞানের মূর্ত্ত জীবন স্বরূপ। তাহাদের যে কোন কাজ—স্ত্রীআচার, দেশাচার, লোকাচার—সবই নিখুঁত সত্যের অনুসরণ করে। মাঘ মাসকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া, মাঘের পালনীয় একটী ব্রতের কথাই এখন উল্লেখ করিব। সকল মাসেই তাহাদের এই সংযম-সাধিত ব্রতের নিরূপিত দিন রহিয়াছে। প্রত্যেকটী ব্রতই জীবনব্রতের আংশিক ক্রিয়াস্বরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তির (পৌষ শেষ) প্রাতঃকালে পবিত্র স্নান করিয়া মাঘ মাসের প্রথম দিনেই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বমুখী হইয়া সূর্য্যদেবকে অঞ্জলি দিতে হয়। দূর্ব্বা, ফুল ইত্যাদি একত্র করতঃ কলাগাছের খোলের পাড় দ্বারা তাহাকে শাখাপ্রশাখা যুক্ত করিয়া অতি মনোরম ভাবে অঞ্জলি দানের 'মুঠা' প্রস্তুত করিতে হয়। এই ব্রতের নাম—মাঘমণ্ডল ব্রত। এই সময়ে প্রাতঃস্নান ভারতবাসীর বড় উপকারী—প্রভাতে কার্য্যের ভিতর দিয়া মুক্ত হাওয়ায় বিচরণ করাও স্বাস্থ্যজনক। গৃহস্থের স্ত্রীকে বারমাস অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া উঠানে গোবরছড়া, গৃহাদি পরিষ্কার ও প্রাতঃকালের আবশ্যক অন্যান্য কর্ম্ম করিতে হয়; তাহার পর সময়মত আহার-পানেরও আয়োজন করা তাঁহাদের জীবনব্যাপী কর্ত্তব্য। সুতরাং মাঘমণ্ডল ব্রতের ভিতর দিয়া তাঁহারা ধর্ম্ম, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও স্ত্রী-জীবনের সকল কর্ত্তব্যের পাকা শিক্ষা পান। বিজ্ঞানবলে আমাদের আহার্য্য দ্রব্যাদির ভিতর হইতে সূর্য্যের শক্তি আনিয়া আমাদের জীবনীশক্তিকে জীবিত রাখি,—ইহাও সূর্য্যের উপাসনা, পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের অংশ জ্যোতি স্বরূপ তপনদেবের সাধনা। এই সাধনার ফল আত্মা ও দেহের উৎকর্ষ।

অপেক্ষাকৃত পরিণতা কন্যারাই এই ব্রতের ব্রতী; প্রাতঃস্নানে রিক্তা সুকুমারী বালিকা—

"লও গো সূর্য্য আর গো, লও পূজার পাণি
লিখিয়া জুকিয়া লও সাত জন পাণি।"

ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে। অনুরোধ আছে—যদি আমার পূজার অঞ্জলি সত্য সত্যই তোমার পূজার উপযুক্ত না হয়, তবে আমাকে শাস্তি দিও। সত্যই, তোমারই পূজার জন্য আমার কুসুমদাম সহ এই অঞ্জলি লইয়া আসিয়াছি, তোমার দর্শনলাভের আশায় সরোবর তীরে বসিয়াছি, প্রীতির আবেগের গানে তোমাকে অঞ্জলি দান করিতেছি।

তার পর সূর্য্যকে প্রথম উদয়ের সময়ে যেরূপ দেখা যায় ঠিক তদনুরূপ আকৃতি করিয়া, মণ্ডলাকারে গোময়-লিপ্ত শুদ্ধ স্থানে অঙ্কিত করিতে হয়। এই উপলক্ষে হাতী, ঘোড়া, পাখী, বই, পাখী, পৃথিবী ইত্যাদি নানাবিধ চিত্র, নানা রঙের চূর্ণ দ্বারা অঙ্কিত করিয়া লইতে হয়। লাল সুরকির অতি মসৃণ চূর্ণ, বেল পাতার সবুজ রং, চা'লের দ্বারা শ্বেত চূর্ণ, হলুদের হরিদ্রা বর্ণ, পোড়া তুষের দ্বারা ঘোর কাল রং, আবার পরস্পর মিশ্রণে আরও ৪।৫ রকম রং প্রস্তুত করা হয়। এই রং ব্যবহারেও বিলক্ষণ বুদ্ধির আবশ্যক। ব্রতী বালিকা স্বয়ং কিংবা তাহার আত্মীয়-স্বজন অথবা তাহার জননী, মাতামহী, পিতামহী কিংবা খুড়ী ইত্যাদি—সকলেই অত্যন্ত আনন্দ সহকারে নিজ নিজ বুদ্ধির যথাযথ পরিচয়ে চিত্রবিদ্যার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

ব্রতকথাগুলি বালিকারা শিখিয়া লয়; প্রথমে মাতা ও ভগিনী তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। এই পূজা মন্ত্রে, সংসার জীবনের সুখস্বচ্ছন্দের আশা দ্বারা ভবিষ্যত সুন্দর সংসার-ছবি গড়িয়া লওয়া হয়। সংসার বিভীষিকাময় নরক নয়; ইহা মানবজীবনের পবিত্র স্থান—ভগবৎ সাধনার মন্দির—মনুষ্যত্বের শিক্ষা-মন্দির—ভগবানের মহিমা বিকাশের স্থল। এমন বহু শিক্ষা ব্রতকথায় আছে। আর আছে পৃথিবীকে নিজের করিয়া পূজা করা—আত্মীয়স্বজনকে সত্যই আত্মীয় ও স্বজন মনে করা। আরও আছে, পৃথিবী ধ্বংস হইয়া গেলেও সাধনব্রতে চির-চিত্ত-স্থির থাকা। নারী-জীবনের স্নেহ-মমতায়, পাতিব্রত্যে নারীর সার্থকতাও ইহার মূল মন্ত্র।—চিত্রিত সূর্য্যকে ভক্তিভরে পূজার সময় ৮।১০টী পূজার দুর্ব্বা হাতে নিতে হয়। এ দুর্ব্বায় সকলই পূজিত হয়—মাঘমণ্ডল, সোনার খুণ্ডল, বাপ রাজা, ভাই প্রজা, মা পাটেশ্বরী, আপনি বিদ্যাধরী; জন্মে জন্মে আয়রাণী (চির সধবা)। এই মন্ত্র সত্যই প্রাণস্পর্শী। পৃথিবীর কোথাও এমন আছে কি? সভ্যতার আলোকে ত পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছে—ঘরে ঘরে সকলে মিলিয়া অন্ধকার হইতে আলোকে পাদুকা শব্দে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তেমন শিশু প্রাণে শিশু-মনমাতান প্রথম মন্ত্র আর কোথাও কি শক্তি সঞ্চার করে? পৃথিবী, দেশমাতৃকা, জননী ও আত্মীয়-স্বজন পূজার সকল ভাবই এই মন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়—

"ত্রিকোনা পৃথিবী পূজি,
ত্রিকোনা রাজ্য পূজি;
যদি রাজ্য যায় ভেসে
মুই ব্রতী ব্রত করি সিংহাসনে বসে,
ঘোলাতে আত্মীয় প্রীতি।"

* * *

ঘোলায় এলাম ঘোলায় গেলাম,
মামার বাড়ীতে ঘি-ভাত খেলাম।

পূর্ব্বের পাদুকা ব্যবহারের মন্ত্রে—পাদুকা কিম্বা চর্ম্ম পাদুকার মত 'খড়ম'কে বলা হয়—

"উল্ খড়ম দিয়া পাও
সুস্বামীর ঘরে যাও"।

অশ্বকে তুষ্ট করিয়া বলা হয়—

"উখল ঘোড়া নকল ঘোড়া;
ঘোল বনের ঘেসে ঘোড়া।"

"তেলকলসী হাতে ঘি কলসী মাথে", "প্রথম পুতে (পুত্র) করে রাজ প্রথম বউ ভোগে রাজ", "মুই যাব শ্রীকৈলাস"—ইত্যাদি সুন্দর মন্ত্রের ভিতর কিরূপ নিষ্কাম সাধনা জড়িত রহিয়াছে—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারও কষ্ট হইবে না। পুথি ইত্যাদি অনেক পূজিতে হয়। শেষ মন্ত্রে আছে—"খালে ভাত ভুঞ্জারে পানি, বাপ রাজা মাতা রাণী"—ইত্যাদি সুন্দর সজীব কথা। এমন কি বনের পাখী, কুকুর বেচারারও তুষ্টিসাধন মন্ত্র আছে। সংসারের এমন ছবি আর হয় কি? তাহার সঙ্গে পবিত্র ভগবদ্ভক্তি—তাহার সঙ্গে সংযম নিয়ম। পুষ্করিণী পূজিতে সূত্রের ভিতর দিয়া কোমলা বালিকা বলে—"মামা দিলে পুকুর ভাগিনেয় দিলে পাড়, পশুপক্ষীও জল খায়-দেখরে সংসার।" পানের বাটাও বাদ পড়ে নাই। সন্ধ্যাবেলায় আবার ঘোলা পূজা ও 'তারা' পূজা।

প্রতি রবিবারে কলার খোলের নৌকা প্রস্তুত করিয়া আগের সাত দিনের রঙের গুঁড়া ও মুঠাগুলিকে নিয়া জলে ভাসাইতে প্রতিবেশিনীরা কত সুন্দর গান

সংহিতা পুষ্করিণী পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করেন। অন্য দিনে ব্রতের দেবতা পূজিলেই হয়, এই দিন এই জলে ভাসান কাজ না হইলে খাওয়া যায় না। রবিবারে নিরামিষ আহার্য্য। তারা-পূজার মন্ত্রে আছে—"হে তারা তুমি উঠে দেখ, আমি নিষ্পাপ, সকল রকম সুখ শান্তি যেন আমার ও আমার সকলের হয়।" মাঘ মাস ভরা এইভাবে পূজা করিয়া,ফাল্গুন মাসে পুনঃ সকাল সন্ধ্যায় সূর্য্য এবং চন্দ্রতারা পূজিতে হইবে। উভয় সংক্রান্তিতে সূর্য্য ও বিষ্ণু পূজা পদ্ধতি আছে, নিয়মনিষ্ঠা আছে, লোকসেবা আছে। ক্রমান্বয়ে চারি বৎসরের শেষে তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। সেইদিন মাঘ মাসের সংক্রান্তি; মহাসমারোহে বাস্তাদি সহ সূর্য্যদেবের নির্ম্মাল্য বিসর্জ্জন ও অঞ্জলি দান করা হয়। নাপিত ধোপার সেইদিনে কাজের বন্দোবস্ত আছে—গুরুপুরোহিত সেইদিন পূজায় ব্রতী হন। সেদিন আত্মীয়-গণের আনন্দধ্বনিতে সমস্ত বাড়ী মুখরিত হয়। প্রতিবেশী রমণীরা বালক-বালিকা-সহ সেদিন পূজার বাড়ীতে সমাগতা—সেদিন মিষ্ট সন্দেশ প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হয়—সেদিন সকলের একত্র আহার ও আনন্দোৎসব। তাহাতে আরও সৌন্দর্য্য আছে—চারি বৎসর সাধনার ফলে নিজকে বশ করিতে, হৃদয়কে পবিত্র করিতে,পরকে আপন করিতে তাহার শক্তিলাভ হইয়াছে। সেদিন সেই পবিত্র ব্রতী বালিকা নববস্ত্রে ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া অজানা আর এক পরিবারের আর একটী কন্যাকে আপনার বন্ধু বলিয়া—প্রাণের স্বজন বলিয়া গ্রহণ করে; তাহাদের পরিবার এক হইয়া যায়। সেদিন সবই একাকারের দিন। আরও সুন্দর,—এ বন্ধুত্ব আজীবন ঘুচে না। কালের প্রভাব, সহরের শিক্ষার দম্ভ তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না; দুইজনেই যেন এক হইয়া যায়। সেদিন সকল সৌন্দর্য্যের পূর্ণ খনি এই মাঘমণ্ডল ব্রতের সৌন্দর্য্য আরও অনুপমভাবে ফুটিত হয়।

শিশু-চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীঅমূল্যকুমার চন্দ্র, এম-ডি; (হোমিও)

দারিদ্র্যের কষাঘাতে দেশবাসী জর্জ্জরিত, তাহার উপর আবার দেশ জুড়িয়া নানাবিধ জীবন-ধ্বংসী পীড়ার তাণ্ডব নৃত্য; এরূপ অবস্থায় যদি আমাদের দেশের মেয়েরা একটু হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে শিক্ষা করেন তাহা হইলে আর কথায় কথায় ডাক্তার ডাকিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় না। সামান্য চেষ্টায় তাঁহারা নিজেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছোট খাট অসুখগুলি আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবেন। যাহাতে মাতৃ-মন্দিরের পাঠিকাগণ অল্প আয়াসে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া নিজেদের ছেলে মেয়েদের অসুখগুলি আরোগ্য করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব সরল ভাষায় শিশু-চিকিৎসা মাতৃ-মন্দিরের পাঠিকাগণের সম্মুখে ধরিলাম; আশা করি এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লাক্ষণিক চিকিৎসা। রোগীর লক্ষণ সমষ্টির সহিত যে ঔষধের অধিকাংশ লক্ষণ মিলিবে রোগীকে সেই ঔষধ অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের ন্যায় দুটী তিনটী বা ততোধিক ঔষধ একত্রে মিশ্রিত হইয়া ব্যবহৃত হয় না, একবারে মাত্র একটী ঔষধ ব্যবহার হয়।

ঔষধ সেবনের পর রোগীর ক্রমোন্নতি দেখা যাইলে যতক্ষণ বা যতদিন পর্য্যন্ত এই উন্নতি হইতে থাকিবে ততক্ষণ বা ততদিন ঔষধ বন্ধ রাখিয়া সেই রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে যে, রোগীর আর উন্নতি হইতেছে না তখন সেই ঔষধ উচ্চতর শক্তিতে (Potency) বা বর্ত্তমান লক্ষণে অন্য কোন ঔষধ নির্দ্দেশিত হইলে তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে।

মনে রাখিবেন রোগীর লক্ষণ সমষ্টি বলিলে যে সব

লক্ষণই ঔষধ নির্ব্বাচনের জন্য প্রয়োজন হয় তাহা নহে; ইহার মধ্যে রোগীর মানসিক লক্ষণ, প্রবল লক্ষণ, অসাধারণ লক্ষণ এবং অস্বাভাবিক লক্ষণ এই সমস্ত লক্ষণই গ্রহণযোগ্য এবং ইহারাই ঔষধ নির্ব্বাচনের সহায়তা করে। ইহার মধ্যে আবার রোগীর মানসিক লক্ষণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। রোগের উপচয় এবং উপশম কিসে হয় এবং কখন হয় এইগুলিও খুব মূল্যবান লক্ষণ—যেন মনে থাকে। বর্ত্তমান রোগের কারণ কি তাহাও জানিতে হইবে। একটী উদাহরণ দিতেছি—

রোগী একটী স্ত্রীলোক, অতিশয় নম্র স্বভাবের, বিনীত এবং ক্রন্দনশীল প্রকৃতির—এইগুলি মানসিক লক্ষণ। পূর্ব্বরাত্রে লুচি কচুরি ইত্যাদি খাওয়ায় পেটের অসুখ হইয়াছে—এইটী কারণ। রোগিনী পেটের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন, বেদনা পেটের মধ্যে চারিদিকে যেন চলিয়া বেড়াইতেছে, পুনঃ পুনঃ পাতলা দাস্ত হইতেছে। মলের রং পরিবর্ত্তনশীল—এইগুলি প্রবল লক্ষণ।

পেটে ঠাণ্ডা জলের পটী দিলে এবং খোলা বাতাসে বেড়াইলে রোগিনী অপেক্ষাকৃত ভাল থাকেন। এইগুলি উপশমের লক্ষণ। গরম জিনিষ খাইলে বা গরম সেঁক দিলে রোগিনীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়—এই গুলি উপচয়ের লক্ষণ। রোগিনীর ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখের মধ্য শুকাইয়া যাইতেছে তথাপি জলপানের ইচ্ছা নাই, এইটী অস্বাভাবিক লক্ষণ। এইরূপ লক্ষণ ধরিয়া চিকিৎসা করিতে পারিলে রোগিনীর সহজে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা।

মাথা ব্যথা, পা কামড়ান ইত্যাদি কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ থাকে, কিন্তু উপরোক্ত লক্ষণগুলিই ঔষধ নির্ব্বাচনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। পলসেটীলা ঔষধের লক্ষণের সহিত এই রোগিনীর প্রয়োজনীয় লক্ষণগুলির সাদৃশ্য থাকায় রোগিনীকে উক্ত ঔষধ দেওয়া গেল এবং রোগিনী অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করিলেন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনকালীন কি কি নিয়ম পালন করিতে হয় তাহা জানিবার দরকার। ঔষধ সেবন কালীন রোগী কর্পূর বা কটুক্রিয়া জল ব্যবহার করিবে না। পেঁয়াজ, রসুন, গরম মসলাযুক্ত খাদ্য, হিং ইত্যাদি কোন ঔষধ গুণ সম্পন্ন খাদ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। কোন তীব্র গন্ধযুক্ত দ্রব্য যেন রোগীর গৃহে না থাকে। যে ঘরে ঔষধ থাকিবে তাহা পরিষ্কৃত হওয়া উচিত এবং যেন তাহাতে কোন গন্ধ না থাকে। ঔষধের বাক্স যেন শুষ্ক স্থানে সর্ব্বদা রাখা হয়।

রোগীকে ঔষধ দিতে নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ জলের অভাবে দুগ্ধ শর্করা (Sugar of milk) অথবা অণুবটিকা (Globules) ব্যবহার করা ভাল। শিশুকে এক মাত্রায় ৪টী অণুবটিকা দিতে হইবে। জলে কিংবা দুগ্ধ শর্করায় ঔষধ দিতে হইলে ১ ঔন্সে দুই কিংবা তিন মাত্রা করা যাইতে পারে। ঔষধ কত শক্তি (Potency) এবং কতক্ষণ অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণের সহিত লেখা হইবে। নিম্নে শিশু রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে একটু লিখিত হইল :—

শিশুর শ্বাস রুদ্ধ (Asphyxia) :—সদ্যপ্রসূত শিশুর শ্বাসরুদ্ধ অতি ভীষণ ব্যাধি। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুক্ষণ পরে এই রোগ উপস্থিত হয়। শ্বাসনালীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা অথবা অন্য কোন বিজাতীয় পদার্থ (Foreign substances) জমিয়া থাকায় শ্বাসরুদ্ধ উপস্থিত হয়। মুখ, ওষ্ঠ এবং সর্ব্ব দেহ নীলবর্ণ হইয়া যায়, শিশুকে দেখিলে মৃতবৎ বোধ হয়। এরূপ অবস্থায় যদি নাড়ী (Pulse) পাওয়া যায় তাহা হইলে অনেক সময় রোগী আরোগ্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ শিশুই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা:— প্রথমে বায়ুনলীর মধ্য হইতে শ্লেষ্মা অথবা অন্য কোন পদার্থ থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। পর্য্যায়ক্রমে শিশুকে একবার শীতল জলে পরক্ষণে আবার গরম জলে স্নান করাইবেন; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হয় ততক্ষণ এইরূপ করিতে হইবে। ইহা পরম উপকারী প্রক্রিয়া। একোনাইট ৩ শক্তি ১০ মিনিট অন্তর অল্প জল সহ রোগীর মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিবেন, ইহাতে রোগীর কাশি হইতে থাকিবে।

ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus):—এই ভীষণ ব্যাধি শিশুর নাড়ী কাটিবার সময় হয়। চেঁচাড়ীর সহিত বা অন্য

কোনও অস্ত্রের সহিত এক প্রকার জীবাণু (Bacilli) কর্ত্তিত স্থানের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া তথায় এক প্রকার বিষ (Toxin) উৎপাদন করে। এই বিষ ক্রমশঃ মেরুদণ্ড আক্রমণ করায় এই সাংঘাতিক পীড়ার উৎপত্তি হয়। এই রোগের জীবাণু রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার ৬।৭ দিন পরে ইহার মারাত্মক লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। তখন রোগীর দাঁত লাগিয়া যায়, খেঁচুনি আরম্ভ হয়; চোয়ালটি এরূপ ভাবে ধরিয়া যায় যে অনেক কষ্টেও অনেক সময় রোগীর মুখ হাঁ করাইতে পারা যায় না। ঘাড়ের মাংসপেশীতে খেঁচুনী হইতে থাকে, ঘাড় অতিশয় শক্ত হইয়া যায়, পিঠের মাংসপেশীতেও খেঁচুনী হয় এবং তখন রোগীর পিঠ বাঁকিয়া ঠিক ধনুকের মত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কেবল মাথা এবং পায়ের গোড়ালী মাটীতে ঠেকিয়া থাকে। হাত পা শক্ত কাঠ হইয়া যায়। সমস্ত পেশীর এইরূপ খেঁচে ধরা ভাব প্রায় সর্ব্বদাই থাকে; অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে খুব বাড়িয়া উঠে তখন রোগীর কষ্ট দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাতে দেহের জ্বর থাকে না। তবে মৃত্যুর সময় খুব বেশী জ্বর হইতে দেখা যায়। ৫।৬ দিনের মধ্যেই প্রায় মৃত্যু হইয়া থাকে। এই পীড়াকে আমাদের দেশের মেয়েরা "পেচোয় পাওয়া" বলে। ইহাতে শিশু প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ভীষণ পীড়ার চিকিৎসা আপনারা কখন করিতে যাইবেন না। উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকাইয়া তাঁহার হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবেন, অথবা নিকটস্থ হাঁসপাতালে রোগীকে পাঠাইয়া দিবেন।

আমাদের দেশের মেয়েদের সামান্য আলস্য হেতু অনেক শিশুই এই রোগে মায়ের স্নেহময় কোল হইতে বৃন্তচ্যুত পুষ্প কোরকটীর মত অকালে ঝরিয়া পড়ে। নাড়ী কাটিবার সময় নিম্নলিখিত উপদেশটী যেন পাঠিকারা স্মরণ করেন—

যে অস্ত্র দ্বারা নাড়ী কাটিতে হইবে তাহা উত্তমরূপে কিছুক্ষণ ধরিয়া গরম জলে ফুটাইয়া লইতে হইবে। পরে নাড়ী কাটা হইয়া গেলে ১ ড্রাম ক্যালেণ্ডুলার মূল অরিষ্ট, ৪ ড্রাম বিশুদ্ধ গিসারিনে মিশাইয়া উক্ত কর্ত্তিত স্থানে পটী দিবেন। এইরূপ ভাবে প্রত্যহ দুইবার করিয়া ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত উক্ত পটী দিবেন। এই প্রক্রিয়ায় শিশুর ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) হইবার ভয় থাকিবে না। অধিকন্তু ক্ষতটী সত্বর শুকাইয়া যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মাঘমাসে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা বাঙ্গালাদেশে হিন্দু নর-নারীদের একটি বিশেষ আনন্দোৎসবের পর্ব্ব। এ পূজা অনুষ্ঠিত হয় না এমন গৃহ বাঙ্গলার বুকের উপর খুঁজে মিলা ভার। তাই 'মাতৃ-মন্দিরের' মাঘ সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করা সম্পূর্ণ উচিত ভাবিয়া যথাসাধ্য সংক্ষেপে তার চেষ্টা করা হইতেছে—এখন পাঠকপাঠিকাদের উপভোগ্য হইলেই শ্রম সার্থক।

হিন্দুমতে পূজার পদ্ধতি দ্বিবিধ। তান্ত্রিক এবং বৈদিক বা পৌরাণিক। দুর্গা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শক্তিপূজা তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে, তদ্ভিন্ন প্রায় সমুদয় দেবদেবী পূজাই বৈদিক বা পৌরাণিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়। শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা শেষোক্ত পদ্ধতিতেই হইয়া থাকে। এই দেবীর প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু গ্রন্থ ঘাটাঘাটি না করিয়াও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা পুরাণাদি সকল গ্রন্থারম্ভেই দেখিতে পাই—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

এই শ্লোকের দ্বারা সরস্বতী বন্দনাও করা হইয়াছে। বৈদিক সন্ধ্যাতেও সাবাহ্ন গায়ত্রীকে শুক্লবর্ণা সরস্বতী' বলিয়া ধ্যান করা হয়। ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা সূক্তে 'যা রাকা সা সরস্বতী' এই উক্তি আছে। চণ্ডীর তৃতীয় অধ্যায়ের ঋষি ছন্দে আছে—'রুদ্র ঋষি, মহা সরস্বতী দেবতা .....

সামবেদ স্বরূপ মহাসরস্বতী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ'। ঐ অধ্যায়েরই নারায়ণীস্তুতির ভিতরে আছে 'মেধে সরস্বতী বরে·····নারায়ণী নমোঽস্তুতে'।

এতদ্ভিন্ন বাণী, ভারতী, বাগ্দেবী, ব্রহ্মবাদিনী, বেদমাতা ইত্যাদি বহু নামে বহুস্থলে উল্লেখ আছে। এই দেবী কুমারী বলিয়াই প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তিকালে নারায়ণী বলিয়া শ্রীবিষ্ণুরই অন্যতমা পত্নীরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। তন্ত্রাদির ভিতরেও, যথা কালীবিলাস তন্ত্রের একস্থলে যখন ভগবতী মহাদেবকে অন্য কোন্ কোন্ দেবদেবীর পূজা শক্তি পূজার সহিত হওয়া উচিত? এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন মহাদেব বলিয়া ছিলেন যে—গণেশ, কার্ত্তিক, জয়া, বিজয়া, সরস্বতী, কমলা, শিব, ব্রহ্মা, সাবিত্রী ইত্যাদির পূজা করা উচিত, তাহা হইলে পূজক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্তই দুর্গাপূজায় সরস্বতী পূজা বাদ পড়ে নাই। অতএব বৈদিক এবং তান্ত্রিক উভয়মতেই সরস্বতী পূজার বিধান পাওয়া গেল।

সরস্বতীর রূপ বর্ণনায় দেখা যায় তিনি—

"শ্বেত পদ্মাসনাদেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরানিত্যা শ্বেত-গন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষ-সূত্র-হস্তাচ শ্বেতচন্দন-চর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণা-ধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার ভূষিতা॥"

এই ভাবে যেন দুগ্ধবৎ শুভ্র কোন পদার্থ দিয়ে গড়া একটি মূর্ত্তি। তাঁর সবই সাদা, যেন সাদায় সাদায় মাখামাখি। এই এত সাদা ধারণার কারণ কি? চণ্ডীতে আছে—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা,' বৈদিক দেবী সূক্তে আছে 'তং সুমেধাম্', গীতার বিভূতিযোগে আছে 'জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্'—তিনি বুদ্ধিরূপিণী জ্ঞানস্বরূপিণী। জ্ঞানের কাজ অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া নির্ম্মল শুভ্র জ্যোতিতে সব প্রকাশিত করা। এখন যে বিষয়ের ধর্ম্ম হইল অপর সমস্তের মলিনতা দূর করিয়া কেবল স্বচ্ছ, শুভ্র ও জ্যোতিষ্মান্ করা,— সেই বিষয়স্বরূপিণীর রূপ কল্পনা যে সত্ত্ব-ভাবতরঙ্গায়িত ঋষি হৃদয়ে শুভ্রাতিশুভ্র বর্ণে প্রতিভাত হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। তাই আর্য্য ঋষিরা যখন পঞ্চনদের শুভ্র স্বচ্ছ সলিলা প্রবাহিনীতে অবগাহন করিয়া নিজেদের মহাপবিত্র ভাবিয়াছিলেন এবং তাহার মধুর কলনাদে তত্ত্বার্থজ্ঞানময়ী বেদত্রয়ী অর্থাৎ প্রণব নিনাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তখনই সেই স্রোতস্বতীকে 'সরস্বতী' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রত্যেক চিন্তাধারার ভিতরেই সত্ত্ব-শুদ্ধ-শুভ্রকান্তির ছাপটি পুরাপুরিভাবে পাওয়া যায়। আবার তিনি 'পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ' যোগাইয়া থাকেন বলিয়া 'দুষ্টা সরস্বতী' এই কলঙ্কিত নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। অনুগত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিলেই তিনি দুষ্টা অবিদ্যার ভাব ত্যাগ করিয়া তুষ্টা হন এবং মন্দ বুদ্ধির বদলে সুবুদ্ধি ও নির্ম্মল সত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া 'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে' এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

বাংলার বাহিরে অন্যত্র বসন্তপঞ্চমী ব্রতোৎসবই মাত্র হইয়া থাকে কিন্তু বাংলাতেই বিশেষভাবে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতেই বসন্তের সূচনা আরম্ভ হয় বলিয়া ঐ দিনকার তিথিকে বসন্ত-শ্রীপঞ্চমী বলা হয়। মূর্ত্তি গড়িয়া সরস্বতীদেবীর অর্চ্চনায় বিঘ্ন ঘটিলেও বঙ্গজননীগণ শ্রীপঞ্চমী ব্রত যথারীতি করিয়া থাকেন। কারণ ঐ বসন্ত পঞ্চমীর সহিত পরবর্ত্তি মদনোৎসব, হোলি, দোলযাত্রা ইত্যাদি বসন্তোৎসবের যৌগিক সম্বন্ধ রহিয়াছে।

এখন এই সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী এবং সর্ব্বকামপ্রদায়িনীর পূজা কিরূপে নরনারী মাত্রেই যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। পূজা বিষয়টা সম্পূর্ণ ভক্তি ও বিশ্বাসের ব্যাপার। যাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধাসমর্পণ করা হইবে, তাঁহার প্রতি যদি অর্পণকারীর যথোচিত অনুরাগ এবং বিশ্বাস না থাকে তবে অনুষ্ঠানের ছড়াছড়িতে কোনই লাভ নাই। কাজেই পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পূজার পাত্রপাত্রীর প্রতি যাহাতে প্রবল ভক্তি ও বিশ্বাস জাগ্রত হয় সেইরূপ উচ্চ চিন্তা ধারণা দ্বারা এবং মহৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করিতে হইবে। হিন্দুদর্শন শাস্ত্রমতে প্রত্যেক বস্তু এবং বিষয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, তদনুসারে বিদ্যাবিষয়েরও একজন অধিষ্ঠাত্রী বিদ্যাদেবী আছেন। তাঁরই নাম শ্রীশ্রীসরস্বতী। এজগতে যত কিছু কর্ম্ম—তা মস্তিষ্ক চালনারই হউক আর হস্ত-পদ চালনারই হউক,— সবই অনুশীলন সাপেক্ষ। অনুশীলনের দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহাই বিদ্যা; এই বিদ্যা পুরুষ-নারী, পণ্ডিত-

মূর্খ, উচ্চ-নীচ, স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী সকলকেই প্রয়োজন মত অর্জ্জন করিতে হয়। কাজেই বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী পূজায় সকলেরই সম অধিকার। ইহা সম্পূর্ণরূপে সার্ব্বজনীন পূজা, মানুষ মাত্রেরই এই বিদ্যাদায়িনী ভগবচ্ছক্তির পূজা করা কর্ত্তব্য। মানুষের শিক্ষা জীবন ভরা ফুরায় না, দিনের পর দিন যেমন অভিজ্ঞতা বাড়ে, তেমনই সঙ্গে, সঙ্গে শিক্ষনীয় নূতন নূতন বিষয়ও আসিয়া জোটে। শিক্ষার শেষ নাই—আর এই শিক্ষাবিধায়িনী মায়ের পূজারও শেষ নাই—এ নিত্য পূজা। সরস্বতী কোনও স্বতন্ত্র দেবী নহেন। তাঁর পূজার মন্ত্রে আছে—

'ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমোনমঃ।
বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এবচ স্বাহা।'

বেদবেদান্তাদি সকল বিদ্যাস্থানের অধিষ্ঠাত্রী ভদ্রকালী ও স্বাহারূপিণী সরস্বতীকে সর্ব্বদা নমস্কার! এই মন্ত্রেই বিদ্যাদেবীর নিত্যপূজার ভাবটি স্পষ্টরূপে বিদ্যমান। বিদ্যা বলিতে যেমন লেখাপড়ার চর্চ্চা, পট-রচনা, নৃত্যগীতবাদ্য শিক্ষা ইত্যাদি প্রধান প্রধান কয়েকটিকেই সাধারণতঃ বুঝায়, তেমন এইসব বিষয়ের অনুশীলনকারী নরনারীর ভিতরেই বিদ্যাদেবীর বিশেষ সমাদর। তাই সকল কবি এবং গ্রন্থকারই সরস্বতীর আশীষ মাগিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ছাত্র-ছাত্রীরাই তাঁহার পূজানুষ্ঠানে সর্ব্বদা মাতিয়া উঠে। পাশ্চাত্য জগৎও এই দেবীকে ভুলিতে পারে নাই। গ্রীকজাতিরা জুপিটারের মস্তকোৎপন্না চিরকুমারী মিনার্ভাকে (Goddess of learning) শিক্ষাদায়িনী দেবীরূপে পূজা করিতেন। ভাষারূপিণী তিনি সর্ব্বজীবের 'কণ্ঠে জিহ্বাগ্রে চ সরস্বতী' হইয়া বিদ্যমান আছেন, তাই বাণীপূজার মন্দিরদ্বার সকলের জন্যই নিত্যমুক্ত!

পূজার প্রধান সামগ্রী ভক্তি ও বিশ্বাস যদি সৌভাগ্যক্রমে আহরণ করিতে পারা যায় তবে অন্য উপচার মিলে উত্তম, না মিলিলেও কিছু যায় আসে না। গীতায় ভগবান অতি স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন যে, ভক্তিভাবে যে যাহা দেয় তাহা নিশ্চিতই তিনি গ্রহণ করেন।

অতএব পূজা স্বয়ং করাই সর্ব্বোত্তম। অসমর্থ হইলে বা অস্থিরচিত্ত হইলে প্রতিনিধি স্বরূপে বিশুদ্ধ পুরোহিত দ্বারা হইবে। পুষ্পবিল্বপত্র, দূর্ব্বাক্ষত, চন্দন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি সহ ঘটে, পটে বা মূর্ত্তিতে পূজা করিবে। পূর্ব্বমুখী বা উত্তরমুখী হইয়া পূজা করিবে। যখন যে দেবতার পূজা করিতে হয় সেই দেবতাকে ভগবানের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নজ্ঞানে পূজা করা কর্ত্তব্য।

ওঁ বিষ্ণু, ওঁ হরি, ওঁ তৎসৎ, এই বলিয়া তিনবার আচমন করিয়া হাত দুইয়া ফেলিবে। "ওঁ অপবিত্র পবিত্র বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা। যঃ স্মরেৎ শ্রীসরস্বতীং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।" 'ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং। সরস্বতীং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণিকারয়েৎ।' এই বলিয়া নমস্কার করিবে। হাতে আতপ চাউল লইয়া 'ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তিনঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তিনোবৃহস্পতির্দ্দধাতু।' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিবে। করজোড়ে 'ওঁ তৎসৎ অদ্যমারভ্যঃ শুভায় ভবতু' এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

সঙ্কল্প—কুশিতে হরিতকী, তিল, তুলসীপত্র, পুষ্প, চন্দন এবং জল লইয়া মাটির উপর স্থাপিত বাম হাতের উপর রাখিবে এবং ডান হাতে ঢাকিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে—'ওঁ বিষ্ণুর্ওঁ তৎসদদ্যশ্য মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে পঞ্চম্যাংতিথৌ (গোত্র নাম উল্লেখ করিয়া) সরস্বতী প্রীতিকামো গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্ব্বকং শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজন-কর্ম্মাহং করিষ্যে।' কুশির দ্রব্যাদি ঈশান কোনে মাটিতে ফেলিয়া দিবে এবং আতপ তণ্ডুল লইয়া 'ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশির উপর ছিটাইয়া দিবে এবং কুশি তুলিয়া ধুইয়া নিবে।

একটি সচন্দন ফুল লইয়া 'এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পুষ্পথালার উপরে দিবে। এক একটি সচন্দন-ফুল লইয়া 'এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ', 'এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ', 'এতে গন্ধে পুষ্পে আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ' 'এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ সরস্বতীদেব্যৈ নমঃ' অর্পণ করিবে। গঙ্গাজল হইলে আর জল সেচনের আবশ্যক হয় না। অন্যথায় 'ওঁ গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। ওঁ কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণিচ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি পূজাকালে ভবন্তীহ।' একটি সচন্দন ফুল লইয়া

'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধার পঙ্কজে কমলাসনায় নমঃ' মন্ত্রে নিজের আসনের উপর দিবে এবং দুই হাতে আসন স্পর্শ করিয়া 'ওঁ আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ, কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা, দেবিত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। সূর্য্যার্ঘ্য দান কর্ত্তব্য :—কুশিতে দুর্ব্বাক্ষত, রক্ত পুষ্প, চন্দন, তুলসীপত্র ও জল লইয়া 'বিষ্ণুরোঁ। মাঘেমাসি শুক্লপক্ষে পঞ্চম্যাম্তিথৌ (গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া) শ্রীসূর্য্য প্রীতিকামো নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণো ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিত্রে সুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে কাশ্যপগোত্রায় ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় এষোঽর্ঘ্য নমঃ।' মন্ত্রে অর্ঘ্য ভূমিতে প্রদান করিয়া করজোড়ে 'ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে! অনুকম্পায় মাং ভক্তং গৃহানার্ঘ্যং দিবাকর!!' এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবে

'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয় মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্॥'

ঘট স্থাপন ও গণেশাদির পূজা যথাবিধি কর্ত্তব্য।

শ্বেতসর্ষপ বা আতপ-তণ্ডুল লইয়া 'ওঁ অপসর্পন্তুতে ভূতা যে ভূতা ভূবিসংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে-নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।' এই মন্ত্রে চারিদিকে ছিটাইয়া দিয়া পূজাবিঘ্নকারী ভূতাপসারণ করিবে।

ষড়ঙ্গন্যাস – সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং (হৃদয়ায়) নমঃ,
সীং তর্জ্জনীভ্যাং (শিরসে) স্বাহা,
সূং মধ্যমাভ্যাং (শিখায়ৈ) বষট্,
সৈং অনামিকাভ্যাং (কবচায়) হুং,
সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং (নেত্রত্রয়ায়) বৌষট্,
সঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং (সর্ব্বাঙ্গায়) ফট্।

মূর্ত্তি থাকিলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পূজককে বেশ মনে রাখিতে হইবে যে আমরা মূর্ত্তি পূজক পৌত্তলিক নই, আমরা সেই প্রাণময় বা চিন্ময় দেবতাকেই অবলম্বনরূপে সম্মুখের ঘটে, পটে, শিলায়, কাষ্ঠে, জলে আহ্বান করিয়া পূজা করি, আসলে আমরা সেই সর্ব্বশক্তিশালী পরমাত্মারই পূজা করিয়া থাকি। তাই আমাদের পূজায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিশেষ পদ্ধতি বিদ্যমান। এবং এই জন্যই যুগে যুগে অসুরের দলে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন ও মন্দির ধ্বংস করিয়াও হিন্দুর পূজা এবং ধর্ম্মের অনুমাত্র নড় চড় করিতে সমর্থ হয় নাই, বা হইতেছে না। কেবল নিজেদের বর্ব্বরতা, হীনতা এবং হিংসা-প্রবণতার কলঙ্কর চিত্রই জগতে ইতিহাসের বক্ষে সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে। প্রাণ প্রতিষ্ঠাঃ—একটি পুষ্প দ্বারা প্রতিমার গণ্ডদ্বয় স্পর্শ করিয়া 'ওঁ আং হ্রীং ক্রোং হ্যং রং লং বং শং ষং সং হোং হ্রং সঃ শ্রীসরস্বত্যাঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং……হ্রংসঃ শ্রীসরস্বত্যাঃ জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং……হ্রংসঃ শ্রীসরস্বত্যাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং……হ্রংসঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।" পরে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া 'ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যম্, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বে-দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোঁপ্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু অস্যৈদেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।' এই মন্ত্রে মহাদেবীকে প্রতিমাতে স্থির করিবে। এখন দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যানের মন্ত্র—

'ওঁ তরুণ সকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতি শুভ্রকান্তিঃ।
কুচভর নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকর-কমলোদ্ভল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ।
সকল বিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥'

একটি সচন্দন ফুল লইয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যানের মূর্ত্তিটি চিন্তা ও দর্শন করিতে করিতে মন্ত্র পাঠ করিয়া 'সাহম্' বলিয়া মস্তকে ফুলটি ধারণ করিবে। পূজকও পূজ্য যে একাত্ম জীবাত্মা পরমাত্মা যে অভিন্ন, তার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ হিন্দুদের সকল পূজায় অহরহ ঘোষণা করিতেছে। ভিতরের খবর না জানাতেই যে-সে হিন্দুকে মূর্ত্তিপূজক বলিয়া অকারণ গালি দেয়—কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা ও ভ্রান্তি পূর্ণ! এখানে মানস পূজা করিয়া লইবে, ইহাই আসল পূজা। (১) জ্যোতির্ম্ময়ী সরস্বতীদেবীকে হৃদিকমলাসন দান করিয়া তাঁহাকে বসাইবে। (২) সহস্রার স্থিত অমৃত দ্বারা পাদ্যার্ঘ্য করিয়া দেবীর চরণদ্বয় ধুইয়া দিবে। (৩) মনঃরূপ অর্ঘ্য দিবে। (৪) পূর্ব্বোক্ত অমৃত দ্বারাই স্নানীয় ও আচমনীয় দিবে। (৫) আকাশতত্ত্বরূপ বস্ত্র দিবে। (৬) গন্ধতত্ত্বরূপ চন্দন দিবে। (৭) চিত্তপুষ্প দিবে। (৮) প্রাণধূপ তেজতত্ত্বরূপ দীপ দান করিবে।

(৯) সুধাসূধিরূপ নৈবেদ্য। (১০) অনাহত প্রণবধ্বনিরূপ বাদ্য। (১১) বায়ুতত্ত্বরূপ চামর ইত্যাদি মনে মনে সব সম্প্রদান করিবে। পুনরায় ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া যথেষ্ট ফুল, বেলপাতা, দুর্ব্বা, চন্দন, লইয়া আবার পূর্ব্বোক্ত ধ্যান মন্ত্রে দেবীকে সাক্ষাৎ উপস্থিত ভাবিয়া 'ওঁ এতানি গন্ধপুষ্পাণি ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ' বলিয়া অর্পণ করিবে এবং পত্র পুষ্পাদিদ্বারা দেবীর অঙ্গে সাজাইয়া দিয়া আবাহন মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

"ওঁ সরস্বতি দেবি! ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ; ইহতিষ্ঠ, ইহতিষ্ঠ; ইহাসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধাস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ"।

রত্নাসন লইয়া 'ওঁ এতৎ রত্নাসনং ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।' কুশিতে জল লইয়া 'ওঁ এতৎ পাদ্যং ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ'। কুশিতে দূর্ব্বাকত, পুষ্প, সচন্দন-তুলসী জল সহ লইয়া 'ওঁ এষঃ অর্ঘ্যঃ.....নমঃ'। জল লইয়া 'ওঁ ইদমাচমনীয়ং.....নমঃ'। 'ওঁ ইদং স্নানীয়ং..... নমঃ'। বস্ত্রালঙ্কার লইয়া 'ওঁ এতানি বস্ত্রালঙ্কারাণি.....নমঃ'। চন্দন লইয়া 'ওঁ এষঃ গন্ধঃ.....নমঃ'। পুষ্প লইয়া 'ওঁ এতৎ পুষ্পং.....নমঃ'। সচন্দন বিল্বপত্র লইয়া 'ওঁ এতৎ সচন্দন বিল্বদলং.....নমঃ'। ধূপ লইয়া 'ওঁ এষঃ ধূপঃ.....নমঃ'। দীপ দর্শন করাইয়া 'ওঁ এষঃ দীপঃ.....নমঃ।' বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইয়া ধূপ-দীপদ্বারা একটু আরতি করিয়া লইবে। পরে আচমনীয়, নৈবেদ্যাদিভোগ, পানীয়, পুনরাচমনীয়, তাম্বূল সব ভক্তিভাবে নিবেদন করিয়া নারায়ণ, লক্ষ্মী, লেখনী, মসীধার, পুস্তক, বীণা ইত্যাদির পূজাও গন্ধপুষ্প দ্বারা করিবে।

এখন 'ঐঁ' এই বীজমন্ত্র ১০৮, ১০০৮ বা তদূর্দ্ধ যথাশক্তি জপ এবং ১৬ সংখ্যায় পূরক, ৬৪ সংখ্যায় কুম্ভক ও ৩২ সংখ্যায় রেচক এই ভাবে প্রাণায়াম সমাপন করিবে। পরে সাধ্যমত 'ওঁ বাগ্দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ' এই সরস্বতী-গায়ত্রী জপ করিয়া 'ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি! ত্বৎ প্রসাদান্মহেশ্বরি!' এই মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে। 'ওঁ বদ বদ বাগ্বাদিনী স্বাহা' এই মন্ত্রে আহুতি দিয়া যথাবিধি হোম করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি :—"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এবচ স্বাহা। এষঃ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি মায়ের চরণে ভক্তির সহিত অর্পণ করিবে। পরে একএকবার পুষ্পাঞ্জলি লইয়া লেখণ্যৈ—মসীধারায়ৈ—পুস্তকেভ্যঃ নমঃ বলিয়া অঞ্জলি প্রদান করিবে।

প্রার্থনা :—'ওঁ যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ। ত্বাং পরিত্যজ্য সন্নিষ্ঠেত্তথা ভব বরপ্রদা। বেদাঃ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ। ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ। লক্ষ্মীর্মেধাধরা পুষ্টি র্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ। এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি!!'

প্রণাম—'ওঁ জয় জয় দেবী চরাচরসারে, কুচযুগ শোভিত মুকুতা হারে। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতি! ভারতি! দেবি! নমস্তে। ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে বিশ্বরূপে বিদ্যালক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে।

বাণীস্তোত্র—'যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেত-পদ্মাসনা। যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শুভ্রবস্ত্রপ্রিয়া। যা ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্কর প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদাবন্দিতা। সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা। সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী। মুরারি বল্লভা দেবী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।.....শ্বেতপদ্মাসনাদেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা। শ্বেতাম্বর-ধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা। শ্বেতাক্ষসূত্র-হস্তাচ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা। শ্বেতবীণাধরা শুক্লা শ্বেতালঙ্কার ভূষিতা। বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরর্চ্চিতা সুরমানবৈঃ। পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা। স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীং। যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে।.....

প্রণামান্তে ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে দেবীর নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা—

পূজান্তে দোষ ত্রুটির জন্য অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা :—তুলসীসহ হরীতকী কোশার জলে ধরিয়া 'অদ্য কৃতৈষ্বিন্

পূজাকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎ ন্যূনং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে।' মন্ত্রে একটু জল ঘটে দিবে। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ো দিবীবচক্ষু-রাততম্। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দশবার 'ওঁ বিষ্ণু' জপ করিবে।

বিসর্জ্জন :—"ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈবজানামি পূজনম্। বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি !!" ওঁ সরস্বতী-দেবি ক্ষমস্ব' মন্ত্রে ঘটে ও মূর্ত্তিতে জল ছিটাইয়া দিয়া পরে হস্ত দ্বারা ঘট ও মূর্ত্তি কিঞ্চিৎ নাড়িয়া দিবে এবং নির্ম্মাল্য পুষ্পপত্র লইয়া ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া তদুপরি 'ওঁ নির্ম্মাল্য-বাসিনৈ্য নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে। বাদ্যাদিসহ বিসর্জ্জনের মন্ত্র পাঠ করিবে—

'ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি! ভূম্যাং পর্ব্বত-বাসিনি!
ব্রহ্মযোনি সমুৎপন্নে! গচ্ছদেবি! মমান্তরম্।
ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি!
সম্বৎসর ব্যতীতেতু পুনরাগমনায় চ।'

শান্তি কর্ম্ম :—ওঁ সর্ব্ব রোগ:শান্তিঃ, সর্ব্বাপচ্ছান্তিঃ। ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতি গচ্ছতু। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

পূজা সমাপ্তির পর প্রথানুসারে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আম্রমুকুল চন্দন সহ ভক্ষণ করিবে :—

'ওঁ চূতপুষ্প-বসন্তাদৌ তাং পিবামি সচন্দনং।
রোগশোকবিনাশায় সুখসম্পদহেতবে।'

এবং প্রসাদাদি গ্রহণ করিয়া শীতবাস্তাদি আনন্দোৎসবের যথোচিত ব্যবস্থা করিবে। জয় শ্রীশ্রীসরস্বতী মাই কি জয়

নানা কথা

মাতৃ-মন্দিরের নূতন গ্রাহক—

পৌষ মাসে নিম্নলিখিত মাননীয়গণ মাতৃ-মন্দিরের নূতন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন—

(১) বিমলবালা চক্রবর্ত্তী—পুরী। বৈশাখ হইতে ১৩৩৩ চৈত্র।
(২) অমূল্যভূষণ ভট্টাচার্য্য—শ্রীহট্ট। অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৩৪ কার্ত্তিক
(৩) চারুশীলা ঘোষ—টালা। বৈশাখ হইতে ১৩৩৩ চৈত্র।
(৪) ফুলবাসিনী দেবী—শ্রীহট্ট। বৈশাখ হইতে ১৩৩৩ চৈত্র।
(৫) ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—হুগলী। পৌষ হইতে ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ।
(৬) প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার—বগুড়া। পৌষ হইতে ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ।
(৭) নীতা রায় চৌধুরী—কলিকাতা। পৌষ হইতে ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ।
(৮) সুবর্ণপ্রভা ঘোষাণী—শ্রীহট্ট। পৌষ হইতে ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ।
(৯) অবনচন্দ্র দাস—দিল্লী। বৈশাখ হইতে ১৩৩৩ চৈত্র।
(১০) নৃপেন্দ্রকুমার বসু—কার্ত্তিক হইতে ১৩৩৩ চৈত্র।
(১১) মাধবচন্দ্র মুখার্জ্জি—মানভূম। পৌষ হইতে ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ
(১২) সুরবালিনী দেবী—বীরভূম। কার্ত্তিক হইতে ১৩৩৩ চৈত্র।
(১৩) পান্নালাল ঘোষ—সিরিজগঞ্জ। মাঘ হইতে ১৩৩৪ পৌষ।
(১৪) পান্নালতা দেবী—পাবনা। পৌষ হইতে ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ।
(১৫) সুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল—কাঁচড়াপাড়া। বৈশাখ হইতে ১৩৩৩ চৈত্র
(১৬) সুধাংশুশেখর ভৌমিক—কলি। পৌষ হইতে ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ
(১৭) মিহেল্ সি, বি, মিত্র—বাবলাদ। মাঘ হইতে ১৩৩৪ পৌষ।
(১৮) মহাশীষ কে,এ,মল্লিক—জামসেদপুর। পৌষ হইতে ১৩৩৪ অগ্র:
(১৯) শীতলচন্দ্র বক্সী—বলোহর। বৈশাখ হইতে ১৩৩৩ চৈত্র।
(২০) আবুহেন বিশ্বাস—শিকারপুর। মাঘ হইতে ১৩৩৪ পৌষ।

রাঁচি নারী-সমিতি—

রাঁচি নারী-সমিতি বালিকাগণ দ্বারা "প্রহ্লাদ" নাটকের অভিনয় করিয়া স্থানীয় জনসাধারণ আনন্দবিধান করিয়াছিলেন। বাচ, গান, অভিনয় প্রভৃতি ব্যাপারগুলি আমাদের দেশে অনেকদিন হইতেই বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া আছে। জাতি যখন শক্তিহীন হয়, তখন বিষয়ও তাহার ভাবে মনে পরিণত হয়। তাই নারীর পক্ষে এ প্রকার আনন্দউৎসব করা আমাদের দেশের সাধারণে যেন সহজ করেন না, কিন্তু আমরা বলি—নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদে যারা পাইলে নারীর মন দিন দিন আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে। কাজেই আমরা নারীর নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের সমর্থন করি। নারী সরস্বতীরূপিণী; তাঁহার কণ্ঠের সঙ্গীত, তাঁহার হস্তের বীণার ঝঙ্কার মানুষের উপভোগ্য।

মহিলা-সভা—

গত ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে বর্ত্তমানের উপযোগী স্ত্রীশিক্ষার ধারা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মহিলাদের একটী বহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেডি অবলা বসু, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী শান্তা দেবী, মিসেস্ বি, এল, চৌধুরী, মিসেস লতিকা বসু, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, মিসেস্ পি, কে রায় প্রভৃতি মহিলাগণ স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। মাতৃ-মন্দিরের পক্ষ হইতে শ্রীমতী সুশীলা বক্সী নারীশিক্ষার ধারা বিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পুনায় নিখিল ভারত-মহিলা-কন্‌ফারেন্সে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া

সভার পক্ষের মতামত ব্যক্ত করেন। সকলেই বিশেষ ভাবে এই সভা আহূত হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শ্রীযুক্তা অতিকা রায় পুনার মহিলা-সভায় বাংলার পক্ষের প্রতিনিধিরূপে গমন প্রস্তাব হয়।

বাঙ্গলাভাষায় বিদেশীয় মহিলার কৃতিত্ব—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এম্-এ পরীক্ষায় মিস্ জে. হেলেন রোলান্ড নামী জনৈকা ইউরোপীয় মহিলা বাঙ্গলাভাষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গলাভাষা যে বিদেশিনী মহিলার নিকটে এত আদরণীয় হইয়াছে ইহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার মহিলা-সম্মিলনী—

গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার মহিলা-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন অকোলা নগরে সম্পাদিত হয়। শ্রীযুক্তা বিদ্যাগৌরী সেঠী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সম্মিলনীতে প্রায় একহাজার মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। সভানেত্রী একজন বিশিষ্টা দেশ-কর্ম্মী। তিনি বলেন, স্ত্রীশিক্ষা নারী-কল্যাণের মূল অবলম্বন। তিনি নারীশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করিবার জন্য সকলকে উত্তেজিত করেন। বাল্যবিবাহ এবং জাতিভেদ-প্রথার নিন্দা করিয়া উহাকেই হিন্দু-সমাজের অবোনতির প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি পল্লীসংস্কার ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন।

দান—

শ্রীযুক্তা সরযূবাই রাই নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ১১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মরিস কলেজ হইতে যে ছাত্র বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম হইবে তাহাকে এই টাকা হইতে একটী স্বর্ণ পদক প্রদান করা হইবে।

নিগৃহীতার আশ্রয় লাভ—

চট্টগ্রামের যশোমতীনামী মুসলমান কর্ত্তৃক অপহরণের বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। তাহাকে মুসলমানরা কত মাস যাবৎ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। আশ্চর্য্যের কথা এই, এতদুপলক্ষে তিনজন আসামী তিন বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হওয়ার পরেও বেলা জজের বিচারে মুক্তি পাইয়াছে। সে যাহাই হউক, অত্যন্ত সুখের বিষয় যে নারীরক্ষা-সমিতির চেষ্টার ফলে যশোমতীকন্যা স্বামীগৃহে স্থান পাইয়াছে, স্বামী পুত্র লইয়া সংসার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

যশোমতীকন্যাকে কোর্ট হইতে যখন স্বামীর উকীল রায় কালিকুমার দাস বাহাদুরের বাড়ীতে লইয়া আসা হয়, তখন সেখানে স্থানীয় গণ্যমান্য বহু ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্তা যশোমতীকে সাদরে গৃহে আনয়ন করেন। শ্রীযুক্তা কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকদের পায়ের ধূলা গ্রহণ করে। পরে যখন তাহার স্বামী হরমী সেইখানে উপস্থিত হইল, তখন যশোমতী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া স্বামীর পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া তাহার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। জনৈক ভদ্রলোক যশোমতী ও তাহার সন্তানকে কাপড়-জামা উপহার দিয়াছেন। মহিলারা তাহাকে উলুধ্বনি দিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন। উপস্থিত মহিলারা যশোমতীকে হাতখানে লইয়া কতো তোলাইয়াছেন, আর ভদ্রলোকেরা হরমীকে লইয়া কতো তুলিয়াছেন। এই উপলক্ষে এক ভোজের আয়োজন হয়, তাহাতে ভদ্রলোকেরা হরমীকে লইয়া আহার করিয়াছেন এবং যশোমতী তাহাদিগকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়াছে।

আর একটি নিগৃহীতার আশ্রয় লাভ—

চট্টগ্রামে বদরখিল গ্রাম হইতে সরলীবালা নামী একটী বিধবা নারীকে কোন দুর্ব্বৃত্ত অপহরণ করিয়া ব্রহ্মদেশের আকেয়াবে লইয়া যায়। দুর্ব্বৃত্ত সেখানে ধরা পড়ে। বিধবা নারী অসুস্থ হইয়া পুনঃ ফিরিতে ইচ্ছুক হইলেও তাহার দেবর তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। কিছুদিন হইল জনৈক কায়স্থ যুবকের সহিত বিধবার বিবাহ হইয়াছে।

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন, কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা ব্রাহ্মণ সভা হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিরূপে একটী সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন যে, নিগৃহীতা স্ত্রীলোক মাত্র গঙ্গাস্নান দ্বারাই পবিত্রীকৃত হইয়া পূর্ব্ব সমাজে স্থান পাইতে পারিবেন।

পুরাতন বস্ত্র ভিক্ষা—

১৭ নং এলগিন রোড কলিকাতা হইতে রেভারেণ্ড গোপালচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইতেছেন—কলিকাতার দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহের দীন, দুঃখী, অনাথ, বিধবা, পিতৃহীন শিশু ও অন্য আতুর দিগের ব্যবহারের জন্য কিছু পরিধান বস্ত্র ও শীতবস্ত্রের আবশ্যক। ইহাদের বন্ধুরূপে যদি কেহ বস্ত্র খরিদের জন্য কিছু টাকা বা নূতন-পুরাতন যাহা কিছু শীতবস্ত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে বড় উপকার হয়। ধর্ম্মিষ্ঠেরা সাহায্যের জন্য ধনশালী ব্যক্তিগণের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

আলুরক্ষার উপায়—

কানাডা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এগ্রিকালচার সরকারী স্কুলেটিনে পোক আলু রক্ষার নিম্নলিখিত উপায় প্রকাশ করিয়াছেন—

বাজারচলিত ব্যবসায়ীয় ফরমিউলিক এসিডে পরিপাক শুদ্ধ জল মিশা যে সলিউশন হইবে তাহাতে আলুগুলিকে ভিজাইয়া দশ ঘণ্টা রাখিয়া তাহার পর শুষ্ক করিয়া গুদামজাত করিলে আলু নষ্ট হইবে না।

ঐ একই সলিউসনে বরাবর আলু নিমজ্জিত করিলেও ইহার শক্তি বিকৃত হয় না বা কমিয়া যায় না। একটা আলু রাখিবার ঐরূপ সলিউসন করিয়া আলুকে নিমজ্জিত করিবার সুবিধা হইবে।

ব্যাপারিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে উপরোক্ত প্রথায় রক্ষিত আলু বাহিরের সঙ্গে অবিকল রহে। অধিকন্তু ১৮ মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে, যেন সদ্য জমী হইতে আলু তুলিয়া আনা হইয়াছে।

এইরূপে রক্ষিত আলুর বীজে গাছ হইবে না, কেবল খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

সটির পালো বা সটিফুড্—

শীতকাল সটি প্রস্তুতের সময়। সটির পালোর কথা আমরা একাধিকবার মাতৃ-মন্দিরে প্রকাশ করিয়াছি। ইহা বর্ত্তমানে শিশু ও রোগীর জন্য একটি উৎকৃষ্ট পথ্য রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গলায় অনেক পল্লীতে সটির গাছ জন্মে, কিন্তু বাঙ্গালীরা এখনও ইহা হইতে পালো প্রস্তুত করিতে জানেন না। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীর মেয়েরা সটির মূল হইতে নিজ হাতে সটি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। অনেক দরিদ্র পরিবার ইহা প্রস্তুত করাই বিক্রয় করিয়া সংসারের অর্থকষ্ট দূর করিয়া থাকেন।

এই সটিফুড্ সর্ব্বপ্রথমে ফুলবার বৈদ্য কার্ম্মেনীর ডাক্তার আণ্ডতোষ বসু আবিষ্কার করেন এবং ব্যবসায়ী সমাজে প্রচার করেন। বর্ত্তমানে ইহা কলিকাতা ষ্টকইট্ পাল এণ্ড কোং-প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ নানা রূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট ধন অর্জ্জন করিতেছেন।

রাণীর সম্মান—

রাজসাহীর অন্তর্গত পুঠিয়ার ধর্ম্মপরায়ণা রাণী হেমন্তকুমারী দেবী সম্প্রতি উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মাতৃমন্দিরে আমরা ইহার অনেক সৎ-কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি। ইহার এই যথাযোগ্য উপাধি লাভে আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি।

নারীরক্ষা-সমিতি—

কলিকাতার নারী-রক্ষা-সমিতি নির্য্যাতিতা নারীদের পক্ষ হইয়া অনেক কার্য্য করিতেছেন, নারী-নির্য্যাতন সম্বন্ধীয় অনেক মোকর্দ্দমা পরিচালন করিয়া অত্যাচারীদিগের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সমস্ত ব্যাপারে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইতেছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যাহা কিছু অর্থ দান করিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণকে আমরা আহ্বান করিতেছি। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীযুক্ত গোপচন্দ্র আঢ্যবর্ণী, কার্য্যাধ্যক্ষ—নারী-রক্ষা-সমিতি, ২০৮।১।৪ বর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাত্রবৃত্তি—

কিছুদিন পূর্ব্বে বড়লাট-পত্নী লেডি রোনাল্ডসের কলিকাতায় বেথুন স্কুলের পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব লেডি-প্রিন্সিপাল কলেজের হিন্দু ছাত্রীদিগের দ্বারা লাট-পত্নীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। লেডি-প্রিন্সিপাল ইংরাজ মহিলা, কাজেই তিনি হিন্দুর পূজা-পদ্ধতির একটা ভ্রমপূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। মানুষের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া অথবা মানুষ পূজা কোন ক্রমেই সমর্থন করা যাইতে পারে না।

শুদ্ধির সুফল—

জনৈক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণকে মুসলমান করার পর শুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মে পুনরানয়ন করা হইয়াছে। অদ্ভুত সুখের বিষয়, গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে মথুরা জেলার খাদগাঁও নিবাসী রোশন নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই রমণীকে হিন্দুমতে বিবাহ করিয়াছেন। ইহা খাঁটী ব্রাহ্মণদের শুদ্ধি আন্দোলনেরই সুফল।

দুইটি পৈশাচিকতা—

পাঞ্জাবে মুরিদাবাদ একটি যুবতী স্ত্রীলোক তাহার ষাটবৎসর বয়স্ক স্বামীকে হত্যা করিয়াছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে ঐ যুবতীর সঙ্গে বিলম্ব একটি পৈশাচিকতা ছিল। ঘটনা পুলিসের হাতে গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশের দিনবারা নামক স্থানে একটি যুবতী বিধবার অসামাজিক ভাবে একটি সন্তান হয়। সন্তানটি মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; কিন্তু সমাজের পৈশাচিক লীলায় কয়েকদিন পরেই বিকটরূপ নদীর জলে শিশুটির মৃতদেহ পাওয়া যায়। স্থানীয় সেসন জজের বিচারে বিধবার যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়। পরে রেঙ্গুনের বিচারপতি সার বেঞ্জামিন হিন্ডের এজলাসে আপীল করায় বিচারপতি বিধবাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। আহা, এই মুক্তিই কি তাহার মুক্তি! ইহা অপেক্ষা যাবজ্জীবন কারাবাসে তাহার ভাল ছিল। বিধবা এখন কি করিয়া সমাজে মুখ দেখাইবে, সমাজে তাহার স্থানই বা কোথায়?

আমরা দুইটি পৈশাচিকতার উল্লেখ করিলাম, দুঃখের বিষয় অপরাধিনীরাই কি ইহার জন্য দায়ী? ইহার জন্য সমাজ, পাপের ধারাই করিতেছেন, পাপের কি কোন ধারা করিবেন না?

চারি মাসের জননী—

সম্প্রতি একটি আশ্চর্য্য বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। গয়া হাঁসপাতালে চারি মাসের একটি শিশু কন্যাকে চিকিৎসার্থে আনা হয়। শিশুকন্যার তলপেটে ফোড়া হইয়াছে বলিয়া সার্জ্জেন অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া দেখেন যে, তাহার গর্ভে একটি ক্ষুদ্র শিশু রহিয়াছে। গর্ভস্থিত এই শিশুটির দুখানি হাত ও একটি পা ব্যতীত সকল অঙ্গই জন্মিয়াছিল। এই অদ্ভুত ক্ষুদ্র শিশুর মৃতদেহ একটি কাচপাত্রে স্পিরিটের মধ্যে রাখা হইয়াছে। হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা প্রদর্শনীরূপে রক্ষা করিয়া এই আশা বিলাতে প্রদর্শনী লইতেছেন। শত শত ব্যক্তি ইহা প্রদর্শনী দিয়াও দেখিয়া যাইতেছে; চারি মাস বয়স্কা জননীটি শুশ্রূষা ও চিকিৎসার গুণে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ভগবানের বিচিত্র লীলা!

কলিকাতায় বিধবা বিবাহ—

গত ২৩এ ডিসেম্বর কলিকাতা আর্য্যসমাজ মন্দিরে বৈদিক প্রথা অনুসারে টেলিগ্রাফ বিভাগের ডেপুটি চীফ এঞ্জিনীয়ারের আফিসের

বেলা চারিটায় শ্রীযুত অনুরূপচন্দ্র রায়, বি-এল সহিত সরলাবালা দেবী নাম্নী এক বালবিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র এবং পাত্রী উভয়েই সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলোদ্ভব। পাত্রের বিবাহ হুগলী জিলায় বলদরা গ্রামে এবং পাত্রীর বিবাহ বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ভেমিয়া গ্রামে। বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভার উদ্যোগে এই বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। প্রায় দুই হাজার লোক এই বিবাহ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা—

গত ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য আবদুল রশিদ নামক জনৈক মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহার কৃত্য ধরম সিংহও গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। পুলিশ হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

স্বামীজির বয়স হইয়াছিল একাত্তর বৎসর। সম্প্রতি তিনি নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। হত্যার দিন অপরাহ্নে আবদুল রশিদ স্বামীজির সহিত ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাহে। স্বামীজির স্বাস্থ্যবান খানসামা ধরম সিং বলে যে, তিনি অসুস্থ, অন্যদিন আলোচনা করিবেন। অতঃপর রশিদ একটু জল পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ধরম সিং জল আনিয়া দেয়। জলপান শেষ হইলে ধরম সিং সেলাম্‌টি রাখিতে গেলে আবদুল রশিদ স্বামীজিকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি গুলি মারে। স্বামীজির তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ভৃত্য ধরম সিংহ দৌড়াইয়া আসিয়া হত্যাকারীকে ধরিয়া ফেলে, তখন রশিদ তাহাকেও একটি গুলি মারে। ইতিমধ্যে পুলিশ ও লোকজন আসিয়া রশিদকে ধরিয়া ফেলে।

হিন্দু সমাজ সংগঠনে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রভূত কার্য্য ছিল। বর্ত্তমান-শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে চিনিয়াছিলাম। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র অনুন্নত শ্রেণীর লোক তাঁহার প্রবর্ত্তিত পবিত্র শুদ্ধি আন্দোলনের ভিতর দিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল লালা মুন্সিরাম এবং তিনি প্রথমজীবনে জলন্ধরের একজন বিখ্যাত উকিল ছিলেন। আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের মতবাদে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তিনি আর্য্যসমাজে যোগদান করিয়া হিন্দু সংগঠনে প্রবৃত্ত হন। সর্ব্বপ্রকারে হিন্দু সমাজকে পরিপুষ্ট করাই তাঁহার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপ মহান্ নেতাকে হারাইয়া হিন্দুসমাজ বিশেষভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

হত্যাকারী প্রকাশ করিয়াছে—মুসলমান ধর্ম্মের শত্রুকে বিনাশ করিয়া সে তাহার জাতীয় ধর্ম্ম-পথ পরিষ্কার করিয়াছে। অধিকন্তু এই কুকার্য্যের দ্বারা সে স্বর্গে গমন করিবার দাবীও রাখে। প্রকাশ, সে তাহার উদ্দেশ্য সাধনার্থে কাবুল হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ডে সমগ্র দেশ স্তম্ভিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান নেতাগণও এই হত্যার জন্য হত্যাকারীর নিন্দা এবং স্বামীজির জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের এই অকাল-মৃত্যুতে হিন্দুজাতির তথা সারা ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইবার নয়। হিন্দুর কর্ত্তব্য, সংঘবদ্ধভাবে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যকে অগ্রসর করিয়া তোলা।

নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভা—

গত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর আসামের গৌহাটী সহরে নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার একচল্লিশ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া-গিয়াছে। বাঙ্গালার জনপ্রিয় নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভা-পতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন আসামের সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি দেশপূজ্য নেতৃগণ এই মহাসভার যোগদান করিয়া দেশ কল্যাণ বিষয়ক প্রস্তাবাদির আলোচনা করিয়া ছিলেন। এই মহাসভায় প্রতিনিধি ও দর্শক অনুমান দশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত প্রতিনিধির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল—

বঙ্গদেশ ৮০০, যুক্ত প্রদেশ ৪০০, বিহার ৩০০, মাদ্রাজ ১০০, তামিল নাড়ু ১৫০, অন্ধ্র ১০০, মহারাষ্ট্র ১০০, আসাম ৮০, কেরল ৫০, কর্ণাটক ৫০, উৎকল ৫০, মধ্যপ্রদেশ হিন্দুস্থানী ৫০, মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র ৩০, পাঞ্জাব ৪০, বোম্বাই ২০, সিন্ধু ১০, সিন্ধু ১০, ব্রহ্মদেশ ১০। বহুসংখ্যক মহিলা-প্রতিনিধিও সভায় যোগদান করিয়া দেশের কথায় আলোচনা করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে আসামের অতীত গৌরব, খাসিয়া চেরকা ও মেচের বর্ত্তমান সমস্যা প্রভৃতির আলোচনা করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বর্দ্ধনা করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের অভিভাষণও বিশেষ চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অভিভাষণের ভিতর দিয়া সকলকে ক্ষুদ্র মতভেদ ভুলিয়া নিজ দেশের মুক্তি সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুদ্ধংদেহি ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন।

এই মহাসভায় স্বামী-শ্রদ্ধানন্দের মর্ম্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডে শোক প্রকাশ, স্বায়ত্তশাসন সভার কার্য্য পদ্ধতি, আফ্রিকা ফেরিয়া প্রবাসী ভারতীয়দিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার, সাম্প্রদায়িক-সমস্যা এবং দেশের গঠনমূলক কার্য্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া সকলকে উহার সম্মান রক্ষার্থে অনুরোধ করেন।

ঢাকা- [illegible]

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৪র্থ বর্ষ | চৈত্র—১৩৩৩ | ১২শ সংখ্যা

চৈত্র

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

চৈতের উদাসী হাওয়া,
নয় শুধু গান গাওয়া
নয় শুধু ফুলের বাসর,
ঝরে পড়ে জীর্ণ পাতা,
ধরণীর বুকে পাতা
বিরাগের বিদায় আসর!

আনে সে কুসুম ফাগ,
শিমুলের রক্ত রাগ,
অগ্নিবর্ণ অশোক পলাশ,
মালতীর মধু গন্ধ,
মুকুলের মধু ছন্দ
জীবনের নব অভিলাষ!

যায় সে উড়ায়ে ধূলি,
ঝরিবার ঝড় তুলি,
ভেঙে দিয়ে বিহগ কূজন,
যে গান বুকের মাঝে,
জাগিয়া দলিতে বাজে,
রুদ্র রাগে তাহারে ভুলায়!

সন্ন্যাসের মন্ত্র আনে,
টানে সে পথের পানে
ভৈরবের পিণাক গুনায়,
কুলদোল সাঙ্গ করি
ভস্মরাগে অঙ্গ ভরি,
চিত্ত ভরে নব চেতনায়।

নারী-শিল্পের ধারা

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

"শিল্প কর্ম্ম" এই বিষয়টি যেমন হবে অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা, তেমন তার সঙ্গে এটি আরও হবে দেশের সেবা। এ ছাড়া শুধু ঘরের ব্যবহারের জন্য যে শিল্পকর্ম্ম সেটি খুব বড় বিষয় বলে এখানে আমরা মনে করব না। আর সে একটি স্বতন্ত্র বিষয়।

যে শিল্পে অর্থ উপার্জ্জন হবে তার সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে দেশের আর আর লোকের অর্থাৎ ক্রেতাদের। কাজেই এটিকে যদি আমরা কেবল আমাদের অর্থোপার্জ্জনের পন্থা মাত্র বলে মনে করি তবে কাজটি আমাদের অতি ছোট হয়ে পড়ে। আর ঐ কাজটিকেই যদি আমরা আমাদের অর্থোপার্জ্জন এবং দেশকে দ্রব্য সরবরাহ রূপ দেশের কর্ম্ম বলে মনে করতে পারি তবে ঐ কাজটিই আমাদের একটি বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

কোন কুম্ভকার যদি মনে করে, হাঁড়ী কলসী গড়ব, বেচে পয়সা হবে, আমার সংসার চলবে—শুধু এই আপন নিয়েই যদি তার বিষয় হয়, তবে—অতি ক্ষুদ্র গণ্ডি নিয়েই সেটা হল; তখন সে তার সংকীর্ণ বুদ্ধিতে যা তা করে জিনিসটি গড়বে। গৃহস্থের ঘরে গিয়ে বেশী দিন যাতে টেকে সেদিকে তার মন চলবে না—এমন কি একটি ছিদ্র পাত্রকেও কাদার প্রলেপ দিয়ে গ্রাহকের চোখে ধুলো দিতে তার কোন বাধা থাকবে না। তাই শিল্পীর চিন্তা যদি শুধু তার আপাতঃ অর্থোপার্জ্জনের বিধান নিয়েই হয় তবে তাতে ভবিষ্যতে তারও মঙ্গল হবে না, দেশেরও না। তাই আমাদের সব চেয়ে বেশী মন দিতে হবে, দেশের সাধারণের কল্যাণকর শিল্পের দিকে, দেশের সাধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্য উৎপন্নের দিকে। এই রকম শিল্পই দেশে অধিকতর ব্যাপক হয়।

এখন মেয়েদের শিল্পকর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা এই যে, এর উৎপন্ন দ্রব্যগুলি হওয়া চাই খুব সহজ শিক্ষা এবং সহজ শ্রমের মধ্য দিয়ে। এতে মূল্যবান্ যন্ত্রপাতির ব্যবহার খুব কমই থাকবে, আর বলা বাহুল্য এর কার্য্যক্ষেত্র হবে অন্তঃপুরে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, উৎপন্ন দ্রব্যগুলি হবে পল্লীর সাধারণ গৃহস্থের অনিবার্য্য ব্যবহারের সমজীয়। এই কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রেখে মেয়েরা শিল্পে মনোযোগ দিলে তা অবশ্যই সফল হবে, সার্থক হবে।

দেশের প্রয়োজনের দিক দিয়েই শিল্পের সৃষ্টি হয়ে শিল্পের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে। অনেক বাহুল্য বিলাস-দ্রব্য প্রস্তুত ক'রে যে শিল্পের সৃষ্টি হয় তাতে অনেক সময় দেশের কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণ করে তোলে। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে থেকে আমাদের দেশে মেয়েদের স্কুল-কলেজের ভিতর দিয়ে যে শিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল, সেটা ছিল সম্পূর্ণ বিলাতের আমদানী। যেমন কার্পেট বোনা, লেশ বোনা, উলের কম্ফর্টার ও মোজা বোনা প্রভৃতি। কিন্তু সেটা আমাদের দেশের কোন কাজেই আসে নি, বরং এই দরিদ্রের দেশে বিলাসিতার প্রশ্রয় দিয়ে কিছু অনিষ্টই করেছে। তার পর বর্ত্তমানে সহরে সহরে যে দু-একটা নারী-প্রতিষ্ঠান হয়েছে তার ভিতর দিয়েই আগেকার ত্রুটিটা ধরা পড়েছে। কিন্তু তথাপি সেই অনাবশ্যক শিল্পের বাহুল্যই এর ভিতর দিয়েও ফুটে উঠছে। বর্ত্তমানের উপযোগী শিল্পের বিশেষ কোন ধারা এখনও এই প্রতিষ্ঠানগুলি পায় নি।

এর একটা কারণ হচ্ছে এই, যে সকল নেতা এই নারী-শিল্পের পরিচালনের ভার নিয়েছেন, তাঁরা বিদ্যাবুদ্ধিতে খুব উন্নত হলেও মেয়েদের আবশ্যক অর্থকরী শিল্প সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করেন নি। আরও একটা কথা এই যে, এঁদের জীবনের ধারা পল্লীর সাধারণের অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র ধরণের। এই জন্য যে সকল শিল্প দ্রব্য তাঁহারা ব্যবহারিক জীবনে ভোগ করে থাকেন সেই সকল শিল্পসম্বন্ধীয় শিক্ষাই মহিলা শিল্প-প্রতিষ্ঠান গুলিতে প্রবর্ত্তিত করেছেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত চরকা এবং খদ্দর তাঁতকে এই কলকারখানার যুগে পূর্ব্বে আমি বর্ত্তমানের উপযোগী বলে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিছুদিন পর আমার ইউরোপ-ভ্রমণের ভিতর দিয়ে সেখানকার মেয়েদের শিল্প সম্বন্ধে দেখা

শুনার সুযোগ হয়। ঐ সময় আয়র্লণ্ডের পল্লীতে ঘুরে ঘুরে যে সব কুটির-শিল্প দেখেছি তার মধ্যে হাতের তাঁতে বস্ত্র বয়ন কার্য্যই দেখলাম মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ। ইংলণ্ডের মত অত উন্নত প্রণালীর কলকারখানার মধ্যেও দরিদ্র আয়র্লণ্ড মেয়েদের মধ্যে বয়নশিল্পে মনোযোগী হয়ে দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে ইংলণ্ডকেই তার যথাসর্ব্বস্ব দিতে হ'ত। আয়র্লণ্ডের মেয়েদের কাজ দেখে আমি মহাত্মার চরকা ও হাতের তাঁতের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাসপরায়ণ হয়েছি।

এইবার আমি আমার দেশের মা-বোনদিগকে একটু দুঃখের নিবেদন জানাতে চাই যে, দেশের এই সুতাকাটা এবং বয়নশিল্পের অত্যন্ত আবশ্যকতা সত্ত্বেও এটা তাঁরা গ্রহণ করছেন না। তাঁদের যে কাজ করবার শক্তি নাই, এ কথা বলতে পারব না। বিলাতী শেলাইয়ের কলে তাঁরা যে সকল ব্যবহারিক পরিচ্ছদ তৈরী করছেন তাতে তো তাঁদের কম কৃতিত্ব দেখি না। এর কারণে বুঝেছি যে, এই শেলাইয়ের কাজটা তাঁদের বেশ ভাল লেগেছে। কিন্তু তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, এটি 'প্রেয়' হলেও চরকা কাটা তাঁত বোনা যে 'শ্রেয়' কাজটি, তাই এখন গ্রহণ করতে হবে।

মহিলা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধায়কগণকে বিশেষ করে বুঝতে হবে যে,মেয়েদের শিল্প-শিক্ষার জন্য সাবেকী প্রথা রক্ষা করে শিক্ষা বিষয়ে পুরুষ-শিক্ষকের সংস্রব থেকে দূরে রেখে চলবে না। আমি নিজে একজন শিল্পী, আমার উদ্ভাবিত শিল্পকর্ম্মটি আমাদের পরিবারে মেয়েদের ভিতরে শিক্ষা দিয়ে তাঁদের দ্বারা প্রভূত ফল পেয়েছি। দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠান গুলির সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু চিন্তা করি এবং মাতৃ-মন্দিরের ভিতর দিয়ে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করে থাকি। কলিকতার বিশেষ কয়েকটি মহিলা প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার যতটুকু সম্বন্ধ আছে তাহার ফলেই আমি নারী-শিল্পের এই অসুবিধাগুলি অনুভব করিয়াছি। মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন উপযুক্ত পুরুষ-শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং শিক্ষিত শিল্পীদের দ্বারা মাঝে মাঝে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। এইরূপ বিভিন্নমুখী সাহায্যের ফলে কালে আমাদের দেশের নারী-শিল্প একটি সত্য ধারা পেয়ে উঠবে।

আগামী বর্ষের সুসংবাদ

আগামী বৈশাখে মাতৃ-মন্দির পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিবে এবং ইহার আকার বড় করিয়া পত্রসংখ্যা দেড় গুণ বৃদ্ধি করা হইবে। ফলতঃ বিষয়-গৌরবে, ছবিতে ও বাহ্যিক সৌষ্ঠবে ইহাকে একখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় পরিণত করা হইবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য হইবে পাঁচ আনা; বার্ষিক মূল্য তিন টাকা মাত্র।

খেয়ার শেষে

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(১১)

উমার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র শৈলবালা পিত্রালয় হইতে চলিয়া আসিল। প্রকৃতপক্ষে নেহেরের মত উচ্চকণ্ঠে কাঁদিবার একজন লোক হইল; কিন্তু শৈলবালা আসাতেও অন্তঃপুর হইতে যে রোদনরোল উঠিয়া আকাশটাকে ভরাইয়া ফেলিল না ইহাতে পাড়ার মেয়েরা বিস্মিত হইল বড় কম নয়! অনেকেই স্পষ্ট বলিল "কাঁদবেই বা কেন বাছা, যাওড়ি বই তো নয়। নিজের ছেলে—তাই এস না গা, এতো ভাইপো-বউ।"

শৈলবালা ইহার গলা জড়াইয়া ধরিল, নিঃশব্দে উভয়ের চোখের জল মিলিয়া এক হইয়া গেল। অনন্তবাবু অন্তঃপুরে আসিতেছিলেন, দূর হইতে এই শোকের জীবন্ত দৃশ্য দেখিয়া তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, সেইখানেই থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটীও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিতেছিল, তাই তাহা লুকাইবার জন্যই তিনি আস্তে আস্তে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে শৈলবালার দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল; সে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে যথাসম্ভব সরল করিয়া বলিল "আসুন বাবা, ফিরে যাচ্ছেন কেন?"

মুখখানা অন্যদিকে ফিরাইয়া চোখের জল সামলাইয়া অনন্তবাবু অগ্রসর হইয়া আসিলেন। শৈল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল "আপনি বড় রোগা হয়ে গেছেন বাবা।"

অনন্তবাবু একটু হাসিয়া নিজের দেহের পানে চাহিয়া বলিলেন "কোথায় রোগা হয়েছি মা? আমি দেখছি আমার দেহ দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না।"

বাস্তবিকই তিনি রোগা হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার উদরের স্ফীতি একেবারে কমিয়া গিয়াছিল; এখন তাঁহাকে দেখিলে সাধারণ মানুষ বলিয়াই বোধ হয়।

শৈল যাইবার সময়ে যাহা দেখিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। এ সংসারের মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র বস্তুটিও যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

নিজের স্বাস্থ্যের দিকে অনন্তবাবুর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, সামান্য মাথাধরাটাকেও তিনি সামান্য বলিয়া কখনও উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। সময়ে অসময়ে দেহের ধারুণ স্ফীততা সত্ত্বেও তিনি দেহের পানে তাকাইয়া বড় রোগা হইয়া যাইতেছেন বলিয়া আপশোষ করিতেন।

সেই স্বাস্থ্যের প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি তাঁহার দূর হইয়া গিয়াছে, নিজের দেহটাকে অসহ্য ভার বলিয়া এখন তিনি অনুভব করিতেছেন। উমার পশ্চাদনুসরণ করিবার জন্য প্রাণটা তাঁহার ছটফট করিতেছে। কাল উমার দেহ বহনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আর প্রবেশ করেন নাই। আজ শৈলও আসিয়াছে, নিজেরও একটা দরকার পড়িয়াছে তাই তিনি অন্তঃপুরে আসিয়াছেন।

তাঁহার বিমর্ষ গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া শৈলর চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল, সামলাইয়া লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুরপোর খবর পেয়েছেন বাবা?"

অনন্তবাবুর মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল, নিজের রাগত ভাবটাকে প্রশমিত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত ক্রোধে বলিলেন "আর সে পাজীটার কথা আমার কাছে বলো না বউমা। আমি মনে করছি আমার ছেলে ছিল—কিন্তু অনেককাল আগে সে মারা গেছে। আমি তার বাপ হয়ে তার শ্রাদ্ধ করে ফেলেছি।"

"অমন কথা মুখেও আনবেন না বাবা, সে—"

আবেগ ভরা স্বরে অনন্তবাবু বলিলেন "বলব না? মনে

করে দেখ দেখি বউমা—সে কি আমার ছেলের মত কোনও কাজ করলে? যাকে উপলক্ষ করে আমি নির্দ্দোষ উমাকে কত রকমেই না নির্য্যাতন করেছি, সেই ছেলের এই ব্যবহার? যে ছেলের জন্ম আমি সুখী হতে পারলুম না, উমা সুখী হতে পারলে না—সে—না থাক সে কথা। দুর্ত্তাগিনী, আহা মরবার সময়েও সেই ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে চলে গেল। না বউমা, না আমার ছেলে নেই, আমার ছেলে মরে গেছে।"

নিদারুণ যন্ত্রণায় পিতৃহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তিনি দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া শৈলও ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল, কি বলিবে, কি বলিয়া এ দুঃখে সে সান্ত্বনা দিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

অনেকক্ষণ পরে অনন্তবাবু মুখ তুলিলেন, "থাক সে সব কথা বউমা, অনর্থক কেন আর অতীত কথা তুলে নিজেও কষ্ট পাই, তোমাকেও কষ্ট দেই? এখন আমি একটা কথা বলতে এসেছি শোন, তোমার সঙ্গে ভিন্ন সে বিষয়ে পরামর্শ করব এমন কেউ আর নেই।"

"বলুন—"

অনন্তবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "আমার সকল সম্পত্তি, জমিদারী, সব আমি বউমার নামে লিখে দেব, তাকে একটা পয়সাও দেব না; তোমার এতে মত কি বল তো মা?"

শৈল স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল "আপনিই এ সব বিষয় ঠিক করুন বাবা, আমি কি বলব?"

অনন্তবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন "না, তা বললে হবে না মা, তোমার মত কি তাই বল।"

শৈল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তা কেমন করে হবে বাবা?"

অনন্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন হবে না তা বল।"

শৈল বলিল "কারণ কিছুই নেই, আবার ধরতে গেলে সবই আছে। আমার মত যদি নিতে চান, আমি বলছি কাজটা ভারি অন্যায় হবে। ঠাকুরপো ছেলেমানুষ, এ বয়সে অমন ছেলেমানুষী অনেক লোকে করে থাকে, কিন্তু সেই ছেলেমানুষী দেখে কোন বাপে তো ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেন না। ঠাকুরপো আবার ফিরে আসবে বাবা, নিজের দোষ বুঝতে পারলে সকল ছেলেমানুষী ছেড়ে সে আবার ফিরে আসবে। আপনি এখনই যদি আপনার সকল বিষয়-সম্পত্তি ইভার নামে লিখে দিয়ে যান তাতে সে আরও রেগে উঠবে। ইভাকে সে মোটেই দেখতে পারে না; যাও আশা আছে কালে সে ইভাকে একটু স্নেহ করতে পারবে, ইভাকে আপনি যদি বিষয় দিয়ে যান, সে হয়তো কোন কালেই আর ফিরে আসবে না।"

একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অনন্তবাবু বলিলেন "সেই ভাল মা, তাইতো আমি চাই, সে যেন আর না ফিরে আসে। তুমি মনে করছ আমি এ কথা মুখেই বলছি কিন্তু না, এ আমার অন্তরের কথা; শুধু ছেলের পরেই নয় মা, কে জানে কেন—সারা জগৎটার পরেই আমার এমনি একটা বিরক্তি ধরে গেছে। আমি কেন যে ইভার নামে সব লেখাপড়া করে দিয়ে যাচ্ছি তা তুমি বুঝতে পারছ না তাই এই সব কথাগুলো বলে যাচ্ছ। মানুষের জীবন মরণের কথা কেউ কি বলতে পারে মা? আজ হঠাৎ যদি আমি মরে যাই, কাল এসে সে জমীদার হয়ে বসবে, সবই তার হবে, তখন যদি সে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে কেউ তাকে আটক করতে পারবে কি? এই যে বোবা মেয়েটীকে আমি নিয়ে এসেছি, একে সে দেখ করতে পারে নি, কোনও কালে পারবে যে তাও বোধ হয় না। তবু—তবু বলে বলছি—সম্ভব হতে পারে যদি ইভার নামে সব থাকে—বাধ্য হয়ে, টাকার লোভে যদি সে ইভার দিকে আপনাকে এগিয়ে দেয়। নচেৎ—তুমি কি ভাবছ মা, জমিদার হয়ে বসলে সে ইভাকে এখানে থাকতে দেবে? নিজের নিষ্কণ্টক জীবন উপভোগ করবার জন্যে সে পাষণ্ড এই দুর্ত্তাগিনী মেয়েটীকে পথে দূর করে তাড়িয়ে দিতেও ছাড়বে না—এ আমি ঠিক বলে রাখছি। আর তুমিই কি তখন থাকতে পারবে এখানে তার সেই সব ব্যভিচার সহ্য? আমার পবিত্র ভিটে সে কলঙ্কিত করে তুলবে, আমার বহুকালের এই কষ্টোপার্জ্জিত ধনরাশি দুই হাতে সে তার বিলাসিতায় ব্যয় করবে—এ সব কল্পনাও যে আমার একেবারে অসহ্য মা। আমি না ভেবে কিছু করি নে মা। অনেক দিন হতেই এ ভাবনা ভাবছি, কিছু করে উঠতে পারি নি,

কিছু কাল হতে আজ পর্য্যন্ত গভীর করে ভেবে কাজ করে ফেলেছি। সেও দেখুক, যে বাপমায়ের স্নেহ-ভালবাসাকে ঘৃণাভরে পথে ছড়িয়ে গেছে সে—সেই পথে পড়ে থাকা স্নেহ-ভালবাসা একটী বোবা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে তাকে রত্নসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।"

শৈল স্থিরকণ্ঠে বলিল "আপনি তো সবই করে ফেলেছেন বাবা, তবে আর আমাকে কেন?"

অনন্তবাবু পকেট হইতে একখানি এনভেলাপ বাহির করিয়া শৈলর হাতে দিয়া বলিলেন "এর মধ্যে আমার উইল আছে, পড়। আমার যথাসর্ব্বস্ব সব বউমার, আমার অবর্ত্তমানে বউমাই সকল বিষয়ের অধিকারিণী, অমিয়র এতে আর কোনও দাবী দাওয়া রইল না। তাকে আমি স্পষ্ট ত্যাজ্যপুত্র বলে উল্লেখ করেছি।"

শৈল পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া বিষণ্ণমুখে বলিল "তাকে একটী পয়সাও দিলেন না বাবা?"

অনন্তবাবু এনভেলাপের মধ্যে পত্র পুরিয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে গম্ভীর ভাবে বলিলেন "একটী পাইও নয়।"

(২০)

অমিয় যখন টেলিগ্রামখানা পাইল তাহার মাথায় তখন লক্ষ বজ্র ভাঙ্গিয়া উঠিল, দুই হাতে মাথাটাকে টিপিয়া ধরিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

কুমুদিনী আজ মাসখানেক হইল পিত্রালয়ে গিয়াছেন, পরেশবাবুও সেদিন কুমুদিনীর অসুখ শুনিয়া অমিয়কে বাড়ীর ভার দিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছেন।

অনেককাল সে পিতামাতার কোনও সংবাদাদি পায় নাই। রোষের বশে যে পত্রখানা সে পিতাকে লিখিয়া ফেলিয়াছিল সেই পত্রখানার কথা ভাবিয়া কিছুতেই সে আর শান্তি পায় নাই। সেই পত্রের কথা ভাবিয়াই সে আর একখানি পত্র লিখিতেও পারে নাই।

পিতামাতা কি বিশ্বাস করিবেন তাহাকে, তাঁহারা কি জানিবেন যে, সে সেই অমিয়ই আছে, খেয়ালের বশে রাগের মাথায় পিতার পত্রের উত্তরে কড়া পত্রখানা লিখিয়া সে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, এখন তাহার হৃদয়ই ক্ষমার জন্য, একটু সান্ত্বনা লাভের আশায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। হায় রে, অভাগা সে, জীবনে সে পাইয়াছিল প্রচুর কিন্তু রাখিতে তো কিছুই পারিল না, একে একে সবই যে হারাইয়া ফেলিতেছে। যে হৃদয়টা শুধু তাহারই ছিল, যাহার উপর আজও সে নির্ভর করিত, জানিত শত দোষ করিলেও সেখানে মার্জ্জনা পাওয়া নিশ্চিত, আজ সেই অনন্ত স্নেহ পরিপূর্ণ মাতৃ-হৃদয়খানি তুমিও নির্দ্দয় হস্তে কাড়িয়া লইতেছ, প্রভু?

অমিয় দুই হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুজল ফেলিতে লাগিল। হৃদয়াকাশে সঞ্চিত নিকষকাল গাঢ় মেঘ এই বারিবর্ষণের ফলে পরিষ্কার হইয়া গেল।

এতক্ষণ মা কি বাঁচিয়া আছেন, এখনও কি তিনি এই চির অপরাধী দুর্ব্বিনীত পুত্রের আগমন পথে চাহিয়া চোখের জল ফেলিতেছেন? ভগবান, চেতনা রাখো, ওগো, চেতনা রাখো, যে পর্য্যন্ত সে বাড়ী গিয়া মায়ের পায়ের তলে পড়িয়া ক্ষমা না চাহিতে পারে সে পর্য্যন্ত তাহার চেতনা রাখো, তাহাকে জড়পদার্থে পরিণত করিও না।

তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া গোটাকতক টাকা মণিব্যাগে ভরিয়া সেই কাপড়েই বাড়ী যাইবার জন্য সে প্রস্তুত হইল। ঠাকুর চাকরকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

ট্রেনে উঠিবার সময় তাহার জ্ঞান মোটেই ছিল না, যখন ট্রেন চলিল তখন তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বাতায়ন-পথে গগন পানে চাহিল।

অনেক আশা লইয়া আজ দেড় বৎসর পরে সে দেশে যাইতেছে। মায়ের পায়ে সে পড়িবে, মায়ের সেবা করিবে, মাকে মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিবে। কিন্তু সে সুযোগ যদি না হয়, তাহার পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই যদি মা চলিয়া যান?

তাই কি হইতে পারে? অমিয়র মন অত্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সে তাহা আবার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ কখনই হইতে পারিবে না, তাহার ক্ষমা চাওয়ার আগে মায়ের চলিয়া যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

জোর করিয়া এই কথাটা বার বার সে ভাবিতে লাগিল, ইহারই উপর সে দৃঢ়ভাবে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

আশা নিরাশার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে সে যখন তাহাদের গ্রামের ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িল, তখন সন্ধ্যা সাজিয়া আসিয়াছে, বুকে তাহার অন্ধকার রাশি, ললাটে তাহার তেমনি কালো মেঘের সারি। একটী তারার টিপও আজ সন্ধ্যার ছায়া-অন্ধকার ললাটে জ্বল জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। ষ্টেশনে ট্রেন আসার আগে গোটাকতক আলো জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ট্রেন ছাড়িতে ছাড়িতে সেগুলি আবার নিভাইয়া দেওয়া হইল। অন্ধকার গভীর হইতে লাগিল, সেই অন্ধকারের মাঝে বুকের মাঝে তার চেয়েও বেশী অন্ধকার ধরিয়া বাহিরের অন্ধকারের পানে তাকাইয়া অমিয় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে, কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া যাইতেছে, অন্ধকারের বুককে উজল করিয়া দিয়া ঝিকমিক্ করিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে, কালো আকাশের গায়ে চিকিমিকি বিদ্যুতের খেলা নিরন্তর যেন অসুর হস্তের অবিরত ঘূর্ণায়মান তরবারি, তখন যে কোন দিকে ঘুরিতেছে।

পল্লী-ষ্টেশন প্রায় জনশূন্য। রাত্রে আর একখানি মাত্র ট্রেন আসিবে, ষ্টেশনমাষ্টার নিশ্চিন্তমনে এখন বাসায় গিয়াছেন, অন্য কুলিরাও চলিয়া গিয়াছে, কেবল একজন হিন্দুস্থানী নিদ্রালস নেত্রে ঢুলিতে ঢুলিতে গান ধরিয়াছিল, বর্ষার মেঘ ভরা আকাশের পানে চাহিয়া তাহার বোধ হয় দেশের বেদনা বুকের মাঝে বাজিয়া উঠিতেছিল। অমিয় তাহাকে একটা ছাতার কথা বলিবামাত্র সে আগুন হইয়া উঠিল। বেগতিক দেখিয়া অমিয় লম্বা পায়ে বাহিরে আসিয়া পড়িল, আজ অন্ধকার বড় ভীষণ বলিয়াই তাহার চোখে ঠেকিতেছিল। হৃদয়ে যদি তাহার আলো থাকিত, এ অন্ধকারের বুক বাহিয়া চলিয়া যাইতে বাধিত না, কিন্তু আজ তাহার পা সরিতে চাহিতেছিল না, অন্ধকারের পানে চাহিয়া প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু থাকুক এ ভীষণ অন্ধকার, তাহাকে যাইতেই হইবে যে, বিলম্ব করিলে চলিবে না, তাহার মা যে মৃত্যুশয্যায়। বিলম্বে যে তাহারই ক্ষতি, তাহার মাকে হয়তো সে দেখিতে পাইবে না।

অন্ধকার পদে পদে তাহাকে বাধা দিতে লাগিল, তথাপি সে থামিল না। খানিক আগে বৃষ্টি হইয়া পথে প্রচুর কাদা জমিয়াছিল, অমিয়ের পা কাদায় বসিয়া যাইতেছিল, তথাপি সে থামিল না, সে চলিল।

ওই না বাড়ীর আলো দেখা যাইতেছে? অমিয় ক্লান্ত আঁখিদ্বয় যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া চাহিল—ওই যে ঝিউলের গৃহটীতে উজল আলো জ্বলিতেছে, মুক্ত গবাক্ষপথে তাহার ছটা বাহিরে আসিয়া অনেকটা স্থান প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে। মুক্ত গবাক্ষ পথে কে যেন দাঁড়াইল, একবার সে বাহিরের অন্ধকারের পানে চাহিয়া তখনি সরিয়া গেল, অমিয় বুঝিতে পারিল এ তাহার বউদি সৈল।

বাহিরের বড় দরজাটার কাছে সে দাঁড়াইল, বড় আলোটা সামনে জ্বলিতেছে, রাশি রাশি ধূম উদ্গীর্ণ হইয়া ইহারই মধ্যে চিমনিকে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে, তাই আলো বাহিরে তেমন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হইয়া উঠিতে পারে নাই। মেঘ ভরা আকাশের তলে, সীমাহীন অন্ধকারে দিশাহারা পতঙ্গ গুলি আলো দেখিয়া চিমনির চারিদিকে উড়িতেছে, কাঁচে ঠেকিয়া তফাতে যাইতেছে, আবার আসিতেছে।

দরজা বন্ধ দেখিয়া অমিয় দাঁড়াইল, তাহার পর হাত দিয়া ঠেলিতেই দরজা খুলিয়া গেল, দেড় বৎসর পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিল কিন্তু সেরূপ তেজ দর্পের সহিত উগ্র মস্তকে নয়, চোরের মত সন্তর্পণে।

অনন্তবাবু যে গৃহে থাকিতেন অমিয় সেই গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল গৃহদ্বার রুদ্ধ, গৃহে আলো আছে, অনন্তবাবু একা সেই গৃহে বসিয়া কাগজপত্রাদি দেখিতেছেন।

অন্তঃপুরে চোরের মত সে প্রবেশ করিল। দাসী তখন বারাণ্ডায় বসিয়া ঢুলিতেছে, ঠাকুর রন্ধন করিতেছে, চাকর দুইটা তাহাদের গৃহে গল্প করিতেছে।

পিছল প্রাঙ্গণে পা দিতেই অমিয় হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল; সেই শব্দে দাসীর তন্দ্রা টুটিয়া গেল; অন্ধকারে প্রাঙ্গণে সাদা বস্ত্র একটা কি দেখিয়া আতঙ্কে একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া সে রন্ধনগৃহের মধ্যে ছুটিয়া গেল। সাহসী ঠাকুরও তাড়াতাড়ি দরজার অর্গল দিয়া মহা চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার সে রাসভনিন্দিত চীৎকার শুনিয়া চাকর দুজন একটা আলো এবং পাকানো বাঁশের লাঠি লইয়া চীৎকার করিয়া বাহির হইয়া আসিল। অমিয়ের সামনে

আলোটা উঁচু করিয়া ধরিতেই তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল, খোকাবাবু—"

দাসী ত্রস্তপদে বাহির হইয়া আসিল, বিস্মিতনেত্রে খানিক চাহিয়া থাকিয়া গালে হাত দিয়া বলিল "ওমা দাদাবাবু,—আপনি, আমি ভেবেছিলুম—ডাকাত টাকাত কেউ হবে।"

অমিয় একটু হাসিল, তখনি গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বউদি কোথায়?"

দাসী বলিল "উপরে।"

মা কেমন আছেন এ কথাটা অমিয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল কিন্তু কণ্ঠে তাহার স্বর ফুটিল না, জিহ্বা তাহার এড়াইয়া গেল, কম্পিত পদে সে উপরে উঠিয়া গেল।

বহুদূর হইতে যে গৃহখানিতে আলো দেখিয়াছিল সেই গৃহের দরজায় সে দাঁড়াইল। শৈল সেদিনকার একাদশীর দারুণ কষ্টে চোখ মুদিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়া ছিল, ইলা খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া একদৃষ্টে আলোকটার উপর পানে তাকাইয়া ছিল।

হঠাৎ দরজার উপর দণ্ডায়মান অমিয়ের পানে চোখ পড়িতেই ইলা অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া শৈলকে জড়াইয়া ধরিল; শৈল ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দ্বারের পানে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিল "কে ও?"

অমিয় কথা কহিতে পারিল না, কে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। নিজের পরিচয় সে কি করিয়া দেয়, এই উজ্জ্বল আলোকে নিজের কলঙ্কবালিমা মাখা মুখখানা কেমন করিয়া প্রকাশ করে সে?

শৈলবালা তেমন রুদ্ধকণ্ঠে আবার বলিল "কে তুমি, কথা বলছ না কেন? রঘুয়া—"

এবার অমিয় উত্তর দিল "আমি বউদি—"

সে প্রবেশ করিল; তাহার মুখপানে চাহিয়াই ইলা দুই হাতে মুখখানা ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল, শৈল বিস্মিত নেত্রে অমিয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

"সত্যিই কি তুমি ফিরে এসেছ ঠাকুর পো, না আমি ভুল দেখছি? আমি যে বিশ্বাস করতে পারছিনে মোটে।"

অমিয় গম্ভীরমুখে উত্তর দিল "ভুল নয় বউদি, জ্যান্ত মানুষটা দেখতে পাচ্ছো তোমার সামনে স্বপ্নও বলা চলে না।"

ধপ করিয়া সে খাটের উপর বসিয়া পড়িল, সত্যই সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

শৈল যখনই তাহাকে দেখিয়া খুসি হইয়া উঠিয়াছিল। দুই একটা কথার পরে সে জিজ্ঞাসা করিল "তা হলে এখন এখানেই থাকবে তো?"

মাথা নাড়িয়া অমিয় বলিল "না, আবার আমায় কাল পরশুই যেতে হবে। মাকে দেখতে এসেছি, টেলিগ্রাফ পেয়েছি মার নাকি বড় অসুখ।"

শৈল একবার ইলার পানে মুখ ফিরাইল, উচ্ছ্বাসে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল "মাকে দেখতে এসেছ ভাই, আবার কাল ফিরে যাবে? মাকে কোথায় পাবে ঠাকুর পো, না যে আমাদের ফেলে স্বর্গে চলে গেছেন।"

"তা আমি ঘর দেখেই বুঝেছি বউদি—"

সে উপুড় হইয়া পড়িয়া ক্ষুব্ধ বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, আর তাহার মত ক্ষতি আর কাহারও হয় নাই। সে যে অনেক আশা লইয়া আসিয়াছিল, তাহার আশা তো পূর্ণ হইল না।

শৈল নিঃশব্দে দেখিতেছিল, হৃদয় হাহাকারে ভরিয়া উঠিতেছিল কিন্তু চোখে তাহার এক ফোঁটাও জল ছিল না।

"বড় বউমা—"

বজ্রধ্বনির মত কণ্ঠস্বর এ, শৈল চমকাইয়া উঠিল, সোজা হইয়া বসিল, করুণ নেত্রে হতভাগ্য অমিয়ের পানে চাহিল।

"বড় বউমা, সেই সয়তানটা নাকি আমার বাড়ীতে এসেছে? আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙতে, আমার চোখ এড়িয়ে সে নাকি তার কলঙ্কমাখা পায়ের স্পর্শে আমার পুণ্যতীর্থ কলঙ্কিত করে দিতে এসেছে?"

অনন্তবাবু দ্বারের উপর দাঁড়াইলেন, তাঁহার শুষ্ক কঠোর মুখখানার পানে তাকাইয়া শৈলর প্রাণ শুকাইয়া গেল। অমিয় উঠিয়া বসিল, চোখের জল মুছিয়া সে পিতার পানে চাহিল।

রক্তাভ চোখে তাহার পানে চাহিয়া অনন্তবাবু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "এই যে - সে এখানে বসে। তুই কার আদেশে আমার বাড়ী ঢুকেছিস্ অমিয়?"

অমিয় নীরব, দৃষ্টি সে পিতার পানে স্থির রাখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি মুখ নামাইয়া লইল।

অনন্তবাবুর গলার স্বর আরও উচ্চে উঠিল—"বল, তুই কার আদেশে আমার বাড়ী এসেছিস, কে তোকে এ ঘরে আসবার অনুমতি দিয়েছে? জানিস নে এ বাড়ীতে আমার অধিকার তুই চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছিস? আজ তোকে ত্যাজ্যপুত্র করেছি—তুই তা জানিস নে? বউ মা, তোমাকেও না আমি বার বার বারণ করে দিইছি ওই সয়তানীর সঙ্গে কথা বলো না, তবু তুমি কথা বলেছ, ওই খাটে বসতে দিয়েছ!"

ক্রুদ্ধ শ্বশুরের সামনে শৈলর একটী কথাও ফুটিল না।

বাহিরের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া দিয়া অনন্তবাবু বলিলেন "বেরো এখনি আমার বাড়ী হতে, এক মিনিটের জন্যেও এ বাড়ীতে তোর স্থান নেই। মনে রেখে দিস এ বাড়ীতে আসবার অধিকার তুই হারিয়েছিস। তোর মা যদি বেঁচে থাকত, সন্তান স্নেহে তোকে ক্ষমা করত, হয় তো তার অনুরোধে আমিও তোকে ক্ষমা করতুম, কিন্তু সে চলে গেছে—সে আর নেই, ওই দেখ হতভাগী, তোর পায়ের তলায় ওই মেঝেতে কত তার চোখের জলের দাগ—দেখ কি রকম জমছে। চল আমার ঘরে, দেখতে পাবি তার বুকের রক্ত আজও সেখানে তেমনি জমে আছে, আমি তা মুছতে দেই নি—ওরে মাতৃঘাতি, শুধু তোকে দেখাব বলে। তোকে দেখাব—তোর অত্যাচারে সে কি করে মরেছে! জানিস ওরে পিশাচ, ওরে মাতৃঘাতি, কি করে মেরেছিস তাকে, তিলে তিলে তার বুকের রক্ত খেয়ে ফেলেছিস। সেই রক্তে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছি, তোকে আর নেব না, সেই দিন হতে তুই আমার ত্যাজ্যপুত্র। মাতৃঘাতির স্থান আমার বুকে আর নেই। এখনও গেলি নে—তবু বসে রয়েছিস?"

নির্ব্বাকে অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইল, আর্ত্তকণ্ঠে শৈল বলিয়া উঠিল "বাবা—"

কঠোর স্বরে অনন্তবাবু বলিলেন "সাবধান করে দিচ্ছি, পুরানো কথা আর তুলো না। আমার পুত্রস্নেহ বুক হতে বিলুপ্ত হয়ে গ্যাছে, দারুণ জীঘাংসা তার স্থানে জুড়ে বসেছে, আমি ভুলব না। কারও কথা শুনব না, কারও পানে চাইব না। আমায় পাগল বলবে বল, আমি পাগল নই, আমার মাথা ঠিক আছে।"

তিনি ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ বাধা প্রাপ্ত হইলেন, ইভা তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল, তাঁহার পা দুখানা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া নীরবে নয়নের ধারা দিয়া সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

পাষাণ হৃদয় অনন্তবাবুর প্রাণ বিগলিত হইয়া উঠিল, এই মূক কিশোরীর হৃদয়ভাব তাঁহার নিকট গোপনীয় রহিল না। যদি তাহার বাকশক্তি থাকিত তবে স্বামীর জন্য তাহার এই শত্রুতায় তিনি অত্যন্ত রাগত হইয়া উঠিতেন কিন্তু এ যে মূক, এর ভাষা যে শুধু নয়নজলেই মূর্ত্ত হইয়া উঠে, সে ভাষাকে কঠোরতা দ্বারা ঠেকানো যায় না, সে কথাকে চাপা দেওয়া চলে না।

উমার অসীম স্নেহভরা হৃদয়খানির কথা চকিতে অনন্তবাবুর প্রাণে জাগিয়া উঠিল, মরিবার সময়ও তিনি শান্তিতে মরিতে পান নাই। যখন তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনন্তবাবু অমিয়ের উপর রাগ করিয়াছিলেন, তখন মরণোন্মুখীর ক্লান্ত চোখ দুটী বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়া অনেক ফোঁটা অশ্রুকণা দান করিয়াছিল। চন্দ্রনাথবাবু যখন অমিয়ের ভার লইলেন তখন নিশ্চিন্তমনে উমা চিরনিদ্রার কোলে মাথা রাখিতে পারিলেন। সেই মুমূর্ষু রমণীর হৃদয়ভাবের সহিত আজ এই কিশোরীর হৃদয়ভাব মিলাইয়া অনন্তবাবু অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। উমা নিজের হৃদয়ের ব্যাকুলতা কি এই মূক বালিকাকে দান করিয়া গিয়াছেন, চোখের জলও দিয়া গিয়াছেন?

"কি মা লক্ষ্মী, তুমি কি চাও মা?"

ইভাকে তিনি উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইভা উঠিল না, আরও শক্ত করিয়া পা জড়াইয়া ধরিল।

শৈলর পানে চাহিয়া অনন্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "পাগলী মা আমার কি চাচ্ছে বউ মা, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে।"

রুদ্ধ কণ্ঠে শৈল বলিল "ইভা তার স্বামীর জন্যে আপনার কাছ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছে বাবা।"

ললাট কুঞ্চিত করিয়া অনন্তবাবু বলিলেন "স্বামী? কে ওর স্বামী? অমিয় ওর স্বামী নয়। ওঠ মা আমার, যে তোমায় পূর্ণ অশান্তি মনে করে আমার পায়ের কাছে ফেলে রেখে চলে গেছে, তার জন্যে তুমি আবেদন করতে আসছ

না? ভাব, ও তোমার কেউ নয়। ওর সঙ্গে সম্পর্ক তোমার একটী রাতের মাত্র, তারপরে যেমন তুমি চিরকালের পর, তেমনিই পর হয়ে আছ। আমাদের সঙ্গে তোমার পরিচয়, আমার মেয়ে হও তুমি, আমার মত পাষাণে বুক বাঁধো, ওর দিকে চেয়ো না।"

ইভা উঠিল না, তাহার চোখের জল অজস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া অনন্তবাবুর পা ভিজাইতে লাগিল। অনন্তবাবুর কঠোরগম্ভীর কথাগুলি অমিয়কেই কাঁপাইয়া গেল মাত্র, ইভাকে বিচলিত করিতে পারিল না।

অনন্তবাবু শৈলবালার পানে চাহিয়া কঠোর সুরে বলিলেন "এ সব তোমারই শিক্ষা বউমা, নচেৎ এই মূক বালিকা, সংসারের কিছুই যে জানে না, স্বামী কি তা যে জানে না, সে কেন তার স্বামীর জন্যে আমার পায়ে পড়ে কাঁদছে? তুমি পরে পরে আমার আদেশ লঙ্ঘন করে চলেছ। আমি যাকে আমার মনের মত করে গড়ে তুলছিলুম, তোমরা দশজনে মিলে আমার সে আদর্শকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে। এ রকম করে আমার শত্রুতা করা কি তোমার উচিৎ কাজ হচ্ছে বউ মা?"

শৈল ভগ্না সুরে বলিল "আমায় আদেশ দিন বাবা আমি, সব ছেড়ে আমার ভাইয়ের কাছে ফিরে যাই।"

অনন্তবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন "না, তা হয় না। তোমাকে এখানেই থাকতে হবে, আমারই মত নিয়ে তোমায় চলতে হবে।"

ইভার পানে চাহিয়া বলিলেন "ওঠো মা, কেবলমাত্র তোমার অনুরোধেই আজ ওকে ক্ষমা করেছি; তোমার চোখের জলে আমার পাষাণ বুকখানা পর্য্যন্ত গলে গেছে।"

ইভা উঠিয়া বসিল। অনন্তবাবু পুত্রের পানে চাহিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন "মনে রেখো—শুধু মায়ের অনুরোধেই তোমায় ক্ষমা করলুম, কিন্তু তোমায় আমি এক পয়সার অধিকারী করে যাব না। বউমাকে আমি উইল করে আমার সব দান করেছি, আমার অবর্ত্তমানে বউমা-ই এ জমীদারির একমাত্র মালিক। তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছি সেইটে কেটে দেব। বউমার জমীদারিতে তুমি তার—"

বাধা দিয়া অমিয় তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আপনি যদি নিজ হতে আমায় ক্ষমা করতেন, আমি সে ক্ষমা মাথায় তুলে নিতুম, কিন্তু যে ক্ষমার বাণী একটী মেয়ের ধাক্কার ফলে আপনার মুখ হতে বেরিয়েছে সে ক্ষমা আমি চাই নে, মেয়ের ভিক্ষায় ধনবান হওয়ার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। তার চেয়ে দণ্ড শ্রেয়ঃ; তার চেয়ে আপনার ত্যাজ্যপুত্র হয়ে বহুদূরে আমায় থাকতে হয়, সে আমার লক্ষগুণে ভাল।"

ইভা স্বামীর মুখপানে চাহিল, সে দৃষ্টিতে জাগিতেছিল করুণা ভরা আবেদন, কিন্তু অমিয় তখন বক্ষ স্ফীত করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, চির স্বচ্ছন্দে পাত্রী স্ত্রীর পানে সে চাহিল না। অনন্তবাবু গর্জ্জিয়া বলিলেন "চাওনা—আমার ক্ষমা চাও না?"

"না, আপনার ক্ষমা আমি চাই নে।"

ক্রুদ্ধরোষে দুলিয়া উঠিয়া অনন্তবাবু বলিলেন "তবে দূর হয়ে যা; আর একমুহূর্ত্ত এখানে থাকিস নে। মেয়ের আবেদন করে চাওয়া ক্ষমাকে যদি প্রত্যাখ্যান করতে পারিস তবে তারই ঘরে দাঁড়িয়ে আছিস কোন মুখ নিয়ে?"

"চলনুম—"

অমিয় দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সে আসিয়াছিল সান্ত্বনার আশায়, কিন্তু পিতার ক্রোধ তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিল, সে কোন মতে আপনাকে সামলাইতে পারিল না।

অনন্তবাবু বাহির হইয়া গেলেন। ইভা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল।

মুক্ত জানালার কাছে দাঁড়াইয়া শৈল—কিন্তু কোথায় কি? অন্ধকারের পর অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাধ্য কি শৈলর এই বিরাট অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিবে সে?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শৈল জানালা বন্ধ করিল।

(ক্রমশঃ)

মুসলমান নারীর শিক্ষা

(বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতিতে সভানেত্রীর অভিভাষণ)

মিসেস্ আর, এস্, হোসেন।

মাননীয়া উপস্থিত ভগিনীবৃন্দ!

আপনারা আমার ন্যায় তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তিকে এ সম্বরের জন্য সভানেত্রীপদে বরণ করিয়া আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমি অবশ্যই বলিব যে, আপনাদের নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই। কারণ আমি আজীবন কঠোর সামাজিক 'পর্দ্দার' অত্যাচারে লোহার সিন্দুকে বন্ধ আছি—ভালরূপে সমাজে মিশিতে পাই নাই—এমন কি সভানেত্রীকে হাসিতে হয়, না কাঁদিতে হয়, তাহাও আমি জানি না। সুতরাং আমার ভাষার কথায় অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিবে, তজ্জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী মিসেস্ লিওসে আমাকে মুসলমান বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভাব অভিযোগের কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সমবেত সুশিক্ষিতা গ্রাজুয়েট মহিলাদের সম্মুখে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তবে ২০।২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজ সেবা করিয়া,—বিশেষতঃ ১৬ বৎসর যাবৎ 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল' পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহাই আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি।

স্ত্রী-শিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য্য হয়। প্রবাদ আছে "বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়।"

এখন প্রশ্ন এই যে, মুসলমান বালিকাদের সুশিক্ষার উপায় কি? আপনারা হয় ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন? সে জীব ভারত নারী! এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন; স্বয়ং থার্ডক্লাস গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া দারিদ্র রেল-পথিকদের কষ্ট দূরীকরণ করিয়াছেন। পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, তাই যত্রতত্র পশুক্লেশ-নিবারিণী সমিতি দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে, তাহার জন্য এংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও এ ভূভারতে নাই।

নারী ও পুরুষ বিরাট সমাজদেহের দুইটী বিভিন্ন অংশ। বহুকাল হইতে পুরুষ অংশ নারীকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে আর নারী কেবল নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। পুরুষের পক্ষে নারায়ণী সেনা আছেন বলিয়া তাঁহারা এযাবৎ নারীর উপর জয়লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। সুখের বিষয় এতকাল পরে 'শ্রীকৃষ্ণ' স্বয়ং আমার এই হিন্দু ভগ্নীদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাই চারিদিকে হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবরোধ-বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা, বিশেষতঃ মাদ্রাজের মহিলাবৃন্দ সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এবার মাদ্রাজের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটী প্রেসিডেন্টের পদে একজন মহিলা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রেঙ্গুনে একজন মহিলা-ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। লেডী ব্যারিষ্টার মিস্ কোরাবজীর নামও সুপরিচিত। কিন্তু মুস্‌লিম্ নারীর কথা আর কি বলিব?—তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরেই আছে!

"মাতা যদি বিষ দেন আপন সন্তানে
বিক্রয়েন পিতা যদি অর্থ প্রতিদানে"—

তাহাকে আর কে রক্ষা করিবে? আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব এক সময়ে তাঁহার কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন "এদেশে বালক ও বালিকার শিক্ষার পার্থক্য রাখার ফলে আমাদের অবস্থা

এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে (যে আমাদের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে।) বালিকাদের শিক্ষা না দেওয়া আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে, বরং ইহা আমাদের দুরপণেয় কলঙ্ক" ইত্যাদি।

যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে মূর্খতার অন্ধকার যুগে আরবগণ কন্যা বধ করিত। যদিও ইস্‌লাম ধর্ম্ম কন্যাদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলিমগণ অজ্ঞানবন্ধনে কন্যাদের মন, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যাপি অবাধে বধ করিতেছেন। কন্যাকে মূর্খ রাখা এবং চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া জ্ঞান ও বিবেক হইতে বঞ্চিত রাখা অনেকে কৌলিন্যের লক্ষণ মনে করেন। কিছুকাল পর্য্যন্ত মিশর এবং তুরস্ক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঠকিয়া ঠকিয়া নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এখন সুপথে আসিয়াছেন। সম্প্রতি তুরস্ক এবং মিশর ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্যতামূলক আইন করিয়াছেন। কিন্তু তুরস্ক ইউরোপ ও আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণে সোজা পথ অবলম্বন করেন নাই, বরং আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী অলঙ্ঘনীয় আদেশ পালন করিয়াছেন। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ ও স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমাদের রসুল মকবুল (অর্থাৎ পয়গম্বর সাহেব)। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষা-লাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। তের শত বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের জন্য এই শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজ তাহা পালন করে নাই, পরন্তু ঐ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তদ্রূপ বিরুদ্ধাচরণকেই বংশগৌরব মনে করিতেছে। এখনও আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটী ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে—যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দ্দু ও কোরাণশরীফ পাঠ ছাড়া আর কিছু,—বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া না হয়। এই ত আমাদের সামাজিক অবস্থা!

এখন শিক্ষার অবস্থা এই যে, আমাদের দেশে গড়পড়তা প্রতি ২০০ (দুই শত) বালিকার একজন অক্ষর চিনে; প্রকৃত শিক্ষিতা মহিলা বোধহয় দশ হাজারের মধ্যেও একজন পাওয়া যাইবে না। সেখ আবদুল্লাহ সাহেব আর এক স্থানে বলিয়াছেন—

"স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীগণ বলেন যে, শিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোকেরা অশিষ্ট হয়। ধিক! ইহারা নিজেকে মুসলমান বলেন, অথচ ইস্‌লামের মূল সূত্রের এমন বিরুদ্ধাচরণ করেন। যদি শিক্ষা পাইয়া পুরুষগণ বিপথগামী না হয়, তবে স্ত্রীলোকেরা কেন বিপথগামিনী হইবে? এমন জাতি যাহারা নিজেদের অর্দ্ধেক লোককে মূর্খতা ও "পর্দ্দা" রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখে, তাহারা অন্যান্য জাতির—যাহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়াছে, তাহাদের সহিত জীবন সংগ্রামে কিরূপে প্রতিযোগিতা করিবে?"

ভারতবর্ষে এক কোটী লোক ভিক্ষাজীবী, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং তাহারা কোন মুখে অন্য জাতির সহিত সমকক্ষতা করিবে? আমরা আবার কৌলিন্যের বড়াই করি। ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা নীচ কার্য্য আর নাই, আর মুসলমানের সংখ্যাই ইহাতে অগ্রণী। ইহার কারণ এই যে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে বঞ্চিত রাখিয়া সর্ব্ব বিষয়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। ফলে তাহাদের গর্ভজাত সন্তান অলস ও ভ্রমকাতর হয়; সুতরাং "বাপদাদার নাম" লইয়া ভিক্ষা ছাড়া তাহারা আর কি কাজ করিবে?

এখন স্ত্রীলোকেরা ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহার হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিতা রহিয়াছে। গত ইলেক্‌শনের সময় দেখা গেল, কলিকাতায় মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছে। ইহা কি মুসলমানের গৌরবের বিষয়? তাঁহারা কোন্ সুযোগের আশায় বা অপেক্ষায় বসিয়া আছেন?

হজরত ঈসা বলিয়াছেন, "তুমি নিজে অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিও।" এস্থলে আমি সেখ সাহেবের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না; তাহা এই :—"ভারতবর্ষের অবরোধপ্রথা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এই অবরোধপ্রথা আমাদের সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। ভ্রাতৃগণ! পর্দ্দার নাম শুনিবামাত্র আপনারা হয়ত একযোগে" বলিয়া উঠিবেন,

'তবে কি আমরা ইংরাজদের অনুকরণে বিবিদের রাজপথে বেড়াইতে দিব?' তদুত্তরে বলি, আমি মুসলমানশাস্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া আপনাদের সহিত কথা বলিতে চাই। ভারতীয় পর্দ্দার সহিত শাস্ত্রীয় পর্দ্দার কোন সম্বন্ধ নাই বলিলে, অত্যুক্তি হইবে না।"

পর্দ্দা সম্বন্ধে আমি নিজের কোন মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি—কেবল এইটুকু বলি যে, সেখ সাহেব পর্দ্দাকে "সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত" বলিয়াছেন, আমি তাহা মনে করি না। "যন্ত্রণাদায়ক" হইলে অবলাগণ 'বাবারে! মারে! ম'লুমরে! গেলুমরে!' বলিয়া আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেন। অবরোধ প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্ব্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না! অন্তঃপুর-বাসিনী নারী এই অবরোধ-গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।

বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার বিধান যে অন্য রূপ—সে বিধি অনুসারে প্রত্যেককেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের উচিত যে, তাঁহারা বাক্সবন্দী হইয়া মালগাড়ীতে বসিয়া সশরীরে স্বর্গলাভের আশায় না থাকিয়া স্বীয় কন্যাদের সুশিক্ষায় মনোযোগী হন। কন্যার বিবাহের সময় যে টাকা অলঙ্কার ও যৌতুকক্রমে ব্যয় করেন, তাহারই কিয়দংশ তাহাদের সুশিক্ষায় ও স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় করুন। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা করা প্রয়োজন; আর প্রয়োজন বিশুদ্ধ বাতাসের। আল্লাহর দান এই বিশুদ্ধ বাতাস বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে মহিলাগণ কেন অনিচ্ছুক, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। শীতকালে তাঁহারা এরূপ ভাবে জানালা দ্বার, বিশেষতঃ সার্সী বন্ধ করিয়া রাখেন যে, আমার মনে হয় গবর্ণমেণ্ট কেন আইন করিয়া দ্বার ও জানালায় সার্সী বন্ধ করা নিষিদ্ধ করেন না?

আমাদের স্কুলের ছাত্রীগণ পরীক্ষার সময় প্রায়শঃ ভূগোল, ইতিহাস এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে অকৃতকার্য্য (ফেল) হয়, ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের বাস ভবন এবং সূতিগৃহ ব্যতীত দুনিয়ায় আর কিছুই দেখিতে পায় না। এই দুনিয়ায় তাহাদের পিতা ও ভ্রাতা ছাড়া আরও কেহ আছে কিনা, তাহা তাহারা জানে না; রুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া না জানিয়া অনবরত রোগ ভোগ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে দেখে। তাহারা কেবল জানে, অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়। এই সকল দু-রোগের একমাত্র ঔষধ সুশিক্ষা।

আজি আপনাদের অনেক খানি সময় নষ্ট করিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এখন আমি ইতি করি।

মহিলা-গ্রাহকদের প্রতি—

যাঁহাদের বার্ষিকমূল্য বিদেশস্থ অভিভাবক অথবা আত্মীয়গণ দিয়া থাকেন, তাঁহারা মূল্য শোধ হইবার পূর্ব্বেই যেন নূতন বৎসরের মূল্য তিন টাকা আগামী ১৫ই চৈত্রের মধ্যে আমাদের আফিসে মণিঅর্ডারে পাঠাইয়া দিবার জন্য বিদেশস্থ অভিভাবক অথবা আত্মীয়দিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন। অন্যথায় ঐ সকল গ্রাহককে নূতন বৎসরের মূল্যবাবদ ভিপিতে পত্রিকা পাঠাইলে গ্রাহকের পক্ষে অসুবিধা হইতে পারে।

কালমেঘ

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী।

সার জন উড্রফ তাঁহার "ভারতশক্তি" নামক পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষীয়দিগের বাড়ীর আশে পাশে যে সকল আয়ুসম্ভূত বৃক্ষলতা বিদ্যমান, ভারতবর্ষীয়েরা অতি সহজে তাহা সেবনে নিরাময় হইতে পারে। কিন্তু তাহা তাহারা বুঝিল না। যদি কোন পাশ্চাত্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ভারত-জাত ঐ সকল ঔষধি দ্রব্য ব্যবহারের পরামর্শ দেন, তাহা হইলে তখন ভারতবাসীরা নিজেদের দ্রব্য নিজেরাই চিনিতে পারিবে।"

আজ সার জন উড্রফের এই উক্তি বাস্তবিকই সত্যে পরিণত হইয়াছে। "কেমিকাল ওয়ার্কস"গুলির আবিষ্কৃত গাছগাছড়ার তরলসার (Liquid Extract)এর ব্যবহার এখন ভারতবাসীর ঘরে ঘরে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে যে সকল গাছগাছড়া বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার গুণাগুণ অবগত হইয়া সেই সকল গাছড়ার স্ব রস বা কাথ যদি আমরা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি তাহা হইলে অনেক সময় অনেক দুঃসাধ্য রোগ বিনাপয়সায় নিরাময় হইতে পারে। গাছড়ার তরলসার ব্যবহার অপেক্ষা টাটকা গাছের রসে অতি অল্প সময়ে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

আপনারা যদি দুইটী শিশু যকৃতের রোগী লইয়া একটীকে কালমেঘের তরলসার ও একটীকে কালমেঘের পাতার রস খাওয়াইয়া পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন যাহাকে টাটকা কালমেঘের পাতার রস খাওয়াইয়াছেন সেই রোগীটীর শীঘ্র উপকার হইয়াছে। ইহা আমি বহু স্থলে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, টাটকা গাছড়ার পাতার রসে যেরূপ শীঘ্র উপকার পাওয়া যায় তরলসারে সেরূপ পাওয়া যায় না। আর এক কথা—আমাদের এই অন্নচিন্তা চমৎকারা অবস্থার দিনে যদি বিনা পয়সায় রোগ শীঘ্র আরোগ্য হইতে দেখা যায় তাহা হইলে অনর্থক পয়সা ব্যয় করিয়া লাভ কি? এইস্থানে একটা কথা বলিয়া রাখি—কালমেঘের পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। কালমেঘ আমাদের বাড়ীর আশে পাশে দেখিতে পাওয়া যায়।

যাক্, এখন কালমেঘ কি গুণ সম্পন্ন ও কি উপায়ে ব্যবহার করিতে হয় তাহা বলা যাউক—

ইহা বলকারক, পরিপাক বর্দ্ধক, পিত্ত নিঃসারক ও শিশু যকৃতের মহৌষধ। শিশুদিগের পক্ষে কালমেঘ উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদিগের দৌর্ব্বল্যে, পেটকামড়ানিতে, ক্বচিৎ কঠিন ক্বচিৎ তরল মলভেদে, অরুচিতে ও অতিসারের পক্বাবস্থায় কালমেঘ বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ।

ব্যবহার—শিশুদিগের উক্ত রোগসমূহে কালমেঘের পাতার রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

কালমেঘের বড়ি—কালমেঘের পাতা পানের মত করিয়া চিরিয়া বোঁটা ফেলিয়া দিয়া বেশ করিয়া জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ছোট ছোট বটী করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে "কালমেঘের বড়ি" প্রস্তুত হয়। এই বড়ি প্রত্যহ সকালে একটী ও বিকালে একটী মধুর সহিত শিশুকে সেবন করাইলে উক্ত রোগ সঙ্গে সঙ্গে নিবারিত হয়। ইহা আমি দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। শিশু-যকৃতে আমি ইহা প্রথম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি। একবার আমার দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিন বৎসরের একটী শিশু রোগী পাই, তাহার শীর্ণ দুর্ব্বল দেহ, অনবরত পেট কামড়াইয়া থাকে, যাহাই খাইতে দেওয়া যাক্ না কেন তাহাই হজম হয় না, দিনে ৭।৮ বার তরল মলভেদ হয়, জ্বর হয় না—ইহাই লক্ষণ। এই শিশুটীকে আমি "কালমেঘের বড়ি" প্রত্যহ সকালে ১টী ও বিকালে ১টি কালমেঘের পাতার রস ও মধু অনুপানে খাইতে দিই। সাত দিন ঔষধ সেবনের পর দেখা গেল শিশুর দেহ শীর্ণ বটে কিন্তু দুর্ব্বল ততটা নহে, পেট আর সেরূপ কামড়ায় না, দাস্তও কমিয়া গিয়াছে, দু তিনবার মাত্র হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগীর আশাতীত ফল হইয়াছে।

পেট কামড়ান একেবারে বন্ধ হইয়াছে, দাস্ত দুইবার হয়, দুর্ব্বলতাও অনেক কম, যাহা খায় তাহা সহজে হজম হয়।

আর একবার একটী চারি পাঁচ বৎসরের শিশুকে কালমেঘের বড়ি খাইতে দিই। সে রোগীটী খুব দুর্ব্বল সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও হয়। তিন চারি মাস যাবৎ জ্বর লাগিয়াই আছে। ইহাকেও আমি সকালে ও বিকালে "কালমেঘের বড়ি" কালমেঘের পাতার রস ও মধু অনুপানে খাইতে দিই। ৮।১০ দিনের মধ্যে জ্বর একেবারে বন্ধ হয়, দুর্ব্বলতাও অনেক কমিয়া যায়। এইরূপ বহু শিশুকে আমি কালমেঘের বড়ি খাওয়াইয়া উপকার পাইয়াছি। সাধারণতঃ কালমেঘের বড়ি প্রস্তুতের পর একমাস পর্য্যন্ত বেশ ফল পাওয়া যায়। এক মাসের পুরাতন বড়ি ব্যবহার না করাই ভাল।

পরিণত বয়সে কালমেঘের ব্যবহার—আমার একটী পরিচিত ভদ্রলোক পরিপাক ভাল হওয়ার জন্য কালমেঘের তরলসার (Liquid Extract of Kalmegh) প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে সেবন করিতেন। এইরূপ তিনি বহুদিন হইতেই এই তরলসার ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে আমি জোর করিয়া কালমেঘের বড়ি সেবন করাই, দিন পনের কালমেঘের বড়ি কালমেঘের পাতার রসের সহিত ব্যবহার করিবার পর দেখা যাইল তাঁহার পরিপাকশক্তি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, তিনি আগে যতটা দুর্ব্বলতা বোধ করিতেন এখন আর ততটা করেন না। ইঁহার পর আমি আরও কয়েকটীকে যকৃতের বিকৃতির জন্য ইহা ব্যবহার করাইয়া উপকার পাইয়াছি। আমি কিন্তু কালমেঘের বড়ি আহারের পূর্ব্বে ব্যবহার করি না, সকালে ও বিকালে খাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

কালমেঘের আলুই—আগে আমাদের প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এই কালমেঘের আলুই প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

জীরা, রাধুনী, মৌরী, আমকল, বড় এলাচের খোসা এই দ্রব্যগুলি বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকটী সমান ভাগে লইয়া কালমেঘের পাতার রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ছোট ছোট বটী করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই এই আলুই প্রস্তুত হয়। এই "কালমেঘের আলুই" শিশুদিগের পক্ষে বড় উপকারী। শিশুদিগের কি নূতন জ্বর, কি পুরাতন জ্বর, কি কম্পজ্বর, সকল প্রকার জ্বরেই এই ঔষধের একটী বড়ি সকালে ও বিকালে শুষ্কদুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। শুষ্কদুগ্ধের অভাবে কেবল মাত্র মধুর সহিতও সেবন করান যায়।

এই আলুইর বড়ি আমি শিশুদিগের জ্বর ভিন্ন শিশুদিগের পেট কামড়ান, উদরাময় ও ক্ষুধামান্দ্যেতেও ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। আমি শুনিয়াছি এই আলুইর বড়ি এখন বিলাতে পর্য্যন্ত নামান্তর হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। সেখানে উহা কুইনাইনের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি একবার দাতব্য চিকিৎসালয়ে একটী পাঁচ ছয় বৎসরের জরাতিসারের রোগীকে এই আলুই ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

সাবধানতা—শিশুদিগের রোগ হইলে কালমেঘ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মাতার একটু সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। শিশু যদি স্তন্যপায়ী হয় তাহা হইলে শিশুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতাকেও রোগিনী মনে করিয়া লইতে হইবে। স্তন্যপায়ী শিশুর মাতার বিশেষ সতর্ক হইয়া স্নান ও পথ্যাপথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে কারণ—সুস্থ মাতার দুগ্ধই শিশুর সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। মাতা যদি নিরোগী না হন তাহা হইলে মাতার দুগ্ধ কখনই সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে। সে অবস্থায় শুষ্কদুগ্ধের পরিবর্ত্তে গর্দ্দভ, গো বা ছাগী-দুগ্ধের সহিত জল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া সেবন করান বিধেয়। শিশুর দাঁত উঠিলে সাগু বা বার্লি সেবন করান যাইতে পারে।

নারীর রূপ

(গল্প)

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম দেখার দিনই বুকের কল্পনা সে নিঙড়ে শেষ করে নিয়েছিল। এমন সুঠাম সুন্দর মেয়েটীকে পথের অতিথির ঘরে পাঠিয়ে দেবতা যে তাঁর নিষ্করুণ হৃদয়ের পূর্ণ ছবি সবার সাম্‌নে ধরে দিয়েছেন এ কথা বার বার নিজের মনে ত তোলপাড় করেছিলুমই, রাত্রে ওঁকেও এ নিয়ে কম জ্বালাতন করি নি।

ওঁর চাপা হাসি কিন্তু আমাকে রাগিয়ে তুলেছিল খুব বেশী। পুরুষের কঠিন মনের অনুশাসনে যে তিরস্কার শাসন সেদিন তাঁকে সইতে হয়েছিল আমার হাতে, জীবনে এত বড় নিগ্রহ ভোগ আর তিনি করেছেন কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য্য দেখ্‌লুম তাঁর ধৈর্য্য, সকল অনুযোগের পরও হাসি-মুখে বল্‌লেন,—দেখ, এ দয়া চিরদিন থাক্‌বে ত?

আমি বেশ একটু কাঁকাল গলায় বল্‌লুম,—কেন থাক্‌বে না শুনি? এ কি তোমাদের পাথুরে বুক পেয়েছ যে, সাত চড়েও রা বস্‌বে না? মেয়েমানুষের মন কাদার চেয়েও নরম।

মাথা চুল্‌কে তিনি জবাব দিলেন,—তা ঠিক, তবে কি না মাটিটা বেশে। একটু এঁটেল মিশেল থাক্‌লেও কথা ছিল না। সাত সাতটা লোকের মুষ্টি পাওনায় ভাগ বসালে, এই অল্পেই যা-ভাবনা।

আমি এবার সত্য সত্যই রেগে উঠে বল্‌লুম,—এত কৃপণই যদি হয়ে থাক তুমি, আমার দিনের খোরাকটা বন্ধ করে দিও। তা বলে অমন মেয়েটীকে উপোস করিয়ে আমি রাখ্‌তে পার্‌ব না। যেদিন যা জোটে দেব।

তিনি কেবল একটু ফিকে হাসি হাস্‌লেন, মুখে কিছু বল্‌লেন না।

(২)

তার মা-কিন্তু আমার এই দয়ার দুর্ব্বলতাকে একদিনও ঢাক দেতে দেয় নি। সেদিন থেকে খুঁটিয়ে সব জিনিষই তাদের দিতুম, আর ভাবতুম, আহা বেচারী।…

স্বামী এর পর একদিনও আর কোন কথা তোলেন নি। তুল্‌লে অন্যায়ের কশাঘাত যে সহ্য কর্‌তে হ'ত সেটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তিনি সে ধাঁচের লোকই ছিলেন না, গৃহস্থালীর কোন কর্ত্তব্যে পুরুষের হাত দেওয়া অতি দোষনীয় বলেই মনে কর্‌তেন। জোর করে টেনে আন্‌তে গিয়ে হার মেনেছি; হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁকে বল্‌তে শুনেছি,—যার যা গণ্ডী তার পায়ে তার পা দেওয়া উচিত ত নয়ই বরং দোষের। এত অপরাধের মাঝে নয় ত ওই অপরাধটাই আমার বাদ রয়ে গেল ললিতা, তাতে তোমার এমনই বা কি ক্ষতি বৃদ্ধি হবে?

চুপ করে যেতুম, তর্ক তুল্‌তে পারতুম্ না। মনে হ'ত, আহা থাক না, অনেক ঝক্কাট্ ত আছে।

সেদিন তার মা এসে বল্‌লে,—মেয়েটীকে যদি বাড়ীর এক কোণে পড়ে থাক্‌তে দাও মা, একটা মস্ত বড় দায় উদ্ধার কর তা হ'লে। অত বড় সোমত্ত মেয়ে……

কথাটা প্রাণে বাজ্‌ল। না বল্‌তে পার্‌লুম না।

উনি কেবল একটু ক্ষীণ আপত্তি তুলে বল্‌লেন,—দেখ, পরের মেয়ে, আমাদের এত কি?

কিন্তু সে আপত্তি শোন্‌বার আগেই তাঁকে বোঝালুম, এত দিনে তাঁর পা-টা গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে, সাবধান।

হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি সরে গেলেন। মেয়েটীর প্রবেশ-পথে আর কোন বাধাই রইল না।

(৩)

দিন তিনেকের মধ্যেই অগিয়ার সঙ্গে তার একটু মেশামিশি দেখে ভয়ানক তেতে উঠ্‌লুম। সেদিন তাকে বার বার সাবধান করে দিলুম,—খবরদার, এমনটা যেন আর না দেখি।

অগিয়া ভয়ে মাথা হেঁট করে চলে গেল। মেয়েটী মুখ গোঁজ করে বসে রইল।

তেলের শিশিটা বড় শীগ্‌গির ফুরিয়ে যেতে লাগ্‌ল; আতর, সাবানও তাই। আনি আমি সেগুলো কোথায়

যায়, কিন্তু বলতে কেমন মুখে বাধে। মনে হয়, আহা বেচারী।...

মাস চারেক যায়, তার চেহারা আমার কেমন খট্‌কা লাগিয়ে দিলে। খোঁজ নিয়ে জান্‌লুম, অনুমান মিথ্যা নয়। সেই দিনই তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিলুম। মনিয়ারও জবাব হয়ে গেল।

উনি কিছু গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন,—কোন কিছু করে ভাবার চেয়ে, ভেবে করা ভাল। এখন ত তাড়ালে, খানিক পরেই কিন্তু পা ছড়িয়ে কাঁদতে বস্‌বে হয় ত।

গম্ভীর ভাবে বলে উঠ্‌লুম,—আমার কি এতই নীচ পেলে তুমি; জেনে শুনে ওর হাতে জল খাব?

উনি হেসে বল্‌লেন,—মানুষ মাত্রেই ত প্রবৃত্তির দাস—এ কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

এমন রক্ত চক্ষে তাঁর দিকে চাইলুম! তিনি কিন্তু তা গায়েই মাখলেন না, প্রফুল্লিত হাসিকে সমান সাম্‌নে রেখে ধীরপদে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

(৪)

কলকাতার এক টী শিশুকে কোলে নিয়ে কল্যাণদারা এক জননী এসে বাটীর দ্বারে দাঁড়াল, উপেক্ষায় তাড়াতে পারলুম না তাকে, সিধে হাতে বার-বাটীতে নেমে আস্‌তে হ'ল।

দেখেই কিন্তু চম্‌কে উঠ্‌লুম, ঘৃণা এবার আর বুকে আসন নিতে পারলে না। ধীর কণ্ঠে বল্‌লুম,—এমন দশা হয়েছে তোর, এতদিন আসিস্ নি কেন?

কথা সে বলতে পারলে না, কেবল দুটী নীরব প্রস্রবন মুখে দাগ রেখে নেমে গেল। ছুটে গিয়ে তাকে হাতে ধরে কাছে টেনে নিলুম। ছেলেটিকে তার বুকে চেপে ধর্‌লুম। এতটুকু তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কথা প্রাণে এল না, কেন আস্‌লে, এখন আমিও যে মা হ'তে চলেছি।

উনি দেখলেন, সব শুন্‌লেন, কেবল একটু হাস্‌লেন, কোন প্রতিবাদ করলেন না। আমার মুখে কিন্তু জবাবটা আপনা হ'তে বেরিয়ে এল,—কি করি বল, মা যে, সে কি কোন মাকে ছোট বলে দেখতে পারে? যত বড় কলঙ্কের দাগ থাকনা কেন, কেবল ওই শিশুর খাতিরে ওর সে দিকটা চেপে গিয়ে আমার বরণ নিতেই হবে, নইলে মার নামে দোষারোপ করা হবে যে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী বর্ষের গ্রাহক—

চৈত্র মাসে যে সকল গ্রাহকের মূল্য শোধ হইবে আগামী বৈশাখ সংখ্যা তাঁহাদিগকে ভি: টাকা চারি আনার ভিপিতে পাঠাইয়া ১৩০৩ সালের গ্রাহক করা যাইবে। মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইতে হইলে ১৫ই চৈত্রের মধ্যে তিন টাকা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন।

বান্ধব গ্রাহক—

যিনি ১৩০৩ সালের মাতৃ-মন্দিরের তিনটি নূতন গ্রাহক ঠিক করিয়া তাহার মাসিক মূল্য ৯৲ টাকা চৈত্রমাস মধ্যে পাঠাইবেন, তাঁহাকে বিনামূল্যে ঐ সালের এক বৎসরের জন্য "বান্ধব গ্রাহক" করা যাইবে।

নমুনা সংখ্যা—

আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ আগামী বৎসরের গ্রাহক করিবার উদ্দেশ্যে যদি বন্ধুবান্ধবের দুই-তিনটি নাম ঠিকানা পাঠান, তবে চৈত্র সংখ্যা মাতৃ-মন্দির ঐ ঠিকানায় বিনামূল্যে প্রেরণ করা যাইবে। আশা করি,গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ ঐ সকল বন্ধুবান্ধবকে পৃথক পত্র লিখিয়া বৈশাখ হইতে গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

নূতন লেখিকা—

মহিলা গ্রাহকদের মধ্যে যাঁহারা মাতৃ-মন্দিরে কিছু কিছু লিখিতে চান, তাঁহারা প্রবন্ধ বা স্বামীর সংবাদাদি লিখে আমায় তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। লেখার বিষয় বা ভাব উপযুক্ত হইলে ভাষার দোষ যতই থাকুক তাহা আমরা যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া লইব। এই হিসাবে প্রবন্ধাদি লেখা শিখিবার পক্ষে মাতৃ-মন্দিরের গ্রাহিকা হওয়া সুবিধাজনক।

সমাজের অবস্থা

দূর হ— দূর হ— এখান থেকে—

—"আমার কি মতি হবে ঠাকুর! আপনি আদেশ না করলে আমায় যে কেউ সমাজে স্থান দেয় না। আমি নিরাপরাধ নারী—অবলা। যখন দুর্বৃত্তেরা আমাকে হরণ করে নিয়ে যায়, তখন কত চেষ্টাই করেছিলাম তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। আপনারও স্ত্রী কন্যা আছে; তাদের দেখি, আপনার ঘরে যদি এই ঘটনা ঘ'ত?"

সমাজপতিদের বিক্রম

—"কি!—এত বড় কথা!!
আমাদের ঘরে ভাত চুকবে—তার নাগ এমন কথা বলে?"

এইবার সমাজপতির ঘরে—

—"ওগো ম'লাম গো, গেলাম গো, ঘর গো, আমার বিয়ে দেল গো!"

যঃ পলায়তি স জীবতি

—"পালা—পালা—পালা, ঐ আস্‌ছে—ঐ আস্‌ছে, আমাদেরও বুঝি ধরে নিয়ে যাবে।"

ধর্ম্মদাস শ্রেষ্ঠী ও তাঁহার জননী

শ্রমণ শ্রীপুন্নানন্দ স্বামী।

"মা, একটু বেদানার রস মুখে দাও: আর ক'দিন শুকিয়ে থাকবে?"

"না বাবা, বেদানার রসে প্রয়োজন নেই।"

"আগে শরীর রক্ষা, পরে ধর্ম্মাচরণ। দেহে প্রাণ না থাকলে মা, কিসের দ্বারা ধর্ম্ম করবে?"

"যেদিন ভগবান বুদ্ধদেবের মুখে অমৃত ধর্ম্ম প্রথম শুনি, সেদিন হ'তে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা কমে গেছে। এখন অন্তিম সময়, আহার পানের সময় নেই। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে ততক্ষণ ধর্ম্মচিন্তা করে পরপারে যাবার পাথেয় সঞ্চয় করি। বাবা, তুমিও প্রমত্ত থেকো না, অপ্রমত্তভাবে ত্রিরত্নের সেবা করে যাও।"

মার কথা শুনিয়া শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী ধর্ম্মদাস হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য, বিপুল বৈভব সমস্তই তাঁর মায়ের কল্যাণে লাভ হইয়াছিল। তাঁহার মাতা শ্রাবস্তীর প্রধান শ্রেষ্ঠী মৃত শ্রীবর্দ্ধনের একমাত্র দুহিতা। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাই আশা করিয়াছিলেন মেয়ে সুমনাদেবীর পুত্র হইলে তাহাকে স্বীয় পদে অভিষিক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মচিন্তায় অন্তিম সময় অতিবাহিত করিবেন।

শ্রেষ্ঠী মনের মত বর নির্ব্বাচন করিয়া সুমনাকে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং মেয়ে ও জামাইকে পরম যত্নে পোষণ করিতেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার অমৃত ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা শত সহস্র লোককে স্বর্গমার্গ ও মোক্ষমার্গে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন।

শ্রেষ্ঠী শ্রীবর্দ্ধন এই সংবাদ শুনিয়া অনতিবিলম্বে ভগবানকে বন্দনা করিতে গেলেন। ভগবান তখন এক বিরাট জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। শ্রেষ্ঠী ভগবানের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ না পাইয়া একপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মধুর বাণী শুনিতে লাগিলেন।

ভগবান দিব্যজ্ঞানে শ্রেষ্ঠীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মোপদেশের গতি ফিরাইয়া বলিলেন "হে উপাসক উপাসিকাগণ, দাতা, শ্রীমান ও কল্যাণধর্ম্ম ব্যক্তিদের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে। শুদ্ধচিত্ত লোক যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়।" এই কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সভাভঙ্গের পর শ্রেষ্ঠী ভগবানের সমীপে গিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন "ভগবান, আমি যে সন্দেহ লইয়া আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াছি, আপনার কৃপায় আমার সে সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। আপনার ধর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তবে আমরা সংসারী লোক, নানা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকি, আপনার উপদেশ সম্পূর্ণ প্রতিপালন করা আমার মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আপনার অনুগ্রহে সম্ভব হইবে। দয়া করিয়া আগামী কল্য দীন উপাসকের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের অনুমতি করুন।"

ভগবান নীরবে সম্মতি দিলেন। শ্রীবর্দ্ধন তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘের ভিক্ষার উপযোগী আহারাদি প্রস্তুতের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। রাত্রিতেই সমুদয় আয়োজন শেষ হইল। প্রাতে শ্রেষ্ঠী ভিক্ষা প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া ভগবানকে সংবাদ দিলেন।

ভগবান পূর্ব্বাহ্নে ভিক্ষাপাত্র ও চীবরাদি গ্রহণ করিয়া সশিষ্যে শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য আসন পাতা ছিল। প্রত্যেকে স্ব স্ব উপযোগী আসনে উপবেশন করিলে শ্রেষ্ঠী স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং জামাইকে জল দেওয়ার ভার দিলেন।

শ্রেষ্ঠী স্বহস্তে ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। তৎপরে তিনি পরিবারস্থ সকলকে লইয়া ধর্ম্ম কথা শ্রবণের নিমিত্ত করজোড়ে ভগবানের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। ভগবান মধুর ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা সপরিজন শ্রেষ্ঠীকে খুব উৎসাহিত ও আনন্দিত করিলেন।

ভগবানের উপদেশে শ্রেষ্ঠীর ধর্ম্মবিষয়ে সকল সন্দেহ

দূর হইল। তিনি ত্রিরত্নের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। তিনি প্রত্যহ ভিক্ষুগণকে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভিক্ষা দিতেন, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী দিবসে বিহারে গিয়া উপবাস ব্রত পালন করিতেন। সমস্ত দিন ধর্ম্ম কথা শ্রবণ ও ধ্যান করিয়া দিবস অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। প্রতি পুণ্য কার্য্যের পর শ্রেষ্ঠী স্বীয় বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার প্রার্থনা করিতেন।

যথাসময়ে সুমনার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইল। শ্রেষ্ঠী পরম যত্নসহকারে ও সাবধানতার সহিত সুমনার গর্ভ রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। মাতার আহার, পান, চলাফিরা, চিন্তা, পাপপুণ্য কর্ম্মাদির দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের সংস্কার সমূহ সঞ্চিত হয় বলিয়া শ্রেষ্ঠী অতি যত্নপূর্ব্বক সুমনাকে কদাহার, কদাচার, কুচিন্তা ও কুকর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখিতেন।

মার গুণে সন্তানের স্বভাব গঠিত হয়। কৌশল্যার মত মা না হইলে রামচন্দ্রের মত ছেলে হওয়া সম্ভব নয়, দেবকীর মত মা না হইলে শ্রীকৃষ্ণের মত সন্তান হয় না, মহামায়ার মত মা না হইলে বুদ্ধের মত সন্তান হইতে পারে না। প্রাচীন কালে গর্ভস্থ সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য "গর্ভ পরিহার" দেওয়ার প্রথা ছিল। গর্ভিনীকে সর্ব্বদা সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখা, সদালাপে ও সৎচিন্তায় রত রাখা, ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ, ধর্ম্ম কথা শ্রবণ, দান দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করান ও শীল পালন দ্বারা সংযম অভ্যাস করান প্রভৃতিকে গর্ভ পরিহার বলে। বুদ্ধদেবের জন্মের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মহামায়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক অতি যত্নসহকারে ব্রত সম্পূর্ণ করেন এবং গর্ভ গ্রহণের পরও দশ মাস ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। ব্রতের সময় স্বামীর শরীরও স্পর্শ করেন নাই। স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ আলাপও অতি কম করিতেন।

বর্ত্তমান "সাধ ভক্ষণ" প্রথা গর্ভ পরিহারের রূপান্তর। গর্ভিনী যাহা খাইতে ইচ্ছা করে তাহা খাইতে দেওয়া ও যাহা পড়িতে ইচ্ছা করে তাহা পড়িতে দিয়া তাহার মন প্রফুল্ল রাখাই ইহার উদ্দেশ্য। গর্ভিনীর মানসিক কষ্টের দরুণ গর্ভস্থ সন্তানের কোন বিষয়ে অপূর্ণতা হয় এই ভয়ে এই সব সংস্কারের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে।

সুমনাও "গর্ভ পরিহার" লাভ করিয়া যথাসময়ে চাঁদের মত এক ছেলে প্রসব করিলেন। বংশের সেবা করিয়া লভ বলিয়া সুমনা ছেলের নাম রাখিলেন "ধর্ম্মদাস"। শ্রেষ্ঠী অতি যত্নে ও অতি স্নেহে দৌহিত্র ধর্ম্মদাসকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। সুমনাও পুত্রের শুশিক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন।

ধর্ম্মদাস ক্রমে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুসর্ব্বগুণসম্পন্ন বালক হইয়া উঠিলেন। চরিত্রের মাধুর্য্যে তিনি সকলের স্নেহ ও আদর পাইতে লাগিলেন। সকলের প্রিয় ছাত্র, মাতাপিতার স্নেহভাজন, নাতামহ ও মাতামহীর আদরণীয় হইয়া তিনি পরম সুখে শৈশব অতিবাহিত করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলেন।

শ্রেষ্ঠী শ্রীবর্দ্ধন সুমনা ও ধর্ম্মদাসের হাতে বিষয়কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মচিন্তায় অন্তিম সময় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করিয়া মেয়ে ও দৌহিত্রকে কাজ-কর্ম্ম শিখাইতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে মাতাপুত্র দুইজনে শ্রেষ্ঠীর সমুদয় কর্ম্ম ও ধনসম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাদের হস্তে সমুদয় ভার অর্পণ পূর্ব্বক বিহারে গিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি আর গৃহে যাইতেন না, গৃহস্থালীর কোন কথাও মনে করিতেন না, দিবারাত্র সংসারের অনিত্যতা স্মরণে সময় যাপন করিতেন। সুমনা দেবী স্বহস্তে নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পুত্র ধর্ম্মদাসকে লইয়া বিহারে যাইতেন এবং অতি যত্নের সহিত পিতাকে ভোজন করাইয়া মাতা পুত্র গৃহে ফিরিতেন।

শ্রেষ্ঠী-পত্নী সুপ্রিয়াও গৃহে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া ভিক্ষুদিগকে দান দিতেন। ধর্ম্ম কথা শ্রবণ, ধর্ম্মালাপ ও ভিক্ষুদিগের সেবা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হইয়াছিল। ধর্ম্মদাস মাতার উপদেশ-মতে বিষয়কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। তাঁহার সংসার পরম সুখের ও শান্তির আকর হইয়া উঠিল, সর্ব্বত্র পুণ্যের হাওয়া প্রবাহিত হইল।

ক্রমে শ্রেষ্ঠীর আয়ু পূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি একদা রাত্রে হঠাৎ প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন। পিতৃবিয়োগে সুমনা অতিশয় কাতর হইলেন। সুমনার স্বামী শান্তিবর্দ্ধন শ্বশুরী, স্ত্রী ও পুত্রের কুশল কর্ম্মে সর্ব্বদা সহায় ছিলেন। তাঁহাদের কোন পুণ্যানুষ্ঠানের পুণ্যাংশ গ্রহণ না করিয়া তিনি ছাড়িতেন না। যথেষ্ট অবসর ছিল

বলিয়া সকল সদনুষ্ঠানে তিনি আনন্দের সহিত যোগ দিতেন এবং লোকের হিতার্থে সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন।

ধর্ম্মদাস ও শান্তিবর্দ্ধন সুমনাকে নানা প্রকারে আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই বুঝিল না। তিনি দিবারাত্র পিতার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইতেন। শোক-বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রমে তিনি উন্মত্তার ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। কখনও পিতার জন্য আহারাদি প্রস্তুত করিয়া বিহারে লইয়া যাইতে ধর্ম্মদাসকে ডাকিতেন। কখনও গৃহে আসনাদি প্রস্তুত করিয়া পিতার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। কখনও পিতার জন্য বিছানা প্রস্তুত করিয়া শুইবার জন্য ডাকিতেন। কখনও বা পিতাকে আনিবার জন্য বিহারের দিকে ছুটিতেন। ভিক্ষুদের ভিক্ষার জন্য আসিতে দেখিলে ভিক্ষা দিবার জন্য পিতাকে ডাকিতেন।

ধর্ম্মদাস মাতার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া বড় ব্যথিত হইলেন এবং নানা উপায়েও মাতাকে প্রকৃতিস্থ করিতে না পারিয়া এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন।

কোন এক গৃহস্থের এক বিরাটকায় বলদ মরিয়া গিয়াছিল। মৃত বলদ মাঠে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ধর্ম্মদাস কতকগুলি ঘাস লইয়া মৃত বলদের নিকট গেলেন এবং ঘাস খাওয়াইবার জন্য নানাপ্রকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কখনও বা মুখে ঘাস প্রবেশ করাইয়া দিয়া যাইতে বলিতেন, কখনও নাকে, কখনও বা কাণে গুজিয়া দিতেন। কখনও জল পানের জন্য জল দিতেন। গরুকে উঠাইবার জন্যও তিনি নানা প্রকারে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বলদ কিছুতেই উঠিবে না। ধর্ম্মদাসেরও চেষ্টার ত্রুটি নাই। আহার, নিদ্রা, বাড়ী ঘর, কাজকর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মদাস কেবল মরা গরুর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দিতেন না। সকলে স্থির করিল ধর্ম্মদাস পাগল হইয়াছেন এবং তাঁহার জন্য সকলে বড় দুঃখিতও হইল।

লোকেরা সুমনাকে এই সংবাদ দিলে সুমনা একমাত্র প্রিয়তম পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা হইয়াছে শুনিবামাত্র পিতৃশোক ভুলিলেন। "কি আমার ছেলে পাগল হইয়াছে?"—পুত্রশোকে ব্যথিত চিত্ত হইয়া এই কথা বলিয়া তিনি বেগে মৃত বলদের নিকট গেলেন এবং স্বচক্ষে ছেলের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন "ধর্ম্মদাস, প্রাণাধিক, বাবা তুমি পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাবান। কেন তুমি মরা গরুকে ঘাস ও জল দিতেছ?" মাতার কথা শুনিয়া ধর্ম্মদাস উত্তর করিলেন—

"এই শির, এই কায়, লেজ পাদচতুষ্টয়,
সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ, আছে নেত্র দ্বয়।
তাই আমি আশা করি উঠিবে এই গোপ্রবর,
এই হেতু এত চেষ্টা করি নিরন্তর।
মাতামহের হাত পা কায় শির নাই,
কিরূপে ফিরিবেন তিনি হতে ঘর ঠাঁই?
শ্মশানেতে গিয়া কেঁদে কিবা ফল আর,
বল মাতঃ দুর্ম্মতি কি মোর না তোমার?"

পুত্রের কথায় সুমনার প্রাণ শীতল হইল। তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"আমি এবে শল্যহীন আজি নির্ব্বাপিত,
নাহি শোক, শুনি তব মধু ধর্ম্মামৃত।
প্রজ্ঞাবান কিম্বা দয়াবান্ যেই নয়,
সেই নাহি করে শোক, তুমি যথা প্রিয়বর।"

পুত্রের অপূর্ব্ব কৌশলে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুমনা দেবী পিতৃশোক ভুলিয়া শান্তচিত্তে পূর্ব্ববৎ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পুণ্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তিনি আহার নিদ্রার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পুণ্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেও তিনি একান্ত মনে ধর্ম্মচিন্তা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মদাস মাতাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য নিজে পাগল সাজিয়া অপূর্ব্ব কৌশল ও বুদ্ধিবলে মাতাকে শোকহীন করিয়া অদ্ভুত মাতৃভক্তির পরিচয় দিলেন এবং যতদিন মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন স্বহস্তে মাতার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুর পর শোকে বিহ্বল হইলেও প্রজ্ঞাবান ধর্ম্মদাস অচিরে শোক দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চল্‌তি-রসের ছড়া

কুড়ুনীর মা।

কতই না দেখব আর
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

মামীর মা বড় দুখী
গাছা ভাতে কচুর মুখী।

উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট
উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট।

তোর ছিল তোর ঘোড়া
তোরই আছুর ধীতের ঘোড়া।

দুই দেবরের মিষ্টি কথা
ঘুমিয়ে বলে কাহু,
কথা দিয়ে কথা লয়
প্রাণে যবে পাহু।

আপন খেলা লীলা খেলা
মোর লিখেছে পরের বেলা।

আমি কি নেড়ী ভেড়ী?
কাপড় কাচাই ধোপার বাড়ী।

আপ করেছেন কাটোয়া (১)
পাকুল যাবেন ভেটোয়া।

দৈবজ্ঞ যদি বলে ঠিক
তবে কেন যাগে ভিক্।

ষোলোর বাসা কলসী তোর
যা পায় ভেত যা পায় ঘোর।

ষোলশ ঘরে যা হয় চাস,
বর্ষের ঘরে যা লয় পাস।

নদী নারী নৃপবাণী
এ তিন না বিশ্বাস করি।

যা পোড়ে না পোড়ে মাসী
তাল খেয়ে ঘরে পাড়াপসী।

বিনুনে চুলুনে ঘর
কামারে জমালে বর।

চাকাই পরের পুতোর দি
যেমন ক্ষেত তেমে ফলে
এ আবার টি?

বিষ তিতো বিবিধে তিতো,
তিতো বুড়ো বর,
তার চেয়ে অধিক তিতো
দুই সতীনের ঘর।

নির্গুণ পুরুষের তিন গুণ বাস,
পরকে খাওয়া,
কাঁদে ঠাকুরদাদার পাস।

ছাকা, বোকা, চলচলে কাহা
তিনে প্রত্যয় করোনা যাহা।

পড়লে কথা লজার মাথে
যার কথা তার গায়ে বাজে।

পড়েছি মোগলের হাতে
খানা খেতে বলে সাথে।

পরনা দিয়ে খাই বই
কিসের আমার পরনা নই?

পরের দি পাই
খাই আর প্রাণীলে সোড়াই।

পরের ধন আপন ভালা
যত ইচ্ছে তত ফেলা।

পরের সোনা দিয়ামনা কাণে
কেড়ে নেবে বেঁধে কা টানে।

বাবা—সেই জন খায়
তবু হাঁদুলে বাঁদুলে যায়।

কালে যা কতই হল
পুলি পিটে লেজ বেরুল।

কালের বেলায় কালী
কাল ফুরালে পাকী।

কিসের বাই কি
পাখা তাতে দি।

যা বড় ধন—
কিসের মানী কিসের গিনী
কিসের বৃষাবন?

কুকুরের মুখে পড়ি,
কুকুর বলে আমার একি বিপত্তি?

তোর কালে নাইক গাই
ঘুটুনী দিয়ে ঘুচিয়ে যাই।

কোন্ কালে হবে গো
ঘুপুর ঘড় তুলে খো। (২)

পাবি পাখা তখন
ঐ ত পুরুষের লক্ষণ।
আমি অভাগী তপ্ত খাই
কোন দিন বা ঘরে যাই।

পাষের বোঝা মানুষ নয়
গায়ে হাত দিয়ে কথা কয়।

বড় ভক্ত রামানন্দ
পেট ভরলে আনন্দ।

বাকী ঘোড়া খেল হল
খেঁটে খল কত বল?

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।

বয়স কালে মানী
কপের কালে গিনী।

---

(১) কাটোয়া—কাঁদ।

(২) দেবর—"পাছে কাঁঠাল—গোঁফে তেল"।

হ'লে না থাকি বেলার ভাই
বেলায় গেলে খেতে পাই।

বাপ্ তলায় বিয়ন পাই
সেই সম্পর্কে মাসতুত ভাই।

গোপনে চলে না কেউ
যদের পিছে লাগে ঢেউ।

বাড়ীর মধ্যে এক দা
তার আবার অন্ধ।

রাগের জন্মে নাইকো চাষ
বাসকে বলে দুর্গা ঘাস।

যেমন ক্যাপা তেমনি ক্ষেপী
ঘুলো পিঁয়তে আনে চেঁকী।

যৌবন জোয়ারের পানি
কাল থাকতে বুঝ্‌লেনা নানী।

ছয়ন বলে কাঁচকলা ভাই
তোর—গায়ের সাথে মরে যাই।

যা—বটে
না—বটে।

নানী যার শতরঞ্জা
যেমন কীর্ত্তনে মরা।

যার বিয়ে তার মনে নাই
পাড়া পড়শীর ঘুম নাই।

ওরে বিধি বাইরে বিধি
খেতে যেয়না বাদল বিধি।

সবারই একদিন আসে শেষ,
ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে।

চরণামৃত—চরণামৃত,
না মিষ্টি না তিক্ত।

বুড়ির ঘোমে পাই কষ্ট
কাঁকড়া খেয়ে রবিবার নষ্ট।

ভোরের মায়ের বড় গলা
রোজ খায় দুধ কলা।

ছুঁড়ো যদি আসর মাঝে
তবু কি তার গয় চাকে?

ছেলে যারে ঘট যারে,
আপনার ক্ষতি আপনি করে।

ছোট সরাটি ভেঙ্গে গেছে,
বড় সরাটি থাকে
নাচো কোঁদো কেন বউ আমার
হাতের আবাজ আছে। (১)

জন্মে করে নাই লক্ষ্মী পুজো,
একেবারে বশমুজো।

গাল্ পুড়লো আপন ঘোরে,
কি কমুরে ঘরিয়ারে?

আলা দিতে নাই ঠাঁই,
আলা যেন সতীনের ভাই।

টক্ টোপো আঁটি সারা,
এই আম বিলাবার পারা।

বাইরে জামাই বসুসুদন
ঘরে জামাই যমো:
ভাত খাওরে বসুসুদন
ভাত খেয়ে যে যমো।

বিধি যদি করে দয়া
পুত বিয়োতে কতক্ষণ?

বিধি যখন বড় হবে
নিয়া তখন ঘরে যাবে।

বিয়াত্রিসের হাতে 'সৌভাগ্য'
ঠাকুর—ঘর পড়ো 'ধলিবাস'।

মুখলায় যাব—মুলো কিন
কলুলো ওয়া—খেলায় কিন।

ছেলে কি জানে কপূরের গুণ?
শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন।

বেয়াই যত খায় ঘি
মুখ দেখেই চিনেছি।

বৈকুণ্ঠ হইতে বড় অমে ছিল সাধ
'কৃপাবলি' লোক ওরে
পড়ে গেল বাধ।

আষাঢ়ে বড়া পড়ে
শহুনির উদর বড়ে।

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে,
তার বাইনে চৌদ্দ সিকে।

ভাগের ভাগ পাই
খাই বা খাই ছিটিয়ে বেলাই।

ওরে কাঁকর বালালী
তাদা খারে খোড়লী।

ভাত পায় না—গায়ের বাথর
ঘুলো খেয়ে পেটটি ভাথর।

হাহাও নয় না
নায় ও নয় না।

ভাল বাসায় এমনি গুণ
পায়ের লক্ষে যেমন চুণ
কম হলে লাগে খাল
বেশী হলে পোড়ে গাল।

ভীম রোগ কর্ণ সেল
সন্ধ্য হল রবী,
হস্ত পূর্ব্ব অস্ত গেল
জোনাকীর পাছে বাতী।

কর্ত্তা বড় তেজী
ঘ'রের ঘরের বেজী।

মন হলে যাদুর ঘরি
খোলা হলে মেরে থারি।

নদীর সোণা নদী
ওড়ার চিল বদী।

(১) ছোট সরাটি ভেঙ্গে যাওয়ায় বউ বড় সরায় বেশী ভাত পাবার আশা করেছিলেন, শাশুড়ী তাই জামায়ের যে বেশী ভাতের আশা করা বৃথা।

আমার নাম আহলাদ মাজ
সাথী সঙ্গ নেই লাজ।

পাঁ পাঁয়াতে পাঁয়া মারে
বিড়াল তাবে তাড় মারে।

রূপের সাগর রসের সাগর
যদি ধন পাই
আদর করে করি তারে
বাপের জামাই।

রাজার ঘোরে রাজ্য নষ্ট
স্ত্রীর ঘোরে স্বামীর কষ্ট।

আমার—রাণী
আমার—রাণী।

কালার গুণ বুঝলি না
এখন—সুখের বিয়ে ঘুরে যা।

লজ্জায় রাংগ মুলো
বেটনা সতী সাধ্বী হল।

ঘরে হয়তে খাই নাই
সে বড় মাঁদুনী
যার লগে ঘর করি যাই
সে বড় ঘরনী।

যে দিল অন্তরে ব্যথা
তার সঙ্গে কিসের কথা?

ঘর দিল বাড়াবুন
লব হল কীর্ত্তনে।

বেহুলে ঘটাঘটি
কাঁদিয়ে ভিজায় মাটি।

যদি দেখে চাপাচাপ
মনে মনে মনস্তাপ।

কপাল মন্দ এক দেখে
সবাই মরণ ভাল্ দেখে।

ঘরোয়া ভাগ্যবতী
পরের পুত্রে পুত্রবতী

বাচ্চলে জামাই খান না পিঠে
স্নেহ বেড়াবি চেঁকশাল ছেটে।

যার খোলায় ঘর
তার কথায় চাল।

যার বি—তার জামাই
পাড়া পড়শীর কাউনা জামাই।

মধুরের মাঝে দেখি
লেজ ঘুরায় টুনি পাখী।

মরম কা ব্যথা
ব্যথী কা মীত।

টেকো মাথায় উঠলো চুল
মরা বাপকে ফুটলো কুল।

গরলা গুরে বি
মায়ের গুণে বি।

যায় ফুলে মিঠে
মায়ে ফুলে পিঠে।

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে
কাল কহলে এঁড়ে গরু কিনে।

উলুর বেলায় দুধে মা
খাবার বেলায় পদ্মার মা।

মরম কর যৌবনের ভরে
দেখে—কীটতে হবে অবোর ঘোরে।

ঘর ভরা ধান
কিনে রাখে মান।

গায়ে ফুল্লরা পরে সবাই
মাধবের আমার কেউ নাই।

গায়নের নেই ঠিকানা
তবুই বলে চাক্ বাজানা।

গায়ে ওড়ে খড়ি
কলপ্ করে দাড়ী।

বিয়ির উপর বিয়িপনা
তারা পিঁড়ের আলপনা।

মা ডাকলে সেলাম না,
বাপী ডাকলে সেলাম না,
সাতপুরুষে চেঁকী বলে
পাল্লা খা পাল্লা খা।

এলে মেলে মানুষের ঘুটুর
চাটলে চুটলে গরুর কুটুর।

মার জোটেনা কাঁথায় শুতো
বেটার পায়ে চৌখ ঝিকের জুতো।

মা পোড়ে না পোড়ে মাসী
খাল খেয়ে ঘরে পাড়াপড়শী।

মা খেতে যায় নষ্টে শাক
বেটার মাথায় বাবোনাই পাগ।

মামার ঘর যদি মামীর বড় চল
আমানি পান্তর পাবে,
নতা পতা ফল।

মায়ের নাম ঝিউড় মাসী
মেয়ের নাম পদ্মরাণী।

যেই ঘর যেই বাড়ী
বইসে পদ্মার চাকাই শাড়ী।

দুঃখের কথা কারে জানাই
ঘরের পুত ঘর—শাশুড়ীর জামাই।

সন্দর্ভের বলিহারী যাই—
"মাসীর মায়ের বকুল-ফুলের
বোনপো বৌয়ের বোনঝি-জামাই।"

[ক্রমশঃ]

গ্রন্থ-সমালোচনা

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়—শ্রীযুক্তা বিনোদিনী মিত্র প্রণীত। "সাধু নাগ মহাশয়" নামে পুস্তকাকারে ইতিপূর্ব্বে নাগমহাশয়ের জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ও বহুলরূপে সমাদৃত হইয়াছে। পরে তৃতীয় কন্যা শ্রীযুক্তা বিনোদিনী মিত্র "শ্রীশ্রীনাগমহাশয়" নাম দিয়া তাঁহার জীবনের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত যত উপাদান পূর্ব্বে ছিল সে সমুদায় পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। ভক্তজীবনী পাঠে সকলেরই পরিতৃপ্তি হয়। সাধুজীবনীতে অনেক অলৌকিক ব্যাপার থাকে, এ পুস্তকখানিতেও অস্বাভাবিক পরিমাণে তাহা আছে, কিন্তু অস্বাভাবিক কিম্বা আদৌ গল্প ঘোটেই নয় বরং মধুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পুস্তকখানি অতি সরল ভাষায় লিখিত। এমন ভক্তজীবনী আমরা দেশের সাধারণের, বিশেষতঃ মা-বোনদের হাতে দেখিতে আশা করি। পুস্তকের আকারের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, বেড় টাকা মাত্র। প্রকাশক—শ্রীযুক্তা মিত্র, ৩।১।৪, পাঁচু খানসামা লেন, কলিকাতা।

ভারত নারীর সৎসাহস ও বীরত্ব—বাঙ্গালার বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত সংবাদ। মাতৃ-মন্দিরেই এই সকল সংবাদ যথাপেক্ষা বেশী পরিমাণে প্রকাশিত হয়, এজন্য মাতৃ-মন্দিরের সাহায্য লইলে আরও অনেক চিত্তাকর্ষক সুন্দর সংবাদ স্থান পাইতে পারিত। সে যাহা হউক, এ গ্রন্থ বঙ্গবাসীদের প্রাণে শক্তি সঞ্চিবার পক্ষে অনেক সহায়তা করিবে। পাটনা—মোহোরপুর হইতে শ্রীমধুসূদনচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ৸৹ আনা।

নারী ধর্ম্ম—প্রাচীন শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দজী গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রন্থখানিতে প্রাচীন কালের নারীধর্ম্ম যেভাবে লিখিত হইয়াছে সে হিসাবে গ্রন্থখানি খুবই মূল্যবান; তবে বর্ত্তমানে ঐ সকল রীতিনীতি পালন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। জাতি যখন উন্নতির পথে ধাবিত হয় তখন তাহার মধ্যে নানা নূতন মত প্রবর্ত্তিত হইয়া জাতিকে পুষ্ট করিতে থাকে, আর যখন জাতির অবনতি হয় তখন কোন নূতন মত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় না, তখন প্রাচীনতার রক্ষা করিতে চেষ্টা করাই বুদ্ধির কার্য্য। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়, ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ সিকা।

প্রাচীন চিত্র—কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তররাম চরিত—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের এই তিনখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নায়কনায়িকাদের চরিত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা। যাঁহাদের ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের সুযোগ নাই তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া অনেকটা রসাস্বাদ ভোগ করিতে পারিবেন। মৈথাটী কাঁঠালপাড়া নিবাসী পণ্ডিত রামসহায় বেদান্তবাগীশ প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা। প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শিশুপরিচর্য্যা—Messrs Joseph Nathan & Co: কর্ত্তৃক প্রকাশিত শিশুপরিচর্য্যা নামক একখানি পুস্তক পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। যদিও পুস্তকখানি প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য—তাঁহাদের "Glaxo" নামক উৎকৃষ্ট শিশুখাদ্যের প্রচার করা, তথাপি শিশুপালন এবং শিশুদের পথ্যাদির বিধান সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কন্যাদায়ের প্রতিকার—এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বুঝাইতে চাহেন যে, আমাদের এই দরিদ্রপ্রধান দেশে একটী ব্যক্তির বহু সন্তান জন্মিলে তাহাতে পরিবার আরও দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং সেই নিমিত্ত দেশও দুর্ব্বল হয়। দু-একটী মাত্র সুস্থ-সবল সন্তান জন্মিয়া বাঁচিয়া থাকিলে তাহাই পরিবারের কল্যাণকর হয়। আমরা বিশেষ কথা, অনেকেরই অধিকাংশ সন্তান জন্মে। পরন্তু অনেকে বৈষয়িক দায়িত্ব সুখকে বর্জ্জন করিতে পারেন না, তাহারই ফলে সন্তান জন্মিয়া সংসারের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। এই অভাব অনুভব করিয়া গ্রন্থকার দেশীয় এবং পাশ্চাত্য কৃত্রিম প্রথায় সন্তান উৎপাদন সংযত করিবার কতকগুলি নিয়মপদ্ধতি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। দাম্পত্যজীবন যাহাতে সুখময় হয় পরস্পর প্রেমের ডোরে, তাহার দিকে লক্ষ্য রহিয়াছে। আত্মসংযম না করিতে পারিলে দাম্পত্যজীবন দুর্ব্বহ ভার হইয়া পড়ে। যাঁহারা আত্মসংযম দ্বারা, সন্তান উৎপাদন পরিমিত করিতে অসমর্থ তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থের উপদেশগুলি বড় মন্দের ভাল। এ সম্বন্ধে অনেক পাশ্চাত্য মতামত গ্রন্থখানিকে বহু পরিমাণে সার্থক করিয়াছে। প্রকাশক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৯।১, বেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

গান্ধিক একাকার—ডাঃ শ্রীমাতঙ্গভাব দত্ত গুপ্ত প্রণীত। এক্ষণত পূজা, মূল্য আট আনা। বৌদ্ধ ও হিন্দু সংঘর্ষে ভারতের জাতীয় অবনতির কারণ উল্লেখ করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসাকে রাজধর্ম্ম রূপে বলে কর্ম্মবাদের ঢাল দিয়া ভারতকে অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, গ্রন্থমধ্যে ইহাই প্রমাণের যথেষ্ট উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। ভিন্নার যৌক্তিকতায় এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, তবে এই সকল দুরূহ বিষয় সরল ভাষায় ফুটাইতে পারিলে আরও ভাল হইত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার, নবদ্বীপ।

শান্তিপুর শ্রীরাস-মণ্ডল পরিচয়—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর লীলাক্ষেত্রের শান্তিপুর বহুদিন হইতেই হরিনাম-প্রসিদ্ধ স্থান ও বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়া খ্যাত। আলোচ্য ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে স্থানীয় বহু দেবদেবী ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের পরিচয় এবং শান্তিপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সরল পদ্যে বিবৃত করা হইয়াছে। শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈত-ভাবতা তখন হইতে কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য।

মিথিলায় ভগবান—শ্রীগৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। রামায়ণ-বর্ণিত রামচন্দ্রের বিবাহ-ঘটনা অবলম্বন করিয়া নাটকখানি লিখিত। নাটকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, ঘটনাকৌশল চমৎকার, চরিত্রগুলিও বেশ সামঞ্জস্যের সহিত সমাবেশ করা হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা। পোষ্টেজ ১০০, কবিরা, মানভূম—এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

বিলাসিনী—গল্পের বই। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সম্পাদক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ-র্যাট-ল প্রণীত। ছোট গল্প রচনায় বিলক্ষণ প্রভাতবাবুর রচনার নূতন পরিচয় দিবার কিছুই নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানির বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্পগুলি সুপাঠ্য। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। অনেকগুলি ছবি থাকায় গ্রন্থখানি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—মানসী প্রেস, ৩৫।১।এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০ পাঁচ সিকা।

অস্পৃশ্যের মুক্তি—মুদিয়া অন্ত্যজ আশ্রম হইতে শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, মূল্য চার আনা। ইহা হরিজন এবং হিন্দু সমাজভুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তি অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে যে সকল মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিতেছেন তাহা। বঙ্গানুবাদে অস্পৃশ্যতা মুক্ত করে বেশ সুখপাঠ্যরূপে প্রকাশিত। জাতি যখন অবনত হইতে থাকে তখন পরস্পরের মধ্যে প্রেমের ভাব থাকে না, তাহারই ফলে একে অন্যকে ঘৃণা করিতে থাকে। কেবল চক্ষুপ্রকে হয়ত অনেকে দোষী মনে করেন কিন্তু দেখা যায় অন্তরে প্রেমই এই দোষ দূর। তাঁহারাও অনেকাংশে আমাদের ঘৃণা করেন। ভারতের অস্পৃশ্যতার মধ্যেই এই অবনতির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অস্পৃশ্যের মুক্তি হইলে যে কেবল অস্পৃশ্যই মুক্ত হয় তাহা নহে, মুক্তিদাতাও তাঁহার মনের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হন; ইহা তাঁহার আত্মার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক। এই গ্রন্থখানিতে অনেকের কল্যাণ করিবে আশা করা যায়।

দীপালি সঙ্ঘ।

নারীসমাজকে জ্ঞান-কর্ম্মে সজীব ও আনন্দময় করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে আজ চারি বৎসর হইল ঢাকা সহরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ঢাকা সহরে ইহার সভ্য সংখ্যা দুই শতের অধিক হইবে। এই সামান্য সর্ব্বসাধারণ মহিলাদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে নূতন প্রেরণা ও আশা দান করিয়াছে। প্রথমে শিক্ষা শিল্প ও সমাজসেবা লইয়া কাজ আরম্ভ হয়। মহিলাদের মধ্যে শিল্পের উৎকর্ষ বিধানার্থ প্রতি বৎসর একটি মহিলা শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইয়া থাকে। দীপালি-ভাণ্ডার নামে একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দীপালি সঙ্ঘের মূলধনে পরিচালিত।

বর্ত্তমানে দীপালি সঙ্ঘ ধর্ষিতা ও অত্যাচারিতা নারীদিগের সাহায্যকল্পে একটি নারীরক্ষা ফণ্ড খুলিয়াছেন। ইহা হইতে উক্ত উদ্দেশ্যে আবশ্যক ব্যয় করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে প্রায় ছয় শত টাকা ফণ্ডে জমা আছে। মহাত্মা গান্ধি সঙ্ঘের কার্য্য দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মহিলাদের শারীরিক উন্নতি বিধান ও প্রয়োজন বোধে আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে লাঠি খেলা শিক্ষা হইতেছে। ইহাতে শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চার সঙ্গে প্রভূত আনন্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ঢাকা দীপালি সঙ্ঘের অনুকরণে কলিকাতা দীপালি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। ইহারাও জ্ঞানচর্চ্চা, শিল্পকার্য্য, সমাজ সেবা, ব্যায়াম ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা দ্বারা সঙ্ঘকে বিশেষ পুষ্ট করিতেছেন। গত ফাল্গুনের মাতৃ-মন্দিরে ঢাকা ও কলিকাতার বিবরণ সম্বলিত প্রবন্ধ এবং কলিকাতা শ্রীযুক্ত পার্কের ইহাদের লাঠি খেলা শিক্ষার্থিনীগণের ছবি প্রকাশিত হইয়াছে।

গত চার বছরের কথা

বাংলার নারীর অবস্থা চিন্তা করে চারিদিক অন্ধকার দেখতাম। আশার ক্ষীণ আলোকের ভিতর দিয়ে "মাতৃ-মন্দির" প্রথম দেখা দিয়েছিল। বৎসরের পর বৎসর ধীরে ধীরে বাংলার মেয়েদের মাতৃ-মন্দিরের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ দেখে আমাদেরও আশা বেড়ে গিয়েছে। সম্মুখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোক দেখতে পাচ্ছি। বাংলার মেয়েদের মধ্যে সত্যই জীবনের সাড়া এসেছে।

দেশের প্রাচীনপন্থীগণ মেয়েদের এই আত্ম-অনুভূতির ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে সন্দীহান ছিলেন; কেউ কেউ এর প্রতিকূলেও ছিলেন। কিন্তু সকলেই দেখছি এখন অনুকূলে এসেছেন। সকলেই বুঝেছেন, দেশের মা-দিগকে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন করে রাখলে দেশের সন্তানগণও অন্ধ হয়ে জন্মাবে। তাই এখন মনে হয় ভগবান বুঝি বাংলার মেয়েদের এই সাধনার প্রতি অনুকূল হয়েছেন।

আরম্ভের সময়ে মাতৃ-মন্দির পুরুষেই মাত্র পড়তেন, বাইরের বৈঠকখানায় এর স্থান ছিল। বর্ত্তমানে মাতৃ-মন্দির একেবারে অন্দরমহলে গিয়েই হাজির হয়, বাহিরের কেউ খুললে তার জন্য মেয়েদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, কারণ অন্দরমহলের কর্ত্রীরাই হয়েছেন এর মালিক। আজ সারা বাংলার ও বাংলার বাহিরের ত্রিশ হাজারের উপর বঙ্গ-মহিলা আগ্রহের সহিত মাতৃ-মন্দির পড়ছেন।

মাতৃ-মন্দির আরম্ভ থেকে এই চারি বৎসরের মধ্যে দেশের কি কি কাজ করেছে;—

চার বৎসর পূর্ব্বে মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন লেখাই সাময়িক পত্রিকায় স্থান পেত না। মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলবার কইবার আছে, এ ধারণা অতি কম লোকেরই ছিল। প্রথম বৎসরের মাতৃ-মন্দিরে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়েই মেয়েদের সম্বন্ধে চিন্তা দেশের লোকের প্রাণে জেগে উঠল। মেয়েদের আত্মকথা নিবেদনের স্থান হ'ল। তারপর থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় মেয়েদের সম্বন্ধে বহু বহু প্রবন্ধ বের হ'তে আরম্ভ হল। বর্ত্তমানে এমন কোন পত্রিকাই দেখা যায় না, যাতে মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু না কিছু লেখা না থাকে। এই চার বৎসরের মধ্যেই যে বাংলায় এতটা পরিবর্ত্তন এসেছে, এতে আমাদের আনন্দের সীমা নেই। তারপর মাতৃ-মন্দিরের বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ এবং সংবাদ বিশেষ বিশেষ পত্রিকায় নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে বাংলার মেয়েদের দিকটাকে পুষ্ট করে তুলেছে।

সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লেখা মেয়েদের মধ্যে প্রায় ছিল না বললেই চলে। দু-একজন শিক্ষিতা মহিলার দু-চারখানি কবিতার বই বা উপন্যাসের বইএর জন্যে সুলেখিকা বলে কিছু খ্যাতি ছিল। মাতৃ-মন্দিরে তাঁরা তাঁদের আত্মকথার আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন। অনেকের চিন্তা প্রখর থাকলেও ভাষার প্রথমতঃ অধিকার ছিল না। আমরা ভরসা দিলাম, অনেক কাঁচা লেখা সংশোধিত হ'য়ে মাতৃ-মন্দিরে প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ হল। আজ লিখিত সাহিত্যে মেয়েদের দখল এসেছে। বর্ত্তমানে বহু পত্রিকায় বহু ভাবে তাঁরা তাঁদের চিন্তাধারা প্রকাশ করবার শক্তি ও সুযোগ পেয়েছেন।

কিছুদিন আগে বাংলার বিভিন্ন পল্লীতে যে সকল জনহিতকর কার্য্য সম্পর্কে সভা-সমিতি হ'ত তাতে মেয়েদের স্থান ছিল না। আজকাল অধিকাংশ সভাতেই পৃথক ভাবে মেয়েদের জন্য স্থান নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে এবং সেই স্থানের পরিমাণ দিনদিনই প্রসারিত হয়ে চ'লছে। এমন কি, দেশের শিল্প-প্রদর্শনী, শিশুমঙ্গল-সমিতি প্রভৃতি সাধারণ জনহিতকর অনুষ্ঠানে অনেকস্থলে নারী-পুরুষ সমানভাবে কাজ ক'রে ঐগুলিকে বিশেষভাবে কার্য্যকর ক'রে তুলছেন।

ঘরে বাইরে মেয়েদের প্রতি অত্যাচারের কথা অথবা মেয়েদের মধ্যে কেউ কোন ভাল কাজ করলে সে সব কথা সাধারণে প্রকাশের স্থান ছিল না। কেবল 'সঞ্জীবনী' আর 'প্রবাসী' এর কিছু কিছু প্রকাশ করতেন। বর্ত্তমানে মাতৃ-মন্দিরে আলোচনা ও নানা কথার ভিতর দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে মেয়েদের ভালমন্দের কথা প্রকাশিত হয়ে সমাজে প্রচারিত হচ্ছে।

বাংলার মেয়েদের সাধারণ শিক্ষার পথ অতি সঙ্কীর্ণ এক – শৈশবে পল্লীর পাঠশালায় আর গৃহে আত্মীয়-স্বজনের কাছে। কিন্তু এতে কোনমতে দু-দশ লাইন চিঠি লেখা আর রামায়ণ মহাভারত পাঠ করা, এই মাত্র ছিল তাঁদের শিক্ষার গণ্ডী। মাতৃ-মন্দিরের ভিতর দিয়ে দেশের কল্যাণকামী চিন্তাশীল লোকদের লেখা সুচিন্তিত সুরুচি সম্পন্ন বিষয় মাসে মাসে নূতন মূর্ত্তিতে বাংলার সহর পল্লীর গৃহে গৃহে পৌঁছে মেয়েদের শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের আকাঙ্খাকে প্রতি নিয়ত জাগরিত করে রাখছে। অর্থকরী শিল্পশিক্ষার বিষয় মেয়েদের পক্ষে ছিল আকাশকুসুমের মত। মাতৃ-মন্দিরে প্রথমবর্ষ থেকেই মেয়েদের উপযোগী অর্থকর কুটির শিল্পের নানা উপায় প্রকাশিত হয়ে আসছে।

মেয়েদের হাতে কাজ ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করা জনসমাজে নিন্দনীয় ছিল। মাতৃ-মন্দিরের এ পর্য্যন্তকার আলোচনায় দেশের মেয়েদের এ দিকে মন এসেছে। কুটির-শিল্প সম্বন্ধে মাতৃ-মন্দিরের সম্পাদকীয় মৌখিক প্রবন্ধাবলী দেশে নূতন ধারা দিয়েছে। তার ফলে অনেক মহিলা-শিল্প-শিক্ষালয় বাংলার নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন কি মেয়েদের প্রস্তুত শিল্পের জন্যই পৃথক ভাবে মহিলা-শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হয়ে থাকে।

নারী কল্যাণ সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তন দেশে এসেছে এই সকলের মূলেই এই মাতৃ-মন্দির পত্রিকাখানিকে উল্লেখ করলে আমাদের একটি অজ্ঞতামূলক আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায়। তবে একথা খুব সত্য যে, উল্লিখিত পরিবর্ত্তন গুলি মাতৃ-মন্দির প্রকাশিত হবার পর থেকে এই চারি বৎসর কাল মধ্যেই বিশেষভাবে বাংলার জনসমাজে দেখা দিয়েছে।

মাতৃ-মন্দিরের পক্ষ থেকে দেশের মেয়েদের অনুকূলে এমন কিছুতেই কাজও হয়ে থাকে যা সাধারণের জানবার সুযোগ ঘটে না। বালিকাবিদ্যালয়, মিউনিসিপালিটি, রেল-ষ্টিমার প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অভাব অভিযোগ অনেক সময় পত্রিকায় না করে ঐ সকল তৎতৎ স্থলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে জানান হয়। অত্যন্ত সুখের বিষয় অধিকাংশ-স্থলেই সেগুলি তাঁহারা আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ ক'রে থাকেন।

একটা দুঃখের সংবাদ এখানে প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি যে নারীদের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ যে সকল আমাদের নিকট উপস্থিত হয় আমরা সে সম্বন্ধে যৎসামান্য পরামর্শ দান ভিন্ন কিছুই করে উঠতে পারি না। ঐ সম্বন্ধে কিছু কাজ করতে হলে একটি স্বতন্ত্র ব্যাপারের ভিতর গিয়ে পড়তে হয়, পত্রিকা পরিচালকদের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। তথাপি ঐ সকল বিষয় আমরা উপেক্ষা করব না। আমাদের দ্বারা যে ভাবে যতটুকু কাজ হতে পারে তার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত আছি।

মেয়েদের জন্য পত্রিকা পরিচালন অতি দায়ীত্বপূর্ণ কাজ। বিশেষতঃ তাঁহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের জন্য যে সকল কথা বলতে হবে তা অত্যন্ত ভেবে চিন্তে বলতে হয়। এই অনুকূলে আমরা দেশবাসী স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট পরামর্শাদি পেতে আশা করি। পত্রিকার সাধারণতঃ কি কি দোষ পরিলক্ষিত হয়—কি হ'লে ইহার উৎকর্ষ হ'তে পারে এ সম্বন্ধে দু-এক কথা যখন যা মনে হয় সেগুলি যদি দয়া ক'রে আমাদিগকে লিখে পাঠান তবে এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ সহায়তা করা হবে।

বাঙ্গলার প্রায় দশ লক্ষ স্ত্রীলোক লেখা পড়া জানেন। এই লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোক, প্রতি দশ জনের মধ্যে একজন মাত্রও যদি মাতৃ-মন্দির পাঠ করেন তবে মাতৃ-মন্দিরের এক লক্ষ পাঠিকা হ'তে পারে। আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণ যদি প্রতি বৎসর অন্ততঃ একটি করে নূতন গ্রাহিকা দেন তবে কয়েক বৎসর মধ্যেই ইহা পূর্ণ হয়। এখন সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, মাতৃ-মন্দিরের সহায়তায় বাংলার মেয়েদের শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের প্রসার করবার বিধান আমাদের পাঠক পাঠিকাদের দ্বারাই সম্পন্ন হ'তে পারে। আগামী বৈশাখ হতে মাতৃ-মন্দির বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হবে।

নানাকথা

ফাল্গুনের নূতন গ্রাহক—

(১) লীলাময়ী দেবী—মহকুমা। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(২) নলিনমোহন মুখোপাধ্যায়—রামরামাবাদ। ১৩৩০ বৈশাখ হইতে
(৩) বিজয়কৃষ্ণ দাস—কলিকাতা। বৈশাখ হইতে ১৩৩০ চৈত্র।
(৪) আর, এন্, দাস—আসানসুন। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(৫) লালচন্দ সিংহ—দিল্লী। বৈশাখ হইতে ১৩৩০ চৈত্র।
(৬) সুপ্রভা দাস—ময়মনসিংহ। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(৭) আর, সি, দাস—রংপুর। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(৮) মনীষাবালা দত্ত—হাটি। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(৯) কুমারী সুবর্ণপ্রভা সরকার—বোলপুর। বৈশাখ হইতে চৈত্র ৩৩।
(১০) ইন্দুবালা দাসী—বগুড়া। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(১১) হেড পণ্ডিত, খোশালপুর বালিকা বিদ্যালয়—ময়মনসিংহ।
(১২) এস্, মুখার্জ্জি—কলিকাতা। অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৩১ কার্ত্তিক।
(১৩) সুকুমার গুহ—বগোহর। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(১৪) সুরভিবালা বালা—কুষ্টিয়া। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(১৫) নিবারণচন্দ্র সিংহ—খুলনা। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(১৬) হরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—কাশীপুর। ১৩৩১ বৈশাখ হইতে।
(১৭) সুধাংশু সেনাপতি—শ্রীহট্ট। অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৩১ কার্ত্তিক।
(১৮) হেমপ্রভা দেবী—মহকুমা। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(১৯) কাজি কাসেম সরদার—বর্দ্ধমান। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(২০) বসন্তকুমারী দে—মেদিনীপুর। ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সাল।
(২১) সুশীলিনী মজুমদার—বাটাজোড়, বগোহর। ১৩৩১ বৈশাখ হইতে

উচ্চ শিক্ষা—

আমাদের দেশে পুরুষদের শিক্ষা যেমন অনেকাংশে ভাবে চলিয়াছে, মেয়েদের শিক্ষা তাহার চেয়েও অনেকাংশে ভাবে চলিয়াছে; অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এ কথা বলিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বেথুন কলেজের বার্ষিক সভায় বর্ত্তমান ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ও ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিয়া অনেকস্থলে দেখা যায় তাঁহারা নারীসুলভ মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত হন। এমন কি নারীর সর্ব্বপ্রধান গৌরবের মাতৃত্বটিও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য হইয়া উঠিতেছে না। শিক্ষা সকলেরই প্রয়োজন ঘটে, কিন্তু অবশ্যকরী ও গ্রহণে হইলে তাহা আরও বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে। আমরা আমাদের মত বহুবার প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তা মহিলার সংখ্যা এখনো কম নহে। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু মতামত জানিতে চাই।

নারীজাতির উন্নতিকল্পে—

বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১৯২৭ সালের জানুয়ারী হইতে সংযোজনশীল নারী-শিক্ষালয়ের সাহায্যার্থে ও বৎসরের জন্য মাসিক ৩৫০৲ টাকা ও সন্তরণশীল নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্যার্থে এক বৎসরের জন্য মাসিক ১১৫৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আমরা এজন্য গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিতেছি।

মিশনারী বালিকা-বিদ্যালয়—

খ্রীষ্টান মিশনারীগণ বাংলার সহর পল্লীতে বহু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যা শিক্ষাদানের অনেক সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এই ঐকান্তিক চেষ্টা ও অর্থব্যয় তাঁহাদের উদ্দেশ্য এমনকে সার্থক করিয়াছে। একটি বিষয় আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, বাংলার মেয়েদিগকে তাঁহারা যেভাবে শিক্ষাদান করিতে চাহেন আর মেয়েদের অভিভাবকগণ মেয়েদের যেভাবে শিক্ষাদান করিতে চাহেন, এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেক স্থলে মেয়েদের ঘাড়ে বাইবেলের জন্য এত অধিক চাপ পড়ে যে, হিন্দু মেয়েদের পক্ষে তাহা দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। আমরা বাইবেল শিক্ষার বিরোধী নহি, কিন্তু উহাকেই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া মিশনারীগণ বালিকাবিদ্যালয়ের পরিচালন করেন, তবে তাহাদের উদ্যমকার প্রশংসা করিব না।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব—

বিগত এণ্ট্রান্স পরীক্ষাতে নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি—খাপাপাণি সিংহ—ইতিহাসে ১ম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করিয়া, প্রিয়ব্রতা দত্ত—অঙ্কশাস্ত্র পণ্ডিত, ১ম বিভাগে ৩য় স্থান অধিকার করিয়া, কোয়া খাসা—ইংরাজী সাহিত্যে, ২য় বিভাগে, রেণুকা চৌধুরী ঐ তৃতীয় বিভাগে, জে, হেলেন রোজেওস্—বাঙ্গালা সাহিত্যে, ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করিয়া, ইউনী দাস—ফার্সি পাঠে, ১ম বিভাগে, ২য় স্থান অধিকার করিয়া)। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে কয়েকটি হিন্দু ছাত্রী আছেন এবং একটি বিদেশিনী খ্রীষ্টান ছাত্রী বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

মানভূমে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা—

হোসেনাবাদের পুরুলিয়া সহরে সর্ব্বশ্রী ভদ্রলোকগণের সম্মিলিত চেষ্টায় একটি আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এই অঞ্চল বিশেষ অনুন্নত। এখানে হাজারেকরা সাতজন স্ত্রীলোক ঘোমটাশূন্য অবস্থায় দৃষ্ট হয়। এখানকার অনেকের

যায়না, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে শীঘ্র বিধবা হয়। এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অঞ্চলে বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন আছে। এই বিদ্যালয়-স্থাপন-কমিটিতে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র মাতৃ-মন্দিরের হস্তে আসিয়াছে। সভ্যবর্গ তাহাদের কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র (Retired Dy. Magistrate) মহাশয়ের নিকট পুরুলিয়া (মানভূম) ঠিকানায় অর্থসাহায্য পাঠাইবেন।

বঙ্গে বিধবাবিবাহ—

বঙ্গীয় বিধবাবিবাহ সমিতির তৃতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে সমিতির উদ্দেশ্য তিনটি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—(১) সত্যের অনুসন্ধান ও প্রচার, (২) বিধবাবিবাহ প্রচলন দ্বারা নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, (৩) সমাজের হিতসাধন ও সমাজের পুষ্টি সাধন। কার্য্যবিবরণীতে জানা যায় ইং ১৯২৬ সালে একটি বিধবা ব্রাহ্মণ, দুইটি কায়স্থ, একটি নাপিত, একটি তিলি, দুইটি সাহিত্য এবং তিনটি অসবর্ণ শূদ্রজাতীয়—মোট এগারটি বিধবার পুনর্বিবাহ হইয়াছে। বয়স ১২ হইতে ১৮ বৎসর। সমস্ত বিবাহই হিন্দুমতে সম্পন্ন হইয়াছে। তাহা খুব বেশী না হইলেও বাংলার মত নব প্রচেষ্টায় উদ্যমহীন দেশের পক্ষে ইহাদের এই কার্য্য কম নহে।

মাতৃ-জাতি সেবক সমিতি—

৺ব্রজ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট স্থাপিত, কলিকাতা মেসেরেগণের সাহায্যে পরিচালিত। মহিলাদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রচারের জন্য মাতৃ-জাতি সেবক সমিতির পরিচালকগণ কিছু কিছু কাজ করিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

কালনা বালিকা বিদ্যালয়—

কালনা বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভা বর্ষমানের বিদ্যোৎসাহিনী সভাগৃহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভা উপযুক্ত লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেও আমাদের একটু বলিবার বিষয় এই যে, বালিকাবিদ্যালয়ে স্থানীয় মহিলা সভ্যদেরই দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য করাইলে অধিকতর শোভন হইত। কারণ তাহাতে ছাত্রীদের মধ্যে একটু দেশাত্মবোধ জাগিয়া ওঠে।

লক্ষ্মী সরস্বতীর বরকন্যা—

আলীগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান পরিচালকের আর এক নাইয়াছেন একজন ভারতীয় নারী—ইনি কৃপালের বেগম সাহেবা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক উপাধি দানের উৎসব সভায় তিনি কয়েক মূল্যবান্ নারীহিতকর প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। একেই বলে লক্ষ্মী সরস্বতীর বরকন্যা।

নারী-সৈন্যবাহিনী—

চীন দেশে চীনবাসীদের সহিত ইয়োরোপের সমরায়োজন চলিতেছে, তাহাতে একটি পরিচালিকা নারী-সৈন্যবাহিনী গঠিত হইয়াছে। তাহার অধিনায়িকার নাম বিচক্ষণা হইয়াছেন কুমারী ফু-চু-উঙ্গ। ইনি বলশেভিক আন্দোলনের সময়েও উহার একজন কর্ম্মিষ্ঠা পরিচালিকা ছিলেন। আশা-করা যায় স্বদেশরক্ষার কার্য্যে নারীর এই সাহায্য গ্রহণ হইবে।

উৎকৃষ্ট প্রস্তাব—

বিভিন্ন বঙ্গ স্ত্রীশিক্ষা-সমিতির যে বার্ষিক অধিবেশন ইয়ং উইমেন্স্ ক্রীশ্চান এসোসিয়েসন (Y.W.C.A.) হলে সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে একটি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্রস্তাবটি এই—আমাদের বালিকাবিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে জীবন ও চরিত্রগত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শসমূহের বিকাশ এবং এই প্রকারে দেশে কর্ম্মঠ চিন্তাশীল ও বলিষ্ঠ নায়ক গড়িয়া তোলাতে সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য আমাদের হস্তে বালকবালিকাদিগের শিক্ষা এমন লোকের হস্তে অর্পণ করা উচিত, যাহার মাঝে বর্ণবিন্যাস, অটল চরিত্র এবং জীবনে মহৎ আদর্শ আছে।"

সেবারূপ কর দান—

কলিকাতায় শিক্ষার্থিনী মেয়েদের জন্য নির্ম্মিত হোষ্টেল গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষে লাট-পত্নী লেডি লিটন বলেন—"এই পৃথিবীতে বাস করিবার জন্য আমরা সেবারূপ কর দিয়া থাকি।" হোষ্টেলটির জন্য এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং একশতটি শিক্ষার্থিনী থাকিবার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে।

সুযোগ্য পুত্রবধূ—

স্বনামধন্য স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের পুত্রবধূ (স্বর্গীয় রায় হারাধন পাল বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী) শ্রীযুক্তা মহারাণী পাল মহোদয়া তাঁহার স্বামী প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা তাঁহার স্থাপিত ৺গোপাল বিগ্রহের নামে দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে শ্রীগোপালের পূজা, অতিথি সেবা এবং বিধবাদের সাহায্য করা হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই প্রচেষ্টা ফলবতী হউক।

শারীরিক শক্তি—

মিস্ ভক্সীবাই নাম্নী একটি বক্ষিণ ভারতীয় মারাঠা সম্ভ্রান্তবংশের একটি মহিলা সার্কেলে চলন্ত মটর গাড়ীর গতিরোধ করতঃ অদ্ভুত শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মহিলাটির বয়স ত্রিশ বৎসর। সুবিখ্যাত পালোয়ান গ্রেকোর রাষ্ট্রপূর্ব্বে ইতিপূর্ব্বে চলন্ত মটরগাড়ী থামাইয়া খ্যাতি হইয়াছিলেন। তাহার এই মারাঠা মহিলাই এই গুরুত্ব অর্জ্জন করিলেন।

মহিলা শিল্প প্রদর্শনী—

কলিকাতা নারীশিক্ষা সমিতি তাঁহাদের নানাপ্রকার কাজের সঙ্গে প্রতি বৎসর মহিলা শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছেন। মহিলাদের হাতের প্রস্তুত নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই সঙ্গে নানাপ্রকার আমোদআহ্লাদ ও বাজনাদের সাহায্যে মাতৃ-কল্যাণকর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এবার আগামী ১৯শে, ২০শে ও ২১শে মার্চ তারিখে তিনটি দিবসের জন্য প্রদর্শনী খোলা হইবে। ১৯শে তারিখে সর্বসাধারণের জন্য এবং অপর দুই দিন স্ত্রীলোকদের দেখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নারীশিল্পে বাংলা গবর্ণমেণ্ট—

লেডীজ বিদ্যালয়ে শিল্প দিয়া শিল্পশিক্ষার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট বাংলার বিভিন্ন স্থানের প্রায় দুইটি বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে সন্তোষজনিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি, এবং নারীশিক্ষা সমিতি—এই দুইটি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বাকীগুলি সমস্তই খ্রীষ্টান মিশনারী বিদ্যালয় দেওয়া হইয়া থাকে। এজন্য গবর্ণমেণ্ট দোষী নহেন। দেশের সাধারণ নারীশিল্পের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়াই গবর্ণমেণ্টের এই দান মিশনারীগণের হস্তে এত অধিক পরিমাণে দেওয়া হইয়া থাকে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন—

আগামী ১৬ই ও ১৭ই এপ্রেল হাওড়া জেলার অন্তর্গত মাজু গ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। এই সম্মেলনের সঙ্গে কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য, কুটীর শিল্প এবং খদ্দরের একটি প্রদর্শনী হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে যাঁহারা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা জেনারেল সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, হাওড়া—ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

জাহাজে বিশ্ববিদ্যালয়

৪৫০ জন ছাত্র ও ছাত্রী লইয়া একখানি জাহাজ আমেরিকা হইতে রওনা হইয়া চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া ইউরোপ অভিমুখে রওনা হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে জাহাজখানি ভারতবর্ষের বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিয়াছিল। সমস্ত পৃথিবী প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ বিদ্যালয়ে করিবেন। জাহাজখানিতে কলেজপূর্ণ লাইব্রেরী, রোষ্টল, খেলার মাঠ ইত্যাদি সমস্তেরই সুবন্দোবস্ত আছে। প্রতিদিন দুইবেলা নিয়মিত ক্লাশ বসিয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীদের বয়স পনর হইতে চব্বিশ বৎসরের মধ্যে। জাহাজটিতে কি বিরাট আয়োজন।

মহাত্মা গান্ধীর বাণী—

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধী কলিকাতার আমেরিকান একটি শোকসভায় বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধানন্দের আত্মত্যাগে হিন্দুসমাজের পাপক্ষালন হৌত করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দু মুসলমান তাঁহাদের স্ব স্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম প্রচার করিতে পারেন। গান্ধীজি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও সংগঠন আন্দোলনের জন্য যে কার্য করিয়াছিলেন তাহা যদি করিতে পারিলে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষা হইবে।

বাঙ্গালায় নারী নির্য্যাতন—

শ্রীযুক্ত আবদুল মোহন গোস্বামী বাঙ্গালায় নারী-নির্য্যাতনের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি কাউন্সিলে জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন—

(ক) গত ১৯২৫ ও ১৯২৬ সনে বাঙ্গালায় কতগুলি নারীহরণ হইয়াছে, উহাদের নাম কি এবং উহারা কোন্ ধর্মাবলম্বী?

(খ) কতজন স্ত্রী এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই এবং তাহারা কোন্ ধর্মাবলম্বী?

(গ) বর্ত্তমান সময়ে আদালতে কতগুলি মামলা ঝুলিয়া আছে এবং সেই সব মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম কি?

(ঘ) কতগুলি নারীহরণে এখন পর্য্যন্ত আসামীদের কোন সন্ধান হয় নাই?

(ঙ) নারীহরণের প্রাবল্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট কি উহাদের দমনের কোন ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক আছেন?

নূতন অবতারের প্রতীক্ষায়—

পৃথিবীতে যত যত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মূলেই একটি অবতারের আবির্ভাব। একটি অবতার পুরাতন হইলেই নূতন অবতারের প্রতীক্ষায় জনসমাজ ব্যাকুল হইয়া উঠে। বর্তমান জগতে সর্বত্র যেরূপ অশান্তির ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে জগতের বিশেষ বিশেষ সাধকগণ ভগবানের পুনরাবতারের আশা ও আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। বিশেষ্ ষ্টাডিবেশাণ্ট প্রভৃতি বিশেষভাবে এই মত প্রচার করিতেছেন।

বর্ষশেষ —

মাতৃ-মন্দিরের তৃতীয় বর্ষ শেষ হইল। আগামী বর্ষে পত্রিকার আকার বড় করা হইবে, এবং বার্ষিক মূল্য তিন টাকা হইবে। বর্তমান চৈত্রে যাঁহাদের মূল্য শোধ হইল, বিশেষ কোন সংবাদ তাঁহাদিগের নিকট হইতে না আসিলে বৈশাখ সংখ্যা ভিঃ পিতে তিন টাকা চারি আনা ধার্য্য করিয়া পাঠাইয়া আগামী বর্ষের গ্রাহক করা হইবে। আশা করি গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ আমাদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করিবেন। অতঃপর আমরা আগামী বর্ষের আয়োজনে নিযুক্ত রহিলাম।

Printed & Published by
ATUL CHANDRA NANDY
ECONOMIC JEWELLERY WORKS.
33, Cornwallis Street, Calcutta.

VIDYODAYA PRESS.
17, Radhanath Shaw Lane
Po. Beadon Street
CALCUTTA.